

ওয়েস্টার্ন
ফেরা
মার্সেনারি
রওশন জামিল

দুটি বই
একত্রে





ফেরা
রওশন জামিল
প্রথম প্রকাশ: ১৯৮৬

এক

কাইবাব জঙ্গল। শীতের বরফ গলে ঝরে পড়ছে গাছের পাতা থেকে। গাঢ় কমলা ভারমিলিয়ন পর্বতচূড়ায় তরল তুষারের ছোপ। পন্ডেরোসা ঝোপের ভেতর কচি পাতা চিবুচ্ছে হরিণের পাল। পাশেই ঝরনার পানিতে খেলা করছে ট্রাউটের ঝাঁক। বাসন্তী রোদে ঝিকিয়ে উঠছে ওদের রূপোলি শরীর। চকিতে পন্ডেরোসার তলায় একটা ছায়া দেখা দিয়েই মিলিয়ে গেল দ্রুত।

পাহাড়ে ঝরনার ধারে কচি ঘাসের ওপর পাঁচটা হরিণ চরছে। গাছের পাতার ফোকর গলে আসা সূর্যকিরণে ওদের পিঠে আলো-ছায়ার খেলা।

নিঝুম পরিবেশ। ঝরনার কোল ঘেষে একটা গাছ, গোঁড়ার মাটি অনেক আগেই ধুয়ে গেছে। গাছটার শিকড়ে চুমু খেয়ে ঝরনার পানি ভেঙে পড়ছে পাথরের ওপর। একটা হরিণ লেজ নাড়ল, রাজকীয় ভঙ্গিতে গ্রীবা বেকিয়ে বাতাসে বিপদের গন্ধ ঝুঁকতে চেষ্টা করল। টের পেল না কিছুই, পাইন বনে দাঁড়ানো ছায়াটা বাতাসের উল্টো দিকে।

ঝিরঝিরে বাতাস ঘাসের ডগা ছুঁয়ে গাছের পাতায় কাঁপন তুলল। ঠিক তক্ষুণি ছায়াটা সূর্যের আলোয় বেরিয়ে এল। একটা লোক, সবচেয়ে কাছের হরিণটা থেকে মাত্র বিশ ফুট দূরে স্থানুর মত দাঁড়িয়ে।

দীর্ঘ একহারা গড়ন। গায়ে ধূসর বাককিনের জ্যাকেট। লম্বা কালো চুল ঘাড় বেয়ে নেমেছে। রোদে পোড়া তামাটে চেহারা। খয়েরি চোখ। হরিণটা আবার মুখ তুলে সোজা তার দিকে না তাকানো পর্যন্ত নিখর দাঁড়িয়ে রইল সে।

চমকে উঠল হরিণটা। ঘোঁৎ করে একটা শব্দ করেই ছুটে পালাল। দেখাদেখি বাকিগুলোও চম্পট দিল। হ্যারি কার্টার কোমরে হাত দিয়ে দাঁড়িয়ে রইল, ওদের উর্ধ্বশ্বাসে পালানো দেখছে।

পাইন বনের ভেতর থেকে আরেকটা লোক বেরিয়ে এল। ছিপছিপে, মুখে বয়সের ছাপ সুস্পষ্ট। পাকা গোঁফ। নীল চোখ জোড়ায় কৌতূকের ঝিলিক।

‘তোমার কী মনে হয়, রাউন্ডি?’ হ্যারি প্রশ্ন করল। ‘পারবে তোমার কোন অ্যাপাচি এর চেয়েও বেশি যেতে? আর এক পা গেলেই ওটাকে ছুঁতে পারতাম আমি।’

ঘাসের ওপর একদলা থুতু ফেলল রাউন্ডি। ‘এর চেয়ে ভাল? অসম্ভব। আমি অন্তত দেখিনি কখনও। সত্যি, হ্যারি, তোমার তুলনা হয় না। ভাগ্যিস আমার পিছু নাওনি তুমি!’ পকেট থেকে পাইপ বের করে হাতের তালুতে ঠুকতে লাগল সে। ‘আমাদেরকে টডস্টল ক্যানিয়নে ফিরে যেতে হবে, হ্যারি। তোমার বাবা খবর পাঠিয়েছে।’

‘কোন গোলমাল?’

‘ম, ঠিক জানি না। তবে দিনকাল খুবই খারাপ যাচ্ছে।’ আমার মনে হয়, তোমার বাবার বোধহয় ইচ্ছে, এবার তুমি দল নিয়ে যাও।’

জোড়াসনে ঘাসের ওপর বসল হ্যারি, চারপাশে চোখ বোলাল। এই বনে-বাদাড়ে ঘুরে বেড়াতেই ভাল লাগে তার, ফিরে যাওয়ার মোটেও ইচ্ছে নেই। তা ছাড়া ওখানে গিয়ে যে-অবস্থার মুখোমুখি হতে হবে সেটাও তার পছন্দ নয়। ‘বোধকরি তোমার কথাই ঠিক, রাউন্ডি। বাবা বলেছিল এই বসন্তেই আমাকে দলবল নিয়ে বেরোতে হবে। তা সে-সময়ও তো এসে পড়েছে।’

একটা ঘাস ছিঁড়ে নিয়ে চিবুতে লাগল ও। ‘তা এবার কোথায় যাবে ওরা তাই ভাবছি?’

‘যেখানেই যাক না কেন, প্ল্যানে কোন খুঁত থাকবে না। তোমার বাবা একজন তুখোড় সেনাপতি হতে পারত, হ্যারি। সে-যোগ্যতা তার ছিল। কোন কিছুই ভোলে না সে।’

‘তুমি তো দীর্ঘ দিন তার সাথে আছ, তাই না?’

‘তা মালা দিন তো হলোই। ও যখন তোমায় পুঁথি নেয় তারও আগে থেকে। সেই যুদ্ধের সময়, ঠিক কত সালে আজ আর মনে নেই, মেক্সিকোতে ওর সাথে আমার প্রথম দেখা হয়। আমি তখন সব কৈশোরে পা দিয়েছি।’

ঘাসের ওপর পড়ে থাকা একটা পাইনফল কুড়িয়ে নিল সে। ‘বাছা! এই যে!’ টসকি মেরে ফলটা শূন্যে ছুঁড়ে দিল রাউন্ডি।

নিমেষে হ্যারির খাপমুক্ত পিস্তল খুক করে কেশে উঠল। তারপর আবার। দ্বিতীয় গুলিটা শূন্যেই ফলটাকে বাদামি পাউডারে পরিণত করল।

‘মন্দ নয়,’ বলল রাউন্ডি, ‘তবে বড্ড তাড়াহুড়ো করো। নিশানা স্থির করে তবে মারবে। অধিকাংশ সময়েই একটার বেশি সুযোগ পাবে না তুমি, হ্যারি।’

বনের ভেতর দিয়ে ফিরতি পথ ধরল ওরা। পাশাপাশি হাঁটছে। পুরু কার্পেটের মত পাইনপাতায় ছাওয়া জমি। মাঝে-মাঝে ঝড়ে ভাঙা গাছ-গাছালির ফাঁক দিয়ে দূরের সান ফ্রান্সিসকো পাহাড়ের শীর্ষমালা দেখা যাচ্ছে। মেঘ জমেছে ওগুলোর মাথায়। সঙ্গে তরুণ যুবকের মত রাউন্ডি অতটা লম্বা নয়, তবে হাঁটছে। কাঠুরিয়াদের মত দীর্ঘ স্বচ্ছন্দ পা ফেলে। জঙ্গলের শেষ মাথায় এসেও নীরবতা ভাঙল। ওখান থেকে দুর্গম, পাথুরে ক্যানিয়ন এলাকা স্পষ্ট দেখা যায়। ‘তোমার বাবা ভারি চমৎকার জায়গা বেছে নিয়েছে। ঈশ্বরের দুনিয়ায় ওখানে কেউ খুঁজে পাবে না তাকে।’

‘ইন্ডিয়ানদের কথা ভুলো না,’ হ্যারি মনে করিয়ে দিল। ‘মরমনদেরও কেউ কেউ ওই অঞ্চলটা ভাল করেই চেনে।’

‘তোমার বাবা যেমন ওদের চটায় না, তেমনি ওরাও তাকে ঘাঁটায় না,’ রাউন্ডি বলল। ‘এজন্যেই দলকে কড়া শাসনে রাখে সে।’

আবার নীরবে হাঁটতে লাগল দু’জন। মাঝেমাঝেই থেমে ভীষণ চোখে পথ-ঘাট লক্ষ্য করছে হ্যারি। বোঝার চেষ্টা করছে ওরা যাওয়ার পর এই পথ দিয়ে আর কেউ গেছে কি-না। ‘এই জিনিসটা আর কখনও কোরো না,’ বলল রাউন্ডি।

যে-পথ দিয়ে গেছ সে-পথে না ফেরাই ভাল। ওঁৎ পেতে কেউ বসে থাকতে পারে।'

'কে থাকবে?'

'হ্যাঁ। সেটাও একটা প্রশ্ন বটে। তোমার ব্যাপারে তোমার বাবার ইচ্ছের কথা অবশ্যি কারও জানার কথা নয়; কিন্তু, বলা যায় না, জানতেও তো পারে। একটা কথা মনে রেখো, বাছা, কোন কিছুই দীর্ঘ দিন গোপন থাকে না। আর, বাজি ধরতে পারো তুমি, দলের কেউ না কেউ ঠিকই মাথা ঘামাচ্ছে তোমাকে নিয়ে।'

আবার থামল ওরা, চারপাশ দেখে নিল ভাল করে। তারপরই রাউন্ডি সে-ই প্রশ্নটা করল যেটা ওকে আজ ক'মাস হলো বেশ ভাবিয়ে তুলেছে। 'হ্যারি, দলের ভার বেন তোমাকে নিতে বললে কী করবে তুমি?'

'নেব। এ ছাড়া আর কী-বা করতে পারি বলো?'

'ভেবে বলছ তো? সত্যি সত্যি আউট-ল হতে চাও তুমি?'

'আমাকে মানুষ করার পেছনে এটাই তো কারণ, তাই না?' হ্যারির কণ্ঠস্বরে তিক্ততার স্বাদ।

'হ্যাঁ, তা অবশ্যি ঠিক।' জুতোর ডগা দিয়ে একটা পাইনপাতা পিষে দিল রাউন্ডি। 'কিন্তু জীবনটা তো তোমার। বেন কারির নয়। সে চাইলেই তার মত করে তোমার জীবন চালাতে পারো না তুমি।'

'একটা জিনিস মনে রাখা দরকার, হ্যারি, দিনকাল বদলেছে। বেন আর আমি প্রথম যখন আসি, তখন এই এলাকা ছিল দুর্গম; বুনো। কিন্তু এখনকার পরিবেশ আলাদা। মানুষজন আসছে, বসত গাড়ছে। বাড়ি বানাচ্ছে।'

'এখন পালানো অত সোজা হবে না। বেন আর আমি যখন আসি তখন সব কিছুই ছিল খোলামেলা। গরীব মানুষের ওপর ব্যাংকগুলো ছিল খড়্গহস্ত। লালবাতি জ্বালাবার জন্য মুখিয়েই থাকত সর্বদা। রেল-রাস্তার কল্যাণে বড় বড় বাথান মালিকদের তখন পোয়াবারো। ফলে ব্যাংক বা ট্রেন ডাকাতি নিয়ে সাধারণ মানুষ বিশেষ মাথা ঘামাত না। তবে খুন-খারাবি, বিশেষ করে বউ-ছেলেমেয়েসহ-তার কথা আলাদা। ব্যাংক বা ট্রেন ডাকাতি হলে পুলিশ পিছু নিত যতটা না ধরা, তার চেয়ে বেশি মজা করার জন্য। এর মাধ্যমে আসলে একঘেয়েমি দূর করত ওরা। ডাকাতকে ধাওয়া করত ঠিকই, তবে ধরার ব্যাপারে খুব একটা চেষ্টা-চরিত্রের করত না।'

'কিন্তু মানুষ মারলে আর উপায় ছিল না। তখন ঠিকই ধরার জন্যে উঠে-পড়ে লাগত। এবং ফাঁসিতে লটকে তবে ছাড়ত। এজন্যেই বেন কারি খুন-খারাবির ভেতর যায়নি কখনও। এবং দলের একজন তার নির্দেশ অমান্য করায় নিজ হাতে তাকে খুন করেছে।'

'তা হলে ওটা গল্প নয়, সত্যি?'

'আমি নিজের চোখে দেখেছি। লোকটার নাম নিক টমাস। বন্দুকে ওর হাত খুব ভাল ছিল। কথায় কথায় পিস্তল বের করত। সেবার ওয়াশিং সিটিতে ব্যাংক লুট করতে গিয়েছিল ওরা। ফেরার পথে আচমকা একটা লোক ওদের

সামনে পড়ে যায়। নিক টমাস তাকে মেরে ফেলে।

‘সবার চোখের সামনেই ব্যাপারটা ঘটে। এটা যে ইচ্ছেকৃত, তাও বুঝতে পেরেছিল সকলে। তো প্রায় মাইল চারেক যাওয়ার পর বেন থামার নির্দেশ দিল। তারপর নিকের দিকে ঘুরে বলল, “নিক, খুন-খারাবির কথা না নিষেধ করেছিলাম আমি।”

‘জবাবে তাচ্ছিল্যের সুরে নিক বলল, “কী করব, একেবারে সামনাসামনি পড়ে গেল। তা ছাড়া সামান্য বাথানকমী বই-তো আর নয়!”

‘বেন কারি বলল, “কিন্তু আমি যেটা বলি, সেটাই অইন।”

‘কর্কশ সুরে নিক বলল, “তো?” বেন গুলি করল ওকে। নিক দেখতে পেয়েছিল, তবে দিস্তল বের করার সময় পায়নি। পুলিশের চোখে পড়ার জন্যে ওর লাশটা ওখানেই ফেলে রেখে আসে বেন।’

‘কিন্তু কোণঠাসা হয়ে পড়লে কী করত?’

‘সে-কথা আলাদা। আসলে তোমার বাবা খামোকা রক্তপাতের বিরোধী। কথটা চাউর হতে সময় নেয়নি। আউট-লরা যেমন, তেমন শহরবাসী, বাথান-মালিক আর আইনের লোকেরাও জানল।’

‘এ-ব্যাপারে বেশ কিছু গল্প শুনেছি আমি।’

‘শোনার কথাও। বেন কারি তো তখন রূপকথার নায়ক। আসলে সে-যুগে একটু ডাকাবুকো হলেই এসব করা যেত। এমনও অনেক দেখা গেছে যে, কোন বেকার বাথানকমীই হয়তো স্টেজ লুট করে ফেলেছে। কিন্তু এখন আর সে-দিন নেই। মানুষ বাড়ার সাথে সাথে দৃষ্টিভঙ্গিও পাট্টাচ্ছে। তবে আসল সমস্যা বেন নিজেই।’

‘কেন, দল কি খুব বড় হয়ে গেছে?’

‘তা নয়তো কী? তোমার বাবার এলাকা নিউ ইয়র্ক অঙ্গরাজ্যের চেয়েও বড়। সব তার বুড়ো আঙুলের তলায়। পশ্চিমে যারা চেনে, তারা সবাই ভয় পায় তাকে। তবে এদের সংখ্যা খুব বেশি নয়।

‘একেবারে নিজের খাস লোকেরা বাদে বহুকাল হলো আর কেউ দেখেনি তাকে। খুব কম লোকই ওর ক্ষমতার দৌড় সম্পর্কে জানে। কেবল একটা জনরব প্রচলিত: কাছে-ভিত্তেই কোন এক লোক থাকে, যার অধীনে শতাধিক আউট-ল রয়েছে। তবে লোকে এসব কথা বড় একটা বিশ্বাস করে না, আর এটাই ওর সাফল্যের চাবি-কাঠি।

‘দলের লোকেরা একটা নির্দিষ্ট জায়গায় গিয়ে মিলিত হয়। একা-বা জোড়ে যায়। তবে কখনোই এক সাথে হয়ে তিনজনের বেশি নয়। তারপর কাজ শেষে ফের ছত্রভঙ্গ হয়ে যায়।

‘প্রতিটা কাজের পরিকল্পনা সে নিজে করে। কুচিৎ-কখনও মাতব্বর গোছের কাউকে নিয়ে এ-ব্যাপারে আলোচনায় বসে। নিজে বা বিশ্বাসী কোন লোক দিয়ে যেখানে ডাকাতি করবে সেই এলাকাটা ভাল করে জরিপ করিয়ে তবে প্র্যান ফাঁদে। তারপর কয়েকবার মহড়া দিয়ে অপারেশনে যায়।

‘বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই ডাকাতির দোষ পড়ে কোন বেকার বাথানকমী বা

জেসি জেমস বা আর কারও ওপর। তার এলাকা ক্যানাডা থেকে মেক্সিকো এবং সান অ্যানটনে থেকে লস এঞ্জেলস পর্যন্ত বিস্তৃত।

ট্রেইল ধরে হাঁটা দিল রাউন্ডি। 'মানছি এ-সবের পেছনে ওর মাথা কাজ করেছে। কিন্তু ভুললে চলবে না যে আসলে ওর পিস্তলের ভয়েই রা করেনি কেউ। পরের দিকে অবশ্যি ওগুলো আর বের করার দরকার হত না। এখন নিয়ম-শৃঙ্খলার দিকটা কার্ব পেরিন, রিগার মলিনা, বা আর কেউ দেখে। বেন কারি এখন অসম্ভব ফুলে-ফেঁপে উঠেছে। রাজার মত। আর রাজার বয়েস দিন গেলে কমছে না।'

ট্রেইলের ওপর থেমে ঘুরে দাঁড়াল সে। 'তোমার কী মনে হয়, পেরিন যখন ওনবে তুমি দলের ভার নিচ্ছ, তখন হাত গুটিয়ে বসে থাকবে?'

'বরং অবাকই হব তাতে,' চিত্তিত গলায় বলল হ্যারি। 'আমার ধারণা তলে তলে কোন ফন্দি এঁটেছে ও।'

'কোন সন্দেহ নেই তাতে, বাজি ধরতে পারো-তুমি। মলিনার অবস্থাও তাই। দরকার হলে খুন করতেও দ্বিধা করবে না ওরা। তোমার বাবার ভয়েই সম্ভবত এখনও চুপ করে আছে। কিন্তু সময়ে ঠিক চোখ ওল্টাবে। এবং আমার ধারণা তার আর দেরি নেই।'

'এত তাড়াতাড়ি?' হ্যারির গলায় সন্দেহের ছোঁয়া।

'হ্যারি, তোমাকে কোনদিন বলিনি, আর আমি জানি বেনও বলেনি যে ওর সংসার আছে।'

'সংসার!' বিস্মিত গলায় বলল হ্যারি। 'কিন্তু আমি...!'

'হ্যাঁ। স্ত্রী আর দুই মেয়ে। তারা অবশ্যি জানে না যে ও একজন আউট-ল। আর বললেও বিশ্বাস করবে না। টাকসন-এর কাছাকাছি কোথাও থাকে ওরা। রেড ওয়াল ক্যানিয়নে ওর যে বাথানটা আছে সেখানে মাঝে-মধ্যে বেড়াতে আসে। মানুষে জানে ভয়েল ব্যাগান নামে এক লোক ওই বাথানের মালিক। বেন সেখানে ওদের সাথে দেখা করে।'

'আর কে জানে এ-কথা?'

'কেউ না। তুমিও বলো না কাউকে। বেনের বরাবর একটা ছেলের শখ ছিল। কিন্তু হয়নি। তাই তোমার জন্মদাতা যখন মেসিলায় নিহত হলো, বেন তোমাকে নিজের ছেলে হিসেবে মানুষ করার দায়িত্ব নিল। তাও সে আজ কম করে হলেও আঠারো বছর আগের কথা। আর সেই তখন থেকেই তোমাকে নিয়ে অনেক চিন্তা-ভাবনা করেছে ও। আমাকে বহু পরে বলেছে তোমাকে ওর উত্তরাধিকারী বানাবে।'

'আমার জন্মদাতা বাপ, পরিবার এদের ব্যাপারে কিছু জানো?'

রাউন্ডি কাঁধ ঝাঁকাল। 'আমি ভাসা ভাসা যতটুকু জানি, তোমার আসল বাপ আপাচিদের হাতে মারা গেছে। তুমি তখন ঝোপ-ঝাড়ের মধ্যে কোথাও ছিলে। অতর্কিতে হানা দিয়ে ওরা তোমার বাবাকে মেরে তোমাদের ঘোড়া আর ওয়াগন লুট করে। এল-পাসো থেকে একদল সৈন্য ওদের পিছু ধাওয়া করছিল। ওই সৈন্যরাই তোমাকে শহরে নিয়ে আসে। ওদের কাছ থেকে বেন তোমার ভার

নেয়।

‘ওর দয়া।’

‘হ্যাঁ, ঠিক। সে-যুগে এমন একটা কাজ করার জন্যে খুব বেশি লোক পাওয়া যেত না। অধিকাংশ লোকই কোন দায়দায়িত্ব ঘাড়ে নিতে চাইত না। প্রথম দিকে বেশ ক’বছর কেবল তোমরা দু’জনেই ছিলে—বেন আর তুমি। যা জানে তার সবটাই তোমাকে শেখাতে চেষ্টা করেছে।

‘এই যে, দ্যাখো, অ্যাপাচিদের মত ট্রাক করতে পারো তুমি। জঙ্গলে একদম ছায়ার মত মিলিয়ে যাও। আর বেন কারি নিজেও তোমার মত এত দ্রুত আর নির্ভুল নিশানায় বন্দুক চালাতে পারবে কি-না সন্দেহ। পোষ মানে এমন যে-কোন জন্তু-জানোয়ারের পিঠে চড়তে পারো তুমি। তাস, পাশা, কলেত ইত্যাদিতে যে-কৌশল তুমি জানো না, তা আর কেউ জানে না। ছুরিতে দক্ষ, খালি হাতে লড়তে পারো। যে-কোন সিন্দুক বা তাল ভাঙার ওস্তাদ।

‘এগুলো ছাড়াও যে-কোন পরিবেশে যাতে মানিয়ে নিতে পারো সেজন্যে তোমার ভাল শিক্ষা-দীক্ষার ব্যবস্থা করেছে সে। আমার সন্দেহ আছে তুমি যা পেয়েছ, এমন শিক্ষা, প্রশিক্ষণ আর কেউ পেয়েছে কিনা। এখন তোমার হাতে সব ছেড়ে দিতে চায় বেন।’

‘যাতে বউ-মেয়েদের সাথে গিয়ে থাকতে পারে?’

‘হ্যাঁ। নীরবে সরে পড়তে চাইছে ও। তারপর দূরে কোথাও গিয়ে শান্তিতে বসবাস করবে। শেষ বয়েসে একটু আরাম করতে চাইছে। একটা ব্যাপার লক্ষ্য করো, হ্যারি, দুনিয়াতে একটা জিনিসকেই বেন ভয় পায়—দারিদ্র্য। ছেলেবেলায় এটা যথেষ্ট সয়েছে ও। আমার ধারণা, তোমাকে পুষ্টি নেয়ার পেছনে এটাও একটা কারণ। ও ঠিকই বুঝতে পেরেছিল কীসের বিরুদ্ধে লড়তে হবে তোমাকে।

‘এখন সে প্রচুর পয়সাকড়ির মালিক। কিন্তু, জানে, একজন যোগ্য উত্তরসূরি না পেলে বেঁচে ফিরতে পারবে না সে। আর তাই তোমাকে ওর প্রয়োজন।’

‘পেরিনকে দিলেই তো হয়?’

‘এর জবাব তুমি জানো। পেরিন অত্যন্ত নীচ-প্রকৃতির মানুষ, তা ছাড়া খুব ভয়ঙ্কর। বেন কারির জায়গায় অন্য কেউ হলে, আদিনি ও সব হজম করে ফেলত। ডান হাত হিসেবে ভাল, কিন্তু নেতা হিসেবে একদম বাজে। মলিনারও সেই একই দশা। বেনের হাতে মারা পড়ার ভয় না থাকলে এতদিনে ও অন্তত পঞ্চাশটা লোক খুন করত।

‘নাহ, ওদের দু’জনের কেউ-ই পারবে না। নিজেদের মধ্যে মারামারি করে দু’মাসের ভেতর সব নিকেশ করে দেবে: তার চেয়েও বড় কথা, দলের ভেতরে-বাইরে প্রচুর লোক মারা পড়বে এতে।’

রাউন্ডি যা বলছিল তার প্রায় কিছুই হ্যারির কাছে নতুন নয়। তবু একটা জিনিস ওকে কৌতূহলী করে তুলল, হঠাৎ আজ কেন এই বৃদ্ধ এসব প্রসঙ্গ তুলছে। অসমবয়সী এই দু’জনের বন্ধুত্ব দীর্ঘ দিনের। মনের মিল আর চেনাশোনাও প্রগাঢ়, খুব কমই এমনটা দেখা যায়। এক সাথেই থাকে ওরা,

ক্ষুধা-ভৃক্ষা, ঝড়-বাদল সয়ে মরুভূমি আর পাহাড়ে পাহাড়ে ঘুরে বেড়ায়। কেবল মাঝে-মাঝে সকলের সাথে দেখা করতে টডস্টুল ক্যানিয়নের ডেরায় ফিরে যায়।

রাউন্ডির এ-সব কথা বলার পেছনে নিশ্চয়ই কোন কারণ আছে। ধৈর্য ধরে ওর কথা শুনতে লাগল হ্যারি। ও জানে, রাউন্ডি খুব কম কথা বলে। আর যখন বলে তখন কোন বিশেষ উদ্দেশ্য নিয়েই বলে, এমন কোন বিষয়-যার গুরুত্ব আছে। একমনে কথা শুনলেও আশপাশের কোন কিছুই হ্যারির নজর এড়াচ্ছে না। ঝরনার কাছে জংলা ঘাসের ভেতর দিয়ে একটা তিতির হেঁটে গেল, ওদের সামনেই একটা গাছের ডালে কাঠবিড়ালী খেলা করছে। আর ওরা যে-পথ দিয়ে হেঁটে এল মিনিট দুয়েক আগেই একটা নেকড়ে সেই রাস্তাটা পার হয়েছে।

রাউন্ডি বছবার বলেছে ও নাকি আগে কাঠুরিয়া ছিল। আর হ্যারিও লক্ষ করেছে যে, বনে-বাদাড়ে, দুর্গম এলাকায় রাউন্ডি অনেক স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করে। দলের-নেতৃত্ব নেয়ার ভাবনাটা পাষাণের মত চেপে বসে আছে তার বুকে। সে বরাবর জানে, একটা সময়ে এই দায়িত্ব তার ঘাড়েই বর্তাবে, সে-ভাবেই তৈরি করা হচ্ছে তাকে। এতদিন সে-সম্ভাবনাটা নিরাপদ দূরত্বেই ছিল, কিন্তু আজ আগুনের আঁচ তাকে ছুঁতে চলেছে।

সে কি দায়িত্ব নিতে ভয় পাচ্ছে? নাকি ভয়টা এমনি এমনি; কোন কারণ নেই, অমূলক? কিন্তু মনের গহীনতম প্রদেশ হাতড়েও ভয় নামক কোন বোধ খুঁজে পেল না হ্যারি। দায়িত্ব নিতে সে ভয় পায় না, এ-বিষয়ে নিজের ভূমিকার ব্যাপারে সে অনেক আগে থেকেই নিঃসংশয়, নিশ্চিত। ফলে এটা কোন সমস্যাই নয়।

কার্ব পেরিন আর রিগার মলিনার কথা ভাবল ও। সে কি ভয় পায় ওদের? না। সে-ই ছেলে বেলা থেকেই দু'জনের সাথে তার সম্পর্ক ভাল, বিশেষ করে মলিনার সাথে। তবে ওর বয়েস বাড়ার সাথে সাথে ওরা একটু দূরে সরে গেছে। তাকে কী জন্যে তৈরি করা হচ্ছে সেটা কি ওরা জানে?

ওরা তাকে চেনে, কিন্তু কতটুকু? যেমন ওদের কেউ-ই অন্তত তার জানা মতে, ওকে কখনও গুলি ছুঁড়তে দেখেনি।

রাউন্ডির কথায় ওর চিন্তায় বাধা পড়ল। 'হ্যারি,' বলল সে, 'লোকসংখ্যা দিন দিন বাড়ছে। গেল বছর বেশ ক'বার বিপদে পড়ে গিয়েছিল আমাদের ছেলেরা। কোন মতে প্রাণ নিয়ে পালিয়েছে। সাধারণ মানুষ চায় না তাদের কাজে-কর্মে ব্যাঘাত ঘটুক। ফলে এবারেও আমাদের ছেলেরা আগুনে ঝাঁপ দিতে যাচ্ছে।

মানুষ এখন খুনে-ভাকাতকে আর আগের চোখে দেখে না। আজ আর সে বলাহীন তারুণ্যে ভরপুর কোন যুবক নয়, এখন সে খারাপ লোক, সমাজের জন্যে ক্ষতিকর, যে মানুষের তিলে তিলে সঞ্চিত ধনসম্পদ কেড়ে নিতে চায়।

এখন তারা একজন আউট-লকে নেকড়ের সাথে তুলনা করে, এবং সবাই মিলে তাকে তাড়া করে। তাই এতে জড়াবার আগে ভাল করে ভেবে চিন্তে নাও।

তুমি বেন কারিকে চেনো। আমি জানি তুমি ভালবাস তাকে, যেমনটা বাসা উচিত। তোমার জন্যে সে যথেষ্ট করেছে। কিন্তু এটাও ঠিক যে, তোমাকে

একজন দস্যু হতে বাধ্য করতে পারে না বেন। সে তার নিজের ইচ্ছেয় নিজের পথ বেছে নিয়েছে, সেখানে কারও কিছু বলার নেই। তেমনি তোমারও নিজের ভাগ্য গড়ার স্বাধীনতা থাকা উচিত।

‘একজনের ইচ্ছে আরেকজনের ওপর চাপিয়ে দেয়ার অধিকার কারও নেই। “তোমাকে এই হতে হবে,” বলে কেউ কাউকে বাধ্য করতে পারে না। তুমি দস্যু হতে চাও কি-না, সে-প্রশ্ন তোমায় কেউ কোন দিন করেনি, যদিও ছেলেমানুষ হিসেবে তুমি হয়তো “হ্যাঁ” বলতে। দূর থেকে ব্যাপারটাকে রোমান্টিক আর রোমাঞ্চকর মনে হয় বটে, কিন্তু আমার কথা বিশ্বাস করো, আদর্শ তা নয়। ভীষণ নোংরা, কদাকার দুনিয়া। নীচ, আজ-বাজে প্রকৃতির লোকজনের সাথে ওঠা-বসা; সস্তা বাজারে মেয়েছেলের সাথে সঙ্গতের মত, যে কিনা একজন আউট-লর মতই ফাঁকতালে বোজগারের ধান্দায় ঘোরে।’

নিভে যাওয়া পাইপটা ধরানোর জন্য থামল বুড়ো, ওর পরবর্তী কথা শোনার অপেক্ষায় রইল হ্যারি। ‘আমার মতে, প্রতিটা লোকেরই নিজের পথ বেছে নেয়ার অধিকার আছে। এবং, বেন তোমার জন্যে যাই করুক না কেন, তোমারও সে-অধিকার আছে।’

‘জানি না কী করবে তুমি, তবে দলের বাইরে থাকার সিদ্ধান্ত নিলে সে-সময়টায় আমি কাছাকাছি থাকতে চাই না। বেচারী বেনের হাত-পা একেবারে বাঁধা পড়ে যাবে। সত্যি বলতে কী, ও কখনোই তোমার মতামত জানার চেষ্টা করেনি। দায়িত্বটা কারও হাতে দিয়ে নিজে সরে পড়ার চিন্তায় মশগুল থেকেছে সর্বদা।’

‘এখানে সে একটা কিছু গড়েছে। এ-নিয়ে তার এক ধরনের গর্বও আছে। যে কোন কাজেই বেন সফল হতে পারত, কিন্তু ওর চিন্তা-ভাবনা সরলপথে চলে না। তা ছাড়া বহুকাল ধরে ও আর অপারেশনে যায় না। তাই এখনকার পরিস্থিতি ওর একদম অজানা।’

‘হ্যাঁ, প্র্যান ও নিজেই করে বটে। কিন্তু মানুষের মতিগতি কীভাবে বদলাচ্ছে তা তো আর দেখতে পায় না। ওদের কথাবার্তাও শুনছে না সে। জীবন মানে এখন আর শুধু সেলুনে বসে মদ খাওয়া আর জুয়া খেলা নয়। এখন মানুষ গির্জায় যায়, ছেলেমেয়েদের স্কুল আছে। ফলে কেউই চায় না তাদের বাচ্চারা স্কুলে যাওয়ার সময় গোলাগুলির সামনে পড়ক।’

‘ঠিক এই মুহূর্তে তুমি একজন সৎ মানুষ। সঙ্গীতের মতই নির্মল। কিন্তু যে-ই আউট-ল হবে অমনি অনেক কিছুই বদলে যাবে। ভুলো না, তোমাকে খুনও করতে হবে। আত্মরক্ষা বা দেশরক্ষার জন্যে খুন এক কথা, কিন্তু টাকা-পয়সা বা ক্ষমতার জন্যে একদম আলাদা ব্যাপার।’

‘তোমার কী মনে হয়, পেরিনা কিংবা মলিনাকে মারতে হবে আমার?’

‘যদি ওরাই না আগে তোমাকে খতম করে। বন্দকে তোমার হাত ভাল, হ্যারি। বেন কারিকে বাদ দিলে, আমার দেখায় তুমিই শ্রেষ্ঠ। কিন্তু একটা নিশানা ভেদ আর মানুষ খুন, যে নাকি আবার পাল্টা তোমাকেও মারতে পারে, এক জিনিস নয়।’

‘বিলি দ্য কিড, লিংকন কাউন্টির সেই বন্দুকবাজের কথাই ধরো। কিংবা ফ্রাংক অ্যান্ড জর্জ কো, ডিক ব্রিউয়ের, জেসি ইভানস-এরা প্রত্যেকেই হয়তো বেনের মতই পাকা শিকারী। কিন্তু তফাতটা মানুষের অন্তরে-সাহস, মনোবল। গোলাগুলির সময় বেন বরফের মত শীতল। অচঞ্চল। কোন উত্তেজনাই ওকে তখন স্পর্শ করতে পারে না।

‘কার্ব পেরিনও সে-রকম। ধীর-স্থির, শিলার মত অটল। রিগার মলিনা হলো। চঞ্চল কিন্তু গোফুরো সাপের মত মারাত্মক।

‘একবার জুলসবার্গ-এ পাঁচজন লোক কোণঠাসা করেছিল ওকে। গোলাগুলি শেষ হতে দেখা গেল ওদের চারজন অন্ধা পেয়েছে। আর পঞ্চম জনের একটা হাত গুলিতে গুঁড়িয়ে গেছে। মলিনা নিজের শক্তিবলে চলে। নেকডের মত ধূর্ত আর ভাল্লুকের মত হিংস্র।’

থেমে একগাল ধোয়া ছাড়ল রাউন্ডি। ‘আগে হোক পরে হোক মোকাবেলা একটা হবেই, হ্যারি। ওদের যে-কোন একজন হতে পারে, আবার দু’জন হওয়াও বিচিত্র নয়। ঈশ্বর তোমার সহায় হোন!’

দুই

রাউন্ডির কথা শোনার ফাঁকে হ্যারির মনে পড়ল, কাউকে বিশ্বাস করতে ওকে পইপই করে নিষেধ করেছে বেন কারি। যে-কোন লোকের কাছ থেকে আচমকা আঘাত আসতে পারে। তা ছাড়া অতি বিশ্বাসী লোকও অনেক সময় ঝোঁকের বশে বা ঘাড় বাঁচাতে বেফাঁস কথা বলে। অজানা জিনিসে কখনোই আস্থা রাখতে নেই।

সভাবতই বেনের কথা আর কাছে কোন তফাত নেই। কারণ এই খানিক আগে পর্যন্ত হ্যারি কল্পনাও করেনি যে টডস্টল ক্যানিয়নের বাইরে বেনের আর কোন সংসার থাকতে পারে। এটা অবশ্যি ঠিক যে প্রায়ই সে উধাও হয়ে যায়। কিন্তু সেক্ষেত্রে সবাই ধরে নেয় পরবর্তী কোন অপারেশনের ব্যাপারে ঝোঁজ-খবর করতে গেছে বেন। তথ্য সংগ্রহে ওর যে-সব খাস লোক আছে তাদেরকে নেড়ে-চেড়ে দেখতে গেছে।

নিজের পাথর বাড়িতে বেন সভা না ডাকা পর্যন্ত কেউ-ই জানতে পায় না পরবর্তী কাজটা কী ধরনের বা কোথায় হবে। সে-সময় ওর বিরাট নকশা আঁকা কাগজ। যেখানে ডাকাতি করবে সেটা শহরের কোন জায়গায় অবস্থিত, ঢোকা এবং বেরুবার রাস্তা, বিভিন্নয়ের নকশা-সবই থাকে সেখানে। এমনকী সেখানে যারা কাজ করে ডাকাতির সময় তাদের কী প্রতিক্রিয়া হতে পারে তাও ওই সভায় আলোচিত হয়।

ম্যাপে অবশ্যি শহরের নামটা থাকে না। সভায় উপস্থিত কেউ চিনে ফেললে তাকে চুপ থাকতে নির্দেশ দেয়া হয়।

ক্যানিয়ন থেকে অপারেশন এলাকার দূরত্ব হিসেব করে পালাবার জন্য কয়েকটা রাস্তা বাছাই করা হয়, যাতে বিপদের সময় যে-কোন একটা ব্যবহার করা যায়। তরতাজা ঘোড়া, এমনকী ফাস্ট-এইডের ব্যবস্থাও মজুদ থাকে। যে-কোন কাজের পরিকল্পনা কয়েক মাস আগে থেকেই শুরু হয়। এবং শেষ মুহূর্তে একবার খতিয়ে দেখা হয়, কোথাও কোন ত্রুটি রয়ে গেছে কিনা।

প্রয়োজনে পা ঢাকা দেয়ার জন্য বিভিন্ন জায়গায় শেল্টারের ব্যবস্থা থাকে। এগুলোর কোনটাই তরুণদের ডেরা বলে পরিচিত নয়। কেবল সঙ্কট-মুহূর্তেই কোন একটা বিশেষ শেল্টারের ঠিকানা জানানো হয় এবং বলতে গেলে, কখনোই একটা জায়গা একবারের বেশি দু'বার ব্যবহৃত হয় না।

রাউন্ডির যা অনুমান, ওইসব পরিকল্পনার সাথে হ্যারির যোগ তার চেয়ে অনেক বেশি। বেন কারির কর্মপদ্ধতির সাথে পরিচিত হওয়ার জন্য বেশ ক'বছর হলো সে নিয়মিত ডাকাতি পরিকল্পনায় যোগ দিচ্ছে।

‘এমন দিন আসবে,’ বেন কারি বলেছে, ‘যখন তোমাকে যেতে হবে ওদের সঙ্গে। সে-জন্যে তৈরি থাকতে হবে তোমাকে। সব সময় যেতে হবে না, তবে দু'একবার যাওয়া দরকার। এতে করে তোমার আত্মবিশ্বাস বাড়বে, আর ওরাও তোমার যোগ্যতা বুঝতে পারবে। যখনই যাও না কেন নেতৃত্ব দেবে তুমি।’

‘ওরা মানবে সেটা?’ হ্যারি শুধিয়েছিল।

‘আলবৎ মানবে। আমি বলে দেব, তবে তোমার যোগ্যতা তোমাকেই প্রমাণ করতে হবে-আর একটা কথা, গোলাগুলি করবে না কিন্তু। হয় তুমি এভাবেই দল চালাবে, নয়তো ধরে নেব, আমি যাকে খুঁজছি সে তুমি নও।’

আজ পেছনের দিকে তাকিয়ে হ্যারি অনুভব করেছে কত যত্নের সাথে ধীরে ধীরে, একটু একটু করে তাকে সব কিছু শিখিয়েছে বেন কারি। খেয়াল করেছে কতটা নিতে পারছে ও। বেন ইচ্ছে করেই ওকে তার দলের কারও সাথে মিশতে দেয়নি। একমাত্র রাউন্ডি-এর ব্যতিক্রম। তবে ওকে আর সকলের সাথে এক কাতারে ফেলা যায় না, ডাকাতির সাথে তার কোন সম্পর্কই নেই। এই বদ্ধ পাহাড়িয়ার কাছেই সে ইন্ডিয়ানদের যত কলা-কৌশল শিখেছে। পাহাড়-পর্বতের রহস্য চিনেছে। বেন আর রাউন্ডি-দু'জনেই তাকে এমন সব ট্রেইল চিনিয়েছে যেগুলোর খবর আর কেউ জানে না। বহুবার দলের অন্যেরা ওর পেট থেকে তথ্য আদায়ের চেষ্টা করেছে, কিন্তু সে এমন ভাব করেছে যেন কিছুই জানে না।

রাউন্ডির কাছ থেকে পাওয়া নতুন তথ্যটাই ওকে বেশি ভাবিয়ে তুলেছে। যে-বেন কারিকে ও চেনে সে হিংস্র আর দুর্দান্ত হলেও, হ্যারির কাছে সে মহানুভব দয়ালু এক মানুষ যে কর্তব্যের খাতিরে কঠোরও হতে পারে। তাকে সে বটগাছের ছায়া দিয়েছে, নিজের ছেলের মত মানুষ করেছে। কিন্তু হ্যারি ঘুণাঙ্করেও আঁচ করতে পারেনি কোন দিন যে বেনের স্ত্রী-কন্যা আছে। অত্যন্ত চতুরালির সাথে সব দিকে তাল বজায় রেখেছে বেন।

‘তুমি কোন অপরাধ করেনি,’ রাউন্ডি বলল। ‘পুলিসের খাতায় তোমার নাম নেই। তোমাকে খুঁজছেও না তারা। আর ওইসব ম্যাপ, প্র্যান সম্পর্কে যা জানো, সেগুলো ছিল নিছক খেলা। বাস।’

কথাটা অবশি আংশিক সত্য। প্রথম দু'এক বছর ব্যাপারটা খেলাচ্ছিলেই নিয়েছিল ও। মাত্র অল্প দিন আগে ওগুলোর গুরুত্ব বুঝতে পেরেছে সে, আর তখন থেকেই ভাবনায় পড়ে গেছে।

'বেন কারিকে কেউ চেনে না,' বলল রাউন্ডি। 'কোন হলিয়া যদি আদৌ থেকে থাকে তো তার কথা এখন আর মনে নেই কারও। বিগত পনেরো বছরে কোন হামলায় অংশ নেয়নি সে। তাই যখন সে সরে পড়তে চাইবে, বেমালাম গায়েব হয়ে যাবে। তারপর অন্য কোথাও গিয়ে নতুন নামে বউ-মেয়েসহ বাসা বাঁধবে। সবাই জানবে এখন সে অবসর জীবন যাপন করছে। আগে পশ্চিমের কোথাও থাকত, সেখানেই গায়ে-গতরে খেটে টাকা-পয়সা উপার্জন করেছে।'

একটু থেমে আবার বলল রাউন্ডি, 'ফলে বাকি জীবন নির্ভরশীলভাবে কাটাতে পারবে সে। আর এদিকে তার দল সামলাবার জন্যে রইলে তুমি।'

'আর যদি আমি রাজি না হই?'

রাউন্ডি তাকাল ওর মুখের দিকে। অভিজ্ঞ চোখজোড়া কুঁচকে বোঝার চেষ্টা করল ওকে। 'তা' হলে তুমি তাকে জানাবে সে-কথা,' বলল ও। 'যা বলার সামনাসামনি বলবে।'

হারি কার্টারের শরীরে হিম স্রোত বয়ে গেল। ওই বৃদ্ধের সামনে দাঁড়াতে হবে ভাবতেই ওর গায়ে যেন জ্বর এল। 'নাহ্,' মাথা নাড়ল ও, 'মনে হয় না আমার সে-সাহস হবে।'

'কেন? তাকে আঘাত দিতে চাও না, নাকি ভয় পাচ্ছ?'

কাঁধ ঝাকাল হ্যারি। 'দুটোই, সম্ভবত। তবু একটা কথা থেকে যাচ্ছে: নেব না কেন? হাজার হলেও পুরো ব্যাপারটায় একটা রোমাঞ্চ আছে কিন্তু।'

'তা আছে বটে,' বিরস গলায় বলল রাউন্ডি। 'পেরিন আর মলিনাকে যখন বলবে আসল কর্তা কে, তখনই ভাল করে বুঝবে সেটা।'

হারির গালে ভাঁজ পড়ল। 'ওদেরকে সামলাতে পারব,' বলল ও, হাসিটা মিলিয়ে গেছে। 'বেন কারি ভাবেনি এ-দিকটা?'

'নিশ্চয়ই ভেবেছে! নইলে এতদিন ধরে তোমাকে দিন-রাত পিস্তল চালনা কেন শিখাল বলো?'

তার পৃথিবী এখানে, এই ভারমিলিয়ন পর্বতের চৌহদ্দিতেই সীমাবদ্ধ। এটাই তার দেশ। এর বাইরে কী আছে, সে-বিষয়ে কোন ধারণাই তার নেই।

বাইরের আলো-হাওয়ায় সে কি বাঁচতে পারবে? দরকার হলে জুয়াড়ি হবে। তাস, পাশা, ফারো, কলেত-সব খেলাই সে জানে। অথবা গরুর গায়ে মার্ক লাগাবে। এই ধু ধু কক্ষ পাহাড়ি এলাকার বাইরেও একটা জগৎ আছে, যেখানে মানুষ সৎ, পরিশ্রমী; সারাদিনের হাড়ভাঙা খাটুনির পর ফিরে যায় ছোট্ট গৃহকোণ, বউ-ছেলে-মেয়েদের নিয়ে আঙুন পোয়ায়। সেই জগৎ থেকেই ছিনিয়ে আনা হয়েছে তাকে। সেখানে তার বাবা ছিল; মা-ও ছিল, অন্তত তাই ওর ধারণা, যদিও মায়ের কথা সে কিছুই জানে না।

'রাউন্ডি, আমার বাবা-মা সম্পর্কে কী জানো তুমি?'

চোখ মাটিতে নামাল বৃদ্ধ। একদিন তাকে এই প্রশ্নের মুখোমুখি হতে হবে,

সে জানত। কিন্তু কী উত্তর দেবে ঠিক করতে পারেনি কখনও। আজ তার সামনে পড়ে পাশ কাটাতে চাইল সে।

‘বেন মেসিলাতে তোমার ভার নেয়। আমি যা শুনেছি, অ্যাপাচিরা তোমার বাবাকে মেরেছে। সম্ভবত তোমার মা তার আগেই মারা গেছে। তা নইলে সে-ও থাকত তোমার সঙ্গে। তুমি তখন একেবারেই এইটুকুন।’ রাউন্ডি হাত দিয়ে দেখাল হ্যারি তখন কতবড় ছিল।

‘বিষয়টা নিয়ে আমিও ভেবেছি অনেক,’ শান্ত গলায় বলল হ্যারি। ‘আমারও তাই মনে হয়, মা আগে মারা গেছে।’ একটু থেমে যোগ করল, ‘আসলে মানুষমাত্রই কৌতূহলী। বাবা, অর্থাৎ বেন, এ-ব্যাপারে কিছু বলেনি কখনও।’

অ্যাসপেন ঝোপের ধারে ওদের ঘোড়া দুটো চরছিল। সেখানে পৌছুল ওরা। রাউন্ডি মুখ খুলল। ‘তুমি বরং ভবিষ্যৎ নিয়ে ভাব, তাতে লাভ হবে। অতীত ঘেঁটো না। বেনকে কী জবাব দেবে সেটাই ঠিক করো।’

নিজের ঘোড়ার দিকে এগিয়ে গেল হ্যারি। পেছন থেকে রাউন্ডি ওর দিকে তাকিয়ে রইল অপলক। তার নিজের কোন ছেলে নেই। হ্যারি কার্টারকেই সব কিছু শিখিয়েছে সে। দীর্ঘকাল ধরে ওর সাথেই ছায়ায় মত আছে। ওর পেছনে নিজের সময় যতটা সে ব্যয় করেছে পুঁজি কম বাবাই তার ছেলের জন্য অমন করে।

কিন্তু এখন সে ভীত। স্বীকার করতে দোষ নেই, সত্যিই ভীত। ভয় পাওয়ার কারণ বেন কারি হিসেবে ভুল করেছে।

রাউন্ডি ব্যাপারটা পরে জেনেছে। সাধারণ পরিকল্পনা সভায় সে হাজির থাকে। বেশ পেছনে এক কোণে বসে চুপচাপ শুনে যায়। নেহাত প্রয়োজন পড়লে দু’একটা কথা বলে। কিন্তু এবার সে ছিল না, হ্যারিকে নিয়ে পাহাড়ে গিয়েছিল। ফিরে এসে সব জেনেছে।

বেনকে একা পেয়েই ধরেছিল ও। ‘মোরা? নিশ্চয়ই তোমার মাথা খারাপ হয়েছে।’

ঘরের ভেতর পায়চারি করছিল বেন কারি। থেমে শুধিয়েছে, ‘তার মানে? কী বলতে চাও তুমি?’

রাউন্ডি কখনও ওর সাথে ওই সুরে কথা বলেনি। তাই অবাক হয়ে গিয়েছিল বেন। চোখ পাকিয়ে তাকিয়েছে ওর দিকে। ‘এতে দোষের কী দেখলে?’

‘ওদেরকে মোরাতে পাঠিয়েছ তুমি- ওটা চার্লি ফ্যারেল-এর শহর।’

‘কে?’

‘বেন, অনেকদিন হলো বাইরে যাও না তুমি। তাই খবর রাখো না কিছু। চার্লি এক নম্বরের বন্দুকবাজ। ভয়ঙ্কর লোক।’

‘কী জানি, হতে পারে। আমি নাম শুনিনি ওর।’ কাঁধ ঝাঁকিয়েছে বড়ো ভালুক। তারপর যোগ করেছে ‘ওকে দূরে, সান্তা ফে-তে সরিয়ে দিয়েছিলাম।’

‘কিন্তু যখন ফিরে আসবে?’

‘ততক্ষণে আমরা পগার পার।’

‘ওকে তুমি চেনো না, বেন। চার্লি মুখ বুজে থাকার লোক নয়। কে, কীভাবে, এবং কেন—এই তিনটে জিনিস না জানা পর্যন্ত ক্ষান্ত হবে না সে। আমি চিনি ওকে।’

হতাশভঙ্গিতে মাথা নেড়েছে বেন। ‘কিসসু করার নেই। টিল ছোঁড়া হয়ে গেছে। যাই হোক, অসুবিধে হবে না। বৃষ্টিতে ট্র্যাক ধুয়ে-মুছে গেছে।’

এরপর রাউন্ডি আর কোন উচ্চবাচ্য করেনি। কিন্তু তাই বলে ওর দুচ্চিন্তা বেড়েছে বই কমেনি। হ্যারির যাওয়ার সময় ঘনিয়ে এসেছে, কিন্তু সর্বত্র এখন ভীষণ কড়াকড়ি। তার ওপর আবার সাপের লেজে পা পড়েছে। চার্লি ফ্যারেল ট্র্যাকিংয়ের রাজা।

ওই ঘটনার মাস কয়েক পর হাসতে হাসতে বেন একটা মন্তব্য করেছে। ‘কী বলেছিলাম? দেখলে তো কেউ টু শব্দটি পর্যন্ত করল না।’

ফ্যারার প্রেসের পাশে জোড়াসনে বসে কফি খাচ্ছিল রাউন্ডি। বেনের কথায় ও বলেছে, ‘এখনও তো বছরও ঘোরেনি। আরেকটু অপেক্ষা করো, বুঝবে। চার্লি ভোলার বান্দা নয়।’

ঠিক ওই সময়, রাউন্ডি যখন বেন কারির সাথে কথা বলছে তখন, প্রায় চারশো মাইল দূরে পূর্বদিকের ছোট্ট এক শহরে একটা ট্রেন থামল। শহরটা পূর্ব কলোরাডোতে অবস্থিত।

ট্রেন থেকে একটা লোক প্র্যাটফর্মে নামল। লম্বা, সুঠামদেহী। পরনে কালো সুট। প্র্যাটফর্মে দাঁড়িয়ে ট্রেনটার চলে যাওয়া লক্ষ করছে।

টমাস এডি জানালা দিয়ে প্র্যাটফর্মে একটা ট্রেন থামতে দেখল। সচরাচর এখানে কোন ট্রেন থামে না, তাই কৌতূহলী হয়ে ওদিকে চেয়ে রইল সে।

হিসেবখাতা নিয়ে বসেছিল টমাস। এই কাজটা তার মোটেও পছন্দ নয়, অথচ উপায় নেই শহরের করদাতারা তাদের প্রতিটা ডলারের পাই পাই হিসেব জানতে চায়। ও এই শহরের মার্শাল। জরিমানা বাবদ কত আদায় হয়েছে, জেলখানায় কয়েদিদের খাওয়া-খরচ কত—তারই একটা হিসেব-নিকেশ করছে সে।

ট্রেনের নিঃসঙ্গ যাত্রীকে দেখে উঠে দাঁড়াল টমাস। স্ত্রীর দিকে ঘুরে বলল, ‘বেস, আরও একজনের খানা লাগাও। অতিথি আসছে। চার্লি ফ্যারেল এইমাত্র ট্রেন থেকে নামল।’

তিন

খাওয়ার পালা চুকলে টমাস এডি আরেক দফা কফিপেয়ালা দুটো ভর্তি করল। তারপর মাথার পেছনে দু’হাত রেখে চেয়ারে হেলান দিল।

‘তারপর কী খবর? এত দূরে যে?’ বলল ও।

‘হাতে বিশেষ কাজ নেই, তাই ভাবলাম একটু আলাপ-সলাপ করে যাই। তা ছাড়া আমার সহকারীটি বেশ কাজের, নির্ভরযোগ্য। ও চালিয়ে নিতে পারবে।’

‘নীরবে নিজের পেয়ালায় চুমুক দিল টমাস।’

‘ডেভ কুক-এর নাম শুনেছ?’

‘ডেনভার-এর মার্শাল। তাই না? বলল টমাস।’

‘তাই। বিভিন্ন এলাকার মার্শালদের নিয়ে ও একটা সমন্বয় কমিটি করতে চাইছে, যাতে সবাই এক সঙ্গে কাজ করতে পারে। তুমি তো সব কিছুই জানো-প্রত্যেকেই নিজের এলাকা নিয়ে ব্যস্ত, আর কোথায় কী হচ্ছে তা নিয়ে মাথা ঘামাতে চায় না। কিন্তু ডেভ বলছে যে না, আমাদের সবার একাট্টা হওয়া উচিত।’

‘ঠিকই বলেছে।’

‘বহর খানেক আগে মোরাতে একটা ডাকাতি হয়েছে। দোকান লুট, তবে ওখানেই শহরবাসীদের টাকা-পয়সা জমা ছিল। অনেক টাকা, ষাট হাজার ডলার। আমি সে-সময় শহরের বাইরে ছিলাম,’ বলল চার্লি।

‘বড় দাঁও, কিন্তু সোজা,’ মন্তব্য করল টমাস।

‘হ্যাঁ, খুব সোজা। জলের মত। দোকানের সিঁদুকে ষাট হাজার ডলার। তায় শেরিফ আবার শহরের বাইরে। কোন ঝুঁকি নেই। এসে নিলেই হলো, যেন ছেলের হাতের মোয়া। বিশেষ করে যে চিঠিটা পেয়ে আমি সান্তা ফেতে গিয়েছিলাম, সেটা ছিল ভুয়া।’

‘জাল?’

‘না, আরে, সেটাই তো আরেক মজার ব্যাপার। চিঠিটা ছিল আমার ভাই ওরিনের। ওতে লেখা ছিল: “তাড়াতাড়ি চলে এসো।” এরপর চুপ করে বসে থাকি কী করে বলো? কিন্তু গিয়ে জানলাম, বহর দুয়েক আগে ওর বউকে ওই চিঠিটা লিখেছিল ও। ওদের ভেতর ছাড়াছাড়ি হয়ে গেছে।’

‘এখন প্রশ্ন হচ্ছে, চিঠিটা আর কারও হাতে গেল কীভাবে, আর কোথায়ই-বা এতদিন ছিল সেটা?’

‘স্বামী-স্ত্রীতে তখন খুব ঝগড়া চলছিল। সেই সময়েই চিঠিটা লেখে ও। তাই দেখামাত্র মনে করতে পেরেছে।’ একটু খেমে আবার শুরু করল চার্লি, ‘আমার ধারণা, এটা যার কাজ সে খুবই দূরদর্শী। যেভাবেই হোক, চিঠিটা তাদের হাতে পড়েছিল। এবং কোন দিন কাজে লাগতে পারে ডেবে রেখে দিয়েছিল সেটা।’

‘এটা কিন্তু যুক্তিসঙ্গত কথা হলো না। এরকম একটা চিঠির প্রয়োজন হতে পারে অত আগে থেকে জানবে কেমন করে?’

‘একটু মাথা খাটালেই বুঝতে পারবে, টমাস। চিঠিটাতে কোন কিছু ব্যাখ্যা করা হয়নি, তারিখও নেই কোন। ফলে কাজে আসতে পারে মনে করে রেখে দিয়েছিল। আর লোকটার পেটে যে জিলাপির প্যাচ আছে তাতে সন্দেহ নেই।’

‘অর্থাৎ, তুমি বলতে চাইছ ওই ডাকাতির পেছনে সেই লোক জড়িত।’

‘ঠিক তাই। এবং লোকটা সম্ভবত এক সময় চোর ছিল।’

এক চুমুকে বাকি কফিটুকু শেষ করল চার্লি। ‘দাঁড়াও, সব খুলে বলছি তোমাকে। দুপুরে সবাই খেতে যায় বাসায়। রাস্তা-ঘাটও ফাঁকা থাকে তখন। দোকানে মাত্র একজন খদ্দের ছিল। আচমকা আরও তিনজন উদয় হয়। হাত-পা বেঁধে দোকানির মুখে কাপড় গুঁজে দেয় তারা। বাজারবেলা, ফলে সিন্দুক খোলাই ছিল। থলে বোঝাই করে আপসে পেছন দরজা দিয়ে চম্পট দিয়েছে ওরা। লাঞ্চার সময় বলে সামনের ঝাঁপ নামানো ছিল, কেউ কিছু টের পায়নি।’

‘প্রায় দু’ঘণ্টা পর একজন খদ্দের এসে দোকান বন্ধ দেখে চলে যায়। কিছুক্ষণ পর আরেকজন আসে। কিন্তু সে ফিরে না গিয়ে খিড়কি পথে ঢোকান চেষ্টা করে। তার তামাক ফুরিয়ে গিয়েছিল, অথচ ওটা ছাড়া সে অচল।’

‘পেছনের দরজাও বন্ধ ছিল। নক করে সাড়া না পেয়ে কপাটে ঠেলা দেয় লোকটা। অমনি হাট হয়ে দরজা খুলে যায়। ভেতরে গোড়ানির শব্দ শুনতে পেয়ে গিয়ে দেখে মেঝেতে বাঁধা অবস্থায় দোকানি পড়ে আছে, সিন্দুক চিচিংফাঁক।’

‘চেহারার বর্ণনা পাওয়া গেছে কোন?’

‘উঠতি বয়সের তিন যুবক। মাঝারি গড়ন। একজনের গায়ে ছিল বুটিদার শার্ট। দোকানি জানিয়েছে, ওরা খুব দ্রুত কাজ সেরেছে। জানাই ছিল টাকা কোথায় আছে। তিন-চার মিনিটের বেশি থাকেনি। নিজেদের ভেতরে কোন কথা বলেনি, স্রেফ দোকানিকে নির্দেশ দিয়েছে প্রাণে বাঁচতে চাইলে সে যেন মুখ বুজে থাকে।’

‘কেউ কি ওদের আসতে বা যেতেও দেখেনি?’

‘হ্যাঁ, একটা বাচ্চা ছেলে। বাড়ির উঠোনে খেলছিল। একটা লোককে ঘোড়ার পিঠে বসে থাকতে দেখেছে সে। বাকি তিনটে ঘোড়ার লাগামও তার হাতে ধরা ছিল। তিনজন লোককে একটা গলির ভেতর থেকে বেরিয়ে ঘোড়ায় চড়তে দেখেছে ছেলেটা। এই পর্যায়ে আরও একজন এসে যোগ দেয় তাদের সাথে। তারপর পাঁচজনই ঘোড়া ছুটিয়ে উল্টো রাস্তায় চলে যায়।’

‘ওই বাচ্চাটার বয়েস মাত্র নয় বছর, কিন্তু বুদ্ধিমান। একটা ঘোড়াকে সে চিনে রাখে। কালো রং, তিনটে পা আর পাছার কাছে সাদা ছোপ।’

ধীরে ধীরে হাতের কাপটা নামিয়ে রাখল টমাস এডি। টেবিলের ওপাশে বসা চার্লি ফ্যারেলের দিকে সরাসরি তাকাল। ‘কী বললে?’

‘ঘোড়াটার বর্ণনা দিলাম।’

‘তা বুঝেছি, কিন্তু আমারও যে ওই ধরনের একখানা ঘোড়া আছে।’

মাথা দোলাল চার্লি। ‘জানি। সেবার যখন এসেছিলাম, তখন দেখেছি। চমৎকার জিনিস কিন্তু।’

নিজের পেয়ালাটা হাতে নিল টমাস এডি। ওর কফি ঠাণ্ডা হয়ে গেছে, উনুনের ওপর থেকে কেতলি এনে চার্লি আর নিজের পেয়ালা ভর্তি করল। তারপর কেতলিটা যথাস্থানে রেখে আবার চেয়ারে এসে বসল। ‘চার্লি, মৃদু স্বরে বলল ও, ‘বোধহয় একটু আলোর রেখা দেখতে পাচ্ছি। খোঁয়াড়ে গিয়ে এই

জাতের ঘোড়া সম্পর্কে খোজ-খবর করা দরকার।’

একটু জিরিয়ে নিল টমাস। ‘এখনকার এই দায়িত্বটা আমার ঘাড়ে গছানো হয়েছে, তবে বড্ড প্রয়োজনের সময়েই কাজটা পেয়েছি। আমার র‍্যাঙ্কিং ব্যবসায় তখন মন্দা চলছে। একে বাজার খারাপ, তার ওপর খরার দরুন ফসল হয়নি। ফলে খুবই বেকারদায় পড়ে গিয়েছিলাম। এই সময় স্থানীয় লোকজন মার্শালের দায়িত্বটা আমার কাঁধে চাপিয়ে দেয়। আমি যথাসাধ্য ভাল করার চেষ্টা করেছি।’

‘আমার ভাইয়ের হত্যারহস্যের কিনারা করেছ তুমি, টমাস।’

‘এমন কিছু নয়। কাজটা খুবই সোজা ছিল। আমার জানা ছিল কোথায় গেলে খাবার, পানি এগুলো পাবে ওরা। দুয়ে দুয়ে চার মেলানোর মত ব্যাপার।’

‘কেমন লাগছে?’

‘ভালই। তা এবারের সমস্যার ব্যাপারে কিছু পেলো?’

‘ম, বলতে পারো। একা একা কয়েক হাত তাস বেটে কী পেলাম দেখার মত আর কী।’

‘তবে এক্ষেত্রে তাস নয়, জোড়া দিয়েছি কয়েকটা ছোট খবর।’ বুকপকেট থেকে তিনটে ক্লিপিং বের করে টেবিলের ওপর মেলে ধরল চার্লি ফ্যারেল।

তিনটেই ডাকাতি, গেল দু’বছরের মধ্যে হয়েছে। খুব নিপুণ কাজ, পেছনে কোন সূত্রই রেখে যায়নি ডাকাতেরা, মায় একটা গুলি পর্যন্ত ছোঁড়েনি। হঠাৎ করেই যেমন উদয় হয়েছে, তেমনি ভোজবাজির মতই মিলিয়ে গেছে। ডাকাতির স্থান: মন্টানা, ওয়াশিংটন, টেক্সাস।

‘এদের রাজত্ব দেখছি বেশ বিরাট এলাকা জুড়ে,’ মন্তব্য করল টমাস। কেবল মন্টানাতেই ওরা ধাওয়া খেয়েছে। কিন্তু পথেই ঘোড়া বদলে হাওয়ায় মিলিয়ে গেছে। ‘ঘোড়াগুলো নিশ্চয়ই মজুদ ছিল ওদের জন্যে,’ বলল ও।

‘বাথান-মালিক অস্বীকার করেছে। কখন কোন্ জরুরি অবস্থা দেখা দেয় না দেয়, তাই আস্তাবলে ওগুলো সব সময় তৈরি রাখত সে।’

‘এবং পুরটা কেউ জানত।’

ক্লিপিংগুলো আরেকবার পড়ল টমাস। ওদের বর্ণনায় এমন কিছু নেই যা থেকে কাউকে শনাক্ত করা যাবে। কেবল বলা হয়েছে একজনের মাথায় সফ্র কানিশঅলা টুপি ছিল। লোকটা ছিপছিপে, লম্বা। ব্যাংকের কর্মচারীরা তাদের বর্ণনায় লোকটাকে ‘উদ্ভটদর্শন বর্বর’ বলে উল্লেখ করেছে।

‘লোকটা মনে হচ্ছে ইচ্ছে করেই ওরকম সেজেছিল,’ বলল চার্লি। ‘অর্থাৎ সবার দৃষ্টি কাড়তে চাইছিল, যেমন মোরাতে সেই লোকটার পরনে ছিল বুটিদার শার্ট।’

‘তার মানে তুমি বলতে চাইছ, একজনকে অন্তত চিনে রাখুক এটাই চেয়েছিল ওরা,’ বলল টমাস।

‘একটু চিন্তা করো, তা হলেই বুঝবে। কাজ সারতে সময় নিয়েছে মাত্র দু’তিন মিনিট। ফলে ওদেরকে ভাল করে লক্ষ করার সুযোগ পায়নি কেউ, স্বাভাবিক ভাবেই একটা বিশেষ কিছুর ওপর চোখ আটকে গেছে। তাই যখন

দস্যদের বর্ণনা দিচ্ছে তখন ওই বুটিদার শাট কিংবা সে-ই সরু কার্নিশের টপিক্সলা দীর্ঘদেহীর কথাই শুধু মনে করতে পারছে। অর্থাৎ খুঁটিনাটি জিনিসগুলো চোখ এড়িয়ে যাচ্ছে। বাকি লোকগুলো কেমন দেখতে, মনে করতে পারছে না।

টমাস হাতের আঙুল দিয়ে চুল আঁচড়াল। 'চার্লি, এই খানিক আগেও বুঝতে পারছিলাম না, আমি ঠিক পথে চলছি কি-না।' উঠে গিয়ে দেয়াল-আলমারির দেরাজ থেকে একতড়া কাগজ নিয়ে এল সে। 'মনে হচ্ছে আমরা দু'জনেই একই বাছুরের গলায় দড়ি পরাতে চাইছি।'

বসে কাগজগুলো মেলে ধরল সে: হলিয়ার বিজ্ঞপ্তি, চিঠি, নিউজ ক্লিপিংস।

'মোট নটা,' টমাস বলল, 'কানসাস, আরকানসাস, ওয়াশিং, টেক্সাস এবং ইডাহো অঞ্চলে। দু'বার ক্যালিফোর্নিয়ায়। টেক্সাসে তিনবার। এর সাতটাই হয়েছে গত চার বছরে। বাকি দুটো আরও আগে। কেউ ধরা পড়েনি, কোন সূত্রও পাওয়া যায়নি।'

'এমনকী ডাকাতির আগে অচেনা কোন লোককেও শহরে ঘুর-ঘুর করতে দেখা যায়নি। চারবার তো কারও চোখেই পড়েনি ওরা, চেনা তো দূরের কথা।'

একটা হলিয়া-বিজ্ঞপ্তি তুলে নিল টমাস। 'কিন্তু এইটে দেখো: চারজন ডাকাত, একজনের বর্ণনা দেয়া হয়েছে লম্বা, মাথায় মেক্সিকান টুপি।'

'তার মানে একই লোক, শুধু টুপিটা আলাদা।'

'সম্ভবত।'

চার্লি ওর কফিটুকু শেষ করল। 'গোটা পশ্চিম জুড়ে, সেই একই ধরন-নিঃশব্দে সটকে পড়েছে, কেউ কিছু দেখেনি।'

টমাস এডি মাথা নেড়ে ইশারায় কাগজগুলো দেখাল। 'একই দিনের ডাকে ওগুলোর দুটো পেয়েছি। হলিয়া-বিজ্ঞপ্তিটার সঙ্গে মিলিয়ে দেখলাম বেশ মিল আছে ওগুলোর মধ্যে। তখন থেকেই এগুলো সংগ্রহ করছি আমি। কাগজের অফিসে গিয়ে ওদের পুরোনো ফাইল ঘেঁটেছি। ডেনভার এবং শাইয়ান থেকে প্রকাশিত কাগজগুলোও রাখে ওরা। ফলে এক সাথে অনেকগুলো সূত্র ব্যবহার করতে পেরেছি।'

টমাস উঠে উনুনের কাছে গেল। কয়েকটা ছোট লাকড়ি গুঁজে আঁচটা উসকে দিল যাতে কফি যথেষ্ট গরম থাকে।

'তুমি আসায় আমি খুশি হয়েছি, চার্লি। এখন আমরা এক সঙ্গে বসে হিসেব কষব।'

'তোমার ঘোড়াটা দিয়েই শুরু করা যাক।'

'আমাকেও সন্দেহ করছ নাকি?'

চার্লি হাসল। 'আমি প্রত্যেককেই সন্দেহ করি। তবে এক্ষেত্রে আমার নিজস্ব একটা থিওরি আছে। ঘোড়াটা তুমি কীভাবে পেল, তাই বলো আগে।'

'তখন মৌসুমের শেষ প্রায়। নানান ঝামেলায় পিছিয়ে পড়েছিলাম আমরা। ঘাটতি পোষাতে দিন-রাত খাটছিলাম সমানে। একদিন সন্ধ্যা নাগাদ এক লোক পাঁচটা ঘোড়া নিয়ে আমাদের ওখানে এল।'

‘আমাদের বাবুর্চিকে জিজ্ঞেস করল সে খাওয়ার মত কিছু মিলবে কিনা। আমরা খাওয়ালাম তাকে। ঠিক ওই সময়ে কফির জন্যে আমি ওখানে যাই। লোকটা বলে আমাদের জনবল কম। আমি ওর সাথে একমত হয়ে বললাম, কয়েকটা বাড়তি ঘোড়া হলেই এটা পুষিয়ে নিতে পারব আমরা।

‘ও তখন একটুক্ষণ কী যেন ভাবল তারপর ওর ঘোড়াগুলো দেখিয়ে বলল ইচ্ছে করলে আমরা সেগুলো ব্যবহার করতে পারি। “তবে কাজ শেষ হলে,” বলল সে, “তোমার আস্তাবলে ওগুলো তৈরি রাখবে। পাঁচটাই রাখবে এক সাথে। আমি ফিরতি পথে নিয়ে যাব।”

‘এরপর সে উঠে নিজের ঘোড়ার দিকে রওনা দেয়। “তুমি ফিরবে কবে?” আমি জিজ্ঞেস করলাম তাকে। তো সে জানাল, বিশেষ কাজে উপকূলীয় এলাকায় যাচ্ছে। ছয় মাস থেকে এক বছরের মধ্যেই ফিরে আসবে। তারপর ঘোড়া ছুটিয়ে খাওয়ার সময় বলল, “যত্ন নিও, খুব ভাল জাতের ঘোড়া।”

‘ওগুলো পেয়ে সুবিধেই হলো আমাদের। ঝটপট কাজ শেষ হয়ে গেল। তারপর লোকটার কথামত ঘোড়াগুলো আস্তাবলে রেখে দিই আমি। মাঝে-মধ্যে শহরে আসতে ওগুলোর একটা নিয়ে আসতাম।

‘এ-রকম ব্যাপার নতুন কিছু নয়, ফলে ব্যাপারটাকে তেমন আমল দেইনি আমি। কিন্তু মার্শাল হওয়ার পর একদিন অফিসের ডেস্ক গুছাতে গিয়ে এই বিজ্ঞপ্তিটা চোখে পড়ল। বুঝলাম মাত্র দিন কয়েক আগে এখান থেকে পুর্বের এক শহরে ডাকাতি হয়েছে।

‘এখানকার কাগজ তখন বন্ধ ছিল। আমিও তখন ব্যবসার কাজ গুটাতে ভীষণ ব্যস্ত। আর খবরটাও পাইনি কারও কাছ থেকে।

‘ভাসা ভাসা বর্ণনা, চার-পাঁচজন ছিল। তবে সবই অনুমান, সাঠক কেউই কিছু বলতে পারেনি। আমিও আর মাথা না ঘামিয়ে বিজ্ঞপ্তিটা ফাইলে রেখে দিলাম। একদিন ব্যবসার কাজে আমার আস্তাবলের পাশ দিয়ে যাবার সময় দেখলাম ওই পাঁচটা ঘোড়া নেই। কিন্তু তার জায়গায় নতুন পাঁচটা রাখা আছে।

‘এগুলোও ভাল জাতের, কিন্তু দেখে মনে হলো, জোর ধকল গেছে ওদের ওপর দিয়ে। আর তখন থেকেই সজাগ হলাম আমি।

‘থমথমে ঘর। উনুনে ফটফট করে লাকড়ি পুড়ছে, দেয়াল ঘড়িটা বেজে উঠল শব্দ করে। বেশ কিছুক্ষণ নীরবেই কাটিয়ে দিল দু’জন। ‘চতুর’ এক সময় বলল চার্লি। ‘লোকটা ভীষণ চালাক, সন্দেহ নেই।’

‘কিন্তু ওরা আন্দাজ করল কেমন করে,’ চিন্তাচ্ছন্ন গলায় বলল টমাস, ‘আমার মত একজন সামান্য বাথান-মালিক একদিন মার্শাল হবে?’

চার্লি উত্তর দিল, ‘খুব হিসেবী লোক। আগেভাগেই ছক তৈরি করে। তোমার এই ঘোড়া আর ওরিনের চিঠির ঘটনা সে-ই ইঙ্গিতই দিচ্ছে।’ কাগজের তাড়ার দিকে তাকাল ও। ‘তিন গণ্ডা ডাকাতি, অথচ কেউ কিছু বলতে পারে না।’

‘কদিন ধরে চলছে এমন?’

কাঁধ ঝাঁকাল চার্লি। ‘কে জানে? তা ছাড়া আরও ঘটনা থাকতে পারে

যেগুলোর রেকর্ড হয়তো আমাদের কাছে নেই। আমার তো মনে হয় না, আমরা যা জানি এতটা আর কেউ জানে।' তর্জনী দিয়ে কাগজের ভাড়ার ওপর টোকা দিল সে। 'জেমস-এর দল তো এদের তুলনায় ছিঁচকে চোর।'

'ওরা ছিঁচকেই,' বলল টমাস। 'কাজের চেয়ে বড়াই বেশি। কথায় কথায় পিস্তল বের করে। সেবারে বিনাদোষে একটা স্কুল ছাত্রকে মেরে ফেলল।'

'এতদিন ওরা পার পেয়ে গেছে,' মন্তব্য করল চার্লি, 'কিন্তু ঘোড়া রাখার জন্য তোমার ঠিকানা ব্যবহার করেই ভুলের ফাঁদে পা দিয়েছে। আর। একটা ভুলই যথেষ্ট।'

'তা হলে আমাদের এখন কী করা?'

ইশারায় চার্লি কাগজগুলো দেখাল। 'ভাল করে পড়ে ওগুলোর মধ্যে একটা সাধারণ যোগসূত্র খোঁজার চেষ্টা করব। যেমন সেই অদ্ভুত টুপি পরা লম্বা লোকটা। তারপর যে-সব জায়গায় ডাকাতি হয়েছে সেখানে চিঠি লিখব আমরা। লক্ষ্য করব, প্রতিটা ঘটনাতেই মিলে যায় এমন কোন সাধারণ সূত্র পাওয়া যায় কি-না। আমার বিশ্বাস, পাব।'

'ইতিমধ্যেই পেয়েছি একটা,' বলল টমাস।

'কী?'

'উতা। একটাও ডাকাতি হয়নি সেখানে।'

চার

উঠে দাঁড়িয়ে ঘরময় কিছুক্ষণ পায়চারি করল টমাস এডি। তারপর ধপ করে ঘরের এক কোণে রাখা গদি-আঁটা কাউচে বসে পড়ল।

'তোমার কি মনে হয় মনমনদের কাজ এটা?'

'না,' জবাব দিল চার্লি। 'ওদেরকে আমি চিনি। অধিকাংশই ভাল লোক, আইন মেনে চলে। অবশ্যি তাই বলে যে দু'একটা পচা আপেল ঝুড়িতে নেই তা নয়।'

'তবে আমার মতে ব্যাপারটাকে এইভাবে দেখা উচিত: উতা পাহাড়ের দক্ষিণ-পূর্ব এবং সংলগ্ন কলোরাডো, আরিজোনা আর নিউ মেক্সিকো পর্যন্ত হাজার হাজার বর্গমাইল উষ্ণ এলাকা।'

'এই দলটা গোটা পশ্চিম জুড়ে তাদের থাকা বিস্তার করেছে। কেবল উতা অঞ্চল বাদ। কেন? আমার ধারণা, এই লোক নিজের দোরগোড়ায় কোন ঝামেলা পাকাতে চায় না।'

ক্লিপিংগুলো উল্টেপাল্টে দেখল সে। 'এই যে, দ্যাখো, মন্টানা আর টেক্সাসে একদিন আগে-পিছে ডাকাতি হয়েছে। এর অর্থ, আমাদের হিসেব যদি সঠিক হয় তবে লোকটার অধীনে একটার বেশি দল রয়েছে। আমার অনুমান, পাঁচ-ছয় দল। অতজনকে সামাল দেয়া চাটখানি কথা নয়, তার মানে এই লোক কত

কঠিন আর দক্ষ চিন্তা করো। এ-পর্যন্ত একটা খুনও করেনি এরা। ধরাও পড়েনি কেউ।

টেবিলের ধারে বসা লোকটাকে ভাল করে নিরীক্ষণ করল টমাস। আর সকলের মত সে-ও রটনাগুলো জানে। টেনেসি থেকে আসা এই যুবক, চার্লি ফ্যারেল, পশ্চিমের দুর্ধর্ষ বন্দুকবাজদের একজন। এমনিতে শান্ত, অযথা গোলমালে জড়ায় না, কিন্তু একবার জড়ালে তার শেষ দেখে ছাড়ে। চার্লির সাথে এর আগে আরও একবার দেখা হয়েছে টমাসের। সেই ওর, চার্লির ছোট ভাই জো-এর হত্যারহস্য মীমাংসার সময়ে। চার্লিকে দেখলেই ও অস্বস্তি অনুভব করতে থাকে। এ-ধরনের লোকজন, তা সে যত শান্তিপ্রিয়ই হোক না কেন, নিজের শহরে চায় না টমাস। এরা খুব বিপজ্জনক, যেখানেই যায় সেখানেই একটা না একটা গোলমাল হয়।

ওর, টমাসের, নিজের অবশিষ্ট বন্দুকবাজ হিসেবে তেমন খ্যাতি নেই। তবে এই আত্মবিশ্বাসটুকু আছে যে প্রয়োজনে সে তুখোড় লোকদেরকেও কাত করতে পারবে। মার্শাল হওয়ার ইচ্ছে তার আদৌ ছিল না। তবে ঠেকার সময়ে কাজটা পেয়ে আপত্তি করেনি।

পশ্চিমের ছোট্ট একটা শহরের শান্তি-রক্ষা তেমন কঠিন কাজ নয়। এখানে যে-সব বাথানকর্মী মাতাল হতে আসে, তাদের অধিকাংশই ওর পুরোনো সহকর্মী। ওদের কেউ কেউ তার বাথানেই কাজ করেছে, আবার কারও সাথে হয়তো দেখা হয়েছে গরু-মোষের পাল খেদিয়ে আনার সময়ে। সুতরাং, ওরা সবাই ওর কথা শোনে।

এ-যাবৎ বলা যায় সে মোটামুটি সফল, তবে ভাই বলে নিজেকে সে ভাল অফিসার বলে দাবি করছে না। চলনসই-এই পর্যন্ত। কিন্তু চার্লি ফ্যারেল এখন যে-কাজটার কথা বলছে সেটা তার আয়ত্তের বাইরে। কথাটা সে জানাল।

চার্লি তার সে-ই ভুবনমোহন হাসি উপহার দিল টমাসকে। 'আসলে যা মনে করো, তোমার যোগ্যতা তার চেয়ে অনেক বেশি।' টেবিলে রাখা কাগজগুলোতে টোকা দিল ও। 'এগুলো পড়ে একটা গোলমালে জিনিসের আভাস পেয়েছ তুমি। তুমি, টম, যাই বলো না কেন, এই কাজ করার মত সহজাত বুদ্ধি তোমার আছে।'

আবার কাগজগুলো নাড়ল সে। 'তুমি জানো এর ভেতর কী আছে। অথচ বললে কেউ বিশ্বাস করবে না। এদের কাজের ধারাই এমন যে, সাধারণ মানুষ মানতে চাইবে না এগুলো কোন একটা সংগঠিত দলের কীর্তি। বলবে, মদের পয়সা জোটানোর জন্যে স্থানীয় ছিঁচকে বদমাশদের কাজ। কিন্তু আমার ধারণা, এরা কেবল সংগঠিতই নয়, অত্যন্ত হিসেবীও বটে।

'নিশ্চয়ই আগে এসে কেউ না কেউ ডাকাতিস্থল ঘুরে দেখে-ওনে' যায়। পালানোর প্ল্যান তৈরি করে, দরকার পড়লে যাতে ঘোড়া পাওয়া যায় সেটা নিশ্চিত করে।'

'বুঝতে পারছি না কিছুই।' মাথা নাড়ল টমাস। 'কোথাও না কোথাও একটা সূত্র তো থাকতে হবে।'

একটা জড়ানো কাগজের বাঙিল তুলে নিল চার্লি। ভেতর থেকে নিউজ ক্লিপিং বের করল একটা। 'আরে, রোসো। সব দিন সমান যায় না। বিপদে ওরাও পড়ে। এই যে দ্যাখো।'

কারসন-এ ডাকাত সন্দেহে একজন আটক

গত রাতে জেনিংস লাইভেরি থেকে এক ব্যক্তিকে আটক করা হয়েছে। লোকটি জানায় তার নাম ড্যান কেবল। তার কাছে সাড়ে বারো হাজার ডলার সমমূল্যের সদ্য-তৈরি স্বর্ণমুদ্রা পাওয়া গেছে। লোকটি জানায় যে সে গবাদিপশু কিনতে যাচ্ছিল।

তিন দিন আগে র‍্যাপিড সিটি ব্যাংক থেকে পঁয়ত্রিশ হাজার ডলার সমমূল্যের সদ্য-তৈরি স্বর্ণ মুদ্রা লুট হয়েছে। কেবলকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্যে পুলিশী হেফাজতে রাখা হয়েছে।

'তারপর?'

'পরদিন সকালে দেখা গেল সেল ফাঁকা। কেবল উধাও, সেই সঙ্গে তার সোনা আর ঘোড়ারও কোন হদিস নেই। কেউ-ই জানে না, কীভাবে সম্ভব হলো এটা।'

'খুব দ্রুত ব্যবস্থা নিয়েছে ওরা,' চিন্তামগ্ন সুরে বলল টমাস। 'নিশ্চয়ই দলের কেউ কাছেভিতেই ছিল।'

'কারসনে কোন জেলার নেই। ছোট জেল। ভেতরে সেলের দরজা আর বাইরের ফটক একই চাবি দিয়ে খোলে। গোটা ব্যাপারটা এমনভাবে সাজানো হয়েছে যে দেখে মনে হবে, নিজের চেঁচাতেই পালিয়েছে সে। কেউ সাহায্য করেনি তাকে।'

'সোনা ছিল কোথায়?'

'জেল অফিসে। টেবিলের ড্রয়ারে। তখন ব্যাংক বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। তাই মার্শাল ওগুলো সেখানেই রেখে দেয়।'

'কারসন ইদানীং বেশ শান্ত। মাঝ-রাতে সেলুন দুটো বন্ধ হয়ে যায়। রাস্তা-ঘাটও ফাঁকা হয়ে যায় এরপর। কেবল কোনভাবে তার সেলের দরজা খুলে বাইরে আসে। তারপর টেবিলের ড্রয়ার ভেঙে সোনাগুলো নিয়ে আস্তাবলে যায়। ওর ঘোড়াটা সেখানেই ছিল। ওটার পিঠে জিন চাপিয়ে সটকে পড়ে।'

'তাজ্জব ব্যাপার!'

দুপুর-রাত অবধি কাজ করে গেল ওরা। ওদের জানা তথ্যের সঙ্গে পোস্টারের বিবরণ মেলাল। বিভিন্ন নিউজ ক্লিপিং এবং অন্যান্য শহরের মার্শাল আর ব্যাংকারদের চিঠিপত্র খুঁটিয়ে পড়ল।

'আমরা বোধহয়,' সব শেষে বলল টমাস, 'ভবিষ্যতের কথা আগাম চিন্তা করে এগুলো ভাল করব। ডাকাতি হতে পারে এমন কয়েকটা সম্ভাব্য জায়গা বের করে ফাঁদ পাতব সেখানে।'

'আমিও ভেবেছি এ-দিকটা। কিন্তু এর একটা অসুবিধে হচ্ছে ঠিক কোথায় যে হামলা হবে তা নিশ্চয় করে বলা যাচ্ছে না। অবশ্যি ওরা যে বড় দাঁও মারার

ফিকির করবে তাতে সন্দেহ নেই।’

‘স্টেজের ওপর চড়াও হবে বলে মনে হয় না,’ বলল টমাস। ‘বড় বড় চালানোর সময়ে শটগান হাতে পাহারাদার থাকে। এবং তারা যুঝবে।’

চার্লি হাত বাড়িয়ে কেতলি নিয়ে নিজের পেয়ালায় কফি ঢালল। ‘তোমার প্রস্তাবটা নিয়েই ভাবছিলাম এতক্ষণ।’ একটু থেমে যোগ করল, ‘তোমার এখানে ফাঁদ পাতলে কেমন হয়?’

মাথা নাড়ল টমাস। ‘এটা ছোট্ট জায়গা। অত টাকা কারও নেই। কারও না...’ চুপ করল ও। তারপর বিড়বিড় করে বলল, ‘ম! তাই তো!’

চার্লির দিকে তাকাল টমাস। ‘বুড়ো মার্লিনের গরু কেনার ঘটনাটা শুনেছ?’

‘শুধু শুনেছি বললে কম বলা হবে। সবখানে ছি ছি পড়ে গেছে এটা নিয়ে। বুড়ো মার্লিন এখানকার লোকদের কাছ থেকে বাকিতে গরু কিনেছে। ওর সাথে সশস্ত্র লোকজন ছিল। তাই ভয়ে টু শব্দ করেনি কেউ। আর সে-ও ফাঁকতালে অর্ধেকের বেশি গবাদি পশু নিয়ে চলে যায়।’

‘যদূর মনে পড়ছে, বছর খানেক আগে বুড়োর ছেলে জনি মার্লিন সবাইকে জানিয়েছে, যার যা পাওনা আছে মেটাতে আসছে সে। তা প্রায় একলাখ ডলার হবে, সোনা দিয়ে পরিশোধ করবে। ওর বাপ ছিল একটা বজ্জাতের ধাড়ি। কিন্তু জনি ঠিক পথেই এগুচ্ছে।’

‘আগামী মাসে এখানে আসছে ও। ওর সাথে একলাখ ডলারের সোনা থাকবে।’

‘চমৎকার টোপ,’ বলল টমাস, চার্লির মুখের দিকে তাকাল। ‘ওর সাতহাজার ডলার আমার। ওটা হারাতে চাই না আমি।’

‘বেশ,’ বলল চার্লি। ‘ব্যাপারটা যেন তিন কান না হয়। আশপাশে নিশ্চয়ই প্রচুর চর আছে ওদের। বেশি লোক জানাজানি হলে বড়শিতে গাঁথবে না। এমনকী তোমার সহকারীকেও জানাবে না, অন্তত জনি না আসা পর্যন্ত। আমিও সঙ্গে নিয়ে আসব একজনকে।’

‘এখন আসলে হয় ওরা!’ টমাসের মুখভাব কঠোর হয়ে উঠল।

‘আসবেই, টম। বাজি ধরতে পারি আমি। আচ্ছা, তোমার আস্তাবলে তো ওদের কয়েকটা ঘোড়া এখনও আছে, তাই না?’

‘হ্যাঁ।’

‘ওরা আসবে, টম। এবং দেখবে ওদের জন্যে এক চমক অপেক্ষা করছে।’

টডস্টল ক্যানিয়ন। পাথরবাড়ি। জানালার ধারে চেয়ারে বসে আছে বেন কারি। ধ্যানমগ্ন চোখে নীচের উপত্যকার দিকে তাকিয়ে আছে। ঘরের দরজা খোলা। আজকের দিনটা ভারি চমৎকার, কিন্তু বেন কারির মনে শান্তি নেই।

তার বিরাট পাথর-কোঁদা মুখে একটাও বলিরেখার ছাপ পড়েনি এখনও। কেবল কপালের কাছে চূলে পাক ধরেছে। কোন সন্দেহ নেই, বুড়িয়ে যাচ্ছে সে। এমনকী এত মনোরম বসন্তেও তার রক্তে আগের মত শিহরণবান ডাকে না। বহুকাল হলো অপারেশনে যায় না সে। এখন তার অবসর নেয়ার পালা।

এতগুলো বছরে একটাও ভুল করেনি সে, কিন্তু এখন কেমন যেন সন্দেহের দোলায় দুলছে। গেল ছ'বছর ধরে এই পাহাড়-মরুপ্রান্তর তার থাবার নীচে আছে। তার দস্যবৃন্দের বয়েস বিশ বছর। এর মধ্যে পনেরো বছর কেটেছে এক বিশাল দস্যু-সাম্রাজ্যের এক-নায়ক হিসেবে। এই এলাকার সব আউট-লই তার আঙুলের ইশারায় ওঠে-বসে।

ছ'বছর আগে এই প্রত্যন্ত অঞ্চলে এসে শক্ত ঘাঁটি গেড়েছে সে। এখান থেকে সে তার কাজকর্ম পরিচালনা করে। এর দক্ষিণে, কলোরাডো রাজ্যের প্রান্তসীমায়, অলঙ্ঘ্য প্রাচীরের মত দাঁড়িয়ে রয়েছে গ্র্যান্ড ক্যানিয়ন। পূর্ব, উত্তর আর পশ্চিমে ধু ধু মরুভূমি, ট্রেইল জানা না থাকলে ও-পথে চলাফেরা অসম্ভব।

কেবল লী ফেরি-র ক্রসিংটার কথা সকলেই জানে। কিন্তু এর-পরেও ক্রসিং অভ দ্য ফাদারস নামে আরও একটা পয়েন্ট আছে। এটার কথা প্রায় কেউ-ই জানে না। দু'জায়গাতেই লোক মোতায়েন রয়েছে, দিন-রাত নজর রাখছে।

এ ছাড়াও আরও একটা ক্রসিং আছে, একদম ভিন্ন ধরনের। সেটার খবর বেন ছাড়া কেউ জানে না। আর এটাই ওর তুরুপের টেকা।

দলের একটা আইন অত্যন্ত কঠোরভাবে পালিত হয়। উত্তরে, মরমন রাজ্যে কোন প্রকার দাঙ্গা-ফাসাদ করা হয় না। মরমন আর ইন্ডিয়ানদের কখনোই ঘাঁটানো হয় না। তারা, বন্ধু না হলেও, শত্রু নয় অন্তত। দু'দলই তাদের সন্দেহের কথা গোপন রাখে। উপত্যকার শেষ প্রান্তে জনাকয়েক ব্যাঙ্কার বাস করে। স্থানীয় বাজার থেকেই তারা কেনা-কাটা করে। অধিকাংশ দোকানের মালিক আউট-ল। বাসার কাছে হওয়ায় সস্তায় জিনিসপত্র পায় ওরা। ওইসব দোকান তথ্য সংগ্রহের ঘাঁটি হিসেবেও ব্যবহৃত হয়। অচেনা কোন লোক এলেই বেন কারির কাছে সে-খবর পৌঁছে যায়।

কার্ব পেরিনের ব্যাপারে বেন কারি এখনও কোন সিদ্ধান্তে আসেনি। সে জানে, পেরিন দলের নেতৃত্ব বাগানোর তালে আছে। কিন্তু ও যখন জানবে হ্যারি কার্টার দলের তার নিচ্ছে তখন ওর কী প্রতিক্রিয়া হবে?

যাক, নিজেকে শক্ত করল বেন, সেটা হ্যারির সমস্যা। সে-ভাবে প্রস্তুত করা হয়েছে তাকে।

বুড়ো বেন নিজে ছিল পালের গোদা, আর পেরিন তার থাবার নীচে তুচ্ছ ধূলিকণামাত্র। কিন্তু সে যখন দেখবে আনকোরা এক যুবক এসে লাগাম ধরছে তখন কী করবে? তার সেই লোক আবার কোন সফল ডাকাতিতেই অংশ নেয়নি।

বস্তুত, এ-জন্যেই হ্যারিকে ডেকে পাঠিয়েছে বেন। এখন জীবনের পয়লা অপারেশনে যাওয়ার সময় হয়েছে হ্যারির। কাজটা কেবল বড় হলেই চলবে না, তাতে চমক, নাটকীয়তাও থাকতে হবে। এর ছকও ফাঁদতে হবে নিখুঁতভাবে, বিন্দুমাত্র ঝুঁকি যাতে না থাকে। আর এতে সফল হলে দলে ওর প্রভাব বাড়বে।

কপাটের গায়ে মদু নকের শব্দে বাস্তবে ফিরে এল বেন কারি। চেয়ারে আরাম করে হেলান দিল, টোকার ধরন তার পরিচিত। 'এসো!' হুঙ্কার ছাড়ল সে।

ভীষণ দৃষ্টিতে খেয়াল করল, ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দিল পেরিন। তখন, কম্পিত পায়ে এগিয়ে আসছে তার দিকে, সেই সঙ্গে ইতস্তত চোরা চাউনি হেনে দেখে নিচ্ছে ঘরে ওরা দু'জন ছাড়া তৃতীয় কোন প্রাণী আছে কি-না।

‘সর্দার, দলের সবাই অধৈর্য হয়ে উঠেছে। এখন বসন্তকাল চলছে, ওদের হাতও খালি। কিছু কি ভেবেছেন আপনি?’

‘উ। হ্যাঁ, ওদের বেরানোর সময় হয়ে এসেছে।’ দম নিয়ে বেন জিজ্ঞেস করল, ‘কিভাবে সবাই?’

‘প্রায়। আর আপনি তো জানেনই অনেকেই আদৌ যায় না কোথাও, এখানে থাকে।’

‘দুটো খোঁজ আছে আমার কাছে। দুটোই কঠিন। ভাবছি ওর একটাতে পাঠাব ছেলেটাকে।’

‘ওহু?’ পেরিনের গলায় বিরক্তির ঝাঁঝ ফুটল। ‘তার মানে সে-ও যাবে বলছেন?’

‘পুরো অপারেশন ও-ই পরিচালনা করবে। ওর জন্যে এটা ভাল হবে।’

নীলবে সর্দারের কথা হজম করল পেরিন। এই প্রথম হ্যারি কার্টারকে প্রতিপক্ষ হিসেবে ভাবতে শুরু করল সে। এর আগে পর্যন্ত, কারির অবর্তমানে, ওর প্রতিদ্বন্দ্বী ছিল মলিনা। হ্যারি সম্বন্ধে সে বিশেষ কিছুই জানে না, কেবল মাঝে-মধ্যে ঘোড়ায় চড়ে ওকে ক্যাম্পে ঢুকতে-বেরুতে দেখেছে। শিকার নিয়েই মেতে থাকে ছেলেটা। প্রায়ই রাউন্ডি থাকে ওর সঙ্গে। এ ছাড়া, পেরিন জানে, দু'একবার পরিকল্পনা সভাতেও হ্যারি হাজির ছিল। তবু কয়েকটা কারণে ওকে এতদিন প্রতিদ্বন্দ্বী মনে করেনি সে।

পেরিন জানে, নেতৃত্ব নিয়ে রিগার মলিনার সাথে তার গোলমাল বাধবে, কিন্তু হ্যারি? এটা ঠিক যে ও বুড়ো সর্দারের পোষ্যপুত্র, কিন্তু...

ক্রোধের বারুদ জ্বলে উঠল পেরিনের মাথায়। অতি কষ্টে কণ্ঠস্বর সংযত রাখল। ‘সেটা কি ঠিক হবে? একেবারে আনকোরা একটা ছেলেকে নেতা বানাতে দলের সবাই কী ভাববে?’

‘নিজের কাজ ও খুব ভালই বোঝে। অপারেশনে গেলেই সবাই বুঝতে পারবে, ও কারও চেয়ে কোন অংশে খাটো নয়। এবারের দাঁওটাও বেশ বড়, আর কঠিনও বটে।’

‘আর কে যাচ্ছে?’ জিজ্ঞেস করল পেরিন। ‘কাজটাই বা কী?’

‘সঙ্গী ওকেই বেছে নিতে বলব আমি। একপক্ষে এটা ওর জন্যে ভালই হবে। উপযুক্ত লোক বাছাইয়ের ক্ষমতা বাড়বে। অ্যাঁ, কী কাজ? সেটা এখনও ঠিক করিনি। সোনাবাহী ট্রেন লুটও হতে পারে, আবার পূর্ব কলোরাডোর কোনখানে হামলাও হতে পারে। দুটো নিয়েই কিছু দিন হলো চিন্তা-ভাবনা করছি আমি।’

সোনাবাহী ট্রেন? পেরিনের মতে কাজটা তার ন্যায্য প্রাপ্য। ওটার খোঁজ সে-ই এনেছে। এ-ধরনের কাজই তার পছন্দ। পার্বত্যঞ্চলের খনিগুলো থেকে সোনার চালান। খচ্চরের পিঠে করে রেলরাস্তা পর্যন্ত সোনা বয়ে আনা হয়।

প্রচুর সোনা, এত যে ধারণার বাইরে।

মাস দুয়েক আগে ওর নিজের দোষেই ওই ট্রেন আক্রমণের পরিকল্পনা ভেঙে গেছে। ও ট্রেনের সবাইকে খুন করার পক্ষে মত দিয়েছিল। কাছেই কোথাও মাটিচাপা দেয়া হবে তাদের। ফলে কোন সাক্ষীসাবুদ থাকবে না, সোনাসহ ট্রেনটা স্রেফ হাওয়ায় মিলিয়ে যাবে। এবং সেটা যাতে হয় তার দায়িত্বও সে-ই নিতে চেয়েছিল।

‘বড্ড বেশি খুনোখুনি,’ আপত্তি তুলেছে বেন। ‘তুমি দেখছি আজকাল মলিনার সুর ধরেছ।’

‘মরা মানুষ কথা বলে না,’ পীড়াপীড়ি করেছে পেরিন।

মাথা দুলিয়ে ওর কথায় সায় দিয়েছে বেন কারি। ‘হয়তো-বা। কিন্তু তাদের আত্মীয়-স্বজন চূপ করে থাকবে না। ওই ধরনের ঘটনা মানুষকে কৌতূহলী করে তোলে। যখন কেউ খুন হবে তার বদলা নিতে এগিয়ে আসবে আরেকজন। লক্ষ করবে, যখন কোথাও সোনা চুরি হয়, অমনি তা খোজার হিড়িক পড়ে যায়।’

এরপর আনমনে টেবিলের ওপর কিছুক্ষণ তাল ঝুকেছে বেন। তারপর চূড়ান্ত রায় দিয়েছে, ‘না, ওটা না। অন্তত এভাবে নয়।’

কিন্তু পেরিন জানে না, সে-ই তখন থেকেই কাজটা হ্যারিকে দেবে বলে ঠিক করেছে বেন। পেরিনের মাঝে রক্তের নেশা আছে। হ্যারির নেই। তা ছাড়া এ-বিষয়ে ওর নিজের কোন পরিকল্পনা থাকলেও থাকতে পারে।

দলের কেউ কেউ হ্যারি সম্পর্কে অল্পবিস্তর জানে। নানান বিদ্যায় দক্ষ করে তোলার ব্যাপারে ওকে সাহায্য করেছে ওরা। বয়স্কদের অনেকেই ওকে নিজের সন্তানের মত ভালবাসে। গর্ব করে ওকে নিয়ে। এই দাঁওটা মারতে পারলে দলে ওর আসন পাকা হয়ে যাবে। কিন্তু পেরিনের কী হবে?

এখন আবার সেই পুরোনো ভাবনাটাই বেনের মাথায় ঘুরতে লাগল। কাজটা সে হ্যারিকেই দেবে বলে সিদ্ধান্ত নিল। বেশ মোটা দাঁও, বহু বছরের মধ্যে এটাই হবে সেরা।

মনে মনে রাগে ফুঁসতে লাগল পেরিন। এরকম ফনার কোন অধিকার নেই বেনের। সোনাবাহী ট্রেন তার! এর যৌজপাত্তা সে-ই নেব করেছে এবং ওদেরকে খুন করার প্রশ্নে বুড়ো সর্দারের খুঁতখুঁতি থাকলেও, তার নেই। একেবারে ধুয়ে সাফ করে দিতে হবে-এটাই একমাত্র রাস্তা। আর এখন কিনা সামান্য এক পুঁচকে জোড়ার জন্য কাজটা ফস্কে যাচ্ছে তার কাছ থেকে। হ্যারিকে গিলতে বেন কারি বাধ্য করছে ওদের।

ওব রাগ পড়ে গেল, কিন্তু তার জায়গা নিল সিদ্ধান্ত। হ্যাঁ, নিজের পথে চলার এটাই সময়, ভাবল পেরিন। বুড়ো সর্দারের হুকুম অনেক ভাবিল করেছে। বেন যদি চায় সোনা লুটের কাজটা তার ছেলে করবে, করুক সে। কিন্তু সেক্ষেত্রে অপর কাজটা, তা সেটা সর্দার পছন্দ করুক চাই না করুক, পেরিন নিজে করবে। আর এই ভাবে, সর্দারের মতামতের তোয়াক্কা না করে, বেনের মুখের ওপর সে একটা চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দেবে। নেতৃত্ব নিয়ে যদি কোন কোনদল বাধেই তবে সেটা এপান থেকেই ওরু হোক।

‘নেতৃত্ব ও-ই দেবে,’ বলল বেন। ‘সে-ভাবেই গড়ে তোলা হয়েছে ওকে। ওর চেয়ে ভাল নেতা আর পাবে না তোমরা।’

একরাশ ক্ষোভ নিয়ে পাথরবাড়ি থেকে বেরিয়ে এল কার্ব পেরিন। তবে সেই সঙ্গে একটা সুস্থ আনন্দের মনোভাবও তার মনে রিনঝিনিয়ে উঠল। বহু বছর হুকুম তামিলের পর এই প্রথম সে নিজের পায়ে দাঁড়াতে যাচ্ছে। চুলোয় যাক বেন কারি! ব্যাটাকে একহাত দেখাবে সে! সবাইকেই দেখাবে!

তবু ওর মনের গহীন কোণে ছোট্ট একটা ভয় চোখ রাঙাল। নির্দেশ অমান্য করলে বেন কারির কী প্রতিক্রিয়া হবে?

চিন্তাটা মাথায় আসতেই ভেতরে ভেতরে একটু যেন কঁকড়ে গেল পেরিন। বেনের শীতল রাগী চেহারা সে দেখেছে, আর পিস্তল ব্যবহার করতেও দেখেছে।

সে নিজেও এ-ব্যাপারে ঝানু, কিন্তু তার গতি আর নিশানা কি বেন কারির মত অতটা দ্রুত, নির্ভুল?

পেরিনের মনে এ-বিষয়ে সন্দেহ উঁকি দিল। পরক্ষণেই সেটা ঝেড়ে ফেলল সে। বেনকে হারাতে পারবে, এ-ব্যাপারে সে নিশ্চিত। তবে তার হয়তো সরকার পড়বে না। অন্য আরও রাস্তা আছে।

একটা ব্যাপারে তার কোন দ্বিধা-দ্বন্দ্ব নেই: বেন কারিকে সামলানোর জন্যে একটা কিছু করতে হবে তাকে, এবং সেটা করতে হবে খুব শিগগিরই।

পাঁচ

বেন কারির টেবিলের সামনে হ্যারি কার্টার দাঁড়িয়ে আছে। দু’জোড়া চোখ পরস্পর নিবদ্ধ।

বেন কারি দেখতে বিশাল, শক্তিশালী। ভালুকের মত। চোখজোড়া শীতল, কৌতূহলী—তবে স্নেহের পরশও আছে তাতে। এই রকম একটা ছেলে তার আজন্ম কামনা; লম্বা, চটপটে। সীমান্তবাসী পুরুষের মতই শক্ত-সমর্থ চওড়া কাঁধ; বেআইনি কাজে পটু, পিস্তলে দক্ষ, অথচ ভদ্র-মার্জিত। যে-কোনও পরিবেশে খাপ খাইয়ে নেয়ার মত উপযুক্ত।

‘চারজন লোক বেছে নিয়ে সরজমিন ঘুরে আসো, হ্যারি,’ বলছিল বেন কারি। ‘আমি চাই এটার পরিকল্পনা তুমি-ই করো। খনি থেকে সোনাবাহী ট্রেন রওনা হবে বিশ তারিখে। সর্বমোট পাঁচটা ওয়্যাগন, ওগুলোতে সোনা থাকবে। প্রায় পাঁচ লাখ ডলারের মত।’

‘গত দু’বছরে মোট তিনবার আমরা ওই এলাকা খুঁটিয়ে ঘুরে দেখেছি। কাজেই তোমার কাজ হবে ওখানে গিয়ে একবার দেখে আসা, কোন কিছু বদলেছে কি-না।’

‘চেষ্টা করব কারও চোখে না পড়ার। অথবা এখানে-সেখানে ঘুরঘুর করবে

না। কারও সাথে যদি কথা একান্তই বলো, তবে জিজ্ঞেস করবে প্রেসকট ওখান থেকে কতদূর, যাতে তারা ভাবে সে-দিকেই যাচ্ছ তুমি।

‘এই কাজটায় তুমি সফল হলেই দল-প্রধানের দায়িত্বটা তোমার হাতে তুলে দিয়ে আমি সরে যাব। তুমি জানো এটাই আমার শেষ ইচ্ছে।’

‘আমার বয়েস বাড়ছে। শেষ বয়েসটা একটু শান্তিতে কাটাতে চাই। এই দল চালাতে হলে কঠোর হতে হবে। পারবে না?’

‘পারব।’

‘আমারও তাই বিশ্বাস। পেরিনের দিকে নজর রেখো। ও গর্তে লুকোনো সাপ, সুযোগ পেলেই ছোবল দেবে। মলিনাও বিপজ্জনক, তবে ও আড়াল-আবডালের ধার ধারে না, যা করবে সামনাসামনি করবে। কিন্তু পেরিন তার বিপরীত, খল। আমার সাথে পারেনি, কারণ আমি সব সময়েই এক ধাপ এগিয়েছিলাম-এখনও আছি।’

বেন চুপ করল, জানালা দিয়ে তাকিয়ে রইল দূরের সান ফ্রান্সিসকো পর্বত-শৃঙ্গমালার দিকে।

‘হ্যারি,’ ধীর, শান্ত সুরে খেই ধরল সে, ‘বসো। আমাদের দু’জনার কিছু কথা হওয়া দরকার।’

‘হয়তো তোমাকে ভুল পথে পরিচালিত করছি আমি। কিন্তু কোনটা ঠিক আর কোনটা বেঠিক, আমি জানি না। সত্যি বলতে কী, কখনও মাথাও ঘামাইনি এ-নিয়ে। আমি যখন পশ্চিমে আসি তখন এটা ছিল মগের মুল্লুক। এখানে টিকে থাকতে গেলে শক্তির প্রয়োজন হত। কয়েকবার ঘা খেতে হয়েছে আমাকে, বাথান-মালিকেরা ভিটে-মাটি ছাড়া করেছে, আমার বোনকে খুন করেছে।’

‘তারপর খনিতে কাজ করে যখন ভাগ্য ফিরলাম তখন কিছু লোক এসে সেটা আমার কাছ থেকে ছিনিয়ে নিয়ে নিজের নামে করে নিল। এর নাম বিচার নয়। তাই ঠিক করলাম পাল্টা আঘাত হানব।’

‘লোক যোগাড় করলাম আমি। এবং ওই শয়তানগুলো যখন আমার সোনার চালান বাইরে পাঠাল, লুট করলাম সেগুলো। তারপর পুবে গিয়ে একটা বড় দলের সাহায্যে যারা আমাকে ভিটেছাড়া করেছিল, তাদের পাঁচশো গবাদি পশু লুট করলাম।’

‘ওরা আমার পিছু নিলে কয়েকজনকে দিয়ে জানোয়ারগুলো মেক্সিকোতে পাঠিয়ে দিলাম। ওই লোকেরা তাদের তাড়া করল, আর আমি সেই ফাঁকে আরও পাঁচশো খেদিয়ে আনলাম। এরপর ওই পশুগুলোকে দক্ষিণে রওনা করিয়ে দিয়ে আবার ফিরে এলাম আমি। ওদের বাথান ভেঙে ছারখার করে দরজায় আমার মার্কা লাগিয়ে দিলাম যাতে ওরা বুঝতে পারে কার কাজ এটা।’

‘ওরা আইনের আশ্রয় নিল। জেলে পুরতে চাইল আমাকে। কিন্তু আমি পালিয়ে রইলাম। ইচ্ছে থাকুক চাই না থাকুক, আমি দস্যু হয়ে গেলাম। বস্তুত দরজায় আমার মার্কা লাগানোটাই হয়ে গিয়েছিল চরম বোকামি।’

‘আউট-লদের নিয়ে এই এক ‘মুশকিল, নিজেদেরকে তারা ফলাও করে জাহির করতে চায়। যাক, একটা ভুল হয়ে হয়ে গেছে, কিন্তু ঠিক করলাম আর ফেরা

কখনও করব না।

‘আর তাই এতগুলো বছর ধরে নীরবেই কাজ সারছি আমরা। অথচ জেমসের দলের অবস্থা দেখে, সকলেই জানে ওদের কথা। ফলে বেশির ভাগ সময়ে গা ঢাকা দিয়ে থাকতে হয় ওদের।’

একটু জিরিয়ে নিল বুড়ো সর্দার। ‘তা কাদেরকে সঙ্গে নিতে চাও তুমি?’

‘রাউন্ডি, ডাক্তার সয়্যার, কলি, এবং গার্লিন।’

ধীরে ধীরে মাথা দোলাল বেন, তারপর ওর মুখের দিকে তাকাল। ‘কেন?’

‘জায়গা চেনায় রাউন্ডির জুড়ি এ-দেশে নেই। ও অবশ্য বলে আমিও নাকি সমান পাকা। তবু ওকে সাথে রাখতে চাই আমি। ডাক্তার সয়্যার সৎ লোক, আমার কোন ভুল দেখলে ধরিয়ে দেবে। এবং কলি আর গার্লিন, দলের সেরা লোকদের মধ্যে ওদের স্থান। আমি ওদের সাহায্য চাইলে খুশি হবে। চাই কি সে কারণেই প্রয়োজনের সময়ে আমার পক্ষ নেবে।’

ওপর-নীচ মাথা নাড়ল বেন। ‘সুন্দর চিন্তাধারা। হ্যাঁ, কলি আর গার্লিন আমাদের সেরা লোকদের দু’জন। মলিনা আর পেরিনকে নিয়ে শেষ পর্যন্ত গোলমাল যদি দেখাই দেয়, তবে ওই দু’জনকে পাশে পেলে তোমার সুবিধেই হবে।’

পরে, হ্যারি চলে যাওয়ার পর, বেন কারি উঠে জানালার সামনে গিয়ে দাঁড়াল। ভীষণ অস্থিরতায় ভুগছে সে। এর কারণ সে বুঝতে পারছে না, অন্তত যতক্ষণ না...

জীবনে এই প্রথম নিজের কাজকর্ম সম্পর্কে সংশয় দেখা দিয়েছে তার। কোন অধিকারে হ্যারিকে দস্যু বানাচ্ছে সে? রাউন্ডির কথাই বোধহয় ঠিক, সত্যিই তাদের দিন ফুরিয়ে গেছে। জনবসতি বাড়ছে, আর সেই সাথে আগের সুযোগ-সুবিধাও হারিয়ে যাচ্ছে। এমনকী ইন্ডিয়ানরা পর্যন্ত ডেরা বাঁধতে শুরু করেছে। অনেক দিন ধরেই সে খুব ভেবে-চিন্তে জায়গা বাছাই করে আসছে। ছোট ছোট বেশ কয়েকটা শহরের মার্শাল শক্ত মানুষ, তা ছাড়া লোকজনের দৃষ্টিভঙ্গিও বদলাচ্ছে। আর তার নজির তো চোখের সামনেই রয়েছে। মিনেসোটায় একদল কৃষক আর বাবসায়ী মিলে জেমস গ্রুপের কয়েকজনকে গুলিতে ঝাঁঝরা করে দিয়েছে।

বিল কডওয়েল, ক্রে মিলার আর চার্লি পিটস নিহত হয়েছে। ইয়ংগার ভাইদের তিনজনই গুরুতর আহত হয়েছিল। তার মধ্যে একজনের তো চলার শক্তিটুকু পর্যন্ত ছিল না। জেসি তাকে মেরে রেখে যেতে চেয়েছিল, কিন্তু বাকি দু’ভাইয়ের মারমূর্তি দেখে পারেনি, সঙ্গে নিতে বাধ্য হয়েছে।

জেমস গ্রুপ এতদিন মানুষের সহানুভূতি কুড়িয়েছে তার কারণ ওরা একটা ‘নষ্ট বিশ্বাসের’ পক্ষে লড়ছিল। কিন্তু তাতেও পার পাবে না। ওরা যেসব ব্যাংক লুট করেছে সেগুলোর অধিকাংশেরই মালিক দক্ষিণী এবং আগে তারা কনফেডারেটপন্থী ছিল। ফলে ব্যাপারটা দাঁড়িয়েছে পেছন থেকে ছুরি মারার মত।

জানালা থেকে সরে ফায়ারপ্রেসের কাছে গিয়ে দাঁড়াল বেন কারি। ম্যাটেল

থেকে পাইপটা নিয়ে ভেতরের ছাই ঝেড়ে ফেলল। তারপর আবার তামাক ভরল।

যতসব, মন থেকে দুশ্চিন্তা ঝেড়ে ফেলল সে। ছেলেকে সে উপযুক্ত ট্রেনিং দিয়েছে। তা ছাড়া ওর চারপাশে থাকবে শ'দুই বাছাই করা লোক। তবে এটাও ঠিক যে এমন একটা সময় আসছে যখন দল হালকা করতেই হবে। নতুনদের অনেকেই বড় বেশি ছটফটে, দস্যু-জীবনে খাপ খায় না। ওরা চায় ফুর্তি করতে-জানে, কত দ্রুত টাকা-পয়সা ওড়াতে হয়।

মোরায় সংঘটিত ডাকাতির কথা মনে পড়ল। রাউন্ডির উদ্বেগকে সে যতই তুচ্ছ তামিচ্ছ্যা করুক না কেন, তার নিজের মনেও সন্দেহের মেঘ জমা হয়েছে।

কী যেন নাম লোকটার। হ্যাঁ, মনে পড়েছে, চার্লি ফ্যারেল। ওর কথা অন্যদের মুখে শুনেছে সে, তবে তেমন আমল দেয়নি। কারণ তিলকে ভাল করা ওদের স্বভাব। বন্দুকবাজদের নিয়ে কল্লকাহিনি ফাঁদতে ভালবাসে ওরা। তবু রাউন্ডির কথাই ঠিক, বহুদিন হলো সে ঘরে বসা। তার ধার ভোঁতা হয়ে যাচ্ছে।

কলোরাডোর ওই ছোট্ট শহরটাতেই কি এবার হামলা চালাবে? কাজটা সোজা হওয়ারই কথা। নাকি ছেলেকে সেখানেই পাঠাবে? ওখানে এক বাথান-মালিকের কাছে তার কয়েকটা ঘোড়া আছে। বেশ শক্তপোক্ত চেহারা, গবাদি পশুর ব্যবসা করে লোকটা।

নিভে যাওয়া পাইপটা আবার ধরিয়ে নিল সে। কার্ব পেরিনের দিকে নজর রাখতে হবে। সোনাবাহী ট্রেন লুটের দায়িত্ব হ্যারিকে দেয়াটা মনঃপূত হয়নি ওর। পেরিন কথা বাড়ায়নি, তবে ওকে সে ভাল করেই চেনে।

কার্ব পেরিন ভয়ঙ্কর লোক। ধূর্ত, খল, কুচক্রী-ভাল প্ল্যানার তবে অধৈর্য। হতাশা খেপিয়ে তোলে তাকে।

হ্যারি কার্টার উত্তেজনায় ফুটছে। ওর এখন বাইশ চলছে। কিন্তু বয়েসের তুলনায় ওকে বেশ বড়ই দেখায়। অথচ এতগুলো বছরের মাঝে বার কয়েক সল্ট লেক সিটিতে যাওয়া ছাড়া এই পাহাড়ঘেরা ক্যানিয়ন এলাকা থেকে সে কমই বের হয়েছে।

রাউন্ডি ওদের পথ দেখিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। এই ট্রেইলটা ওর পরিচিত। একটা পুরোনো ইন্ডিয়ান ট্রেইল, দক্ষিণে যাওয়ার সময় আউট-লরা ব্যবহার করে এটা।

বেশকিছু ছায়াচ্ছন্ন জায়গায় এখনও ভূষার জমে আছে। কিন্তু যতই ওরা ক্যানিয়নের কাছে আসছে, পর্বতশীর্ষগুলো ততই যেন আকাশে মাথা তুলছে। ট্রেইলটা ক্রমশ সরু পাথরে পাঁচিলের আকার নিচ্ছে; লাল নিরেট পাথরের ঢাল, তার মাঝে ইতি-উতি সিঁড়ার গাছের স্নিগ্ধ সবুজ সৌন্দর্য-দেখে মনে হচ্ছে যেন পাথরের গা ফুঁড়ে বেরিয়েছে।

এই জনহীন প্রান্তরে আরেকজন মানুষের দেখা পাওয়া-তা সে ইন্ডিয়ান হলেও-ভাগ্যের ব্যাপার। ওদের দক্ষিণ প্রান্তে নাভাজো এলাকা। এ ছাড়াও পাইউটসদের ইতস্তত ছড়ানো বসতি রয়েছে। ওরাই সম্ভবত এই দেশটাকে আর যে-কোন মানুষের চেয়ে ভাল চেনে। বেন কারি এখানে আমার পর পরই ওদের

সাথে বন্ধুত্ব পাতিয়েছে। মাঝে-মাঝে ওদেরকে এটা-সেটা ভেট দেয় সে, ঘোড়া বেচাকেনা করে। দলের লোকদের ওপর তার কড়া নির্দেশ, কেউ যেন ওদের না ঘাঁটায়।

রাউন্ডির ঠিক পেছনেই রয়েছে হ্যারি। খুসর রঙের হাড় জিরজিরে একটা ঘোড়ার পিঠে কুঁজো হয়ে বসে আছে রাউন্ডি। ঘোড়াটা দেখতে তার মালিকের মতই বুড়ো হলেও পাহাড়ে চড়ায় পটু, যে-কোন ধরনের বেমক্কা অবস্থায় ওটার ওপর নির্ভর করা যায়।

ওদের পেছনে ডাক্তার সয্যার। দুর্বল, বিষণ্ণ চেহারা। কিন্তু মুখ দেখে তার মনের সন্ধান পাওয়ার জো নেই। সদাসতর্ক চোখ জোড়ায় কৌতুকের আভাস। টুবি কলি লোকটা বেঁটে, চওড়া-চ্যাপ্টা ছাতি। দৃঢ়বদ্ধ চোয়াল, দেখলেই বোঝা যায় প্রচুর আত্মবিশ্বাসের অধিকারী এই লোক। দু'জন লোককে খুন করে দস্যুজীবনে আসার আগে একটা বাথানের ফোরম্যান ছিল ও। চৌকশ লোক।

টেন্স গার্লিন লম্বা, মোটা-সোটা লোক। শান্ত। টেন্সাসে বাড়ি, গার্লিনের অতীত সম্পর্কে এর বেশি জানে না কেউ। তবে জনরব: সেখানে ও নিদেন এক ডজন খুন করেছে।

একটা ছাই রঙা বড় পাথরের পাশ দিয়ে বাক ঘুরে नीচে নামতে শুরু করল রাউন্ডি। সোজা নদীতীরে গিয়ে ট্রেইলটা শেষ হয়েছে।

নদী-সংলগ্ন সমতল জায়গায় একটা ছোট্ট কেবিন। কেবিনটার পাশেই চতুর্ভুজ আকারের বাথান। কেবিনের দোরগোড়ায় রাইফেল হাতে একটা লোক দাঁড়িয়ে। শীতল অভিজ্ঞ দৃষ্টি মেলে একে একে সবাইকে মাপল ও। 'এসো, তোমাদের অপেক্ষাতেই ছিলাম।' লোকটার চোখ হ্যারি কার্টারের ওপর স্থির হলো। 'একে চিনলাম না তো?'

'আমাদেরই লোক,' বলল রাউন্ডি। 'বেন কারির ছেলে।'

'তোমার কথা শুনেছি। শুনি তুমি নাকি চমৎকার গুলি ছুঁড়তে পারো?'

লজ্জায় রাঙা হলো হ্যারি। 'জানি না কী শুনেছ, মোটামুটি কাজ চালাতে পারি আর কী।'

'ওর কথায় ভুলো না,' বলল রাউন্ডি। 'দরকার পড়লে ও ঠিকই পিস্তল ধরবে।'

'তা হলে, বাছা, হয়ে যাক এক রাউন্ড,' বলল কেবিনের বুড়ো। 'একজন ব্যাটাছেলেকে গুলি ছুঁড়তে দেখলে আনন্দ লাগে আমার।'

এপাশ-ওপাশ মাথা নাড়ল হ্যারি। 'অনর্থক গোলাগুলি করা বোকামি। বেন কারি আমাকে শিখিয়েছে বিনা কারণে কখনোই পিস্তল বের করতে নেই।'

'আরে দেখাও না একটু,' অনুনয় করল কলি।

তর্জনী তুলল বুড়ো। 'ওই যে কালো কঞ্চিটা দেখছ? পঞ্চাশ-ষাট কদম দূর হবে। পারবে ওটায় লাগাতে?'

কঞ্চিটার বেড় ইঞ্চি দেড়েকের বেশি হবে না। পাহাড়ের পটভূমিতে দেখাই যায় না প্রায়। 'ওইটের কথা বলছ?' চকিতে পিস্তল বের করেই ঘোড়া টিপল হ্যারি। ছাতু হয়ে গেল কঞ্চিটার মাথা।

পুরো ব্যাপারটাই এত নিখুঁত আর মসৃণভাবে ঘটে গেল যে ওদের কেউ-ই ঠাওর করতে পারল না কী ঘটেছে। গার্লিনের চোয়াল ঝুলে পড়ল, দম আটকে বিস্ফারিত চোখে তাকিয়ে রইল সে-দিকে। আড়চোখে কলির দিকে তাকিয়ে চিবানো ঘাস মাটিতে ফেলল। তারপর বলল, 'এই নিশানা দেখলে কার্ভ পেরিন কী বলবে তাই ভাবছি?'

কলি মাথা দোলাল। 'হ্যাঁ,' মৃদু স্বরে বলল ও। 'তবে কষ্টটা কিন্তু ওকে লক্ষ্য করে পাল্টা গুলি ছুঁড়ছে না।'

বুড়ো বিল দু'কূল ছাপানো খরস্রোতা নদীটা পার করে দিল ওদের। এক চিলতে সফ্র কানিশের ওপর দিয়ে পার হওয়ার সময়ে ভয়ে ওদের গায়ের লোম দাঁড়িয়ে গেল। নদীকে পেছনে রেখে এবার ওরা দক্ষিণ দিকে রওনা হলো। দিন কয়েক পর, দু'তিন জায়গায় ঘোড়া বদলে, ছোট্ট খনি-শহর ওয়েভার-এ এসে পৌঁছল ওরা।

সূর্যাস্তের অল্প কিছু আগে কলি আর গার্লিন শহরে ঢুকল। এর ঘন্টাখানেক বাদে গেল রাউন্ডি আর ডাক্তার সয়্যার। ওরা পরস্পর দূরে দূরে রইল। এরও কিছুক্ষণ পর হ্যারি কার্টার একা ঢুকল শহরে। এমন ভান করল যেন বাকি চারজনকে চেনে না।

সেলুনের বেশির ভাগ খদ্দেরই মেক্সিকান, নিজেদের মধ্যে খোশ গল্পে মত্ত ওরা। বারে তিনজন শ্বেতাঙ্গ বসে আছে। রাগী চেহারা। সতর্ক দৃষ্টিতে ওদের দিকে তাকাল হ্যারি।

ওদের একজন আড়চোখে হ্যারির নকশাতোলা বাকস্কিনটা দেখে বাকি দু'জনের কানে কানে কিছু একটা বলতেই জোরে হেসে উঠল ওরা।

শ্মিত মুখে বারে গিয়ে দাঁড়াল হ্যারি, ওই লোক তিনটাকে পাত্তা দিল না বিশেষ। ওদের একজন ওর কাছে সরে এল।

'হাই, স্ট্রেঞ্জার! তোমার সুটটা তো চমৎকার! কোথা থেকে কিনেছ?'

লোকটার গলা শুনে পাশে দাঁড়ানো কলির দিকে তাকাল গার্লিন। 'করবাস আর ফ্লেচার! গায়ে পড়ে ঝগড়া বাধাতে ওস্তাদ। আমাদের বোধহয় ব্যাপারটা দেখা দরকার।'

'দাঁড়াও আগে দেখি ও সামলাতে পারে কি-না।'

হ্যারির মুখে তেমন ভাবান্তর ঘটল না। 'এরকম জিনিস চাই তোমার? যে-কোন ইন্ডিয়ানের কাছে গেলেই পাবে?' লোকগুলোকে একনজর দেখেই ওদের স্বভাব-চরিত্র সম্পর্কে আন্দাজ করে নিয়েছে সে। প্রায় সব বারেই এদের মত অন্তত একজনের দেখা মেলে। পেটে কিছু তরল পদার্থ পড়লেই এদের মাথা গরম হয়ে ওঠে।

'এত সোজা? গেলেই পাওয়া যাবে?' জিজ্ঞেস করল করবাস। ঝগড়া বাধাবার জন্য মুখিয়েই ছিল সে, হ্যারির গোবেচারা গোছের ভাব-ভঙ্গিতে আমোদ পাচ্ছে।

একটা গোলমাল অনিবার্য হয়ে উঠেছে, কোন উপায় নেই এড়াবার। সে যদি এখন চলে যায় এখন থেকে ওরা পিছু নেবে। তার চেয়ে সরাসরি

মোকাবেলা করাই বরং ভাল। 'হ্যাঁ, সোজাই,' বলল হ্যারি, 'কিন্তু সে-খোজে তোমার কী দরকার ঠিক বুঝলাম না। তোমার গায়ে তো লাগবে না, বড় হবে।' 'আচ্ছা?' হ্যারির গলায় বিদ্রূপের ছল অনুভব করে করবাস বিস্মিত হলো। 'ইয়াকি মারছ?'

'না,' ঠাণ্ডা সুরে জবাব দিল হ্যারি। 'কোন মাতাল উল্লুকের সাথে ইয়াকি মারার মত রুচি আমার নেই।'

'এই সুট কোথায় পাওয়া যাবে জিজ্ঞেস করেছ, বলেছি। ইচ্ছে করলে তোমরা তিনজনই এখন আমার পয়সায় একবার গলা ভিজাতে পারো। আমার মতে সেটাই মঙ্গল হবে।' ওর গলা আরও খাদে নেমে গেল। 'কারণ, আমি তোমাদের বন্ধু হতে চাই। বুঝেছ?'

ফ্যালফ্যাল করে হ্যারির দিকে তাকিয়ে রইল করবাস, বিপদের গন্ধ পেল সে। ব্যাপারটা খুবই ঝুঁকিপূর্ণ হয়ে উঠতে পারে, কিন্তু গলা ভেজানোর প্রস্তাব মেনে নিয়ে গোলমাল মেটানোর মত সরল বান্দা সে নয়। 'আর যদি কোন পুঁচকে ছোঁড়ার সাথে ড্রিংক করতে রাজি না হই, তো?'

চোখে সরষের ফুল দেখল করবাস। হ্যারির বাঁ-হাত নড়তেই তার মাথায় সতর্কধ্বনি বেজে উঠেছিল, কিন্তু ডান হাতটা দেখতে পায়নি সে। বাঁ-হাতের ঘুসিতে ওর ঠোঁট কেটে গেল, বাঁ-চোয়ালের হাড় ভাঙল রাইট-জ্যাবে। ছড়মুড় করে নিতম্ব দিয়ে শক্ত শানের ওপর আছাড় খেলো করবাস। জ্ঞান হারিয়েছে আগেই।

ফ্রেচার আর তার সঙ্গী ইতস্তত করতে লাগল। করবাস মেঝেতে পড়ে আছে। হ্যারির মুখে হাসি নেই। 'তোমরা গলা ভিজাবে, নাকি লড়বে একহাত?'

'ঘুসির বদলে কেউ যদি পিস্তল ব্যবহার করে, তখন কী করবে?' প্রশ্ন করল ফ্রেচার।

'খুন করব,' নিরাসক্ত গলায় জবাব দিল হ্যারি।

চোখের পাতা পিটপিট করল ফ্রেচার। করবাসের হাল দেখে বাসি মর্ডির মত মিইয়ে গেছে সে। 'মনে হচ্ছে তা-ই করবে তুমি। ঠিক আছে, তোমার কথাই সই। ড্রিংকের অভীর দাও। এই পাহাড়ের গোড়ায় ইতিমধ্যেই বিশজনের কবর খোঁজা হয়েছে।'

গগগোল মিটে গেছে দেখে হ্যাঁফ ছাড়ল বারটেডার। ওদের গ্রাস ভর্তি করে দিল সে। অচেতন করবাসের দিকে ফিরেও তাকাল না কেউ।

'জ্ঞান ফিরে এলে করবাস কী করবে তাই ভাবছি,' বলল হার্লি।

হার্লিনের দাঁত দেখা গেল। 'আজ আর কিছু ঘটবে না। সেই শক্তি থাকবে না ওর।'

নীরবতা নেমে এল ওদের মাঝে। কিছুক্ষণ পর হার্লিন বলল, 'ঘটনাটা শোনার পর কার্ব পেরিনের চেহারাটা কেমন হবে, দেখার জন্য আমার সবর সইছে না।' কলির মুখের কাছে ঝুঁকে এল ও। 'জোর ওজর, ছেলেকেই নাকি পরবর্তী নেতা বানাচ্ছে সর্দার।'

'তাই তো গুনছি।'

‘তা ছেলেটা কাজের বটে। মনে হয় পারবে।’

হ্যারি কার্টার তার বিয়্যারের মগ খালি করে বারে নামিয়ে রাখল। এমন সময়ে বাইরে একটা স্টেজ এসে থামল। গাড়ি ধরার জন্য উঠে পড়ল কয়েকজন। হ্যারি দেখল, নীরবে সরে পড়ার এটাই মোক্ষম সুযোগ, ওদেরকে অনুসরণ করল সে।

পায়ের খিল ছাড়াতে স্টেজ থেকে নামছে যাত্রীরা। এই ফাঁকে কিছু খেয়েও নেবে তারা। সেলুনের পাশেই একটা বোর্ডিং। যাত্রীদের ভেতর তিনজন মহিলা, প্রত্যেকেরই পরিপাটি বেশভূষা, চেহারায় পূর্বাঞ্চলীয় ছাপ।

ওকে দেখে তিনজনের একজন এগিয়ে এল। যুবতী। তামাটে রং, দীঘির মত একজোড়া ডাগর চোখ। ধূসর। ‘রেড ক্যানিয়ন ওয়ালে যাওয়ার শটকাট রাস্তা কোনটা?’ ওকে জিজ্ঞেস করল মেয়েটা।

চকিতে সতর্ক হয়ে উঠল হ্যারি কার্টার। ‘স্টেজে গেলে কাল সকাল নাগাদ পৌঁছুবেন। এ ছাড়াও অবশ্যি একটা সহজ রাস্তা আছে। তবে সেজন্যে বাকবোর্ড লাগবে।’

‘কোথায় পাব একটু যদি বলতেন, আমার মা অসুস্থ।’

ওর পেছনেই ছিল ডাক্তার সয়্যার। ‘সাবধান, হ্যারি,’ ফিসফিস করে বলল সে। ‘ঝামেলা বাধতে পারে।’

ছয়

রাস্তায় নেমে মেয়েটার সাথে স্টেজ অবধি হেঁটে গেল হ্যারি। আরেক মেয়েকে সঙ্গে করে ওদের মা স্টেজের পাশেই দাঁড়িয়ে ছিল। কিন্তু হ্যারি দু’চোখ ভরে কেবল মেয়েটাকেই দেখল।

ঈষৎ সোনালি চুল তবে তার সাথে প্রথম যে-মেয়েটা কথা বলেছিল তার চেয়ে একটু শ্যামলা। প্রথম জন শান্ত, মিষ্টি। আর এ উজ্জ্বল; প্রাণময়।

চার চোখ এক হতেই টুপি খুলে অভিবাদন জানাল হ্যারি। ওর সাথেই মেয়েটা মুখ খুলল। ‘এই আমার মা, মিসেস রাগান, আর এ আমার বোন, ড্রুসিলা।’ হ্যারির দিকে তাকাল মেয়েটা। ‘আমি জুলিয়ানা।’

হ্যারি বাউ করল। ওর চোখ ড্রুসিয়ার ওপর নিবন্ধ। ‘আমি হ্যারি কার্টার,’ জবাব দিল সে।

‘মা, ইনি বলছেন, বাকবোর্ড ভাড়া করলে তাড়াতাড়ি পৌঁছুতে পারব আমরা।’

‘ওখানে কোথায় যাবেন আপনারা?’ জিজ্ঞেস করল হ্যারি।

‘ভি-বার, ভয়েল রাগানের বাথানে।’

ও ফিরে যেতে উদ্যত হয়েছিল, কিন্তু মাঝপথে থেমে গেল। ‘কার নাম

বললেন...ভয়েল র্যাগান?’

‘হ্যাঁ। কেন কিছু হয়েছে?’

‘না, এমনি। ঠিকানাটা জেনে নিলাম আর কী।’ হ্যারি হাসল। ‘যদি কখনও যাই সেজন্যে।’

জুলিয়ানার গলায় ঝঙ্কার শোনা গেল। ‘ও, নিশ্চয়ই! এলে খুশি হব। মাঝে-মাঝে ভীষণ একা লাগে ওখানে, অবশ্যি জায়গাটা আমাদের দারুণ পছন্দ। বাকি জীবনটা ওখানে কাটিয়ে দিতে পারলে বেশ হত।’

দ্রুত পায়ে ওখান থেকে সরে এল হ্যারি। এখানে আসার পথে রাস্তায় একটা আস্তাবল চোখে পড়েছে, সে-দিকে এগিয়ে গেল ও। তার মানে এরাই বেন কারির বউ আর দুই মেয়ে। ডাক্তার সয়্যার, যে-ভাবেই হোক না কেন, জানে ব্যাপারটা। আর কে কে জানে?

সম্পর্কে সে ওদের ভাই, ‘তবে সন্দেহ নেই, তার নাম ওরা শোনেনি। বস্তুত, রাউন্ডির কাছে ঘটনাটা না শুনলে সে নিজেও এদের পরিচয় জানতে পেত না। তবু, সয়্যারের নিষেধ সত্ত্বেও, চোরাবালির ওপর দিয়ে হাঁটছে সে। ও যা জেনেছে কারও কাছে ফাঁস করা চলবে না। এটা বেন কারির গোপন কথা, গোপন রাখাই উচিত হবে ওর।

বাকবোর্ড ভাড়া করতে কোন অসুবিধেই হলো না। চালক লোকটাকে পছন্দ হলো ওর। বুড়ো, পোড়খাওয়া চেহারা। দেখেই বোঝা যায় এই লোক যোগ্য, বিশ্বস্ত।

‘বছরের এই সময়টাতে ওই রাস্তা ফাঁকাই থাকে। কোন বিপদ-আপদ হয় না,’ বলল চালক। ‘স্টেজ অর্ধেক পথ যাওয়ার আগেই ওদের নিয়ে পৌঁছে যাব আমি, কারণ আরও যাত্রী নেয়ার জন্যে ঘুরপথে যেতে হচ্ছে না আমার।’

‘ওদের প্রতি খেয়াল রেখো,’ বলল হ্যারি।

লোকটা গাড়ি সাজাতে লেগে পড়ল। হ্যারি আগের সে-ই বোর্ডিং হাউসের কাছে ফিরে এল।

ওকে আসতে দেখে উৎসুক চোখে তাকাল ডুসিলা। ‘পেলেন?’

‘এখুনি এসে পড়বে। অনেক দূরের যাত্রা, তবে ইচ্ছে করলে গড়িয়ে নিতে পারবেন। আসার সময় দেখলাম লোকটা সিটের ওপর মোমের চামড়া বিছিয়ে দিয়েছে।’

‘আপনি খুব ভাল।’

‘হয়তো-বা,’ বলল হ্যারি, ‘তবে আমার কেবল একটা কথাই মনে হচ্ছে, আপনি খুব সুন্দর।’

ঠিক বোঝা গেল না, মনে হলো, মেয়েটা যেন লজ্জা পেয়েছে। রাস্তার বাতিটা তেমন জোরাল নয়।

‘বেড়াতে এলে আপত্তি নেই তো?’

‘আমার বোন তো নেমন্তন্ন করেছে, কী, করেনি?’

‘হ্যাঁ, করেছে। তবে আপনার মুখ থেকেও শুনতে চাইছিলাম।’

‘বেশ। তা আমার মাকে জিজ্ঞেস করলে হত না? আমাদের দু’বোনের মত

তিনিও অতিথি পছন্দ করেন।

‘আপনারা দু’বোনই যথেষ্ট। মাকে জিজ্ঞেস করতে গেলে আবার বাবার অনুমতিও লাগতে পারে।’

‘বাবা আমাদের সাথে নেই। তাঁর নাম বেন র্যাগান। খুব সম্ভব বাথান বা খনির কাজে বাইরে আছেন তিনি। ব্যবসার কাজে খুব ঘুরতে হয় তাঁকে। বাবাকে চেনেন আপনি?’

‘নাম শুনেছি,’ বলল হ্যারি।

ওদের সাথে বসে কিছুক্ষণ গল্প করল সে। কফি পান করল। বেশির ভাগ কথাই হলো ওদের আসন্ন যাত্রা নিয়ে। ডুসিলা চুপচাপ বসে আছে, কথাবার্তা প্রায় বলছেই না। বার কয়েক তার দিকে চোরা চাউনি হেনেছে মেয়েটা, কিন্তু চোখাচোখি হতেই মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে।

‘আকাশের তারা ছাড়া কিছুই চোখে পড়বে না আপনাদের,’ বলল সে। ‘আমার পরামর্শ, একটু গাড়িয়ে নিলে আরাম পাবেন।’

‘ও-দিকেই কোথাও থাকেন নাকি?’ জিজ্ঞেস করল জুলিয়ানা।

‘অনেকটা তাই,’ বলল সে। ‘মানে যখন বাড়িতে থাকি আর কী।’ একটু ইতস্তত করল হ্যারি, মিথ্যে বলতে জিভ সরতে চাইছে না। ‘শিকার আমার নেশা, তাই বনে-বাদাড়েই ঘুরে বেড়াই বেশি।’ তারপর একজন শিকারীর ভবঘুরে জীবন ওরা নাও পছন্দ করতে পারে ভেবে যোগ করল, ‘তবে এবার একটা বাথান দেব ভাবছি।’

নিঃশব্দে-কৌতূহলী চোখে ওর দিকে তাকাল ডুসিলা। কেন যেন ওকে একটু বিব্রত দেখাচ্ছে। তার কথা কি বিশ্বাস করেছে ও? ওভাবে তার দিকে তাকাচ্ছে কেন মেয়েটা?

ওরা চলে যাওয়ার পর আবার সেলুনে ফিরে এল সে, ভীষণ নিঃসঙ্গ মনে হচ্ছে নিজেকে। বারে গিয়ে দাঁড়াল। বিয়ারের মগে চুমুক দেয়ার ফাঁকে উপস্থিত খদ্দেরদের কথাবার্তা শুনতে লাগল। এই সব সেলুনের বাতাসে খবর ওড়ে। এখানে বসেই লোকে ব্যবসায়িক লেনদেন করে, চাকরির সন্ধান পায়, আনন্দ খোজে। আবার অনেক সময় বিয়েও পড়ানো হয় সেলুনে। তাই, কেউ যদি দেশের হালচাল জানতে চায় তার জন্য সেলুনই হচ্ছে সবচেয়ে উত্তম জায়গা।

ওদের ভেতর সোনা চালান নিয়ে আলাপ হচ্ছে। ট্রেন রওনা হওয়ার সময় ঘনিয়ে আসায় লোক ভাড়া করা হচ্ছে। ইতিমধ্যেই, হ্যারি শুনল, গার্ড বাছাই হয়ে গেছে। সোনা লুটের প্র্যান ভাঁজতেই ওর এখানে আসা, এজন্য হয়তো মানুষ খুনের প্রয়োজনও হতে পারে—রুচ বাস্তবে ফিরে আসতেই ওর মনটা তেতো হয়ে গেল।

বিষয়টা নিয়ে চিন্তা করল সে। আত্মরক্ষার জন্য মানুষ খুন এক কথা, যেকারও জীবনেই অমনটা হতে পারে। কিন্তু কোন সম্পত্তি পাহারা দিচ্ছে এমন কাউকে মেরে ফেলা একদম ভিন্ন জিনিস। বেদনার্দ্ৰ চোখে হাতেধরা বিয়ারের গ্লাসের দিকে তাকিয়ে রইল সে। ডুসিলা এটা জানলে কী ভাববে? আর বেন

কারিই-বা তার মেয়ের কাছে একজন আউট-লর যাওয়াটা কী চোখে দেখবে?

কয়েক বছর আগে থেকেই সে জানে, এমন একদিন আসবে যে-দিন তাকে ডাকাত-দলের নেতৃত্ব দিতে হবে। সে-ভাবেই গড়ে তোলা হয়েছে তাকে। জানে, ওর ভরসাতেই বেন তার সমস্ত পরিকল্পনার জাল বুনেছে। কিন্তু সে এখন কী করবে?

কাজটা কী ভাবে করবে তা নিয়ে প্রায়ই ভেবেছে সে। দোকান, ব্যাংক লুট ইত্যাদি নানা কাহিনি শুনে ব্যাপারটা ওর কাছে সহজই মনে হয়েছে; তবে ঠিক স্বচ্ছ ধারণা বলতে যা বোঝায়, তা কখনোই ছিল না। পুরো জিনিসটাই তখন ছিল দিবাস্বপ্নের মত, যার সঙ্গে বাস্তবের কোন যোগ নেই। কিন্তু এখন আর সেটা স্বপ্ন নেই-কঠিন বাস্তবে পরিণত হয়েছে। আর তাই, হঠাৎই, সে অস্বস্তি অনুভব করছে।

এই সঙ্গে ডুসিলার মুখও তার মানসপটে বারবার ভেসে উঠছে।

‘কী সুন্দর মেয়ে! অথচ তার বাপ কিনা একজন আউট-ল। ও কি জানে একথা? যথেষ্ট সন্দেহ আছে তার। রাউন্ডির কথা অনুযায়ী বেন কারি তার জীবনের আরেকটা দিকের কথা ওদের কাউকে জানতে দেয়নি, দূরে সরিয়ে রেখেছে। বেন কারি নিজেও এক হেয়ালিপূর্ণ মানুষ, সোজা পথে চললে সে একজন সফল ব্যবসায়ী-এমনকী ঝানু রাজনীতিক পর্যন্ত হতে পারত। বহু লোককে সে চেনে, সাংগঠনিক ক্ষমতা আছে। এক অদ্ভুত জীবন, হঠাৎ করেই বাঁকা পথ ধরেছে। তবে সেটা একান্তই বেন কারির ব্যক্তিগত ব্যাপার। কিন্তু তার, হ্যারি কার্টারের কী হবে?’

ডাক্তার সয়্যার বারে এসে দাঁড়াল, গলা ভেজানোর প্রস্তাব দিল ওকে। অপরিচিত কাউকে ড্রিংক অফার করা নতুন কিছু নয়, তাই ব্যাপারটা নিয়ে মাথা ঘামাল না কেউ।

‘বিশ তারিখ,’ সে বলল, ‘মোট বারোজন গার্ড। পাঁচজনের হাতে শটগান থাকবে। কোণের ওই পোকার টেবিলে দশাসই চেহারার যে-লোকটা বসে আছে, ও তাদের একজন।’ দম নিতে থামল সে। ‘কাজটা বিপজ্জনক, হ্যারি। ভীষণ বিপজ্জনক।’

রাউন্ডির কথাই সত্যি, সন্দেহ নেই। এখন পর্যন্ত সে সৎলোক, তবে এবার জীবনের সন্ধিক্ষণে পৌঁছে গেছে। সৎ মানুষ আর অপরাধীর মাঝে যে সীমারেখা আছে, সে যে-ই মাত্র ওই রেখা অতিক্রম করবে তখন আর কিছুই আগের মত থাকবে না। হ্যাঁ, পরে হয়তো বেন কারির মত সে-ও জাল কেটে বেরিয়ে আসতে পারবে, তবে সে-সবই পরের কথা।

সয়্যারের কথা শুনতে শুনতে কৌতূহলী হয়ে উঠল সে। এই রকম একজন মানুষ; মেধাবী, দক্ষ সার্জন হঠাৎ দস্যুজীবন বেছে নিল কেন?

‘ডক,’ মৃদু স্বরে বলল ও, ‘তুমি এই পথে এলে কেন?’

ওর দিকে তাকাল সয়্যার। ‘হ্যারি, মনে হচ্ছে তোমার মনে সংশয় জেগেছে কোন?’

‘সংশয়? ইদানীং সব ব্যাপারেই ওটা জাগছে আমার।’

‘আমিও তাই ভেবেছিলাম। তবে তুমি কোন প্রতিবাদ না করায় মনে করলাম, তোমার ব্যাপারে বেনের পরিকল্পনা স্বেচ্ছায় মেনে নিয়েছ তুমি।’

‘হারি, এর অর্থ প্রচুর ক্ষমতা আর টাকা। আউট-ল জীবনের ভবিষ্যৎ নিয়ে কোন সন্দেহ দেখা দিয়ে থাকলে, ঝেড়ে ফ্যালো। এখন থেকে সব কিছুই ভিন্ন রাস্তায় চলবে, বেন কারির যুগ থেকে একদম আলাদা। সেরা উকিলদের দলে ভেড়াতে হবে, ক্ষমতাবান লোকদের পকেটে পোরার জন্য ঘুষ দিতে হবে—তবে যে-টাকা তুমি আয় করবে তাতে সহজেই হয়ে যাবে এগুলো।’

‘রাউন্ডি বলেছে আমাকে, এ-ব্যাপারে তোমার সঙ্গে কথা হয়েছে ওর। বেনের চেয়ে ওর দৃষ্টি এ-সব ক্ষেত্রে অনেক বেশি স্বচ্ছ। পুরোনো দিন গত হয়েছে। এখনও সবার ধারণা ওই ডাকাতিগুলো করেছে জেমস বা রেনো-র লোকেরা। ছিটকে চুরি। এর পেছনে কোন সম্ভব চক্রের হাত কল্পনা করেনি। সেটা বদলে যাবে। বেশ কিছু ধুরন্ধর অফিসার আছে ওদের, তারা একবার জোট বাঁধলে আউট-লদের আর রক্ষে থাকবে না। তবু, যোগাযোগ, ভাল উকিল আর টাকার জোরে তুমি উত্তরে যেতে পারবে।’

‘হ্যাঁ, তা যাব,’ হারি সায় দিল। ‘তবে আমি বোধহয় সেটা চাইনে।’
সয়্যারের ঠোট বেঁকে গেল। ‘কেন, বিবেকের তাড়না? বেন কারির এত খাটুনি কি শেষ পর্যন্ত মাঠে মারা গেল? আজ হঠাৎ এ-ভাবনা হচ্ছে কেন? ভয়? নাকি কোন মেয়েমানুষ?’

‘কেন, সেটা কি অসম্ভব কিছু?’
‘মেয়েমানুষের কথা বলছ? বরং অ্যান্ডিন হয়নি বলেই অবাক হয়েছি। অবশ্যি তুমিও একা একা থাকতে। মেয়েঘটিত ব্যাপার হয়ে থাকলে একটু সময় নিয়ে আরেকবার ভেবে-চিন্তে দেখো।’

‘না, ঠিক তা নয়। গেল দু’বছর ধরে এটা নিয়ে ভাবছি। ঠিক কী করা উচিত আমার, কেবল তাই ভাবছি। বেন কারিকে হতাশ করার কথা কল্পনাও করতে পারি না, তা ছাড়া অন্য কোথাও যাওয়ার জায়গাও আমার নেই। কী করব? শিকার? গরুর গায়ে টাট্টু লাগানো?’

ঠক করে হাতের গ্লাসটা নামিয়ে রাখল ডাক্তার সয়্যার। ‘দুটোই ভাল, হারি। আসলে বেরুনোর চেয়ে টাকা অনেক সহজ। দাগ একবার লেগে গেলে আর উঠতে চায় না।’

‘তবে আমাকে জিজ্ঞেস করো না। নিজের জীবনটাকে শেষ করেছি আমি। খানিকটা মেয়েছেলের পেছনে, বাকিটা রাতারাতি বড়লোক হতে গিয়ে। কিন্তু, একটা ব্যাপার কী জানো, হারি, রাতারাতি কেউ ধনী হতে পারে না। “ইজি মানি” বলে বাস্তবে কোন জিনিস নেই। তোমার সিদ্ধান্ত তোমাকেই নিতে হবে। ম্যাথু আর্নল্ড এ-সম্পর্কে কী বলেছেন, আশা করি জানো নিশ্চয়ই?’

‘“নো ম্যান ক্যান সেভ হিজ ব্রাদার্স সোল, অর পে হিজ ব্রাদার্স ডেট।”’
‘ঠিক তাই। তোমার দায়-দায়িত্ব তোমাকেই নিতে হবে। তবে একটা কথা মনে রেখো, হারি। যে-পথেই তুমি যাও না কেন, খুনোখুনি হবেই। যদি বেনের কাছ থেকে দায়িত্ব বুঝে নাও, কার্ব পেরিন, এবং রিগার মলিনার মধ্যে যে-কোন

একজনকে, আবার এমনও হতে পারে যে দুজনকেই খুন করতে হবে তোমার। তেমনি, সরে দাঁড়াতে চাইলেও মারতে হতে পারে। এমনকী বেন কারিকে পর্যন্ত।

‘না, না! বাবাকে নয়!’

‘হারি, একটা জিনিস মাথায় ভাল করে গেঁথে নাও। বেরিয়ে আসার কোন সোজা পথ নেই। নিজেকে এত একা ভাবছ কেন? রাউন্ডি আর আমি এটার ভাল-মন্দ সব দিক ভেবে দেখেছি। হাজার হলেও,’ আবেগের সুরে বলল সে, ‘আমাদের কোন ছেলে নেই। আমরাই সব কিছু শিখতে সাহায্য করেছি তোমাকে, আর এটা আমাদের জন্য এক বিরাট ব্যাপার।

‘তবে একটা কথা মনে রেখো। একার জোরে কেউ শাসক বা শৈরাজারী হতে পারে না। সে আসলে তার অনুসারীদের ইচ্ছেটাকেই প্রকাশ করে মাত্র। যতদিন ওই ইচ্ছে অনুযায়ী চলে, ততদিন পর্যন্ত সে ওদের নেতৃত্ব দেয়।

‘বেন সর্দার হয়েছে তার কারণ সে শক্তিশালী, তার সংগঠন আছে, ভাল বন্দুকবাজ। কিন্তু এগুলো ছাড়াও আরও কারণ আছে। তার বুদ্ধি বলেই ওরা টাকা-পয়সার মুখ দেখেছে, বিপদে-আপদে বটগাছের ছায়া দিয়েছে। তুমি সরে দাঁড়াতে চাইলে বাঁধের গায়ে চিড় ধরবে। কোন দাগী লোক ভাল হয়ে গেলে তাকে কোন আউট-ল বিশ্বাস করে না। সব সময় বেঙ্গমানির আশঙ্কা করে।’

‘চলো, রাউন্ডির কাছে যাই।’

ওদের কাছেই আসছিল সে। ‘ঘোড়া নিয়ে এসো তাড়াতাড়ি। এফুণি শহর ছাড়তে হবে আমাদের,’ বলল রাউন্ডি। ‘ডাক্তার আর ফার্নান্দেজ এইমাত্র ঢুকেছে এখানে। মাতলামি করছে। আমাদেরকে দেখতে পেলে একটা ভেজাল বাধিয়ে বসবে।’

ইতিমধ্যে গার্লিনও এসে দাঁড়িয়েছে ওখানে। ‘ডাক্তারটা আবার পেরিনের চামচা। ওর ধারণা যা খুশি করে পার পেয়ে যাবে সে।’

‘ওই যে আসছে ওরা!’

‘ঠিক আছে! সরে পড়ো!’ নির্দেশ দিল হ্যারি। ‘ঝটপট ঘোড়াগুলো নিয়ে এসো!’

সাত

বেশির ভাগ অপরাধীরই জগৎ অত্যন্ত সীমিত, সেখানে অধিকাংশ লোকই তার মত। স্বগোচ্রে একজন কেউকেটা হিসেবে পরিচিত হতে চায় সে। আর তা যদি একান্ত সম্ভব না-ই হয়, তবে কেউকেটা গোছের কোন লোকের ডানার তলায় আশ্রয় নিতে চায়। এ জন্য তাকে নিছক তল্লাসবাহক হতে হলেও পরোয়া করে না।

খুব কম লোক একা লড়ে, বেশির ভাগই চেষ্টা করতে পর্যন্ত ভয় পায়।

দলবলই তাদের সহায়, শক্তি। আশ্রয়ও বটে।

আইনভঙ্গকারীরা ঠিকানা লাগায়, এমন কিছু ডেরা আর সেলুন নিয়েই তাদের জগৎ। কোন বড় শহর হলে গোটা কয়েক বাড়ি নিয়ে এই দুনিয়া গড়ে ওঠে। পশ্চিম দেশে এর দৌড় হাতে গোণা কয়েকটা জনপদে, মাত্র কয়েকশো বর্গমাইল এলাকা জুড়ে। পালানোর সময় তারা পুরোনো আড্ডাতেই ফিরে আসে।

বেন কারি আশ্রয়, বুদ্ধি-পরামর্শ, টাকা-সব দিয়েছে, কিন্তু তার অধিকাংশ লোকই এটা পছন্দ করে না। তারা নিজেদের খেয়াল-খুশি মত চলতে চায়। ওদের বেশির ভাগই বদ লোক হিসেবে নাম কামাতে চায়। কেবল ঠাণ্ডা-মাথার লোকজন রেখে বাকি সবাইকে বিদেয় করার চেষ্টা বেন অনেক করেছে-পুরোপুরি সফল হয়নি।

তার কাজ-কর্মের রীতি ওরা টের পাবার আগেই আগাছা সাফ করে ফেলেছে সে। ডাক্তার প্রথমে বেশ শক্ত-সমর্থ লোক ছিল। কম কথা বলত। কিন্তু পরে, পেরিনের শাগরেদ হওয়ার পর থেকে, একদম বদলে গেছে। প্রায়ই মাতাল হয়ে থাকে।

দড়াম করে সেলুনের কাটা পাল্লা দুটো খুলে গেল। ওরা ঢুকল ভেতরে। একনজর দেখেই হ্যারি বিপদ আঁচ করল; কেবল তার জানো নয়, সবার জানো। টম ডাক্তার মদে চুর হয়ে আছে। ওর পেছনেই, স্নেক ফার্নান্দেজ। অগুত জোড়া, এর আগেও বহুবার ফ্যাসাদ বাধিয়েছে, পেরিনের ওকালতিতে বেঁচে গেছে।

‘হ্যারি ওদের দিকে সবে এক পা বাড়িয়েছে, এমন সময়ে ডাক্তার দেখতে পেল ওকে। ‘ওই যে শালা! কুস্তা! সর্দারের পালা কুস্তা!’

‘টম,’ নম্র সুরে বলল হ্যারি, ‘ঘুমুতে যাও তুমি। পাগলামি করার জায়গা এটা নয়।’

‘আরে! এ যে দেখছি আবার হুকুম দিচ্ছে! পাখনা গজিয়েছে, না?’

‘বাইরে তোমাদের ঘোড়া থাকবে,’ হ্যারি বলল। ‘ওতে চড়ে বাড়ি ফিরে যেও।’

মারমুখী ভঙ্গিতে দু’পা ফাঁক করে দাঁড়াল ডাক্তার। ‘যদি না যাই?’

‘টম,’ বোঝাতে চেষ্টা করল হ্যারি, ‘এটা গোলমাল করার জায়গা নয়! কাছে গিয়ে গলা নামিয়ে বলল, ‘বেন কোন ঝামেলা চায় না, তুমি জানো ভাল করে।’

‘বেন? বেন আবার কোন শালা? কার্ব পেরিন, বুঝেছ!’

স্পষ্ট চ্যালেঞ্জ ছুঁড়েছে ডাক্তার, আর কথা বাড়ালে সব ফাঁস হয়ে যেতে পারে। দ্রুত আঘাত করল হ্যারি কার্টার। বাঁ হাত দিয়ে মুণ্ডরের মত মারল বুকে, চোয়াল নড়িয়ে দিল ডান হাতের আপার-কাট। ডাক্তার মুষ্টিযোদ্ধা নয়, তা ছাড়া এই আক্রমণও ছিল সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিত। বোঁ করে ঘুরে কাটা কলা গাছের মত উপুড় হয়ে মেঝের ওপর পড়ল সে।

মুখ খিঁচি করে পিস্তলের জন্য হাত বাড়াল ফার্নান্দেজ, ফলে হ্যারিরও উপায় রইল না কোন। কাঁধে গুলি করল সে। সাপের হাত থেকে পিস্তল খসে পড়ল। অশ্রাব্য গাল বকে বাঁ দিকের হোলস্টারে হাত বাড়াল ও। বাকি তিনজন

ঘোড়া আনতে গেলে গার্লিন দরজার কাছে রয়ে গিয়েছিল, পেছন থেকে জাপটে ধরে পিস্তল কেড়ে নিল সে।

বেহঁশ-প্রায় ডাক্তার পা খামচে ধরে হ্যারি দরজার দিকে রওনা হলো। কিন্তু বিশাল চেহারার এক লোক ওর পথরোধ করে দাঁড়াল। লোকটার চোখ-মুখ কঠোর দেখাচ্ছে, বুকের কাছে একটা তারকা সাঁটা। 'কী হচ্ছে এখানে?' হুঙ্কার ছাড়ল সে।

হ্যারি মিষ্টি করে হাসল। 'কিছু না, অফিসার। আমাদের দলের দুই ছোকরা মাতাল হয়ে গেছে। ওদের ক্যাম্পে নিয়ে যাচ্ছি। কাল ভোরে চলে যাচ্ছি আমরা।'

ডাক্তার সয়্যারের দিকে তাকাল শেরিফ। দু'জনার পরিপাটি বেশ ভূষা দেখে কিছুটা নরম হলো সে। 'তোমরা কে? তোমাদের চিনি না আমি। এখানকার কেউ নও।'

'না, স্যার। মোগোনস্ থেকে আসছি আমরা, গবাদি পশু নিয়ে ক্যালিফোর্নিয়ার এক বাথানে যাচ্ছি। পথের ক্লান্তি দূর করতে গিয়ে নেশা করে ফেলেছে এরা।'

শেরিফের মনে সন্দেহ জাগল। এদের ভেতর কোথাও একটা গোলমাল আছে, তবে সেটা কী, বুঝতে পারছে না সে। 'তোমরা দু'জন বাথানকর্মী হলেও হতে পারো,' বলল সে, 'কিন্তু তোমার সঙ্গে ওই লোক জুয়াড়ির মত দেখতে।'

হ্যারি হাসল। 'অফিসার, আমি খেলেছি ওর সাথে। তাস খেলে রোজগার করতে হলে ওকে উপোস দিতে হবে। আসলে ও একজন ডাক্তার, সার্জন-পাকা হাত। আমাদের মালিকের বন্ধু।'

শেরিফের কাঁধের ওপর দিয়ে আরেকজন উঁকি দিল। লম্বা, পলিত কেশ। 'তোমরা কোন বাথানে কাজ করো? আমিও মোগোনসের লোক।'

গার্লিন বাইরে ডাক্তার আর ফার্নান্দেজকে সামলাচ্ছে। ওদের সাথে গেলেই ভাল ছিল, ভাবল ডাক্তার সয়্যার।

'ওখানকার কোন বাথানে কাজ করি না আমি,' বলল হ্যারি, হাসছে। 'তবে জ্যাক ম্যাককার্ডল্কে জিজ্ঞেস করলেই আমার সম্পর্কে জানতে পারবেন আপনারা। ডাক্তার সয়্যার ওর বন্ধু। ওনার কয়েকটা গরু এই ডাক্তারের মাধ্যমেই বিক্রি হয়েছে।'

পাকা চুলের দিকে তাকাল শেরিফ। 'জো, তুমি এই ম্যাককার্ডল্ লোকটাকে চেনো?'

'চিনি, ভাল লোক। ওর মার্ক "ফ্লাইং এম"। তবে বিক্রির কথা শুনিনি।'

'মনে হচ্ছে তোমরা সত্যি কথাই বলছ,' নেহাত অনিচ্ছাসত্ত্বেও ব্যাপারটা চুকিয়ে ফেলল শেরিফ। হ্যারিকে ঝুটিয়ে লক্ষ করল সে। 'তবে তোমার কথাবার্তা ঠিক বাথানকর্মীর মত নয়।'

'অফিসার, বাথানকর্মীরা ভবঘুরে স্বভাবের লোক। গত বছর আমাদের সাথে এক টাট্টালা কাজ করেছিল। তার বাড়ি ইংল্যান্ডের নরফোকে। 'যাই হোক,' নম্র সুরে বলল হ্যারি, 'আমি পাদ্রি হওয়ার জন্যে লেখাপড়া করছিলাম, কিন্তু আমার

আগ্রহ আমাকে খারাপ পথে টেনে এনেছে। পদস্থলন হয়েছে আমার। একজন পোকায় খেলুড়ে নিশ্চয়ই পাদ্রি হবার উপযুক্ত নয়।

‘তাই তো মনে হচ্ছে।’ শেরিফ হাসল। ‘ঠিক আছে তোমরা এবার আসতে পারো। তবে আর কোন গণ্ডগোল নয়। বুঝেছ? আর, ডাক্তার, আপনি বরং ওই লোকটার জখম পরীক্ষা করে দেখুন।’

হারি ঘুরে রওনা দিল। সন্ধ্যার অনুসরণ করল। বাইরে ওদের লোকজন সব উধাও হয়ে গেছে। ঘোড়ায় চেপে শহর ছেড়ে উত্তর দিকে যাত্রা করল ওরা। বেশ ক’মাইল যাবার পর হারির পাশে চলে এল সন্ধ্যার।

‘তোমার হবে!’ বলল সে। ‘আমার চেনা যে-কোন লোকের চেয়ে ব্যাপারটা সুন্দর সামলেছ তুমি।’

‘উফ! বাঁচা গেছে!’ বলল গার্লিন। ‘আমি তো গোলাগুলি করার জন্যে তৈরি হয়েছিলাম। চমৎকার মিষ্টি কথায় ওদের ভুলিয়েছ তুমি।’

‘ওই শেরিফ কিন্তু,’ চিন্তিত গলায় বলল হারি, ‘সম্ভ্রষ্ট হয়নি। সকালে ও ঠিকই ট্রাক খুঁজতে বেরাবে।’

খিকখিক করে হাসল গার্লিন। ‘এ দিকটা আমিও ভেবেছি। ঠিক এই মুহূর্তে আমরা অন্য কারও ট্রেইলের ওপর দিয়ে ছুটছি। অনেক গরু গেছে এই পথ দিয়ে। সম্ভবত মাইল চারেক পশ্চিমে যে-ঝরনাটা আছে, সে-দিকে গেছে। প্রচুর ঘাসও আছে ওখানে। ভোর হতে হতে ওরাও চলে যাবে। আমার মনে হয় না ওই শেরিফ ব্যাটা কষ্ট করে অন্দুর গিয়ে আমাদের খোঁজ নেবে।’

স্টোন হাউস। কার্ব পেরিন আর রিগার মলিনা টেবিলের ধারে বসে আছে। সন্ধ্যারকে নিয়ে হারি ঢুকল ভেতরে, ক্যানিয়নে ফিরেই সরাসরি এখানে চলে এসেছে সে। দু’জনেই বিরক্ত মুখে তাকাল ওদের দিকে। বেন কারি তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে লক্ষ্য করতে লাগল সব কিছু।

‘হ্যানি ফালতু সময় খরচ করল না। কার্ব, ডাক্তার আর ফার্নান্দেজ ওয়েভারে গিয়েছিল কেন?’

চারপাশে তাকাল পেরিন, হারির কথা বললে ওঁ তার গায়ে জ্বালা ধরিয়ে দিয়েছে, তবে সেই সঙ্গে শতমতও ঝেঁয়েছে একটু।

‘মাতলামি করছিল। আরেকটু হলেই খুনোখুনি বাধত। ওখান থেকে বেরনো মুশকিল হয়ে গেল। অতিরিক্ত মদ টেনে বড্ড বেশি বকছিল। আমি ওদেরকে ঘোড়া নিয়ে বাড়ি ফিরে যেতে বলতেই ঝামেলা বাধিয়ে বসল।’

‘কী রকম?’

‘ডাক্তার বড় বেশি লোকের নজর কাড়ছিল। আমি ওকে না থামালে সব ফাঁস করে দিত।’

‘তুমি ধামিয়েছ?’

বেন কারি চেয়ারে হেলান দিল, আগহের সাথে ওদের কথা শুনতে লাগল। ‘ধোলাই দিয়েছি,’ শান্ত গলায় বলল হারি। ‘তারপর ফার্নান্দেজ পিস্তল বের করতেই ওর কাঁধে একটা বুলেট ঢুকিয়ে দিয়েছি।’

‘মেরে ফেলা উচিত ছিল,’ বলল মলিনা। ‘আগে-পরে হোক মারতেই হবে তোমাকে।’

কার্ব পেরিন আহাম্মক হয়ে গেল। এরকম একটা কিছু ঘটুক তা সে চায়নি-আবার ডাক্তারকে যে হ্যারি সামলাতে পারবে, এটাও তার বিশ্বাস করতে বাধছে। তার ওপর ওর সাথে ফার্নান্দেজ ছিল।

‘আমাদের যে-কারণে যাওয়া সেটা হয়েছে,’ বেন কারিকে বলল হ্যারি। ‘তবে এরকম বিশৃঙ্খলা দেখা দিলে ফাঁদে পড়তে হবে আমাদের। তাই, আমার মতে, ব্যাপারটা আপাতত মূলতুবি রাখা উচিত।’

‘মাথা খারাপ নাকি?’ বলল পেরিন। ‘বিরিট দাঁও। এটার জন্যেই আমরা অপেক্ষা করছি সবাই।’

‘ওয়েভারের শেরিফ,’ হ্যারি বলল, ‘খুব চালু লোক। আমি তাকে ধাপ্পা দিয়ে বেরিয়ে এসেছি ঠিকই, তবে সে হয়তো খোঁজ-খবর নেবে। লোকটাকে আমার সাবধানী বলেই মনে হয়েছে।’

‘চুলোয় যাক ব্যাটা!’ বলল পেরিন।

পেরিন আর মলিনা চলে যাওয়ার পর হ্যারি তার নিজের ঘরের দিকে রওনা হলো, বেনের দিকে ঘুরল ডাক্তার সয়্যার। ‘ওখানে থাকলে গর্বে তোমার বুক ফুলে উঠত। করবাস আর ফ্লেচারের সাথেও একচোট হয়েছে ওর। এক ঘুমিতেই করবাসকে মাটিতে গুঁয়ে দিয়েছে ও। ভয়ে ফ্লেচার আর এণ্ডতে সাহস করেনি। ওর হবে, তোমার গুঁই ছেলের।’

‘আমি জানি ও পারবে,’ বলল বেন, সন্তোষের সুরে।

‘একটা মেয়ের সাথেও আলাপ হয়েছে ওর,’ বলল সয়্যার।

‘ওর জন্যে ভালই হবে এটা।’

‘কিন্তু, চীফ, এ যে-সে মেয়ে নয়। আমার যদি এসব জিনিস বোঝার সামান্য ক্ষমতাও থেকে থাকে, তবে তোমার ছেলে মজে গেছে। আর ব্যাপারটা যে দু’তরফা ঘটেনি এ-কথা নিশ্চয়ই বলছি না।’

ওর গলার স্বরে এমন কিছু ছিল যেটা বেনের মনোযোগ কাড়ল। ‘মেয়েটা কে?’

‘স্টেজে চড়ে আসা একটি মেয়ে। মেয়েটার সাথে তার মা আর বোনও ছিল। হ্যারি ওদেরকে বাকবোর্ড ভাড়া করে দিয়েছে। রেড ক্যানিয়নে ওদের বাধান। ভি-বার।’

পাঁই করে তার দিকে ঘুরল বেন কারি। বেশ কিছুক্ষণ দু’জোড়া চোখ পরস্পর স্থির হয়ে রইল। তার মানে ডাক্তার সয়্যার জানে! অথচ ব্যাপারটাকে গোপন রাখতে চেয়েছিল সে! আর কে কে জানে? কিংবা সন্দেহজনক কু পেয়েছে? অথচ তার বিশ্বাস ছিল কেউ জানে না। জীবনে এই প্রথম ভয় কী জিনিস টের পেল বেন কারি, সত্যিকার ভয়।

‘মেয়েটার নাম ড্রুসিলা র্যাগান। অপূর্ব সুন্দরী, বেন।’

‘অসম্ভব!’ ঠকাস করে হাতের গ্রাস নামিয়ে রাখল বেন। ‘আমি এটা মানব না!’

ডাক্তার সয়্যারের গলা থেকে ব্যঙ্গ ঝরে পড়ল। ‘অর্থাৎ, তুমি বলতে চাইছ তোমার পোষ্যপুত্র তোমার মেয়ের যোগ্য নয়?’

‘খবরদার! ওই শব্দ এখানে উচ্চারণ করবে না। আর কে জানে ব্যাপারটা?’

‘আমার জানা মতে কেউ না। আমি জেনেছি ঘটনাচক্রে। মনে আছে, সে-বার আহত হয়ে ঘোরের মধ্যে ছিলে তুমি, আমি তোমার শরীর থেকে বুলেট বের করেছিলাম। তখন ভীষণ প্রলাপ বকছিলে তুমি।’ নিজের পাইপে অগ্নিসংযোগ করল সয়্যার। ‘দুটিতে সুন্দর মানাবে কিন্তু,’ বলল সে, ‘মেয়েটা ওকে বোধহয় বাসায় ডেকেছে।’

‘না, যাবে না ও। আমি চাই না এদের কেউ ওখানে যাক। তুমি যদি ভেবে থাক আমি একজন দস্যুর সাথে আমার মেয়ের...’

‘ও আউট-ল নয়, এখনও হয়নি।’ পাইপে টান দিল সয়্যার। ‘শেষ পর্যন্ত হয়তো তাই হবে সে, এবং সে জন্যে দায়ী তুমি। কারণ আমার মনে হয় না তা হতে চায় সে।’

জানালায় কাছে গিয়ে দাঁড়াল বেন, নীচে ক্যানিয়নের দিকে তাকাল সে।

‘চীফ, ওই ছেলের ভেতর যোগ্যতা আছে। ভাল নেতা হওয়ার সব গুণই ওর আছে, বিশ্বাস করো আমার কথা, অসম্ভব ক্ষিপ্র। ফার্নান্দেজ লক্ষ্য করে ওর গুলি ছোঁড়া দেখলে বুঝতে। তারপর যখন ওই শেরিফ এল, তখনও পাকা হাতে সামাল দিল।’

বেন কারি নীরব। ওর চওড়া পিঠের ওপর নজর বুলিয়ে সয়্যার দেয়াল আলমারির কাছে গেল। একটা পেয়লা নিয়ে কফি ঢালল তাতে।

‘হয়তো দায়িত্ব এড়াবার কথাই ভাবছে ও। স্মার্ট ছেলে, বেশ স্মার্ট।’

‘আমি যা বলব তাই করবে ও।’

‘হয়তো করবে। তবে ওর একটা নিজস্ব সত্তা আছে, বেন।’

ভেতরে ভেতরে তেতে উঠল বেন। তার এত যত্নের পরিকল্পনা, এত বছরের খাটুনি সব যেন তাসের ঘরের মত ভেঙে পড়ছে।

ছোট্ট একটা সন্দেহের কাঁটা খচখচ করে তার মনে বিঁধছে। ওই কাঁটা তাকে সেই শান্ত অথচ দৃঢ়চেতা ছোট্ট ছেলের কথা মনে করিয়ে দিচ্ছে, যাকে সে একদিন বাড়িতে নিয়ে এসেছিল; সে-ই ছেলে যে কাঁদত না কখনও, কেবল নীরবে হুকুম তামিল করে যেত। তবু, এত সবের পরেও, বেন খেয়াল করেছে ওই ছেলের একান্ত আপনার একটা সত্তা আছে, সব জিনিস সে নিজের মত করে বোঝার, গড়ে নেয়ার চেষ্টা করে।

অনেকক্ষণ হলো ডাক্তার সয়্যার চলে গেছে। প্রায়াক্কার ঘরে চুপচাপ বসে আছে বেন, ভাবছে। ডাক্তার যখন জানে, তখন নিশ্চয়ই আরও কেউ জানে। তবু, তার মনে হলো, কথাটা বিশ্বাস না করতেই ভাল লাগছে তার। ডাক্তার অত্যন্ত সতর্ক লোক, কান সর্বদা মাটিতে থাকে। আর কেউ জানলে সে ঠিকই টের পাবে।

আকাশে আজ বাঁকা চাঁদের সাম্রাজ্য। জানালা দিয়ে ঘরের ভেতর ডানা মেলেছে ক্ষীণ আলো।

ঘুরে-ফিরে বারবার ওয়েভারের ঘটনার কথাই মনে পড়ছে তার। তা ছাড়া, ডাক্তার আর ফার্নান্দেজ-ই-বা কী করছিল ওখানে? যে-শহরে ডাকাতি করা হবে, একমাত্র স্কাউট-পার্টি ছাড়া দলের অন্য সদস্যদের তার ছায়াও মাড়ানো নিষেধ। সেই স্কাউটরাও আবার যাবে এমন ভাবে যেন কেউ তাদের সন্দেহ করতে না পারে। জায়গাটা সম্পর্কে মোটামুটি একটা ধারণা নিয়ে যতটা সম্ভব নিঃসাড় সুরে পড়বে তারা। এটাই তার দলের রীতি, এবং বরাবর এই নিয়মই পালিত হয়ে আসছে।

কিন্তু ডাক্তার মাতলামির জন্য এবার সকলের চোখে পড়েছে ওরা। বেকাস কথাবার্তা বলেছে সে, মারামারি হয়েছে। যে-লোক ওখানকার শেরিফ, হ্যারি সতর্ক করে দিয়েছে, সে খুব বিচক্ষণ। ওদের চেহারা চিনে রেখেছে। ফলে ওদের কাউকেই পাঠানো যাবে না। ছেলেটাও বাদ যাচ্ছে।

নিজেকে খুব নির্ভর মনে হলো তার। এই কাজে ঝুঁকি ছিল বেশি, ব্যাপারটা বেনকে ভাবিয়ে তুলেছিল। বারোজন গার্ড, তায় পাঁচটা শটগান। এতগুলোকে তারা সামলাত কীভাবে?

কার্ব পেরিন কাজটা চেয়েছিল; তাই হোক, কার্বই নিক এটা। এই প্রথম তার মনে বেসম্মানির চিন্তা ঠাঁই পেল। মাথা নাড়ল সে।

না, কার্ব তার একার সমস্যা। এটা সে নিজেই সামলাবে, বরাবর যেমন সামলেছে। কিন্তু ডাক্তার আর ফার্নান্দেজ কী করছিল ওয়েভারে? রাগের মাথায় ডাক্তার কী বলেছে ডাক্তারের কাছে সে শুনেছে: এখন নাকি বেন কারি নয়, কার্ব পেরিনই কর্তা।

একটা ঘোঁট পেকে উঠছে, সন্দেহ নেই।

তার বয়েস বাড়ছে। এই প্রথম নিজের অধিকার সম্বন্ধে তার মনে সংশয় দেখা দিচ্ছে। ছেলেটার কী হবে? বিশ্বাসী কোন লোককে দায়িত্ব বুঝিয়ে দিতে চেয়েছিল সে, কিন্তু ছেলেটাকে একজন আউটল-হা হিসেবে গড়ে তোলাব অধিকার কি তার আদৌ আছে?

আবার জানালার দিকে হেঁটে গেল সে। তার মনে হয়েছে সে-অধিকার তার আছে, তা ছাড়া হ্যারিও তার বাপের ইচ্ছার তামত করেনি কখনও। চাকিতে বেন দাঁড়িয়ে পড়ল, আয়নায় প্রতিফলিত তার আংশিক অবয়বের দিকে তাকাল। হ্যারি তার আপন ছেলে নয়, তা হলে জুসিলার সাথে ওর মিলনে বাধা কোথায়?

মাথা নাড়ল সে। না, না। এ হতে পারে না। কিন্তু-নিজের জামাইকে মানুষ করার সৌভাগ্য কয়টা বাপের হয়? জাবনাটা খেলতেই হাসল সে, তবে একপাশে সরিয়ে রাখল। এই মহূর্তে ভাবার মত আরও অনেক বিষয় আছে।

কার্ব পেরিন নিদ্রোহের চক্রান্ত আঁটছে। নিজের পথে চলাব ফিকির করছে।

তার মন আবার ডুর কাছে ফিরে গেল। আউট-ল হোক চাই না হোক, হ্যারি কার্টারকে যদি ও পেতে চায়, তখন? জুলিয়ানা হলে, সে সন্ধ্যার 'না' বলে দিত, এবং সে-ও সম্ভবত, শুনত। কিন্তু ডু? আপনমনে হাসল বেন। হেসেই তার কথা উড়িয়ে দেবে ও। মেয়েটার স্বভাব অবিকল তার-ই মত।

এখন কী করা? জানালা থেকে সরে এল বেন কারি। কথাটা মনে রাখতে হবে, আর কখনও ওখানে দাঁড়ানো চলবে না তার। একটা সময় ছিল যখন তার ভয়ের কারণ ছিল না কোন, কিন্তু এখন নিজের লোকেদের ভেতরেই তার শত্রু আছে, ভয়টাকে উড়িয়ে দেয়ার সাহস তার হলো না।

ডাক্তার আর ফার্নান্দেজ ওয়েভারে কী করছিল? পেরিনের হয়ে খোঁজ খবর করছিল? নাকি চোরের ওপর বাটপারি করতে চায়?

ফায়ারপ্রেসের কাছে গিয়ে দাঁড়াল সে, গনগনে কয়লার টুকরোগুলোর দিকে অপলক চেয়ে রইল। বুড়িয়ে যাচ্ছে সে, এখন চলে যাবার সময়। জীবনের শেষ কটা দিন বউ মেয়েদের সাথে কাটাতে চায় সে। এখান থেকে বেরিয়ে যেতে চায়, পালিয়ে বাঁচতে চায়। বৈনাশিক কাল তার জন্মদাতা। সে-যুগে হলে সে হয়তো জলদস্যু কিংবা কোন লুটেরা জমিদার হত। এখন হয়েছে আউট-ল।

আক্রমণের কৌশল শানাতে তার ভারি আনন্দ লাগত। আইনের সাথে দাবা খেলাকে উপভোগ করেছে সে, তবে ইদানীং...

সে কি বদলে যাচ্ছে? নাকি এটা সময়ের আঁচড়! তবে কি রাউন্ডির কথাই সত্যি, পুরোনো কাল শেষ হয়ে গেছে? একজন আউট-ল আজ সমাজের শত্রু, এই সমাজ তার সেই প্রথম জীবনের রুক্ষ, ঈষৎসহিষ্ণু পশ্চিমী সমাজের চেয়ে আলাদা।

আলনার কাছে হেঁটে গেল সে, গানবেল্ট তুলে নিল। প্রতিটা পিস্তল পরখ করে ঝুলিয়ে নিল কোমরে।

এখন থেকে এগুলো সাথে রাখাই তার জন্য ভাল হবে, সর্বক্ষণ।

আট

বিছানা থেকে গড়ান দিয়ে নেমে হ্যারি কার্টার বসল। দিনে সে বড় একটা ঘুমোয় না, তবে আজ ফিরে এসে ভীষণ ক্লান্ত লাগছিল। এখন বেশ ঝরঝরে বোধ করছে।

ও যখন বিশ্রাম নিচ্ছিল, সেই ফাঁকে রাত নেমেছে, আকাশে তারার মেলা। জানালা দিয়ে দেখল কয়েকটা মিটমিটে আলো জ্বলছে নীচের বস্তিতে-আউট-লদের বস্তি।

বেন কারির সাথে এই পাথর বাড়িতে কেবল ডাক্তার সয়্যার আর সে থাকে। মাঝে মধ্যে বেনের সাথে আলাপ করতে যারা আসে তাদের দৌড় লিভিং রুম পর্যন্ত। ঘরটা প্রশস্ত, মাঝখানে যে-বিরাত টেবিলটা রয়েছে ওখানেই পরিকল্পনা সভা বসে।

লাগোয়া ঘরগুলোতে ঢোকার দরজা সে-সময় বন্ধ থাকে। বেন কারি নির্জনতাপ্রিয়, কেউ তার প্রাইভেসিতে নাক গলায় না-এমনকী হ্যারি নিজেও

না।

তার মন আজ বড় বিক্ষিপ্ত। তার ভবিষ্যৎ কেমন হতে পারে, করবাস এবং পরে ডাক্তার আর ফার্নান্দেজকে মোকাবেলার ভেতর দিয়ে সে-ধারণা সে পেয়েছে। সত্যি সে কি তাই চায়? নাকি আরও সম্মানজনক জীবন তার কাম্য? ডুসিলা র্যাগান অংশী হয় এমন কোন জীবন?

এ কী! সে আপনমনেই লজ্জিত হলো। কীসের কথা ভাবছে সে? মেয়েটা তো ভাল করে লক্ষ্যই করেনি তাকে, তা ছাড়া সে কে? কেউ না, তার কিছুই নেই। বেন কারির দেয়া এই ছাতটুকু ছাড়া নিজের কোন বাড়ি নেই, চাকরি নেই, দেয়ার মত কিছুই নেই। কোন কোন মানুষ অবশ্যি আউট-লন্দের পছন্দ করে, সে জানে, আসলে ওদের কাউকে চেনে না বলেই করে, তবে ডুসিলাকে তার সে-রকম মনে হয়নি।

এই ভাবনা-চিন্তা শুরু করার জন্য রাউন্ডি বা ডাক্তারের কৌতূহলী প্রশ্নের দরকার হয়নি তার। সে যে-শহরেই গেছে, আত্মহত্রে সেখানকার মানুষজনকে লক্ষ্য করেছে। আইনের লোকজন বা পুরোনো শত্রুর ভয়ে তাদেরকে সন্ত্রস্ত থাকতে হয় না। শীত-বৃষ্টির হাত থেকে বাঁচতে, কিংবা চিকিৎসা করাতে ভয় আছে এমন কোন বুলেটি জখম নিয়ে পর্বত-গুহায় লুকিয়ে থাকতে হয় না তাদের।

বেনের বেশির ভাগ অপারেশনই সফল, কিন্তু সেই সঙ্গে ব্যর্থতাও আছে। মাত্র হপ্তা কয়েক আগে দলের চারজন কোনমতে প্রাণে বেঁচে ফিরে এসেছে, মাত্র পনেরোটা ডলার ছিল ওদের পকেটে। একজন আবার আহত। একেবারে শেষ মুহূর্তে প্র্যানে কিছু অদল-বদল হয়েছিল, ওরা যে-দিন পৌছয় তার আগের দিন সোনার চালান চলে যায়।

ওদিকে নীচে, বস্তিবাসীরা নিশ্চয়ই এতক্ষণে ডাক্তার আর ফার্নান্দেজের সাথে তার গোলমালের খবর জেনে গেছে। শেরিফকে কী ভাবে ধোঁকা দিয়েছে তা-ও শুনে থাকবে। দলের অধিকাংশ সদস্য তাকে ভালবাসে, এই ঘটনায় তারা বুঝবে নিজেকে সামলাবার ক্ষমতা সে রাখে। মলিনা আর পেরিন দলের নেতৃত্ব এবং তার মাঝে এসে দাঁড়িয়েছে।

• মলিনা, পেরিন আর সে। ধোঁয়াটে লাগছে, সাফ করার জন্যে মাথাটা ভাল করে ঝাঁকাল সে। সত্যি কি দস্যু হতে চায় ও?

বাতি নিভিয়ে দরজা খুলল ও, অন্ধকারে পা রাখল। এক মুহূর্ত দাঁড়িয়ে কান পাতল বাতাসে। সুমসাম পরিবেশ। ক্ষীণ গানের সুর ভেসে আসছে সেলুন থেকে। নিরুদ্দেশভাবে রাস্তায় নামল ও। খোলা হাওয়ায় মাথাটাকে একটু খেলাতে হবে। হাতে আর সময় নেই। তাকে একটা কিছু সিদ্ধান্ত নিতেই হবে। কিন্তু বেনকে ছেড়ে সে যাবেই-বা কীভাবে।

সদর রাস্তায় হট্টগোল বেশি। রাস্তার পাশেই একটা সেলুন, স্টোর আর আস্তাবল। এ ছাড়া একটা বোর্ডিং হাউসও আছে। হোটেল নামে পরিচিত হলেও আসলে ওতে থাকার মধ্যে আছে কয়েকটা কেবিন, তাতে লোহার বাংক পাতা। একটা সরু গলি ধরে ক্রীকের দিকে এগিয়ে চলল ও।

গলিটার দু'পাশেই ছোটখাটো কেবিন। প্রতিটাতেই আস্তাবল আছে। কোন কোনটায় পানির টিউবওয়েলও রয়েছে। শেষ কেবিনটার কাছে চলে এসেছে সে-এরপরেই ক্রীক, তার মাথায় গোটা কয়েক বড় গাছ। হঠাৎ একটা ছোঁড়া কথা ওর কানে এল '...রেড ওয়ালে।'

সঙ্গে সঙ্গে দাঁড়িয়ে পড়ল ও। কেবিনের দরজাটা খোলা, বাইরে আলো এসে পড়েছে, তবে সে অন্ধকারে গা ঢাকা দিয়ে আছে।

কার্ব পেরিন কথা বলছে। 'পানির মত সোজা কাজ! আমরা নিজেরাই করব এটা। কারও হুকুমের তোয়াক্কা করব না। ওই বাথানে প্রায় হাজার দুয়েক গবাদি পশু আছে। অন্তত পাঁচশো লুট করব। খদ্দেরও তৈরি। ঠিক সূর্যোদয়ের সময় হামলা করব আমরা।'

'ক'জন থাকে ওখানে?'

'এখন মাত্র চারজন আছে। কিন্তু দেরি করলে আরও চলে আসবে। এই মুহূর্তে কাউকে আশা করছে না ওরা। ফলে প্রস্তুত হবার সুযোগ পাবে না।'

'ক'জন যাবে?'

'দশ-বারোজন। কম হলেই ভাল। আরে ওই, র্যাগানের র্যাঞ্চ খাওয়া কোন ব্যাপারই নয়! বস যখন জানবে ততক্ষণে কাম ফতে। তা ছাড়া সে জানতেই পারবে না যে কাজটা আমরা করেছি।'

'আমিও চাই না সেটা,' বলল ফার্নান্দেজ।

'জাহান্নামে যাক ব্যাটা,' ঘেউ করে উঠল ডাক্তার। 'ওই হ্যারি ছোঁড়াকে শায়েস্তা করতে পারলেই আমি খুশি!'

'আমার সঙ্গে থাকো,' পেরিন বলল, 'ওকে তোমার গর্তে ফেলে দেব।'

'তুমি না বলছিলে কয়েকটা মেয়ে থাকে ওখানে?' ডাক্তার নিশ্চিত হতে চাইল।

'দুই মেয়ে আর তাদের মা। এ ছাড়া দুটো ঝি আছে। মেক্সিকান। কচি মেয়েটা আমার, অন্যগুলোকে নিয়ে মাথাব্যথা নেই।'

ফার্নান্দেজ আমতা আমতা করতে লাগল। 'কাজটা ভাল হবে না,' বলল সে। 'মেয়েদের কথা বলছি আর কী। গরু চুরি করবে, ঠিক আছে। কিন্তু মেয়েলোক? জীবনভর তোমাকে তাড়া করবে ওরা।'

শ্রাগ করল পেরিন। 'কথা বলার মত কোন লোক বেঁচে থাকলে তো...'

ডাক্তার তাকাল ওর দিকে, জিভ দিয়ে ঠোঁট ভিজিয়ে নিল। ফার্নান্দেজ নীরব, একটু বাদে বিড়বিড় করে বলল, 'মানুষ খুন!'

'ইচ্ছে না থাকলে যেও না তুমি,' ঝামটা মারল পেরিন।

'যাব।'

'বেন কারি যদি জেনে ফেলে? জানোই তো কিছুই চাপা থাকে না তার কাছে।'

'কী আবার হবে? বাড়াবাড়ি করলে নিকেশ করে দেব।' একটু থেমে পেরিন যোগ করল, 'ওই বুড়োটাকে শেষ করতে পারলে যত খুশি হব, আর কারও বেলায় অতটা হব না। ব্যাটা সব সময় নিজেকে কর্তা ঠাউরায়। এবার বোঝাব

আসলে জাত অ্যালসেশিয়ান কে!

‘হারির কী হবে?’

পেরিন হাত দিয়ে উড়িয়ে দেয়ার ভঙ্গি করল। ‘ওটা তোমাদের সমস্যা। তুমি আর ফার্নান্দেজ যদি ওকে কাবু করার মত একটা উপায় বের করতে না পারো, তবে আমি ধরে নেব তোমরা অযোগ্য।’

‘ওর রিফ্লেক্স খুব দ্রুত,’ মন্তব্য করল ডাক্তার। ‘ওকে ফেলনা ভাবলে ভুল হবে।’

‘তুমি সামলাবে।’

‘আর তুমি বুঝি লড়বে বেন কারির সাথে?’ এই কণ্ঠস্বর যার, তার নাম বেলেস। ‘তার বয়েস হয়তো বেড়েছে, কিন্তু ভুললে চলবে না পিস্তলের হাত অসম্ভব ক্ষিপ্ৰ।’

‘বুড়োর কথা বাদ দাও! ক্ল্যাভ, প্যানে, মনসন, কাইফার এবং তোমরা তিনজন আমার সঙ্গে যাবে। দল ভ্যাগের জন্যে প্রতি দশজনের ন’জনই থাকবে আমাদের পক্ষে। প্রায় সবাই ইদানীং অসম্ভষ্ট। এ-রকম খাঁচায় আটকা থাকতে পছন্দ করে না ওরা। হ্যাঁ, টাকা ওদের আছে বটে, কিন্তু খরচই যদি না করতে পারল তবে ও থেকে কী লাভ?’

‘মরমনদের আক্রমণ করতে চাইছে মলিনা,’ বলল বেলেস। ‘ওদের গুরু-ছাগলের পালটা বেশ বড়, তা ছাড়া কিছু ভাল জাতের ঘোড়াও আছে।’

হারি কার্টার আর অপেক্ষা করল না। নেহাত বরাতজোরে এতবড় একটা খবর জেনে ফেলেছে সে। প্রথমেই তার মনে হলো এক্ষুণি বেন কারির কাছে যাবে। কিন্তু সেক্ষেত্রে ড্রুসিলার ব্যাপারে ওর স্বার্থহানির আশঙ্কা আছে, অথচ ওসব করার সময় এটা নয়।

বেন কারি যদি জানে তার পোষ্যপুত্র, যাকে সে আউট-ল হিসেবে গড়ে তুলতে চাইছে, তার মেয়ে প্রেমে পড়েছে তা হলে কী বলবে সে? তাও সেই ছেলে একেবারে চাল-চুলোহীন?

তা হলে ও এখন কী করবে?

বেন কারি নিশ্চয়ই খবর পাবে তার দুই মেয়ে আর তাদের মা রেড ক্যানিয়ন ওয়ালে এসেছে, তাদের সাথে দেখা করতে যাবে সে। বেনের ওপর চোখ রাখলে ভি-বারে যাওয়ার শটকাট রাস্তার খোঁজ পেয়ে যাবে ও।

বেন অতীতেও গেছে, তখনকার কথা স্মরণ করে হারি বুঝল ওখানে যাওয়ার নিশ্চয়ই সহজ কোন রাস্তা আছে। সম্ভবত আরও পশ্চিম-দক্ষিণে কোথাও হবে, গ্র্যান্ড ক্যানিয়ন পার হয়ে। তবে ওই গভীর দুর্গম ক্যানিয়নের ভেতর দিয়ে কোন পথের কথা বহু চেষ্টাসত্ত্বেও মনে করতে পারল না ও।

তাকে অপেক্ষা করতে হবে। ড্রুসিলাকে সে আবার দেখতে চায়, কিন্তু এখন তাকে এখানেই অপেক্ষা করতে হবে, নজর রাখতে হবে পেরিনের ওপর, বেনকে রক্ষা করতে একটা কিছু করতে হবে।

বেন এখন কতটা ক্ষিপ্ৰ? মনের জোরই-বা কেমন? কেবল দ্রুত পিস্তল বের করতে পারলেই হলো না, মনোবল আর নির্ভুল নিশানাই আসল।

পেরিন যা বোঝাতে চাইছে দলে যদি সত্যি সে-রকম অসন্তোষ ধুমায়িত হয়ে থাকে, তবে যে-কোন সময় একটা বিপদ ঘটে যেতে পারে। আউট-লরা অর্ধৈষ হয়ে উঠেছে, জানে সে। ওদের অধিকাংশই সেনাবাহিনী থেকে পালিয়ে এসেছে। নিয়ম-কানুন ভেঙেছে, সাজা হবে-তাই। কল্পনাও করতে পারবে না কেউ কতদিন ধরে এদের বশে রেখেছে বেন। এর কারণও অবশ্যি আছে। বেনের বুদ্ধিবলেই ওরা ধনী হয়েছে, আরও একটা গুটী কারণ-ওর ক্ষমতা। কিন্তু সবার ধারণা, তার সে-রাশ আলাগা হয়ে এসেছে।

হঠাৎ ভীষণ ইচ্ছে হলো হ্যারির ঘোড়ায় জিন চাপিয়ে এখান থেকে চিরতরে চলে যায়, এই সব চক্রান্ত থেকে পালিয়ে বাঁচে। জঙ্গলের ভেতর দিয়ে কাইবাব ট্রেল ধরে সে এখন বহুদূরে চলে যেতে পারে। আগে যে-ভাবে চলত, সে-ভাবেই চলবে। ও যে চলে গেছে এটা আঁচ করতেও ওদের অন্তত হুঁশখানেক লাগবে।

তবে এখন পালালে, তা সে এ-জন্য যতই ব্যাকুল হোক না কেন, ডুকে আবার দেখার সব আশা ছাড়তে হবে। তার চেয়েও বড় কথা, ভবিষ্যতে সে যা-ই করুক না কেন, বেনের প্রয়োজনের সময় তাকে ফেলে যেতে পারবে না সে।

নিজের ঘরে ফিরে খাটে বসল সে। ঝড়ের বেগে চিন্তা চলছে মাথার ভেতর। প্রথমে রাউন্ডি তারপর ডাক্তার সয়্যার, প্রত্যেকেই মনে হলো আশা করছে সময় থাকতেই সব ছেড়েছুড়ে এখান থেকে চলে যাবে সে। ডাক্তার বলেছে এটা তার জীবন, সত্যিই কি তাই?

দরজায় মৃদু টোকার শব্দ, পিস্তল হাতে কপাট খুলল সে। রাউন্ডি ঢুকল, চোখ পিস্তলের দিকে।

‘হ্যারি, মনে হচ্ছে উতলা হয়ে উঠেছ? অবশ্যি এ-জন্য দোষ দিচ্ছি না তোমাকে।’

হ্যারি ব্যাখ্যা করল, কী শুনেছে সে। পুরোটা শুনে রাউন্ডি প্রশ্ন করল, ‘হ্যারি, ডেভ লেনকার-এর নাম শুনেছ?’

‘কলোরাডোর সেই বন্দুকবাজ তো?’

‘এ-দিকেই আসছে সে। বেন কারি খবর পেয়েছে, দলের সর্দার বনতে আসছে।’

‘আমার ধারণা ছিল ও বেনের সেরা লোকদের একজন।’

‘আমরা সবাই তা-ই ছিলাম, সে-ও ছিল। তবে ওর ডয় পাছে পেরিন ক্ষমতা দখল করে বসে। ওদের ভেতর সাপে-নেউলে সম্পর্ক।’

‘বেন জানে?’

‘আলবত। ও নিজেও খুব চিন্তিত হয়ে পড়েছে। কয়েক দিনের জন্যে ওর রেড ক্যানিয়ন ওয়ালে যাওয়ার কথা, এখন যাওয়া হচ্ছে না।’

সয়্যার ভেতরে ঢুকল। কী করলে ভাল হয় তাই নিয়ে আলোচনায় বসল তিনজনে। পেরিন একটা সুযোগের জন্য মুখিয়ে রয়েছে।

‘রাউন্ডি,’ প্রস্তাব দিল হ্যারি, ‘আমাদের এই তিনজনের মধ্যে কাউকে সর্বক্ষণ থাকতে হবে এখানে, তবে তুমি আর ডক বাইরে গিয়ে নির্ভর করা যায়

এমন কিছু লোক যোগাড় করতে পারলে সবচেয়ে ভাল হয়। গার্লিন, কলি-এদের মত লোক দরকার। তোমরা যে আঁচ করতে পেরেছ কিছু, এটা যেন টের না পায় কেউ। এ-ভাবেই চলতে দাও ওদের। নিজেরা তৈরি থাকো বিপদ মোকাবেলার জন্যে।

‘গার্লিন ঘোড়ার পালকে ঘাস খাওয়াতে নিয়ে গেছে,’ রাউন্ডি বলল, ‘ওকে আজ পেতে হলে অনেক দূরে যেতে হবে।’

‘ঠিক আছে, সময়-সুযোগ মত ধরো ওকে।’ রাউন্ডি বিদায় নিলে, ঝুলবারান্দায় গিয়ে দাঁড়াল হ্যারি। অন্ধকার রাত, তবে নির্মেষ আকাশ, আর তারাগুলোও বেশ জ্বলজ্বলে। ঘরে এসে শুয়ে শুয়ে ভাবতে লাগল ও।

যে-ভাবেই হোক ভি-বারের বাসিন্দাদের সতর্ক করে দিতে হবে তাকে, কিন্তু কাকে বিশ্বাস করবে সে? ওই বাথান আর তার বাসিন্দাদের নিয়ে যে-গোপনীয়তা, সেটা তার নয়-বেনের। দলের অপর কোন সদস্যের বিপদ হতে পারে এমন কোন বার্তা এই ক্যানিয়নের কেউ বইতে রাজি হবে না। বেনের নাম ব্যবহার করে সে তিন গজা লোক পেতে পারে, কিন্তু তা করতে সাহস পেল না ও।

বেন জানে কী ভাবে দ্রুত পৌঁছানো যায় ওখানে। কোন পথে? সময় থাকতে সেটার খোঁজ কেমন করে পাবে ও?

বিশ তারিখ সোনাবাহী ট্রেন হামলা করার কথা, আবার পূর্ব কলোরাডোতে যাওয়ার কথাও শোনা যাচ্ছে। ওটাও কি বিশ তারিখেই হবে?

ডেভ লেনকার এখানে আসার পথে। বেন জেনে থাকলে, নিশ্চয়ই পেরিনও জেনেছে। এ-ধরনের ব্যাপার গোপন রাখা মুশকিল, বিশেষ করে যখন সেটা গোপন রাখার কোন প্রয়োজনই নেই।

অনেকক্ষণ জেগে রইল সে, ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা ভাবতে চেষ্টা করল। বেন কারির সাথে তাকে কথা বলতেই হবে। সতর্ক করতে হবে তাকে, জানাতে হবে কী জেনেছে সে।

জানালাটা খোলা, দূরে কোথাও একটা কয়োট ডাকছে। বাইরে আবার আগের সেই ভবঘুরে জীবনে ফিরে যেতে সাধ হলো তার। দীর্ঘ উতরাই বেয়ে নামা, অথবা অ্যাসপেন গাছে চড়া। একেবারে মগডালে, সেই যেখানে গাছের শেষ আর ভুষার রাজ্যের শুরু। কিংবা পাহাড়ের গায়ে, ঝরনার আঁতুড় ঘরে।

ওখানে আছে অবাধ স্বাধীনতা। শান্তি! নেই কার্ব পেরিনের মত লোকদের নিয়ে উদ্বেগ। ভয়।

ঝট করে উঠে বসল সে। আউট-ল হিসেবে সে বেড়ে ওঠেনি, বরাবরই এ-কথা তার জানা। বিষয়টা নিয়ে স্বপ্ন দেখেছে কারণ সে তা-ই হবে, এটাই আশা করা হয়েছিল; কিন্তু এখন উপলব্ধি করছে ওটা তার পথ নয়। তবু পালিয়ে যাওয়ার আকুতি তার ভেতর যতই থাকুক না কেন, যাওয়ার উপায় নেই। অন্য লোকের চোখে সে যা-ই হোক, বেন কারি তার বাবা; রক্ষক কিন্তু দয়ালু, কাঁধের কাছে বন্ধুত্ব সুলভ মৃদু চাপ অথবা, যখন সে ছোট ছিল, মাঝে-মধ্যে তার চুলের ভেতর হালকা বিলি কাটার ভেতর দিয়ে বেনের মমতার ছোঁয়া সে অনুভব

করেছে।

আজ বাবার পিঠ দেয়ালে ঠেকেছে, প্রতিমার মত তার দুই মেয়ে আর স্ত্রী বিপদের মুখে। সাহায্যের কেউ নেই, কেবল সে একা। রাউন্ডি, ডাক্তার এবং জনাকয়েক অনুগত লোক আছে সত্যি, কিন্তু ওদের কেউ-ই মলিনা, পেরিন, কিংবা লেনকারের মুখোমুখি হতে পারবে না। শুধু সে, আর এ-জন্যেই তৈরি করা হয়েছে তাকে।

ফের শুয়ে পড়ল ও, বড় বড় চোখে অন্ধকারের ভেতর চেয়ে রইল। এতদিনের প্রশিক্ষণ আর সাধনালব্ধ দক্ষতার সবটুকুই তার প্রয়োজন হবে। পেরিন কৌশলী, বন্দুকে পাকা হাত, এবং ধূর্ত। বেন কারিকে সে নিশ্চয়ই চেনে, দীর্ঘদিনের সহবাস ওদের।

‘কাল,’ আপনমনে বলল ও, ‘কাল আমাকে একটা ব্যবস্থা নিতে হবে, বেন কারির সাথে কথা বলতে হবে। তাকে পষ্ট বোঝাতে হবে কী ঘটছে, কেন ভি-বারে যাওয়ার শটকাট রাস্তা আমাকে তার জানানো উচিত।’

আবার তার দিব্যচোখ খুলে গেল। এখানেই শেষ। পরিষ্কার সব কিছু এখন দেখতে পাচ্ছে সে। বেন কারি এতদিন সংহত রেখেছে ওদেরকে, কিন্তু আর পারবে না, বস্তুত কেউ-ই পারবে না। হাজার ট্রেনিং থাকলেও সম্ভব নয়।

ওদের ভেতর অনেকেই ভাল লোক, ভুল করে এ-পথে এসেছে। কিন্তু অন্যেরা খুনে-বদমাশ, হিংস্র পশুরা এবার তাদের রক্ষককেই মারতে উদ্যত হয়েছে।

আগামীকাল...কাল সে দেখবে কী করা যায়।

কাল...

নয়

ছোট ছোট অনেকগুলো ক্যানিয়ন। মাকড়সার জালের মত। ওই জালের শেষ মাথায় আরও একটা ক্যানিয়ন। ঠিক যেন মরুদ্যান, অসংখ্য নহর, আশপাশে ছড়ানো কয়েকটা ঝরনা আর পর্বতশীর্ষ থেকে গলা তুষারজল বইছে তাতে। এই ক্যানিয়নেরই মাথায় অবস্থিত রেড ওয়াল র‍্যাঞ্চ বা ভি-বার।

জায়গাটা একটু ভেতর দিকে। হঠাৎ কারও চোখে পড়বে না। বর্ষা মৌসুমে প্রচুর ঘাস গজায়, গরু-ঘোড়া এলে খেতে পারে। কিন্তু ঝরনার সময়ে প্রায় ধু ধু মরু, ওই পানি ছাড়া বিশেষ কিছুই মেলে না।

বেন কারি এই জায়গাটা খুঁজে পেয়েছিল বারো বছর আগে। কয়েকজন ইন্ডিয়ান বন্ধুর সহায়তায় এখানে একটা বাড়ি বানিয়েছে সে। পাথরের। লাগোয়া আস্তাবল আর খাটালও আছে। কাছের এক ঝরনা থেকে পাইপ দিয়ে বাড়িতে পানির ব্যবস্থা করেছে। বাড়ির চারপাশে কয়েকটা সিডার গাছ লাগিয়েছে। শেকড় মাটিতে ভাল মত গেড়ে না বসা পর্যন্ত নিয়মিত পানি ঢেলেছে গোড়ায়।

একটু হিসেব করে চললে একজন মানুষ সহজেই ছোট-খাটো একটা বাথান গড়ে তুলতে পারবে এখানে। বর্ষার মুখে খাটাল ভরে ফেলবে গবাদি পশু দিয়ে, খরার সময় বেচে দেবে অধিকাংশ। থাকবে বলেই যে বাড়িটা বানিয়েছে বেন কারি, তা নয়। ওটা স্রেফ তার একটা গোপন ডেরামাত্র। ডাক্তার সয়্যার জায়গাটা চেনে, তবে একমাত্র রাউন্ডিরই যাবার সৌভাগ্য হয়েছে ওখানে।

একটা ছোট দালান, অদূরবর্তী পর্বতমালার আড়ালে প্রায় ঢাকা পড়েছে। ক্যানিয়নের নীচের প্রান্তে একটা নিচু টিলা। ওখান দিয়ে কেউ গেলে বাড়িটা তার চোখে পড়বে না। ওই টিলা আর বাড়ির মাঝখানের অংশে গড়ে উঠেছে আস্তাবল, খাটাল, গুদামঘর আর স্মোকহাউস।

‘বড্ড নির্জন!’ বলল জুলিয়ানা, দূরবিস্তৃত সঙ্কীর্ণ গিরিখাতের দিকে তাকিয়ে আছে ও। ‘এখানে এলে ভাল লাগে, আবার ভয়ও করে।’

ডুসিলা চুপ করে রইল। ওর চোখও নীচের উপত্যকায় নিবদ্ধ। অপূর্ব মায়াময় এই জায়গা। নির্জন অথচ রক্ষ। এর পরতে পরতে অজানার হাতছানি। সম্ভবত এ-জন্যই এই জায়গা তার এত পছন্দ, অতিক্ষণিকের তরে হলেও এখানে ছুটে আসার জন্য ব্যাকুল হয়ে পড়ে সে।

‘একটা কথা আমার প্রায়ই মনে হয়,’ বলল জুলিয়ানা, ‘বাবা এই গহীন এলাকা পছন্দ করল কেন। অন্য যে-কোন জায়গায় র্যাক্স বানাতে পারত সে। আমার তো মনে হয় না আমাদের একশো মাইলের ভেতর আর কেউ থাকে।’

‘ফ্ল্যাগস্টাফের দূরত্ব অত হবে না। আসলে এটা আমাদের বোঝার ভুল।’

‘ধরো কোন বিপদ এল, তখন?’

‘মোকাবেলা করব,’ বলল ডুসিলা। ‘এ-জন্যেই তো বন্দুক চালনা শেখা উচিত তোমার। বলা যায় না, একদিন হয়তো কাজে আসবে।’

‘আমরা চলে আসার পর শহরে গোলমাল হয়েছে,’ বলল জুলিয়ানা। ‘গাড়িতে এ-ব্যাপারে কানাঘুষো শুনেছি। খণ্ড যুদ্ধ মত।’

‘এখন বাবা তাড়াতাড়ি এলে বাঁচি।’

চারদিক ভীষণ শান্ত। বাংক হাউসে, যেখানে বাথানকমীরা শোয়, তার বাইরের চত্বরে নিচুস্বরে কথাবার্তার আভাস পাওয়া যাচ্ছে। বড় স্বস্তিদায়ক শব্দ। রাত নামছে। ইতিমধ্যেই একটা বাতি জ্বলে উঠেছে চত্বরে।

‘এখানে গা ছমছম করে আমার।’

‘ভয়ের কিছু নেই। বাইরে চারজন লোক আছে।’

দু’জনেই চুপ করল, জানালায় পর্দা টেনে দিল জুলিয়ানা। টেবিলের কাছে গিয়ে ডুসিলা লণ্ঠনের চিমনি খুলে ম্যাচের একটামাত্র কাঠি খরচ করে সলতে ধরাল। চিমনিটা যথাস্থানে রেখে চেয়ার টেনে বসল ও। ‘সাপারের সময় তো হয়ে এল।’

‘মনটা খুঁতখুঁত করছে, ডু। কু গাইছে। একটা অঘটন ঘটবে মনে হচ্ছে।’

বোনের দিকে তাকাল ডুসিলা, অপলক চোখে বোঝার চেষ্টা করল ওকে। মাঝে-সাঝে জুলিয়ানার এমন অনুভূতি হয়, এবং প্রায়শ ওর আশঙ্কাই সত্যি হয়। বস্তুত ভয়ের কিছুই নেই এখানে। তবু...

দিনের বেলায় এ-দিকে কেউ এলে বহু দূর থেকেই দেখা যাবে, কিন্তু রাতে?

‘খাওয়া-দাওয়া সেরে,’ বলল সে, ‘বাইরের ওদের সাথে কথা বলব আমি।’

জুলিয়ানা বেরিয়ে গেল ঘর থেকে, ধীর পায়ে আবারও জানালায় গিয়ে দাঁড়াল ডুসিলা। এখনও উপত্যকার বহুদূর পর্যন্ত দেখা যাচ্ছে। কিন্তু আর কয়েক মিনিট বাদেই সব অতল আঁধারে হারিয়ে যাবে।

ওই শিরশিরে অনুভূতিটা এখন তার ভেতরেও জাগছে। হনহন করে নিজের ঘরে গেল ও। ব্যাগ থেকে বাপের দেয়া ডেরিঞ্জারটা বের করে উল্টে-পাল্টে দেখল।

দুটো চেয়ারই ভর্তি। ওটা স্কার্টের পকেটে ফেলে দিল সে।

ভৌতিক পরিবেশ। বাবা এখন কোথায়? ওদেরকে সতর্ক করে দিয়েছে বাবা, একটা নির্দিষ্ট কোন সময়ে তাকে যেন আশা না করে ওরা, তবে এটা ঠিক যে, সে আসবে।

গত কিছু দিন ধরে তলে তলে খোঁজ-খবর করছে ডুসিলা। বেশ ক’বার এই ব্যাঞ্চে বাবা তাদের সাথে দেখা করেছে, কিন্তু শেষ যাত্রায় রহস্যজনক কয়েকটা ব্যাপার তার চোখে পড়েছে। প্রথম, বাবার ঘোড়া। বাবা দাবি করে অনেকদূর থেকে আসছে সে, কিন্তু তার ঘোড়াটা দেখে সে-রকম মনে হয়নি। স্মৃতি হাতড়াতে গিয়ে ওর মনে পড়ল বাবার ঘোড়াটাকে দেখে কখনোই পরিশ্রান্ত মনে হয়নি। এর অর্থ, সম্ভবত ধারেকাছের কোন জায়গা থেকে এসেছে সে। কোথায় হতে পারে সেটা?

কাছেভিতে তো কোন লোকালয় নেই। শুধু ধু ধু প্রান্তর।

আবার উপত্যকার দিকে তাকাল ও। নিকষ অন্ধকার, শুধু দূর আকাশে মিটমিট করছে কয়েকটা তারা।

নীরবে রাতের খাওয়া সারল ওরা। ওদের কেউই বকবক করার মত স্পৃহা অনুভব করল না; তা ছাড়া ওর মা কখনোই বিশেষ একটা কথা বলে না।

‘বাবার সাথে তোমার প্রথম দেখা হয় কীভাবে?’ আচমকা প্রশ্ন করল ডুসিলা।

‘বাবা? ওহ...?’ একটু ইতস্তত করল ওর মা, তারপর হেসে ফেলল। ‘টেক্সাসে, একটা পার্টিতে। চলতি পথে কয়েকজন ঘোড়সওয়ার থেমেছিল। সে-কালে সবাইকে সাদর অভ্যর্থনা জানানো হত। তাই ওদেরও নেমন্তন্ন করলাম আমরা।’

‘দু’জনা নাচলাম, আলাপও হলো এক-আধটু, তারপর একসাথে বসে খেলাম। ওর সঙ্গে আরও দু’জন ছিল। তারা ঘোড়া পাহারা দিল। তবে পার্টিতে শরিক হতে খানিক পরপর পালা বদল করছিল।’

‘ও ছিল খুব সুদর্শন। যেমন চওড়া, তেমনি লম্বা। আশপাশের কোন জায়গা থেকে ও আসেনি, আমি জিজ্ঞাসা করায় বলল, ওর বাড়ি কলোরাডোয় তবে গরু কেনার জন্যে আরও পুবে যাচ্ছে।’

সূর্য ওঠার আগেই চলে গেল ওরা, কিন্তু হস্তাখানেক পর ও ফিরে এল।

একা। সেবার বেশ ক'দিন থাকল। আমরা দু'জন প্রচুর ঘুরলাম একসাথে। ওর হাব-ভাবে কী একটা যেন ছিল যা দেখে অন্যেরা ভয়ে সরে গেল। ওখানকার স্থানীয় কয়েকটা ছেলে...

‘জ্বালাতন করছিল তোমায়?’

‘তা বলতে পারিস। ও আসার পর পিছিয়ে গেল ওরা।’

‘ভয় দেখিয়েছিল ওদের?’

‘না, ঠিক তা নয়। এক ধরনের ব্যক্তিত্ব ছিল ওর ভেতর। রোম্যান্টিক অথচ রহস্যময়। আসত, থাকত কয়েকদিন, তারপর হুট করে চলে যেত।’

‘এখনও রহস্যময়,’ শান্ত সুরে বলল ডুসিলা।

ঝট করে ওর মা চোখ তুলল, রক্ষণাত্মক ভঙ্গী। ‘না, তা হবে কেন। আসলে ওর কাজের চাপ খুব বেশি।’

খাওয়া সেরে ডুসিলা বাইরে গেল। পেছন দিকে। বাংক-হাউসের দরজাটা খোলা, ওর দিকেই হেঁটে আসছে ভয়েল র্যাগান।

‘ভয়েল কাকা, বাবা কখন আসবে?’

‘জানি না, মা। ইচ্ছে করলেই যখন-খুশি এখানে আসতে পারে না সে। কেন, কী ব্যাপার?’

‘জুলিয়ানা ভয় পাচ্ছে। কারণ বলতে পারব না, তবে পাচ্ছে। বিপদের আশঙ্কা করছে। ওর আশঙ্কা প্রায়ই কিন্তু ফলে যায়।’

দীর্ঘ, একহারা স্বাস্থ্য। এই বাথানটা ভয়েল র্যাগানই চালায়। খুব কম কথা বলে। কিন্তু নরম প্রাণ, বিচক্ষণ।

‘ভয়ের কিছু নেই,’ বলল সে। ‘এই জায়গার কথা খুব বেশি মানুষ জানে না। অচেনা লোকও বিশেষ আসে না এদিকে।’

ডুসিলা চুপ করে রইল। তার প্রশ্নের জবাব কি সে দেবে? ‘কাকা...’ ইতস্তত করল ও। ‘বাবা আসলে কী করে?’

চকিতে পেছন ফিরে ক্যানিয়নটা একবার দেখে নিল সে, লক্ষ করল ও, তারপর শান্ত সুরে বলল, ‘কেন, আমি যা জানি তুমিও তা-ই জানো। গবাদি পশুর ব্যবসা। ভাল কাজ, তবে একটু বেশি ঘুরতে হয় এই-যা।’

খুব দ্রুত কথা বলে গেল সে, বাধা দেয়ার কোন সুযোগই ও পেল না। ‘ব্যবসা নিয়ে কোন আলোচনা বাড়িতে সে করে না। এটা তার স্বভাববিরুদ্ধ। যে-ভাবে কেনে, তেমনি ঘুরে ঘুরে বিভিন্ন র্যাঞ্জে মাল বিক্রি করে। মাঝে-সাঝে ছেঁচড়া টাইপের লোকদের সাথেও কারবার করতে হয়। আবার অনেক সময় খদ্দের ঠিক থাকে, মাল কিনেই তার কাছে বেচে দেয়। ঘোরাঘুরির দরকার পড়ে না। ঝানু ব্যবসায়ী। ভীষণ চালাক।’

‘হ্যাঁ। তবে তুমিও কম নও, কাকা। তোমার ওই গল্প মা আর জুলিয়ানাকে ভোলালেও আমাকে পারবে না। আমি জানতে চাই বাবা কোথায় থাকে, এবং পাহাড় ডিঙিয়ে আসে কেন।’

‘এ-ধারণা তুমি কোথেকে পেল?’

‘দেখেছি। ঘোড়ায় চড়ে ঘুরছিলাম আমি, হঠাৎ দেখি পাহাড়ের ওদিক

থেকে আসছে বাবা। তা ছাড়া তার ঘোড়াকেও পথশ্রমে ক্লান্ত দেখায় না, বেশ তরতাজা থাকে।’

অস্বস্তিতে পড়ে গেল ভয়েল র্যাগান। ঠিক এই জিনিসটাই আশঙ্কা করছিল সে। জুলিয়ানা যে-কোন ব্যাপার খুব সরলভাবে গ্রহণ করে। কিন্তু ডুসিলা? উহু। একদম বাপের মত হয়েছে, কিছুই চোখ এড়ায় না।

‘এ-নিয়ে কি কারও সাথে আলাপ করেছ তুমি?’

‘কার সাথে করব? তেমন কাউকে তো পাইনি।’

‘ভাল করেছ। করো না। এমনকী এই বাথানের লোকদের সাথেও না। ব্যাপারটা নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি না করাই শ্রেয়, যেমন আছে তেমনি থাকতে দাও। যত কম জানবে ততই মঙ্গল। বেশি প্রশ্ন করলে লোকজনও কৌতূহলী হয়ে উঠবে।’

‘আচ্ছা, তা হলে এই ব্যাপার।’ ওর গলা খাদে নেমে গেল। ‘বাবা একজন আউট-ল, তাই না?’

‘ম...’

‘অনেক দিন ধরেই সন্দেহ করছিলাম আমি, কিন্তু বাইরের চেহারা দেখে ওরকম মনে হয়নি।’

‘না, ডু। আসলেও সে ওরকম নয়। কক্ষনো জুলুম করে না। তোমার মা বোধহয় ব্যাপারটা জানে কিন্তু স্বীকার করবে না কারও কাছে।’

‘খুব শিগগিরই এসে পড়বে সে। সাহস থাকলে সরাসরি তাকেই জিজ্ঞেস করো। তবে যখনই করো, কেউ যেন গুনতে না পায়।’

‘কাকা, আমার মনে হয় না বাবা আজ রাতে আসবে। আমার মন বলছে, কোন বিপদ দেখা দিয়েছে।’

ওর কাকা একটু কাছে সরে এল। ‘ভয় পাচ্ছ কেন,’ বলল সে। ‘ভয়ের...’

‘আছে।’ একটু থেমে ডুসিলা বলল, ‘আমরা ওয়েভার থেকে রওনা হওয়ার পর একটা লোক আমাদের পিছু নিয়েছিল, কাকা।’

‘পিছু নিয়েছিল?’ চমকে উঠল ওর কাকা।

‘পূর্বের একটা ক্যানিয়নের দিক থেকে এসেছিল লোকটা। অধিকাংশ সময়েই বেশ দূরত্ব বজায় রেখেছিল, যাতে আমাদের চোখে না পড়ে যায়। আমরা রেড ওয়ালের কাছে আসতেই মিলিয়ে যায় সে।’

মনে মনে উদ্বিগ্ন হয়ে উঠল ভয়েল র্যাগান। ভি-বারের মালিক বেন কারি, খবরটা অত্যন্ত গোপন। ভয়েল জানে, টডস্টুল ক্যানিয়নের কাছাকাছি কোন বাথান হামলার ব্যাপারে বেনের নিষেধ আছে। অত্যন্ত সহজ যুক্তি দেখিয়েছে সে। কাছের র‍্যাঞ্চগুলোকে রেহাই দিলে প্রয়োজনের সময় ওরা কাজে আসবে। তবু বেনের নেতৃত্বের ওপর কখনোই ভয়েলের আস্থা ছিল না। দলের কেউ না কেউ যে অবাধ্য হবে এক সময়, তা ও ভাল করেই জানত।

কে হতে পারে? আইনের কোন লোক? প্রায় একশো মাইলের ভেতর লোকালয় নেই। তা ছাড়া ওদের সন্দেহ জাগার মত কোন কারণও ঘটেনি।

আউট-ল? এ ছাড়া আর কী বা হতে পারে? এখন খাটাল ভর্তি, হাটে

নেয়ার সময়ও ঘনিয়ে এসেছে।

‘জু, এ-সব কথা বলে তোমার মা-বোনের মনে ভয় ধরিয়ে দিও না। তুমি রাইফেল ছুঁতে জানো, হাতের কাছে তৈরি রাখো ওটা। আমি রাখালদের সাথে কথা বলছি।’ একটু থামল সে। ‘ওই ঘোড়সওয়ারকে ঠিক কোন জায়গায় দেখেছিলে তুমি?’

ওর বর্ণনা শুনে জায়গাটা সঙ্গে সঙ্গে চিনে ফেলল সে। ‘কাল আমি নিজে ঘুরেফিরে দেখব,’ বলল সে।

‘খুব সাবধান,’ বলল জুসিলা। তারপর বিষয়টা পাল্টাল। ‘আচ্ছা, কাকা, হ্যারি কার্টার নামে কাউকে চেনো তুমি?’

অন্ধকারের ভেতর দাঁড়িয়ে আছে বলে নিজেকে ধন্যবাদ দিল ভয়েল র্যাগান। ‘তুনিনি বললে ভুল হবে,’ সতর্ক গলায় বলল সে। ‘কেন?’

‘এখানে আসার পথে পরিচয় হয়েছে। সত্যি বলতে কী, ওই বাকবোর্ডটা সে-ই ঠিক করে দিয়েছে।’

‘পশ্চিমের অধিকাংশ লোকই মেয়েদেরকে সাহায্য করে।’

‘জানি, তবে ওর ভেতর কী যেন একটা আছে... একটা...’

‘বুঝতে পারছি,’ আমুদে গলায় বলল ভয়েল। ‘নিশ্চয়ই তরুণ, সুন্দর।’

হেসে ফেলল ও। ‘তা অবশ্যি, কিন্তু আমি বলছি ওর চলাফেরার চণ্ডের কথা, ঠিক যেন বনবেড়াল। কার সঙ্গে যেন মিলে যায়। কে, ঠিক মনে করতে পারছি না-তবে বেশ পরিচিত কেউ।’

‘নাম হ্যারি কার্টার বললে, না? মনে থাকবে আমার। কী করে, কিছু বলেছে?’

‘বিশেষ কিছু নয়। শিকারী বলে মনে হয়েছে আমার। বাকস্কিন পরে ছিল। বুঝতে পারছ নিশ্চয়ই, ইন্ডিয়ানদের মত।’ থামল ও। তারপর গলার স্বর স্বাভাবিক রাখার চেষ্টা করে বলল, ‘জিজ্ঞেস করছিল এখানে দেখা করতে আসবে কি-না।’

ভয়েলের মুখে স্মিত হাসি ফুটল। ‘নিশ্চয়ই “হ্যাঁ” বলেছ তুমি?’

এবার ওর হাসির পালা। ‘তাই। কেন আমি কি কৃপণ? হাজার হলেও এটা পশ্চিম?’

ও ভেতরে চলে গেলে ভয়েল র্যাগান বাংক হাউসে ঢুকল। দু’জন রাখাল ইতিমধ্যেই ঘুমিয়ে পড়েছে, কিংবা ভান করছে তার। অপরজন এক পাটি বুট সবে খুলেছে। দ্বিতীয়টার ফিতেয় হাত। ‘এই,’ ওকে ডাকল ভয়েল, ‘ওই এক পাটিও পায়ে চড়াও। পাহারা দেবে। প্রথম পালা তোমার।’

‘পাহারা? কেন?’

‘আসার পথে মেয়েদের পিছু নিয়েছিল কেউ। ব্যাপারটা ভাল ঠেকছে না আমার।’

লোকটা এবার উঠে বসল। ওর নাম, গার্ফিন্ড। ‘ব্যাপারটা তোমাকে তা হলে জানানো দরকার, ভয়েল। দিন কয়েক আগে ত্রীকের ধারে ঘোড়ার কয়েকটা ট্র্যাক দেখতে পেয়েছি আমি। সম্ভবত আমাদের ওপর নজর রাখছিল

কেউ।

‘আচ্ছা। নিজেদের কাজ তোমরা ভালই বোঝ। ইন্ডিয়ান হামলার সময়ে যে-রকম সতর্ক থাকতে ঠিক সে-রকম থাকবে। তফাত কেবল এইটুকু যে ইন্ডিয়ানরা নয়, এবার আসবে সাদা চামড়ার একদল আউট-ল।

‘হাটের সময় হয়ে এসেছে। গরুগুলো জড়ো করছি আমরা। দিন কয়েকের ভেতর আরও কাজের লোক আসবে এখানে। আমার বিশ্বাস, ওরা জানে সেটা। তাই কিছু ঘটলে দু’একদিনের ভেতরেই ঘটবে।

‘বাথান থেকে দু’তিন মাইলের বেশি দূরে যেও না। পেছনের দিকে খেয়াল রাখবে সর্বদা। বিপদ-আপদ দেখলেই ছুটে আসবে। মেয়েগুলোকে রক্ষা করতে হবে।’

‘মেয়েদের ওপর তো হাত তোলে না ওরা!’ প্রতিবাদ করল গার্ফিল্ড।

‘জানি। কিন্তু আমরা লোকালয় থেকে দূরে, পাহাড়ী এলাকায় আছি। খুব কম লোকই জানে আমাদের কথা। কাজেই একটা কিছু ঘটতে কতক্ষণ।’

পায়ে আরেক পাটি বুট গলিয়ে উঠে দাঁড়াল গার্ফিল্ড। গ্যালিসের ফিতেজোড়া কাঁধের ওপর তুলে দিল। গানবেল্ট নিল।

‘উইনচেস্টারটাও নাও। দরকার পড়তে পারে।’

ভাবলেশহীন মুখে ভয়েলের দিকে একবার তাকাল গার্ফিল্ড। একজন রাখাল নাক ডাকতে শুরু করলে ভয়েল সেদিকে ইশারা করল। ‘মাঝ-রাতে তুলে দেবে ওকে। তিনটে পর্যন্ত পাহারা দেবে ও। তারপর সকাল অবধি প্যাট।’

বাইরে এসে দাঁড়াল সে, কান পাতল বাতাসে। নিস্তব্ধ, ভীষণ নিস্তব্ধ। নিজের ঘরে ফিরে গেল সে। শিয়রের কাছে গানবেল্টটা রাখল। ঘড়ির স্ট্যান্ডটা টেনে আনল কাছে। তাক থেকে নিজের উইনচেস্টার পেড়ে এনে স্ট্যান্ডের ওপর রাখল।

দীর্ঘকাল বন্দুক ধরেনি, ভয়েল র্যাগানের মনে সংশয় জাগল, সে কি পারবে ঠেকা দিতে?

দশ

সুন্দর সকাল, ঠাণ্ডা। কিন্তু বাতাসে বিপদের গন্ধ পেল হ্যারি কার্টার। তাড়াতাড়ি গোশাক পাল্টে বোর্ডিং হাউসের দিকে রওনা হলো। অল্প ক’জন লোক নীরবে যাচ্ছে বসে। সে ঢুকতেই মুখ তুলে দেখল ওরা, একজন মাথা নেড়ে দায়সারা গোছের অভিবাদন জানাল। কফি শেষ করে এনেছে হ্যারি, এমন সময় কার্ব পেরিন ঢুকল।

নিমেষে সতর্ক হয়ে উঠল হ্যারি। পেরিনের চলাফেরার মধ্যে একটা উগ্রতা ফুটে উঠেছে, ব্যাপারটা ওর স্বভাববিরুদ্ধ। আড়চোখে একনজর হ্যারিকে দেখল সে, তারপর বসে খেতে শুরু করল।

রাউন্ডি এল, পেছনে ডাক্তার সয্যার। এর অর্থ, পাথর বাড়িতে বেন কারি একা। একটু বাদে ডাক্তার চুকল, ওর পেছনে কাইফার; তারপর রকি ক্র্যাত, মনসন, এবং সবশেষে প্যানে।

কফি পেয়ালা সবে চোটে ছুইয়েছে, চকিতে হ্যারির মনে পড়ল 'এই লোকগুলোকে নিয়েই ভি-বার আক্রমণের ফন্দি এঁটেছে পেরিন। তার মানে, হামলাটা সম্ভবত আজই হবে।

মুখ তুলতেই লক্ষ করল কফি শেষ না করে রাউন্ডি উঠে দাঁড়িয়েছে। দ্রুত বাইরে মিলিয়ে গেল সে।

ওর নিজের খালি পেয়ালাটা টেবিলে রেখে হ্যারি উঠে দাঁড়াল। একটা শীতল ছাঁকা লাগল মেরুদণ্ডে, পিস্তলের নল চোঁসে ধরেছে কেউ। 'ডোন্ট মুভ!' আদেশ করল সে।

লোকটা ফার্নান্দেজ। পেরিন চেয়ারে হেলান দিয়ে বসেছে, হাসছে। কুৎসিতভাবে।

'তোমাকে চমক দিতে হচ্ছে বলে দুঃখিত, হ্যারি।' শুরু করল পেরিন। 'কিন্তু উপায় নেই, লেনকার আসছে, তাই তাড়াহড়ো করতে হচ্ছে আমাদের। ও যখন এসে পৌঁছবে, ততক্ষণে আমি পগার পার। কেউ কেউ তোমাকে খতম করে দিতে চেয়েছিল, কিন্তু আমি ভেবে দেখলাম, সেটা ঠিক হবে না। বরং তুমি বেঁচে থাকলে বুড়ো সর্দারের সাথে দর কষতে সুবিধে হবে।

'এমনিতে তাকে হয়তো ওই পাথুরে খোলস থেকে বের করা মুশকিল। তবে, আমার ধারণা, তুমি আমাদের মুঠোয় থাকলে সে কথা গুনবে।'

'ভুল,' শান্ত স্বরে বলল হ্যারি। 'আমার কী হলো না হলো, তাতে কিস্সু আসে যায় না তার। আমার জায়গায় নতুন কাউকে নেবে। কিন্তু তোমাকে রেহাই দেবে না।'

'তবু পাব।' পেরিন ভেংচি কাটল। 'দেখো। আজ সকালেই সোনাবাহী ট্রেন লুট করতে গেছে রিগার মলিনা। সঙ্গে আরও দশজন আছে।'

'ওটা তো আমার শিকার?' বলল হ্যারি।

'আমি বদলাবদলি করেছি ওর সাথে। রফা হয়েছে, সোনা ওর, ব্যাংক আমার। তবে'-হাসিটা কানে গিয়ে ঠেকল-'ওই বারোজন গার্ড থাকার তথ্যটা দেইনি। বলেছি, তিনজন থাকবে। আমার বিশ্বাস, এরপর আর ওকে নিয়ে মাথা না ঘামালেও চলবে।'

ঝট করে ঘুরে দাঁড়াল পেরিন। 'ওর পিস্তলটা কেড়ে নাও, তারপর দু'হাত পিছমোড়া করে বেঁধে রাস্তায় নিয়ে এসো। আমি চাই বুড়ো দেখুক ওকে।'

'ওই ব্যাটার কী হবে?' পিস্তল উচিয়ে ডাক্তারকে দেখাল কাইফার।

'কিছু বলার দরকার নেই। বলা যায় না, আমাদের একজন ডাক্তারের প্রয়োজন হতে পারে। নিজের মঙ্গল ও ভালই বোঝে।'

রাগে-দুঃখে হ্যারি কার্টারের ইচ্ছে হলো নিজের হাত কামড়ায়। আরও সাবধান হওয়া উচিত ছিল তার। পেরিনের ওপর নজর রাখছিল সে, ওই ফাঁকে ফার্নান্দেজ টুক করে ওর পেছনে চলে এসেছে। ধাক্কিয়ে রাস্তায় নিয়ে আসা হলো

তাকে। প্রথমে রোদের ভেতর দাঁড় করিয়ে দেয়া হলো, মুখ পাথর বাড়ির দিকে।

চাপা উল্লাস বোধ করল সে। তার কপালে যাই ঘটুক, বুড়োকে ওই বাড়ি থেকে বের করা কঠিন হবে। খোলা জায়গায় দাঁড়িয়ে আছে ওরা, সূর্যের আলোয় সবাইকে দেখা যাচ্ছে স্পষ্ট। বাবা নিশ্চয়ই শক্তিশালী বন্দুক হাতে ওপরে কোথাও রয়েছে। দরজা-জানালায় আড়াল থেকে গোটা এলাকাটা সুন্দর কভার করতে পারবে সে।

গাছের গুঁড়ি আর বালির বস্তা দিয়ে রাস্তার মধ্যখানে একটা নিরাপত্তা-পাঁচিল তৈরি করা হয়েছে। তার আড়ালে আশ্রয় নিল পেরিন। 'বেন, নীচে নেমে এসো!' চোঁচিয়ে বলল সে। 'মাথার ওপর দু'হাত তুলে আসবে, না-হলে তোমার ছেলেকে মেরে ফেলব!'

কোন জবাব নেই, মনে হলো না ওদের হাঁক-ডাক শুনতে পেয়েছে সে।

'আমি ওর ছেলে নই,' বলল হ্যারি। 'এমন কী রক্তের কোন সম্পর্কও নেই। বিশেষ একটা কাজ করাবে বলে পুশি নিয়েছে। আমাকে ছাড়াও অনায়াসে তার চলবে।'

'তোমার কথা শুনতে পায়নি ব্যাটা,' বলল ক্ল্যাট। 'চলো বাড়িতে চড়াও হই।'

'ইচ্ছে হলে তুমি যাও,' বলল কাইফার। 'আমি এখানেই বসে লক্ষ রাখব।'

নিজের অসহায়ত্বসত্ত্বেও মনে মনে আনন্দ অনুভব করল হ্যারি। বেন কারি চতুর লড়িয়ে। একবার সাড়া দেয়ার অর্থ যে নতি স্বীকার, তা সে ভাল করেই বোঝে। বেন যদি দেখতেই না পেল তবে হ্যারিকে মারার কোন অর্থ হয় না। তা ছাড়া ওরা নিশ্চিত নয় যে বেন ওদের কথা শুনতে পেয়েছে।

পেরিন ধরে নিয়েছিল, হ্যারিকে বলিতে চড়াতে দেবে না বেন, বেরিয়ে আসবে বাসা থেকে। অথচ, এখন, বেন আদৌ ওদের কথা শুনতে পেয়েছে কিনা, সে-বিষয়ে সন্দেহ দেখা দিয়েছে ওদের মনে। বুঝতে পারছে না পোষ্যপুত্রকে বাঁচাতে সে ধরা দেবে কি-না। প্রথমে ব্যাপারটাকে যুক্তিসঙ্গত বলেই মনে হয়েছিল। সে জানে, পেরিন এখন আর আগের মত জোর পাচ্ছে না মনে। ওর দালালদের অবস্থাও তাই।

'বেরিয়ে আসো!' পেরিন চোঁচাল। 'তোমাদের দু'জনকে পালাবার একটা সুযোগ দেব। ঘোড়া পাবে। নইলে দু'জনকেই মরতে হবে! আমাদের কাছে ডিনামাইট আছে!'

'পেরিন,' বলল হ্যারি, 'বোকামি করছ। বেনের কাছে আমার জীবনের এক কানাকড়ি দামও নেই। মরলাম কি বাঁচলাম, কিসসু আসে যায় না তার। বেরিয়ে সে আসবে না, আর বের করার কোন রাস্তাও নেই। একবারও কি মনে হচ্ছে না তোমার, যে এটাও সে হিসেবের মধ্যে ধরে রেখেছে? তাকে দেখেছ কখনও ভুল করতে?'

ওদেরকে ঘাবড়ে দেয়ার জন্য হ্যারি ইচ্ছে করেই বেশি কথা বলছে। একবার যদি পেরিনের ওপর ওদের আস্থায় সে ফাটল ধরাতে পারে, তবে হয়তো বেন কারির ভয়ে উল্টোদিকে বন্দুক ধরবে ওরা।

তাকে পাত্তা দিল না পেরিন। স্পষ্ট অধৈর্য হয়ে উঠেছে ওরা। সম্ভবতাবে তাকাচ্ছে এদিক-ওদিক, যেন পা টিপে টিপে কেউ আসছে ওদের পানে। বেন কারি অসম্ভব ধূর্ত। আচ্ছা, এ-জায়গায় সে থাকলে এখন কী করত?

‘স্রেফ একটাই কাজ করতে হবে তাকে, কার্ব,’ বলল হ্যারি, ‘ডেভ লেনকারের জন্যে অপেক্ষা করতে হবে। ডেভের সাথে একটা রফা করে ফেলবে সে, তখন তোমার কী দশা হবে? না ঘরকা না ঘাটকা!’

‘চোপ!’ রাগত সুরে বলল পেরিন। ‘ঠিকই আসবে বুড়ো। একটু পায়তারা করছে মাত্র।’

‘চলো হামলা করি,’ অসহিষ্ণু গলায় বলল ডাক্তার।

‘ধেত্তেরি!’ বিরক্তির ছাপ ফুটল কাইফারের গলায়। ‘কেন ঝামেলা বাড়ানো, বাপু! হাতের কাছে নগদ যা পাওয়া যায় তাই নিয়ে সটকে পড়লেই তো হয়। দেরি হলে আবার কে না কে এসে পড়বে। কম করে হলেও শ’দুয়েক গরু আছে খাটালে।’

‘গোলাভর্তি শস্য থাকতে মুষ্টির চাল নিয়ে সম্ভষ্ট হব নাকি?’ ঝাঁঝের সাথে বলল পেরিন। ‘সারাজীবনের কামাই ওই বাড়িতে আছে। স্ট্রং রুম-ভর্তি সোনা, টাকা! এ-সব ছেড়ে তোমার ওই গরু নিয়ে যাব, না?’

কাইফার চুপ করে রইল, তবে সম্ভষ্ট হতে পারল না।

‘ওখানে কোন স্ট্রং রুম নেই,’ ওদের বলল হ্যারি। ‘তিনটে মোটে ঘর। মানুষও তিনজন: আমি, ডাক্তার সয়্যার আর বেন। একটা জিনিসই প্রচুর আছে—অ্যামুনিশন। একটা যুদ্ধ জেতা যায় অ্যাগ্রে। এই পুরো এলাকা তার নাগালের ভেতর আছে। সময়-সুযোগ বুঝে তোমাদের একেকজনকে ধরবে।’

তীব্র সূর্যকিরণ উপেক্ষা করে পাথর বাড়ির দিকে তাকাল হ্যারি। ওপরের ওই বাড়িতে লুকিয়ে থাকা বুড়ো মানুষটার প্রতি অসীম মমতায় ওর মন ভরে গেল। সে ভাল-মন্দ যাই হোক, বেন কারির কাছে ও ঋণী। হতে পারে সে তাকে অপরাধের দিকে ঠেলে দিচ্ছিল, কিন্তু বেনের কাছে শুটা কোন খারাপ জীবন নয়। সামন্ত জমিদারের মত জীবন-যাপন করে বেন। সে নিজে তৈরি করেনি, এমন কোন আইনের প্রতি তার বিন্দুমাত্র আস্থা নেই।

তার ভাবনায় গলদ থাকতে পারে, কিন্তু এতিম হ্যারি কার্টারের সামনে সম্ভাবনার দরোজা খুলে দিয়েছে সে। আর যাই হোক, হ্যারি এখন উপলব্ধি করছে, জীবনে সে কখনোই আউট-ল হতে পারত না। চুরি, ডাকাতি, রাহাজানি—এ-সব তার ধাতের বাইরে। কিন্তু এর অর্থ এই নয় যে, যে-লোক তাকে পথ থেকে কুড়িয়ে এনে খাইয়ে-পরিয়ে মানুষ করেছে, তার বিপদের দিনে সে পিঠটান দেবে।

ওই নিঃসঙ্গ মানুষটার জন্য ভীষণ গর্ব অনুভব করল সে। কোণঠাসা গ্রিজলির মতই সে আমৃত্যু যুঝবে। সে, হ্যারি কার্টার, হয়তো এই ধূলিমলিন রাস্তায় মরে পড়ে থাকবে; কিন্তু, অন্তস্তল থেকে প্রার্থনা করল ও, বেন যেন ওই নিরাপদ দুর্গ থেকে না বেরোয়। যেন হারিয়ে দেয় তার শত্রুদের।

কার্ব পেরিন বেকুব বনে গেছে। লেনকার টডস্টুল ক্যানিয়নে আসছে শুনে

অতিথি প্রান ফেঁদেছিল সে। লেনকার নিশ্চয় সদলে আসছে, সেক্ষেত্রে নেতৃত্বের জন্য ত্রিমুখী লড়াই বাধার আশঙ্কা আছে।

মলিনাকে পথ থেকে সরিয়ে দিয়ে ভেবেছিল বেনের কাছ থেকে গায়ের জোরে সর্দারি কেড়ে নেবে। তারপর ফাঁদ পেতে অপেক্ষা করবে লেনকারের জন্য। ক্যানিয়নে একবার ঢুকলে আর প্রাণ নিয়ে ফিরতে হবে না বাহাদুরদের। কিন্তু এখন দেখছে, তার প্রান, টাইমিং সব গুলেট হয়ে গেছে।

বেন কারি যে সাড়া নাও দিতে পারে, এই চিন্তাই তার মাথায় খেলেনি। পেরিন ভেবেছিল, সে পালাতে চেষ্টা করবে এবং, সেক্ষেত্রে, ব্যবস্থাও করে রেখেছিল সে। পথে গুপ্তঘাতক বসে আছে, পালাতে চেষ্টা করলে গুলি খেয়ে মরবে বেন।

‘তোমরা যদি হামলা একান্ত করতেই চাও,’ সাদামাটা গলায় বলল হ্যারি, ‘পূর্ব কলোরাডোয় একটা ব্যাংক আছে, সেখানে যাও। খবর যা পেয়েছি, তাতে একদম সহজ কাজ। কেবল নেয়ার অপেক্ষা মাত্র।’

কেউ কোন কথা বলল না। তবে ও জানে, প্রস্তাবটা ভেবে দেখবে ওরা। তার মনে যথেষ্ট সন্দেহ আছে, আদৌ ওদের কেউ বেন কারির মুখোমুখি হতে চায় কি-না। হতে পারে সে বুড়িয়েছে, কিন্তু কতটা?

তার নিজের কিছুই করার নেই। যে-কোন মুহূর্তে পেরিন তাকে খুন করার সিদ্ধান্ত নিতে পারে। এই খোলা জায়গায়, হাত পিছমোড়া করে বাঁধা অবস্থায় এক ভাবনা ছাড়া কিছুই করার নেই তার।

রাউন্ডির কী হলো? বুড়ো ট্র্যাপার হঠাৎ করেই টেবিল ছেড়ে চলে গেছে। কফিটুকুও শেষ করেনি, ব্যাপারটা রাউন্ডির বেলায় একেবারেই অভাবনীয়। তবে কি পেরিনের সাথে ওর যোগসাজশ আছে? না, এ অসম্ভব। ও বরাবর বেন কারির বন্ধু, তা ছাড়া কার্ব পেরিনকে পছন্দও করে না সে।

তবে ও কোথায়? বেনের সাথে পাথর বাড়িতে? হয়তো-বা, কিন্তু খাঁচায় আটকা থাকতে তার একেবারে না-পছন্দ। খোলা মাঠে লড়তে ভালবাসে, নেহাত বাধা না হলে রক্ষণাত্মক ভঙ্গি নেয় না। সে যেখানেই থাকুক, হ্যারি নিশ্চিত, তার কর্তব্য সে ঠিকই পালন করছে।

‘ঠিক আছে,’ আচমকা বলল পেরিন, ‘একজন বুড়ো লোককে আমরা সবাই মিলে পাহারা দেয়ার কোন অর্থ হয় না।’ তেরহাভাবে হ্যারির দিকে তাকাল সে। ‘ওই ব্যাংকের ব্যাপারে তোমার আইডিয়াটা মন্দ নয়। তোমাকে আটকে রেখে এখন যাব ব্যাগানের বাথানে। ফিরে এসে তোমাদের দু’জনার ঠিকানা লাগিয়ে তারপর যাব ওই ব্যাংক খেতে।’

একটা গুদামঘরে নিয়ে আসা হলো হ্যারিকে। পা বেঁধে গুদামের পেছনদিকে অন্ধকারের ভেতর ফেলে রাখল ওকে।

একরাশ চিন্তা পরস্পর ঠোকাঠুকি খাচ্ছে ওর মাথার ভেতর। সেগুলো সুন্দর করে সাজাতে আশ্রয় চেষ্টা করল ও। এখান থেকে প্রাণ নিয়ে বেরোতে হলে মাথাটা খেলাতে হবে তাকে। চেষ্টা করলে উপায় একটা মিলবেই।

রেড ওয়াল ব্যাঙ্ক লুট করতে বেগ পেতে হবে না পেরিনের লোকদের।

মাত্র চারজন কর্মচারী আছে ওখানে। অতর্কিতে হামলা চালাবে দস্যুরা, ওরা নিজেদের কাজ ভালই বোঝে। জুলিয়ানা, ডু আর তাদের মা অসহায় হয়ে পড়বে। চারজন লোক, ভয়েল র্যাগানকে ধরে পাঁচ, অতর্কিত হামলা রুখতে পারবে না।

আর এখানে তার হাত-পা বাঁধা। বন্দী।

মরিয়া হয়ে দড়ি ছেঁড়ার চেষ্টা করল ও। কিন্তু যারা ওকে বেঁধেছে তারা একাজে খুবই পটু, জীবনে অনেক গুরু-ঘোড়া বেঁধেছে।

চোখে অন্ধকার একটু সয়ে আসতেই কাজে লাগতে পারে এমন জিনিসের আশায় এদিক-ওদিক তাকাতে লাগল ও। কিছু নেই।

বাইরে সব সুমসাম। ওরা কি চলে গেছে? জানার উপায় নেই। তবে না গিয়ে থাকলেও পেরিন শিগগিরই যাবে। তবে বেন কারির ওপর নজর রাখার জন্য পেছনে যে লোক রেখে যাবে, সেটাও জানা কথা। টানা-হেঁচড়া থামিয়ে চিন্তা করতে বসল হ্যারি। এখান থেকে ও যদি বেরোতে পারে, তারপর চোরাপথের সন্ধান পেলে পেরিনের আগে বাথানে পৌঁছানো হয়তো অসম্ভব হবে না। সেখানে ওদের জন্য ওঁৎ পেতে বসে থাকতে পারবে ও।

রাউন্ডি কোথায়? ডাক্তার সন্ন্যাস?

হাল ছেড়ে দিতে বসেছে, চকিতে একটা কথা মনে পড়ল ওর। এত সোজা ব্যাপার, অথচ এতক্ষণ মাথায় আসেনি! নিজেকে খিঁকার দিল হ্যারি। উপুড় হয়ে শুয়ে পড়ল ও। পাজোড়া পেছন দিকে ঝাঁকিয়ে কোমর অবধি তুলে আনল। কপাল ভাল, পায়ে ওর বুটজুতো, নিত্যদিনের মত বাসায় থাকলে যে-মোকাসিনটা পরে সেটা নেই। স্পারের গায়ে গরুর চামড়া দিয়ে তৈরি দড়ি ঘমতে শুরু করল ও। বড় দাঁতঅলা মেক্সিকান স্পার, সন্ন্যাসের দেয়া।

ঘমতে ঘমতে হাতে ব্যথা ধরে গেল, ঘাম ছুটল সারা গায়ে। একবার জিরিয়ে নিতে থেমেছে, এমন সময় বাইরে থেকে অনেকগুলো ঘোড়ার খুরের শব্দ ভেসে এল। মিলিয়ে যাচ্ছে দূরে।

‘তবে কি ওরা রওনা হলো? এবার একটা সুযোগ মিলতে পারে। যদি...’

মেঝেতে এক জোড়া বুটের শব্দ, কেউ আসছে! ইস্, দড়ি কাটার সময়েই এল হতভাগা। পাছে ধরা পড়ে যায় ওর কীর্তি, কাত হয়ে গুলো হ্যারি।

খুঁট করে দরজাটা খুলে গেল। স্নেক ফার্নান্দেজ। এক হাতে ছুরি। অপর কাঁধে ব্যান্ডেজ, হ্যারির বুলেটে জখম হয়েছে।

‘ফার্নান্দেজকে গুলি করিস, না? এবার মজা দ্যাখ, শালা! বটি-কাবাব বানাব তোকে!’

কাঁধে ভর দিয়ে শুয়ে আছে হ্যারি, চোখ খচরটার উপর। তার ওপর ঝুঁকে এল সে, ছুরির ডগা দিয়ে খোঁচা দিল। হ্যারি নড়ল না।

ক্ষিপ্ত হয়ে ছুরিটাকে ভাল মত বাগিয়ে ধরল ফার্নান্দেজ। ‘বাঞ্ছোৎ, নড়বি না? নড়িয়ে ছাড়ব তোকে!’

তীব্র বেগে ঘাই বসাল সে। চিৎ হয়ে সরে গেল হ্যারি, জোড়া-পায়ে ঝেড়ে লাগি হাঁকাল। হাঁটুতে বুটের হাতুড়ি খেয়ে নিতম দিয়ে ধপাস করে পরে গেল

ফার্নান্দেজ। চোখের পলকে উপড় হয়ে আধহেঁড়া দড়িতে টান মারল হ্যারি।

কিছু একটা ছিঁড়ল, ঢিল পড়ল কজিতে।

আবার ওঠার জোগাড় করছে ফার্নান্দেজ, ছুরিটা কুড়িয়ে নিয়েছে মেঝে থেকে।

শোয়া অবস্থা থেকেই ওর পায়ের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল হ্যারি। চট করে পিছিয়ে গেল যমদূত, ছুরিহাতে রুখে উঠল। পাছা ঘষটে ওর দিকে এগিয়ে গেল হ্যারি, পা ওপরে ওঠানো। আজরাইল এওতেই সাঁই করে দু'পা নামিয়ে আনল ও।

উরুর ওপর দাঁত বসাল স্পার, ডোরাকাটা প্যান্ট ছিঁড়ে এক-খাবলা মাংস তুলে নিল।

যন্ত্রণায় ককিয়ে উঠল ফার্নান্দেজ, একশো মাইল স্পীডে জঘন্য গালাগাল দিল। এক ঝটকায় হাতের দড়ি খসিয়ে ফেলল হ্যারি। গোড়ালির গাঁট ধরে হেঁচকা টানে শয়তানটাকে সামনে নিয়ে এল।

আহত মার্জাডের মত ছাড়া পাওয়ার চেষ্টা করল ফার্নান্দেজ। ওর এক হাত ধরে মোচড় দিল হ্যারি, পা ছেড়ে দিয়ে অপর হাতে চেপে ধরল গলা। সারা শরীরের জোর দিয়ে চাপ দিল। বহু সাধনালব্ধ এই শক্তি, বিপদকালে কাজে আসবে তাই অর্জন করেছে সে।

হাত ছাড়াতে আশ্রাণ চেষ্টা চালাল ফার্নান্দেজ, কিন্তু হ্যারির মুঠি আরও জোরে এঁটে বসল। লোকটার মুখ রক্ত জমে কালো হয়ে গেল। ধীরে নেতিয়ে পড়ল সে। গলা ছেড়ে দিয়ে চোয়ালের একপাশে ভয়ঙ্কর জোরে আঘাত করল হ্যারি। আবার।

অচেতন লোকটার হাত থেকে খসে পড়া ছুরিটা তুলে নিল। পায়ের বাঁধন কেটে উঠে দাঁড়াল হ্যারি। রক্ত চলাচল স্বাভাবিক করতে কজি ঝাঁকাতে লাগল ধীরে ধীরে।

এবার....!

এগারো

অজ্ঞান লোকটার দিকে তাকিয়ে একমুহূর্ত ইতস্তত করল সে। সচরাচর থাকলেও, এখন ফার্নান্দেজের কাছে কোন পিস্তল নেই। বোধহয় দরজার বাইরে রেখে এসেছে। বাইরে কী অপেক্ষা করছে জানে না, তাই সন্তর্পণে মেঝেতে একটুও শব্দ না তুলে দরজার কাছে এগিয়ে গেল ও। সাবধানে পাল্লা ফাঁক করল।

জনশূন্য রাস্তা। দীর্ঘক্ষণ বাঁধা থাকায় হাতে ঝিঝি ধরে গেছে, অবিরাম আঙুলগুলো নাড়িয়ে খিল ছাড়াতে চেষ্টা করল। দরজাটা আরেকটু ফাঁক করে বাইরে পা রাখল। প্রথমেই যে-জিনিসটার ওপর চোখ পড়ল, একটা চেয়ারের

ফেরা

পেছনে ফার্নান্দেজের গানবেল্ট ঝুলছে।

বেল্টটার দিকে দু'কদম এগিয়েছে, এমন সময়ে বাংক হাউস থেকে একটা লোক বেরিয়ে এল। হাতে টুথপিক, মুখে দেবে, হঠাৎ হ্যারির ওপর চোখ পড়ল তার। চমকে উঠল সে। টুথপিকটা ছেড়ে দিয়ে কোমরে হাত বাড়াল।

মাত্র পনেরো ফুট দূরত্ব, ছুরির ডগায় ধরে নীচ থেকে থ্রো করল হ্যারি। সূর্যের আলোয় ঝিকিয়ে উঠল ছুরির ফলা। 'অঁক' করে একটা শব্দ করল লোকটা, পিস্তল পড়ে গেল হাত থেকে। পেটের ভেতর আমূল সঁধিয়ে গেছে ছুরিটা, বাট ধরে টেনে বের করতে চেষ্টা করল। মুখ বঁকে গেছে যন্ত্রণায়।

ফার্নান্দেজের গানবেল্টটা তুলে নিয়ে কোমরে পেঁচিয়ে নিল হ্যারি। একটার বাট সামনের দিকে, অপরটা পেছনে। বোর্ডিং হাউসের উদ্দেশে দৌড় দিল, তার নিজের গানবেল্টটা ওখানেই আছে। ঝড়ের বেগে ভেতরে ঢুকেই জমে গেল ও।

ডাক্তার সয়্যারের হাতে একটা শটগান, পেরিনের চার সাঙাত দেয়ালে বুক ঠেকিয়ে দাঁড়িয়ে। 'তোমার অপেক্ষাতেই ছিলাম,' বলল ডাক্তার। 'এই লোকগুলোকে খুন করতে চাইনি, তবে বাঁধার চেষ্টাও করিনি।'

হ্যারির গানবেল্টটা টেবিলের ওপরেই ছিল। ফার্নান্দেজেরটা খুলে রেখে নিজেরটা পরল ও। তারপর ফার্নান্দেজের পিস্তল দুটো কোমরে গুঁজে রাখল।

'শুয়ে পড়ো!' ওদেরকে হুকুম করল সে। 'উপুড় হয়ে!'

দু'মিনিটের মধ্যে চারজনকে একদড়িতে বেঁধে ফেলল ওরা। ওদের অস্ত্রপাতি কুড়িয়ে নিল সে।

'রাউন্ডি কোথায়?'

'এখান থেকে চলে যাওয়ার পর আর দেখিনি। ওর কথাই ভাবছিলাম আমি।'

'বাদ দাও। চলো বেন কারির কাছে যাই। তারপর একটা ব্যবস্থা করতে হবে। হাতে বেশি সময় নেই। ওরা ভি-বারে গেছে।'

ডাক্তারকে অসুস্থ দেখাল। 'সর্বোনাশ! মেয়েগুলো একা...!'

পেছন দরজা দিয়ে বাইরে এল দু'জন, দালান-কোঠার দেয়াল ঘেঁষে হাঁটতে লাগল। সহজেই যাতে চিনতে পারে, হ্যারি ওর টুপিটা হাতে রাখল। বেন কারি দেখতে পাবে তাদের, সে জানে। পাছে সেমসাইড হয়ে যায়, তাই এই ব্যবস্থা।

সয়্যার দারুণ উত্তেজিত হয়ে আছে, তবে শান্ত থাকার চেষ্টা করছে। জীবনে অনেক বন্দুকের লড়াই সে দেখেছে, তবে নিজে অংশ নেয়নি একটিতেও।

চোরাগুলির ঝাঁক নিয়ে পাথরের সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠল ওরা। ভেতরে কোন সাড়াশব্দ নেই। দরজা খুলে লিভিং রুমে ঢুকে চারপাশে তাকাল। প্রাণের কোন চিহ্ন নেই। মেঝেতে কার্পেটের ওপর একটা কার্তুজের বাক্স পড়ে আছে-রাইফেলের।

একটা চাপা গোঙানির শব্দ ভেসে এল। থমকে দাঁড়িয়ে কান পাতল হ্যারি। পরক্ষণেই ওপরের দুর্গ-ঘরের দিকে ছুটে গেল। দুর্গের দরজার কাছে দাঁড়িয়ে পড়ল ও। ওর একধাপ নীচেই সয়্যার।

আজ পর্যন্ত বাইরের কোন লোক এই ঘরে ঢোকেনি, এমনকী সয়্যারও নয়।

নিরেট পাথরের দেয়াল। পাহাড় কেটে ঝরনা থেকে সরাসরি জলের ব্যবস্থা করা হয়েছে। পাথরের পাইপের ভেতর দিয়ে আসছে, সুতরাং প্রবাহ বন্ধ করতে পারবে না কেউ। যথেষ্ট খাবার-দাবার মজুদ আছে ঘরে। ভারি দরজা, ভেতর থেকে আটকানো যায়; ভিনামাইট চার্জ করেও ভাঙা সম্ভব নয়।

বেন কারির শেষ আশ্রয়স্থল এই ঘর, কিন্তু এখন সে মেঝেতে পড়ে কোকাচ্ছে। 'পা মচকে গেছে। তাড়াহুড়া করতে গিয়েছিলাম। আমার ওজন খুব বেশি।'

'সিঁড়িতে পা পিছলে গেছে, কোনমতে উঠে এসেছি।' হ্যারির দিকে তাকাল। 'আহ! বাঁচলাম। যাক মারেনি তা হলে, খুব ভয় ছিল আমার। নিজের চেষ্টায় পালিয়েছ, তাই না?'

'হ্যাঁ, বাবা।'

এক পলকের জন্য ওর দিকে তাকাল বেন।

সয়্যার হাঁটু গেড়ে বৃদ্ধের ক্ষত পরীক্ষা করছিল। 'মারাত্মক চোট, বেন। বেশি দূরে নিয়ে যাওয়া সম্ভব হবে না তোমাকে।'

'জানালার কাছে একটা মাদুর বিছিয়ে দিলেই চলবে। আমরা দু'জন থাকব। হ্যারি আর আমি। ওদের মোকাবেলা করব।'

'আমি থাকতে পারব না, বাবা। আমাকে যেতেই হবে।'

বেদনা-বিশ্ময়ে সাদা হয়ে গেল বেন কারির চেহারা। বিমূঢ় দৃষ্টিতে চেয়ে রইল। 'বাছা, আমি তো ভাবতেও পারিনি...'

'তুমি বুঝতে পারছ না, বাবা। আমি জানি পেরিন কোথায় গেছে। ভি-বারে হানা দিতে গেছে। গবাদি পশু আর মেয়েগুলোর ওপর তার নজর!'

পাগলের মত উঠে দাঁড়াতে চেষ্টা করল বৃদ্ধ। ডাক্তার ধরে বসিয়ে দিল তাকে। সে মুখ খোলার আগেই সব খুলে বলল হ্যারি, তারপর যোগ করল, 'শটকট রাস্তাটা বাতলে দাও আমাকে। ভাগ্য সহায় হলে ওদের আগেই বাথানে পৌঁছে যাব আমি।'

আস্তে আস্তে স্বাভাবিক হয়ে এল বেন কারি। ধাতস্থ হলো, তার মাথা আবার কার্জ করতে শুরু করেছে। 'পারবে, তবে একটানা অনেকক্ষণ ঘোড়ার পিঠে থাকতে হবে। ইতিমধ্যেই অনেকটা পথ এগিয়ে আছে ওরা। কার্ব জানে, কোথায় গেলে তাজা ঘোড়া মিলবে। সময় নষ্ট করবে না ও।'

কাত হয়ে ওলো, হাত বাড়িয়ে সয়্যারের কাছ থেকে ব্র্যান্ডির বোতলটা নিল। 'জিনিসটা আমার কখনোই তেমন পছন্দ নয়, তবে এই মুহূর্তে...' বোতলে দীর্ঘ একটা চুমুক দিয়ে উঠে বসল। অতি দ্রুত অথচ ঠাণ্ডা মাথায় পথের হুঁশ বাতলে দিল। 'তুমি পারবে,' বলল সে, 'তবে ওই ট্রেইলটা ভীষণ সরু, বিপজ্জনক। প্রথম যে-বার যাই, সেবার একজন লোক আর দুটো ঘোড়া হারিয়েছিলাম আমরা।'

'নদী তীরে এক বুড়ো নাভাজোর দেখা পাবে। আমার অনেক দিনের বন্ধু। আমার কিছু ঘোড়া আছে তার কাছে। নদী পার হওয়ার পর তার কাছ থেকে একটা ঘোড়া নেবে। তোমার কথা ও জানে।'

হ্যারি উঠে দাঁড়াল, বাড়তি কিছু গোলাবারুদ নিল সঙ্গে। 'ওঁর দিকে খেয়াল রেখো, ডাক্তার।'

'ডেভ লেনকার এলে কী করবে?' প্রতিবাদ জানাল সয়্যার।

'আমি সামলাব,' বেনের চোখ জ্বলে উঠল। 'পা ভাঙতে পারে কিন্তু বন্দুক ধরার শক্তি আছে। চটী বেঁধে দাও আর একটা ক্র্যাচ-তা হলেই চলবে।'

দম নিল সে। 'রাস্তায় ওকে দেখামাত্র কুকুরের মত গুলি করে মারব আমি। তবে খারাপ কিছু ঘটলে, হ্যারি, তোমাকে বদলা নিতে হবে। দ্বিধা কোরো না। পেরিন কিংবা ডাক্তার, এদের একজনকে খতম করতে পারলেও পশ্চিমের মানুষদের জন্য সেটা মঙ্গলের হবে। কথাটা আমি অনেক বছর ধরে ভাবছি।

'তবে লেনকারের বেলায় একটা জিনিস মনে রেখো। যদি আমার আগেই তোমার সাথে দেখা হয়, ওর বাঁ হাতটার প্রতি খেয়াল রেখো।'

সিঁড়ি বেয়ে নেমে নিজের ঘরে গেল হ্যারি। তাক থেকে ওর পয়েন্ট ফোর ফোর উইনচেস্টার রাইফেলটা তুলে নিল। তারপর ঝটপট ঘোড়ার পিঠে জিন চাপাল। দরকার পড়লে বেন আর ডাক্তার ওই ঘরে কয়েক হস্তা টিকে থাকতে পারবে। ভয় একটাই, জানালাপথে কেউ ডিনামাইট ছুঁড়তে পারে। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব রেড ওয়ালে গিয়ে আবার ফিরে আসতে হবে তাকে।

একটা ধূপছাই মাস্টাং-য়ে চড়ে আস্তাবল থেকে বেরিয়ে এল হ্যারি। পন্ডেরোসা আর অ্যাসপেন ঝোপের ভেতর দিয়ে একটা বাঁকাচোরা ওপুট্রাইল ধরে এগিয়ে গেল। এই ট্রেইলে সে কখনও চলেনি, তবে এটা ওর চেনা, দৈবাৎ আবিষ্কার করেছিল একদিন। ঘোড়াটা ভাল, ঝোপ-ঝাড় আর খোলা প্রান্তর ধরে দ্রুত ছুটে চলল ওরা।

চলার পথেই মনে মনে কল্পনা করার চেষ্টা করল, ঠিক ওই মুহূর্তে পেরিন কোথায় থাকতে পারে। নিঃসন্দেহে গোপন ক্রসিংটার হদিস ও জানে না, ঘুরপথে যেতে হবে তাকে। তরতাজা ঘোড়া আর নির্ঘুম যাত্রাসত্ত্বেও প্রচুর সময় লাগবে। সে ওই দূরত্বের সিকি ভাগমাত্র অতিক্রম করবে, তবে সে-পথ দুর্গম, বন্ধুর। নদীটা কীভাবে পার হবে, হ্যারির মাথায় এল না। বেন তাকে শুধু এটুকুই জানিয়েছে যে একটা ক্রসিং আছে, ওখানে পৌঁছুলে সে নিজের চোখেই দেখতে পাবে।

'এর জন্য চাই মনোবল, বাবা! মনোবল! তবে মনে রেখো, আমি কম করে হলেও বারোবার পার হয়েছি, এবং আমার ওজন তোমার চেয়ে অনেক বেশি।'

এই এলাকাটা তার একদম অচেনা, নৈর্ঝত কোণে দুর্গম কলোরাডো ক্যানিয়নের দিকে যাচ্ছে সে। এই অঞ্চলে সে কখনও আসেনি। বেন কারি আর মুষ্টিমেয় ইন্ডিয়ান ছাড়া এই পথের খবর কেউ জানে না।

ট্রেইলটা দু'এক জায়গায় বনানীর ভেতর থেকে ফাঁকা প্রান্তরে-বেরিয়ে এসেছে, ছেঁড়াছেঁড়া ভয়াল ক্যানিয়নের রূপ দেখতে পাচ্ছে সে। দৈত্যের মত মাথার ওপর ঝুলছে পাথর-খণ্ড, যে-কোন মুহূর্তে গড়িয়ে পড়তে পারে।

তাকে দ্রুত ঘোড়া ছোটাতে হবে, একটানা। আসার সময় সঙ্গে খানিকটা জার্কি আনেনি বলে অনুশোচনা হচ্ছে ওর। বাথানে পৌঁছানোর আগ পর্যন্ত দানা

পড়বে না পেটে। তা ছাড়া, তখন হয়তো সময়ও থাকবে না হাতে।

একবার একটা ঢালের মাথায় রাশ টেনে ধরল, ঘোড়াটাকে বাতাসের সাথে পরিচিত হয়ে ওঠার সুযোগ দিল। দূরে বিশাল ক্যানিয়নের গায়ে ফাটল, ভয়ঙ্কর একখানা হাঁ। বালুর ওপর থুতু ফেলল ও, হিমস্রোত বয়ে গেল শিরদাঁড়া বেয়ে। কারও সাহায্য ছাড়া ওই হাঁ পার হওয়া সম্ভব, এটা একজন লোক আশা করে কীভাবে?

এই যাত্রার শেষ মাথায় থাকবে কার্ব পেরিন।

পেরিনকে সে গুলি ছুঁড়তে দেখেছে। দারুণ চটপটে, অব্যর্থ লক্ষ্য।

গাছের শিকড়ে, অথবা রোদ যায় না এমন সব ঢালে, এখনও তুমার জমে আছে। ঘোড়া থেকে নামল ও। ঝরনার নির্মল জল পান করার সুযোগ দিল ওটাকে। একটা খাড়া ঢাল বেয়ে বরনাটা একটা ঝোপের ভেতর হারিয়ে গেছে, তারপর খানিকদূর গিয়ে আবার যেখানে বেরিয়ে এসেছে, সেখানে একটা গর্ত। কোন বীবরের কীর্তি হবে। ছোটখাটো পুকুর বলা চলে ওটাকে। আজলাভের পানি খেলো হ্যারি। তারপর নির্জন প্রান্তরে কান পাতল। লক্ষ করল একটা বীবর সান্তরে এগিয়ে আসছে, ওটার মুখে একটা গাছের ডাল। ডালটা ও, হ্যারি জানে, পুকুরের তলায় পুঁতে রাখবে। শীতকালে যখন বরফ পড়বে, পুকুর যাবে বুজে-ওই ডালের ছিদ্রপথেই জীবন-ধারণের জন্য প্রয়োজনীয় অক্সিজেন গ্রহণ করবে ও।

মাস্টাংয়ের কাছে ফিরে গেল সে। রেকাবে এক পা রেখে জিনের ওপর চড়ল। 'চল, বেটা, অনেক দূর যেতে হবে আমাদের।'

পাইন পাতায় ছাওয়া একটা সংকীর্ণ পথ ধরে হেলে-দুলে নামতে শুরু করল ঘোড়াটা, একটুবাদে পণ্ডেরোসা ঝোপের ভেতর থেকে ভুরুর মত একটা ট্রেইলের ওপর এসে পড়ল। ছুঁচোল একটা চুড়োর মাথায় ঝুলছে ওটা। এক চুল এদিক-ওদিক হলেই খাড়া হাজার ফুট নীচে পড়তে হবে। মাস্টাংটা পাহাড়ে চড়ায় অভ্যস্ত, আবার জঙ্গলে না ঢোকা অবধি অতি সাবধানে পা ফেলে এগুলো।

ট্রেইলের ওপর ছায়া এসে পড়েছে, চকিতে একটা সাদা শিলাখণ্ড চোখে পড়ল ওর। পাথরটা পথের নিশানা, বেন জানিয়েছে। বায়ে তীক্ষ্ণ বাঁক ঘুরল হ্যারি, পাথুরে ঢাল, ঘোড়াটা স্রেফ পাথরের ওপর পা রাখল, তারপর পিছলে নেমে গেল নীচে। সামনে বিশাল সমতল ভূমি।

একটা দাঁড়কাক উড়ে গেল, অদূরেই একটা গাছের মাথায় বসল। ওটা জানে, যেখানে মানুষ সেখানে খাবার মেলে। ওর মাথার ওপর চক্কর দিতে লাগল কাকটা, সম্ভবত সঙ্গ চাইছে। খাবারের লোভও আছে সেই সাথে। 'হাতে সময় নেই রে,' বলল সে। 'বেলা ডোবার আগেই অনেকটা পথ পাড়ি দিতে হবে আমায়।'

ক্লান্তি বোধ করছে সে। টের পাচ্ছে, ঘোড়াটার গতি মন্থর হয়ে আসছে। তবে এখন আর কিছু আসে যায় না তাতে।

সে কি পারবে ঠিক সময়ে পৌঁছতে? যদি না পারে? কথাটা ভাবতেই শরীর ঠাণ্ডা হয়ে এল, এ-রকম অনুভূতি আগে কখনও হয়নি। তবে তাকে কী করতে

হবে, সে ভালই জানে। ওদের প্রতিটা লোককে শেষ করতে হবে। এ-জন্য যদি সারা দেশ চষতে হয়, তাও সই। ওদেরকে সে খুঁজে বের করবেই।

পাথরের ওপর দিয়ে ঘোড়া ছোটাল হ্যারি। বহু বছর ধরে ঢাল বেয়ে গড়িয়ে পাথরগুলো এখানে এসে জমা হয়েছে। ট্রেইলটা এখানে ভাঙাচোরা, প্রায়ই হারিয়ে যাচ্ছে। সামনে আরও কী অপেক্ষা করছে কে জানে?

এর আগে কখনও গানফাইটে অংশ নেয়নি ও। ফার্নান্দেজকে গুলি করার ব্যাপারটা কোঁকের মাথায় ঘটেছে। তবে, সে জানে; ওই ক্ষেত্রে ভাগ্য তার সহায় হয়েছিল। বন্দুকের লড়াইতে জ্যান্ত মানুষকে লক্ষ্য করে গুলি ছুঁড়তে হবে। পাল্টা গুলি খাওয়ার আশঙ্কাও আছে সেখানে। গুলি খেলে তার কী প্রতিক্রিয়া হবে? এ-বিষয়ে এখনি মানসিক প্রস্তুতি নেয়া দরকার। ব্যাপারটাকে সে স্বাভাবিক ভাবেই গ্রহণ করবে, এবং পাল্টা আঘাত হানবে।

এমনটা করেছে এ-রকম বহুলোকের কথা সে জানে। একাধিক গুলি খেয়েছে এমন লোকের কথাও শুনেছে। নর্থ-ফিল্ডের রক বেনন এগারোটা গুলির চোট নিয়েও পালাতে সমর্থ হয়, পরে অবশ্যি জেলে যায় সে। তার ভাইদের প্রত্যেকেই অনেকবার জখম হয়েছে। তারা যদি পেরে থাকে তবে সে-ও পারবে।

পেরিন আর ডাক্তার, এই দুটোই ধেড়ে শয়তান, ওদেরকে খুন করতেই হবে। ওরা শেষ হলে অন্যেরা হয়তো পিঠটান দেবে। যাই হোক, ওদেরকে রেহাই দেবে না সে। এটা তার করতেই হবে।

হঠাৎ করে বন শেষ হয়ে গেল, ওর চোখের সামনে ভেসে উঠল অসীম নীলাকাশ। অদূরেই ক্যানিয়ন। মাস্টাংয়ের রাশ টেনে ধরল ও। বিস্ময়ে হাঁ হয়ে গেল মুখ। এমন কী ক্লান্ত ঘোড়াটাও তার কান খাড়া করেছে। হালকা কুয়াশা জমেছে, চারপাশে লালনীলের কুহকী হাতছানি। দূরের পাথর খণ্ডগুলো শেষ-সূর্যের সোনালি আভায়ে মোড়া।

মাস্টাংটা একেবারেই নেতিয়ে পড়েছে। ঘোড়ার মুখ ঘুরিয়ে পাহাড়ের গা কেটে বেরুনো আরেকটা দুরারোহ ট্রেইলে উঠে এল হ্যারি। নীচে অধৈর্য খাদ। শ্রুত পায়ে এগিয়ে চলল ঘোড়াটা, বোধহয় আঁচ করতে পেরেছে আজই তার জীবনের শেষ দিন।

ঝিমুনি এসে গিয়েছিল, হঠাৎ হ্যারি কার্টারের মনে হলো ঘোড়াটা থেমে গিয়েছে। চারদিকে কেমন একটা ভ্যাপসা গন্ধ, সুরু নালা বেয়ে দ্রুত জল গড়ানোর শব্দ আসছে। সামনেই একটা কুঁড়ে, জানালার ফাঁক দিয়ে আলো এসে পড়েছে বাইরে।

‘কেউ আছ ঘরে?’ ডাকল ও। জিন থেকে নামছে এমন সময়ে দরজাটা খুলে গেল।

‘কে?’

‘আমি হ্যারি কার্টার!’ কুঁড়েটার দিকে এগিয়ে গেল ও, হাতে রাইফেল। ‘বেন কারির লোক।’

লোকটা ভেতরে ঢুকে গেল। নাভাজো। বয়েস প্রচুর, তবে শাবিত চোখ।

এক পলকে হ্যারির অন্তস্তল পর্যন্ত দেখে নিল।

‘একটা ঘোড়া লাগবে। আজ রাতেই নদী পার হব আমি।’

বুড়ো ইন্ডিয়ানটা হাসল। ‘অসম্ভব। আজ রাতে পার হতে পারবে না।’

‘চাঁদ উঠলে ওপারে যাব আমি।’

কাঁধ ঝাঁকাল নাভাজো। ‘খেয়ে নাও। ওটাই তোমার সবচেয়ে আগে দরকার।’

‘ঘোড়া?’

আবার হাসি। ‘ওপারে গেলেই মিলবে। আমার ভাই আছে। সেরা জাতের ঘোড়া আছে ওর কাছে।’

‘খেয়ে,’ বলল সে, ‘বিশ্রাম নাও। চাঁদ উঠলে ডাকব।’ একটু থেমে বলল, ‘রাতে পার হওয়ার চেষ্টা এ-পর্যন্ত কেউ করেনি। আমার কাছে অসম্ভব বলে মনে হয়।’

কান পেতে স্রোতের শব্দ শুনল হ্যারি। কোন মানুষ বা ঘোড়ার পক্ষে সাতরানো সম্ভব নয় ওখানে। নৌকো চালানোও অসম্ভব। কথাটা বলতেই বুড়োর ফোকলা গালে ভাঁজ পড়ল আবার। ‘যদি একান্তই যাও,’ বলল সে, ‘কাছি ধরে ঝুলে যেতে হবে।’

‘কাছি?’

‘এখন ঘুমোও। তোমার ঘুম দরকার। সময় হলেই দেখতে পাবে।’

কাছি? এপাশ-ওপাশ মাথা নাড়ল হ্যারি। অসম্ভব। হাস্যকর। নিশ্চয়ই ঠাট্টা করছে বুড়ো।

বাংকের ওপর চিৎ হয়ে শুলো, আধো অন্ধকার ছাতের দিকে চেয়ে রইল। ছাতে নেচে বেড়ানো ছায়াগুলোকে মনে হচ্ছে পেরিন আর তার দলবল। তাড়া করে আসছে ওর দিকে। হঠাৎ করে ছায়াগুলো প্রজাপতির আকার ধারণ করল, উড়ছে। ওধারে ধেয়ে চলা নদীর শব্দ ভরিয়ে তুলছে রাতের নিঃসীম শূন্যতাকে।

ঘুমিয়ে পড়ল হ্যারি...

বারো

রান্নাঘরের জানালার ফাঁক দিয়ে ট্রেন স্টেশনের দিকে তাকাল টমাস এডি। ওর বাড়ির পঞ্চাশ গজ দূর দিয়ে রেললাইন চলে গেছে। ফলে বাসায় বসেই লোকজনকে ট্রেনে যাতায়াত করতে দেখে সে। তাদের সংখ্যা অবশ্যি তেমন বেশি নয়। পাঁচের চার দিনই স্রেফ ‘কু’ বাজিয়ে চলে যায় ট্রেন, দাঁড়ায় না।

ট্রেনের যাওয়া-আসা দেখতে ওদের স্বামী-স্ত্রী, দু’জনারই খুব ভাল লাগে। এইমাত্র কফি নিয়ে এসেছে বেস। সেই পুরোনো প্রসঙ্গ আবার তুলছে ও। ‘ব্যাপারটা একটু ভেবে দ্যাখো, টমাস। ছেলে-পুলে মানুষ করার মত জায়গা

এটা নয়।’

‘আমি পশ্চিমেই বড় হয়েছি,’ মৃদু সুরে জবাব দিল সে।

‘সে-কথা আলাদা। এই জীবন তোমার পছন্দ, কিন্তু ববকে আমি অন্যভাবে মানুষ করতে চাই। পুকের কোন স্কুলে দিতে চাই। উচ্চশিক্ষিত করতে চাই। আমার ইচ্ছে নয়, বড় হয়ে কোমরে পিস্তল খুলিয়ে ঘুরে বেড়াক ও, কিংবা বাথানের ব্যবসায় নামুক।’

আবার স্টেশনের দিকে তাকাল টমাস। বেসি কী চায় সে ভালই বোঝে। কিন্তু পুবে গিয়ে কী করবে সে? ও একদম বুঝতে চায় না। জীবনে সে যেখানেই গেছে আসর জাঁকিয়ে বসেছে, এবং এটা সম্ভব হয়েছে পশ্চিম সম্পর্কে তার ভাল ধারণা আছে বলে। পুবে গিয়ে বড়জোর একটা দিনমজুরের কাজ জোটাতে পারবে। কামারের কাজ সে ভালই জানে, কিন্তু যা করলে ওই দেশে নাম কামাতে পারবে, তা জানে না।

ঠিক এই মুহূর্তে দুটো দায়িত্ব পালন করছে সে। দুটোর জন্যেই পয়সা পাচ্ছে। একাধারে সে কাউন্টি শেরিফ এবং টাউন মার্শাল। এবং জীবনে এই প্রথম টাকা জমাতে পারছে। আর দু’বছর চাকরি করতে পারলেই গরু কিনতে পারবে সে। তখন আবার র‍্যাঙ্কিংয়ে ফিরে যাবে। তার খাটালে এখন যাটটা গরু আর ত্রিশটা ঘোড়া রয়েছে। ওর ভেতর পাঁচটা ঘোড়া আবার অন্যের, তার আস্তাবলে আছে মাত্র।

‘অনেক ভেবেছি, বেস। ওখানে গিয়ে দিন চলবে কী করে? আমার জানাশোনার গণ্ডি বলতে গবাদি পশু আর গোচারণ ভূমি, কোথায় গেলে মিলবে জানি। প্রথম জীবনে মোষ শিকার করতাম, পরে গরুর মার্কা, এবং তারপর বাধান-ব্যবসা। খরা আর কঠোর ব্যাংকিং নীতিমালার ফলে লোকসান খেয়েছি। এখনকার মানুষগুলো ভাল, আমার দুঃসময়ে টাউন মার্শালের চাকরিটা দিয়েছে আমাকে।’

‘ব্যবস্থা একটা হবেই, টমাস। তুমি পারবে, আমি জানি। আমি চাই না বব এখানে বড় হোক। সারাদিন ম্যাককয়দের ওই এতিম ছোড়াটার সাথে পাড়া বেড়ায় ও। ঘোড়া আর বন্দুক, দিন-রাত কেবল এই চিন্তা ওর মাথায় ঘুরপাক খায়।’

‘বিলি ভাল ছেলে,’ বলল টমাস। ‘গেল বছর ওর বাপ মারা যাওয়ার পর থেকেই ছেলেটা একটু সঙ্গতর হয়ে পড়েছে। তবে বেশ গোছানো স্বভাবের। ওর কেবিনটা তোমার একবার দেখা উচিত। একদম ঝকঝকে-তকতকে। খাটিয়ে ছেলে, জীবনে উন্নতি করবে।’

‘কীসে?’

নড়েচড়ে বসল সে, অস্বস্তি বোধ করছে। হুগ্গায় অন্তত একবার এই প্যাচাল হয়, বেস স্বপ্নের রাজ্যে বাস করছে। যেখানে থেকে এসেছে, সেখানে ফিরে যেতে চায় ও-ওর বাপ-ভাইয়ের মত করে মানুষ করতে চায় ববকে। কিন্তু একটা জিনিস কিছুতেই বুঝতে চাইছে না, পুবে গেলে ওরা গরীব হয়ে যাবে। পশ্চিমে গরীব হওয়াটাকে লোকে খারাপ চোখে দেখে না। কিন্তু পুবে, সেখানে

করুণার চোখে তাকাবে সবাই। বড় কোন উৎসব-অনুষ্ঠানে নেমন্তন্ন করবে না। অন্তত তাই শুনেছে সে। পূবে এর আগে সে দু'বার গেছে, মাত্র দিন দুয়েক ছিল।

প্রথম বার, বিয়ের পরপরই, বেসকে নিয়ে গিয়েছিল। তখন এক নজরে যা বুঝেছে, পশ্চিমে তার যা রোজগার পূবের কোন শহরে ওই টাকায় নুন আনতে পাত্তা ফুরোবে। বাথানটা আবার চালু করতে পারলেই... পারবে, সে নিশ্চিত। মাঠের অবস্থা এখন ভাল। প্রচুর ঘাস-পানি। ওর এখন কেবল চাই তিন থেকে পাঁচশো গরু, ব্যস! এই আবহাওয়া থাকলে অল্পদিনেই লক্ষপতি হয়ে যাবে সে।

আর পূবে? গরীব আত্মীয় মাত্র। ওই পর্যন্তই।

‘একটু ধৈর্য ধরো, বেস। আবার বাথান চালু করব আমি। হাতে কিছু টাকা জমলেই হায়াত জনসনের গরুগুলো কিনব ভাবছি। সম্ভবত...’

‘টমাস? মিস্টার ফ্যারেল এসেছিলেন কেন? কোন গোলমাল?’

কফিতে চুমুক দিল সে। ‘না, তেমন কিছু নয়। ওই একটা ব্যাপারে আমাদের দু'জনার আগ্রহই সমান, তাই। হয়তো বোকামি হচ্ছে আমাদের। আচ্ছা তোমার ওই চিঠিগুলোর কথা মনে আছে, বেস, ওই যে যেগুলো আমি ফোর্ট অর্থ আর এল-পাসোতে লিখেছিলাম?’

‘চার্লিও আমার সাথে একমত। ওর বিশ্বাস, ওই ডাকাতিগুলোর অধিকাংশই কোন বড় একটা দলের কীর্তি। আর ওদের পেছনে আছে একজন নেতা।’

‘এতগুলো দস্যুর নেতা যে, না জানি সে কেমন লোক?’

হ্যাঁ, ঠিক। একেবারে বরাবরের মতই, জায়গামত হাত দিয়েছে। ওই রকম বিশাল যার নেটওঅর্ক, সে নিশ্চয়ই আর দশটা মানুষের মত হবে না—একটা না একটা বিশেষত্ব থাকবেই। আর সেটা চোখও পড়বে, এবং মনে থাকবে।

চার্লি আর সে মিলে এ-পর্যন্ত আঠারোটা ডাকাতিতে একসুতোয় গাঁথতে পেরেছে। প্রতিটাই সম্পন্ন হয়েছে অত্যন্ত দ্রুত আর সুচারু ভাবে—গোলাগুলি হয়নি, ধরাও পড়েনি কেউ। পেছনে কোন ট্রেইলও ফেলে যায়নি তারা। এসেছে, লুট করেছে, হাওয়ায় মিলিয়ে গেছে।

দস্যুরা সাধারণত ঘটনাস্থল সরজমিন আগে দেখে নেয় একবার। কিন্তু এ-সব ক্ষেত্রে একজন অচেনা লোককেও সন্দেহজনকভাবে ঘোরাফেরা করতে দেখা যায়নি।

তবে দিন কয়েক আগে তার মাথায় একটা বুদ্ধি এসেছে। এ-বিষয়ে চার্লিকে চিঠি দিয়েছে সে। এই দলের নেতা যে-ই হোক না কেন, সে নিশ্চয়ই তার লোকদের লুকিয়ে রেখেছে কোথাও। তাই, জেলে নেই আবার আশপাশেও দেখা যাচ্ছে না—এমন আউট-লদের সম্পর্কে খোঁজ-খবর করলে কেমন হয়?

অভিজ্ঞতা থেকে সে জেনেছে, একটানা অনেক দিন এরা লুকিয়ে থাকতে পারে না। আরেকটা ডাকাতি কিংবা কোন সেলুনে ঝগড়া-বিবাদে জড়িয়ে পড়ে। ওদের অধিকাংশই মানুষের মনোযোগ কাড়তে চায়, ফলে বেশি দিন গা ঢাকা দিয়ে থাকতে পারে না।

‘কেমন লোক’ বেসের বলা কথাটাই আবার মনে পড়ল ওর। ঝট করে উঠে

দাঁড়াল সে। ক্ষীণ, তবু একটা আলোর রেখা যেন দেখতে পাচ্ছে সে।

জো ফ্যারেলের হত্যারহস্য কিনারার সময়েও বেসের একটা প্রশ্নেই সব কিছু মীমাংসা হয়ে গিয়েছিল। এবারেও যেন তা-ই ঘটতে চলেছে।

অন্তত সেটাই টমাসের ধারণা। সেই দশাসই চেহারার লোকটা, যে তার কাছে ঘোড়া রেখে গেছে, হতে পারে। সেই, এমনটা নিশ্চয়ই ধরে নিচ্ছে না, তবে কেউ পারলে একমাত্র তার পক্ষেই সম্ভব।

পকেটঘড়িটা বের করে দেখল টমাস। সবে নটা। মেরি অ্যান এখনও জেগে থাকারই কথা। বেস পছন্দ করবে না ব্যাপারটা, তবু ওকে জানিয়ে যাবে সে। মেরি অ্যানের সাথে দেখা করা একান্ত দরকার। ওর হাতে অনেক মেয়ে আছে, আউট-লরা আসে মাঝেমাঝে। তাই ওদের বেশির ভাগই মেরি অ্যানের পরিচিত।

দাঁড়ানো অবস্থাতেই কাপটা খালি করল সে। টুপিটা তুলে নিল হাতে। 'বেস, আমি মেরি অ্যানের কাছে যাচ্ছি।'

বেসের ঙ্গ কুঁচকে উঠল। 'যাওয়াটা খুব জরুরি?'

'বেস, তোমার প্রশ্নটা আমাকে পথের সন্ধান দিয়েছে। তোমার ধারণাই ঠিক। মনে আছে, তোমার প্রশ্ন থেকে হত্যারহস্যের জট কীভাবে খুলে গিয়েছিল? সম্ভবত এবারেও তা-ই হতে যাচ্ছে।'

'সে-জন্যে মেরি অ্যানকে কী দরকার?'

'ওর ওখানে আউট-লদের যাওয়া-আসা আছে। ফলে সব খবরই ও পায়।'

'বলবে তোমাকে?'

'বেস, এই শহরে ও থাকে। আর ওই ব্যাংকে ওর টাকাও আছে।'

টমাস গিয়ে দেখল রান্নাঘরে বসে কফি পান করছে মেরি অ্যান। 'এসো, বলল সে। 'তবে আস্তে কথা বলো, মেয়েরা ঘুমুচ্ছে। কাল রাত জেগেছে। খন্দের ছিল।'

মেরি অ্যানের কাছ থেকে এক কাপ কফি নিল টমাস। বয়েস বেড়েছে, কিন্তু বাঁধুনি একটুও ঢিলে হয়নি। মাঝে-মাঝে রাত্তায় যখন বেরোয় মদির ভাব ফুটে থাকে ওর চেহারায়। ভীষণ চালাক, বুদ্ধিমতী। চুপ করে সব কথা শুনল।

'আমি যা জানতে চাই,' টমাস বলল, 'তা হচ্ছে ওদের সর্দারের নাম কী, অথবা এমন কোন আউট-লর নাম যাকে দেখা যাচ্ছে না ইদানীং।'

দম নিয়ে বলল, 'খুব সম্ভব বছর পাঁচেক আগে সর্দার লোকটা এই শহরে এসেছিল।'

কোলের কাপড় ওছিয়ে বসল মেরি অ্যান। 'কেন? কী ব্যাপার?'

'এখানকার ব্যাংকটার ওপর ওদের নজর পড়েছে বোধহয়। চার্লি ফ্যারেলেরও তাই ধারণা।'

'বলো কী! ওই ব্যাংকে তো আমারও টাকা আছে। সারা জীবনের কামাই!'

টমাস অপেক্ষা করতে লাগল, ওকে ভাবার সুযোগ দিচ্ছে। এখানে যে-সব মেয়েছেলে থাকে তারা প্রায় সব আউট-লকেই চেনে। সঙ্গ দিতে বাইরে যায় ওদের সাথে। ভীষণ আনন্দঘন মুহূর্তে বেফাঁস দু'একটা কথা জেনেও ফেলে

অনেক সময় ।

‘রিগার মলিনা,’ বলল মেরি অ্যান ।

‘নাম শুনিনি ।’

‘সর্দার নয়, মাথায় খিলু কম, তবে লম্বা-চওড়া । শক্ত-সমর্থ, পিস্তলবাজ ।’

‘আর...?’

‘গেল দু’তিন বছর ধরে লাপাত্তা । অথচ ওর বেলায় এমনটা ভাবাই যায় না । এই তো সেদিন নতুন এক মেয়ের সাথে ওর গল্প করছিল এখানকার কয়েকজন । মলিনাকে যে একবার পাবে, ভুলবে না আর ।’

‘ইয়া লম্বা, হাত-পা একেকটা যেন গাছের গুঁড়ি । পাতলা চুল । চওড়া চোয়াল । চোখজোড়া কুতকুতে । চলাফেরার ভঙ্গি বেড়ালের মত; নিঃশব্দ অথচ ক্ষিপ্ত । আচার-আচরণে একটা কর্তৃত্বের ভাব আছে । মুখে বড়াই করে না, তার দরকারও পড়ে না আসলে । এমন একজন মানুষ যে চোখে না পড়ে যাবে না । তাই আশপাশে কোথাও এলে ঠিকই জানতে পেতাম ।’

‘আমার কপালটাই খারাপ, ওর সম্পর্কে কিছুই জানি না ।’

‘তাতে কী, আমি জানি । ভার্নাল অঞ্চলের লোক । উতা পাহাড়ের কাছে । মন্টানা, ডাকোটা আর ইডাহোতে চাকরি করেছে । একবার এক লোককে খুন করে । অরিগনের ক্যাটলো ড্যালিতে । গরু নিয়ে ঝগড়া । স্থানীয় লোকেরা পিছু নিলে আরও দু’জনকে শেষ করে । শেরিফ আহত হয় ওর গুলিতে । শেরিফকে নিজের ঘোড়ায় চাপিয়ে এক ডাক্তারের কাছে পৌঁছে দেয় ।’

‘মজার ব্যাপার হচ্ছে এ-জন্যে ওকে নিজের গন্তব্য থেকে দশমাইল দূরে সরে যেতে হয়েছিল । অথচ ইচ্ছে করলেই শেরিফকেও মেরে ফেলতে পারত ।’

উঠে দাঁড়াল ও । ‘দাঁড়াও...ডাফেনকে ডেকে আনি । ওর কথাই বলছিলাম তখন । নতুন এসেছে ।’

ছিপাছিপে । সোনালি চুল । প্রথমে বুকপকেটে সাঁটা ব্যাজ, তারপর টমাসের মুখের দিকে তাকাল ডাফেন । ‘এহুহে । ওটা আবার কেন?’ ব্যাজটা দেখাল ও ।

‘মশকরা বাদ দাও, ডাফ,’ বলল মেরি অ্যান । ‘ও বিবাহিত এবং সুখী ।’

‘সব ভাল লোকই তাই ।’ চেয়ারে বসে সিগারেট ধরাল মেয়েটা । ‘রিগার সম্পর্কে জানতে চাইছ, না? লোকটা ডাকাত, কিন্তু ভাল ।’

‘এখন সে কোথায়?’

সিগারেটে টান দিল ও । ‘মেরি অ্যান, এই লোক কি সত্যিই তোমার বন্ধু?’

‘হ্যাঁ । ওর কথা শুনে তোমারও তাই হবে ।’

একটুক্ষণ চুপ করে রইল মেয়েটা । ছাই ঝাড়ল সিগারেটের, তারপর বলল, ‘ঠিক আমার কেউ নয়, তবে আমার এক বান্ধবীর মনের লোক । নিয়মিত দেখা-সাক্ষাৎ হত ওদের । তারপর একদিন বিদায় নেয়ার সময় বলে যায়, কিছুদিনের মধ্যে বাইরে যাচ্ছে সে । আমার বান্ধবী যেন তার জন্যে অপেক্ষা করে । যে যখন ফিরবে, প্রচুর টাকা থাকবে সঙ্গে ।’

‘এ-ধরনের কথাবার্তা আমরা হরহামেশাই শুনি, তবে মলিনার কাছ থেকে নয় । বড়াই করা ওর স্বভাব নয় ।’

‘ও জানায় যে ও একটা বড় দলে যোগ দিচ্ছে। এতে প্রচুর লাভ হবে ওর। এর পরপরই ও চলে যায়। কিছুদিন পর আমার আরেক বান্ধবীর কাছে শুনলাম, সে নাকি পিয়োশ শহরের কোন এক অখ্যাত রেস্টোরাঁয় মলিনাকে দেখেছে। ওর সঙ্গে হ্যাংলা মত আরেকজন ছিল। খাচ্ছিল ওরা।’

একটু থেমে ডাফেন বলল, ‘ঈশ্বর করুন, ওর যেন অমঙ্গল না হয়। এমনিতে লোক ও খারাপ না। দুনিয়াতে কোন শত্রু নেই—এক পেরিন ছাড়া!’

‘ওই শয়তানটা মরলে খুশি হব আমি,’ বলল মেরি অ্যান। ‘পেরিন আমার এক মেয়েকে একবার বেধড়ক পিটিয়েছিল। আমি তখন গোল্ডফিল্ডে থাকতাম। ওকে মেরে নাকি দারুণ মজা পেয়েছিল বদমাশটা।’

এক মিনিট কী যেন ভাবল ও, তারপর বলল, ‘তাই তো! পেরিনেরও তো দেখা নেই অনেক কাল!’

হুটচিতে অফিসে ফিরে গেল টমাস। মনে হচ্ছে, একটা সূত্রের খোঁজ পেয়েছে।

ওর সহকারী কিম বেকা এক সময়ে পাকা ঘোড়াচোর ছিল। আউল-হুট ট্রেইলের সবাইকে চেনে সে।

ঘণ্টা খানেক পর আরও তথ্য পেল ও। মলিনা আর পেরিন, দু’জনকেই চেনে কিম বেকা। মলিনাকে পছন্দ করে, পেরিনকে করে না। সম্প্রতি দু’জনাই লাপাত্তা। কলিও তাই, ডেডউড শহরের আউট-ল সে। ধীরে ধীরে বেকা আরও কয়েকজনের নাম করল যাদেরকে ইদানীং দেখা যাচ্ছে না।

সাপার খেতে খেতে টমাসের সেই দৈত্যাকার লোকটার কথা মনে পড়ল, যে তার কাছে ঘোড়া রেখে গিয়েছে। মেরি অ্যানকে ওই লোকটার ব্যাপারে জিজ্ঞেস করা উচিত ছিল তার। চকিতে আরও একটা কথা মনে পড়ল ওর, মেরি অ্যানকে যখন সে বলছিল যে বছর কয়েক আগে লোকটা এই শহরে এসেছিল, তখন ওর মুখের রং বদলে গিয়েছিল। পরনের কিমনোটো আঁটসাঁট করে ওছাতে ব্যস্ত হয়ে পড়েছিল সে। মেরি অ্যানকে, কিছুটা হলেও, সে চেনে। ওর মাথায় যখন কোন আইডিয়া আসে কিংবা কোন সিদ্ধান্ত নেয়, তখনই সে ওরকম করে।

লোকটাকে কি চেনে মেরি অ্যান?

চার্লি এখন থাকলে ভাল হত, ভাবল ও। চিঠি পৌঁছুতে অনেক দেরি...

আরে এত চিন্তা কীসের? টেলিগ্রাফই তো আছে! টেলিগ্রাফ ব্যবহারের কথাটা ওর মনে থাকে না কেন? এখানে রেলরাস্তা বসানোর পর থেকেই টেলিগ্রাফ চালু হয়েছে।

স্টেশনে গিয়ে তার পাঠাল ও।

রিগার মলিনা-কার্ব পেরিন-কলি। বিশাল-দেহী, মাঝবয়েসী। ছ’ফুট তিন ইঞ্চি, দুশো চল্লিশ। দৃঢ় চোয়াল, বিশাল হাত। ডান কানের লতির নীচে কাটা দাগ।

সেই রাতেই আগুনের পাশে বসে শান্ত সুরে টমাস এডি বলল, ‘বেস, যদি একান্তই চাও তুমি, ঠিক আছে, আমরা যাব পুবে।’

সেলাই থামিয়ে কোলের ওপর হাত নামাল বেস। 'আমি রাজি হচ্ছিলাম না, কারণ নিজের ভুবন ছেড়ে কোথাও যেতে চাইছিলাম না। কেবল তোমার প্রতিরেই যাব।' একটু ইতস্তত করে বলল, 'আর যেতে না চাওয়ার কারণ, আমি চাইনি তুমি আমার ব্যর্থতা দেখো।'

'একবার ব্যর্থ হয়েছি সেই ঢের।' হাত নেড়ে চারপাশ দেখাল সে। 'এরা আমাকে ভালবাসে। সম্ভবত মার্শালের দায়িত্ব ভালই পালন করছিলাম তাই আমাকে শেরিফও বানিয়েছে। বাথানে লোকসান খেয়েছি স্রেফ আবহাওয়ার জন্যে। কিন্তু পুবে গিয়ে কী করব বুঝতে পারছি না। সেখানে কেউ আমাকে চেনে না, ওদের প্রয়োজনে আসে এমন কোন কাজও জানি না।

'তবে আসল কথা, তোমাকে হাসি-খুশি দেখতে চাই আমি। তাই হবে, এখানকার মেয়াদ শেষ হয়ে গেলে যাব।'

'টমাস, আমি... আমি ঠিক বুঝতে পারছি না কী বলব। আমি ফিরে যেতে চাই। তুমি বুঝবে না, এই সব খুনোখুনিকে কতটা ঘৃণা করি আমি...'

'সে তো যে-কোন জায়গায় হতে পারে।' এক পা তুলে বুট খসাল ও। 'তবে চার্লির সাথে যে-কাজে হাত দিয়েছি, সেটা শেষ করতে হবে আগে।'

দ্বিতীয় পাটি বুটটা খুলে উঠে দাঁড়াল টমাস। 'শুভে যাচ্ছি, বেস। বড় ক্লান্ত। ববের সাথে আলাপ করো তুমি। তোমাদের মতই আমার মত।'

শোবার ঘরে গিয়ে বুটজোড়া একপাশে রেখে দিল সে। তারপর গানবেল্টটা খুলে শিয়রের কাছে যে-চেয়ারটা পাতা ছিল, তার পেছনে ঝুলিয়ে রাখল। গায়ের কোর্তা খুলে বিছানায় বসল।

ভীষণ বোকামি করতে যাচ্ছে সে। পুবে গিয়ে করবেটা কী?

বেস বড় শহরে থাকতে চায়। ওর বাবা সেখানে প্রচুর টাকা করেছে। সে-সব কথাই সর্বদা ভাবে ও। কিন্তু তার পক্ষে সম্ভব হবে না সেটা। ওখানকার লোকদের সাথে পাল্লা দেয়ার মত বিদ্যে তার নেই। সে...

দরজায় কড়া নাড়ার শব্দ হতে উঠে গানবেল্টের দিকে হাত বাড়াল সে। শুনতে পেল বেস কথা বলছে কারও সাথে, তারপর বন্ধ হয়ে গেল দরজাটা।

হাতে একটা চিরকুট নিয়ে ঘরে ঢুকল বেস। 'টেলিগ্রাফার। জরুরি বার্তা মনে করে বাসায় ফেরার পথে দিয়ে গেল এটা।'

চার্লি ফ্যারেলের তার। ছোট্ট দুটো শব্দ লেখা: বেন করি।

তেরো

নামটা তার পরিচিত।

জীর্ণ-প্রায় অফিস-ডেস্কটার সামনে বসে আছে টমাস এডি, এমন সময়ে কিম বেকা ঢুকল। টমাস তার নবীন সহকারীর দিকে তাকাল। টমাসের সহকারী হওয়ার আগে এই এলাকার সবচেয়ে ওস্তাদ ঘোড়াচোর ছিল বেকা। অপরাধ

জগতে যাদের বিচরণ, তাদের সবাইকেই চেনে সে।

“কিম? বেন কারি সম্পর্কে কী জানো তুমি?”

“ওকে ঘাঁটিও না।”

ইতস্তত ছড়ানো কাগজপত্র ডেস্কের একপাশে সরিয়ে রাখল টমাস। সম্ভবত তার কয়েকটা ঘোড়া আছে আমার কাছে। আমার বোঝার ভুল না হয়ে থাকলে বেশ কিছুদিন আগে আমার বাথানে ঘোড়াগুলো রেখে গেছে সে।

‘তার সুবিধা মত ঠিকই নিয়ে যাবে। ওকে ঘাঁটিও না, চীফ। ভয়ঙ্কর লোক।’

‘বিপদের সময়ে ওই ঘোড়াগুলোই তার দরকার হবে। ওকে আমরা ধরতে চাই, কিম।’

নিজের কৃষ্ণকালো চুলের ভেতর আঙুল চালাল বেকা। ‘ঘোড়াগুলো যদি থেকে থাকে, কোন উদ্দেশ্য আছে তার পেছনে। বেন কারি ইঁশিয়ার লোক, ভুল করে না বড় একটা।’

‘আমার ধারণা এখানকার ব্যাংকটার ওপর তার নজর পড়েছে,’ মৃদু স্বরে বলল টমাস।

‘সে নিজে আসবে না। আমার কথা শোনো, ওর কাজ ওকে করতে দাও। মারা পড়ার জন্যে বেতন নাও না তুমি।’

‘একটা দায়িত্ব পালনের জন্যে নিই, কিম। তুমিও।’

‘হ্যাঁ, জানি।’ দম নিল বেকা। ‘আমাকে জানানো হয়েছে, তুমি যেন দিন কয়েকের জন্যে বাইরে কোথাও কাটিয়ে আসো। বিনিময়ে তোমাকে এক হাজার ডলার দেয়া হবে। তুমি এই এলাকার শেরিফও বটে। ইচ্ছে করলেই ওই জাল টাকার ব্যাপারে তদন্ত করতে যেতে পারো কোথাও।’

‘কিম, তোমাকে যে ওই প্রস্তাব দিয়েছে, তাকে জানিয়ে দিও, আমাকে কেনা যাবে না। যে-পুলিশ অফিসার ঘুষ খায় সে একজন চোরেরও অধম। চোর চুরি করতে বেরোয় এবং তার উদ্দেশ্যের প্রতি অবিচল থাকে। একজন পুলিশ অফিসার শান্তি-শৃঙ্খলা বজায় রাখার জন্যে শপথ নেয়।’ চেয়ার ঠেলে পেছন দিকে সরে গেল টমাস। ‘আমি যদি বিচারক হতাম এবং আমার এজলাসে যদি কোন ঘুষখোর অফিসারের মামলা উঠত, তাকে কঠোরতম সাজা দিতাম আমি।’

বেকা কাঁধ ঝাঁকাল। ‘জানতাম এ-কথাই বলবে তুমি। আমাকে বলা হয়েছিল প্রস্তাবটা যেন তোমাকে দেই।’

‘ওদের জানিয়ে দিও, এখানেই থাকব আমি,’ বলল টমাস, ‘এবং তৈরি থাকব।’

‘বেন কারি আসবে না,’ বেকা বলল। ‘হয় মলিনা কিংবা পেরিন। আবার নতুন কেউও হতে পারে। বাতাসে গুজব, বেন কারি নাকি নতুন এক লোক পেয়েছে, এই ধরনের কাজে তার স্পেশাল ট্রেনিং আছে।’

‘ওই দলে তোমার বন্ধু আছে?’

ইতস্তত করল বেকা, তারপর কাঁধ ঝাঁকাল। ‘না। তুমি জানো, কখনও

কোন দলের সাথে জড়িত ছিলাম না আমি। বরাবর একা কাজ করেছি। ওদের কয়েকজনের সাথে পরিচয় আছে, ভাল লোকও আছে ওদের মধ্যে—নয়তো দীর্ঘ দিন এক সাথে থাকতে পারত না। তবে শুনতে পাচ্ছি, বুড়ো সর্দার নাকি অবসর নিতে যাচ্ছে, আর দলের লোকেরাও অধীর হয়ে উঠেছে।

‘খনাবাদ, নতুন কিছু শুনলে জানিও।’

এপাশ-ওপাশ মাথা নাড়ল বেকা। ‘এই ব্যাজ লাগানোর পর থেকে বড় একটা খবর পাই না আমি। তবে,’ বলল ও, ‘এটা পকেটে পুরে ডেনভারে যেতে পারি। লরিমার স্ট্রীটে গেলে হয়তো-বা খবর মিলতে পারে।’

‘যাও।’ কয়েকটা স্বর্ণমুদ্রা বাড়িয়ে দিল টমাস। ‘সঙ্গে বেশি নেই, এই দিয়ে চালিয়ে নিও। যোগাযোগ রেখো।’

দম নিয়ে বলল, ‘কিম, চার্লি ফ্যারেল এই কেসে আমার সাথে। কাজ করছে। আমার বিশ্বাস, চলতি বসন্তে অনেক ঘটনা ঘটতে যাচ্ছে। সহজেই লুট করা যায় এমন সোনার চালান বা ব্যাংক ডাকাতি হতে পারে।’

‘সারাটা শীত ঘরে বসে কাটিয়েছে, তাই আমার ধারণা বড় কোন দাঁও মারার চেষ্টা করবে ওরা।’

কিম বেকা বাইরে এল, সঙ্গে টমাস। এবার তা হলে ডেনভার! রাহাখরচও মিলেছে!

খুব কম জিনিসই গোপন থাকে। কারও অভ্যাস অনর্গল বকা। আবার কেউবা খালি শোনে। পশ্চিমের অধিকাংশ আউট-লই চেনা মুখ, এবং তারা যখন এদিক-ওদিক যায় লোকের নজরে পড়ে। তাদের ওপর যত কঠোর নির্দেশই থাকুক না কেন, সুযোগ পেলেই পুরোনো কোন বান্ধবীর সাথে দেখা করে, কিংবা আড্ডায় গিয়ে গলা ভেজায়।

তার নামে কোন হলিয়া নেই বলে আরও একবার স্বস্তি অনুভব করল সে। কী ঘটতে যাচ্ছে স্পষ্ট বুঝতে পারছে সে। টমাস আর চার্লি নানান সূত্র একসুতোয় গাঁথছে, আর ওরা যখন করছে, তখন অন্যেরাও বসে নেই নিশ্চয়ই। এখন শুধু সময়ের অপেক্ষা, তারপরই আইন তার জাল ওটিয়ে আনবে।

খুব সাবধানে থাকতে হবে তাকে। বেন কারি অপারেশনে খুনোখুনি পছন্দ করে না, কিন্তু এটা স্রেফ একটা নীতিগত ব্যাপার মাত্র। প্রয়োজন পড়লে করবে-করেওছে।

বেন কারির কর্মপদ্ধতি সম্পর্কে তার জানাশোনা অত্যন্ত সীমিত। কানাঘুষো যা শুনেছে। বিভিন্ন কাটিং আর ক্রিপিংয়ের সাহায্যে টমাস ব্যাখ্যা করার আগপর্যন্ত এই প্যাটার্নের ব্যাপারে তার কোন ধারণাই ছিল না। আর প্যাটার্নের অর্থ সূত্র, ট্রেইল-যা ধরে অনুসরণ করা চলে, অন্ধের মত হাতড়ে ফিরতে হয় না। স্বভাববৈশিষ্ট্য পাল্টানো মুশকিল, এবং অসতর্ক মুহূর্তে এখানেই ভুল করে বসে মানুষ।

একজন আউট-ল হয়তো ভাবতে পারে সবাইকে টেক্কা দিচ্ছে সে, কিন্তু কেউ না কেউ-যেমন টমাস আর চার্লি-ঠিকই তাদের গতিবিধির ওপর নজর

রাখছে।

তার দুর্বলতা ছিল ঘোড়া, কেনার সামর্থ নেই এমন জাতের ঘোড়া। দামী ঘোড়ার গতি, সৌন্দর্য তাকে মুগ্ধ করত। পশ্চিমের বেশ কিছু সেরা ঘোড়া সে চুরি করেছিল, কিন্তু এর অসুবিধা ছিল একটাই: লোকে এগুলোর আসল মালিকদের চিনত। মাত্র হুগা কয়েক আগে টমাসের বাথানে গিয়েছিল সে। টমাসই নিয়ে গিয়েছিল। সেখানে একটা নাদুসনুদুস বাদামি গেল্ডিং দেখে তার জিভে জল এসে যায়।

‘ওই ঘোড়াটা যার,’ টমাস বলেছিল, ‘তাকে আমি জেলে পাঠিয়েছি। বেঁচে থাকলে বিশ বছর মেয়াদ খাটতে হবে তাকে। লোকটা দারুণ অসুস্থ, মনে হয় না টিকবে। সে নিজেও জানে এটা। আমি তাকে জিজ্ঞেস করেছিলাম তার সাজ পোশাক দিয়ে কী করব।’

‘আমার বন্দুক, দড়ি আর জিন যত্নে রাখবে,’ সে বলল। ‘আমার জিন কখনও বেচিনি বেচবও না।’

‘গেল্ডিংটার কী হবে?’ আমি জিজ্ঞেস করলাম।

‘ওটা আমার জীবনের শ্রেষ্ঠতম ঘোড়া। আমি চাই না ওটা কোন অপাত্রে পড়ক’ আমাকে বলল সে।’

টমাস বলেছিল, ‘ওর মনোভাব জানতাম, আমি বললাম আমার জানাশোনা এক লোক আছে, লোকটা ঘোড়াপাগল। গেল্ডিংটা তাকে দিলে যদি সে বাঁচবে ওটার যত্ন করবে। লোকটা কে জানতে চাইলে আমি বলি, “কিম বেকা।”

‘কিম, তোমার নাম শুনে সজোরে হেসে ওঠে লোকটা। “কিম? ঠিক আছে, ওকেই দেব। লিখে দিচ্ছি কবলানামা।”

‘তুমি বলতে চাইছ ঘোড়াটা সে আমাকে দিয়ে দিয়েছে?’

‘হ্যাঁ। এই যে কবলানামা। কিম?’

‘ইয়েস, সার?’

‘ওই ঘোড়ায় যখন চড়বে, কবলানামাটা সাথে রেখো। যখনই কোন আইনের লোক একটা সুন্দর ঘোড়ার পিঠে দেখবে তোমাকে, নানান প্রশ্ন করবে।’

গেল্ডিংটার কাছে গিয়ে জিন চাপিয়েছিল বেকা। আন্তাবলের আরেকপাশে এক সাথে পাঁচটা ঘোড়া বাঁধা ছিল। সব কটাই ভাল জাতের।

‘ওইগুলোই, না?’ শুধিয়েছিল সে, উত্তর তার জানা ছিল।

‘হ্যাঁ। তাড়া খাওয়া ফেরারী আসামী পিঠে নেয়ার অপেক্ষায় আছে।’

এরপর ওরা শহরের বাইরে যায়।

‘ডেনভারে পৌঁছুতে বেশ ক’দিন লাগবে,’ বেকা বলে।

‘ট্রেনে যাও। ঘোড়াটা ওরা মালগাড়িতে তুলে দেবে।’

‘তাই তো? ট্রেন ব্যবহারের কথাটা কিছুতেই মনে থাকে না আমার।’ ঘোড়ার মুখ ঘুরিয়ে নেয় সে। ‘চলি, হুগাখানেকের মধ্যেই দেখা হবে আবার।’

কিমকে চলে যেতে দেখল টমাস এডি। নীল নির্মেষ আকাশ। ফুরফুরে বাতাস।

একটা সুন্দর সকাল। ছোট্ট টিলাটার মাথায় দাঁড়িয়ে দূর-পশ্চিমের স্প্যানিশ পর্বতমালার শৃঙ্গ স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে। একদিন আবার সে ওই অঞ্চলে যাবে, চমৎকার জায়গা। কাছেই, একটা কয়োট ছুটে যাচ্ছে, একপাল অ্যান্টিলোপকে তাড়া করছে।

বৃথা সময় নষ্ট করছে ওটা, পালে বুড়ো-হাবড়া হরিণ না থাকলে কোন আশাই নেই ওর। এখনও কোন হরিণ-ছানা তার চোখে পড়েনি, তবে বেশ কয়েকটা অ্যান্টিলোপ পোয়াতি, কয়োটটা বোধ হয় সে-জন্যেই এগিয়ে যাচ্ছে, অসহায় শিশু জন্মালেই ঝাঁপিয়ে পড়বে।

ছুতন্ত অ্যান্টিলোপকে ধরার সাধ্য কোন নেকড়ে বা কয়োটেরই নেই। দ্রুতগামী গ্রে হাউন্ডকেও হারিয়ে দিয়েছে অ্যান্টিলোপ, এমন দৃশ্যও বহুবার দেখেছে সে।

ধীরে ধীরে বিশাল প্রান্তরে চোখ বোলাল সে, তক্ষর্ত দৃষ্টি। বেস তাকে এই জায়গা ছেড়ে যেতে বলছে। ওকে ভালবাসে সে, কিন্তু তার পক্ষে কি সম্ভব হবে এটা? বেস উপলব্ধি করতে পারছে না কী কঠিন সমস্যায় তাকে ফেলে দিয়েছে সে। তাকে বরাবরই একজন সফল ক্ষমতাবান মানুষ হিসেবে দেখেছে ও। প্রথমে র‍্যাঙ্কার, পরে টাউন মার্শাল ও শেরিফ। কিন্তু পূর্বে সাফল্য অর্জন করতে হলে যে-দক্ষতা, শিক্ষা দরকার, সে-সব কিছুই তার নেই।

ঢাল বেয়ে মন্থর গতিতে ঘোড়া নিয়ে নামতে লাগল সে। কিম বেকার কথাই, নিঃসন্দেহে, ঠিক। টাকা জালিয়াতি কেসের প্রতি তার বেশি নজর দেয়া উচিত ছিল। অনেক কাল ধরে পশ্চিমের বড় অপরাধগুলোর মধ্যে এটাও একটা। তা ছাড়া তুলনামূলকভাবে ঝুঁকিও অনেক কম। জাল টাকা শনাক্ত হতে প্রচুর সময় লাগে। ব্যাংকে না পৌঁছানো অবধি ধরা পড়ার সম্ভাবনা খুব কম। ইতিমধ্যেই বাজারে প্রচুর জাল নোট ছড়িয়ে পড়েছে। তার এবং বেকা, দু'জনারই ধারণা এর কারখানা কাছেভিতেই কোথায় হবে।

প্রথমে তাকে সম্ভাব্য ডাকাতি রোধের জন্যে প্রস্তুতি নিতে হবে। বেন কারির লোকেরা খুনোখুনি থেকে বিরত থাকে, তবে সে জানে বিপদ দেখলে করতে কসুর করবে না। শহরবাসীকে হুঁশিয়ার করতে হবে, জরুরি অবস্থা মোকাবেলা করতে দুজন সহকারীও নিয়োগ করবে। বেন কারিকে এত সহজে তার এলাকায় ব্যাংক লুটতে দেবে না সে।

আচ্ছা, বেকা যে-নতুন লোকটার কথা বলল সে কে?

যে-ই হোক না কেন, যুদ্ধ একটা হবেই, এবং কেউ না কেউ মারাও পড়বে।

এটা এড়াবার মত কৌশল বের করতে হবে।

কাউকে মারতে চায় না সে, কেউ মরছে তাও দেখতে চায় না, তবে এর কোন কিছুই হয়তো তার ইচ্ছে-অনিচ্ছের ওপর নির্ভর করবে না।

রেড ওয়াল। শান্ত পরিবেশ। বাসার সামনে তৃণভূমিতে কয়েকটা গরু চরছে। ওপরে চওড়া ঝুলবারান্দায় দু'র‍্যাগান দাঁড়িয়ে, অপলক চোখে ক্যানিয়নের দিকে

তাকিয়ে রয়েছে। যে-ঘোড়সওয়ারকে সে দেখেছে তার ভেতর বন্ধুসুলভ কিছুই ছিল না। লোকটা ইন্ডিয়ান নয়। হলে বাড়ি পর্যন্ত আসত না, কৌতূহল জাগলে বড়জোর দূর থেকে তাকিয়ে দেখত একবার। লোকটা শ্বেতাঙ্গ এবং লোক ভাল হলে র‍্যাঙ্কে এসে অন্তত এক কাপ কফি খেয়ে যেত।

তার জীবনের অধিকাংশ সময় কেটেছে পূবে, তবে চিন্তাভাবনায় সে পুরোদস্তুর পশ্চিমা। প্রথম দর্শনেই এই দুর্গম ভয়ঙ্কর-সুন্দর রাজ্যের প্রেমে পড়ে গেছে সে। এখানকার গৈরিক গিরিখাত, নীল গম্ভীর প্রকৃতি, সবুজ বনানী আর শরতের সোনালি অ্যাসপেন পাতা তাকে হাতছানি দিয়ে ডাকে। ঘোড়ার পিঠে পাহাড়-চূড়ায় উঠে মনোরম দৃশ্যাবলী দেখতে তার ভাল লাগে।

দীর্ঘকাল যাবৎ এই দেশ ছিল ইন্ডিয়ানদের কাছে পবিত্র ভূমি, ওরা যে-সব সুউচ্চ চূড়াকে সম্মান জানাত, আজ সেগুলো তার কাছেও গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে।

তবে এখন তার মনে উঁকি-ঝুঁকি মারছে বিপদের আশঙ্কা। সত্যিই কি বিপদ আছে?

ঘোড়ায় চেপে আশপাশের এলাকা খুঁটিয়ে দেখল ও। ট্র্যাকিং সম্পর্কে তার জ্ঞান সীমিত; স্পষ্ট কিছু চোখে পড়ে কিনা তাই দেখার চেষ্টা করল। যে-ঘোড়সওয়ারকে ও দেখেছিল তার ট্র্যাক চোখে পড়ল। ট্র্যাক অনুসরণ করল ও। লোকটা যে নানান অ্যাসেল থেকে র‍্যাঙ্কটাকে পর্যবেক্ষণ করেছে এটা বুঝতে তার অসুবিধে হলো না: মাটিতে ঘোড়ার খুরের ছাপ পরিষ্কার ফুটে আছে।

ট্র্যাক ধরে এগিয়ে যাওয়ার ইচ্ছে ছিল, কিন্তু বেলা পড়ে এসেছে। উত্তরে বিশাল ক্যানিয়নের দিকে তাকাল ও। একদিন ওখানে যাবে সে, ওটার কিনারে গিয়ে দাঁড়াবে।

বাসায় ফিরে দেখল ওর পথ চেয়ে বারান্দায় দাঁড়িয়ে আছে ভয়োল র‍্যাগান। চোখে-মুখে উদ্বেগের ছায়া। 'কিছু দেখলে?'

'ট্র্যাক,' বলল ও। 'কোন সন্দেহ নেই আমাদের ওপর নজর রাখছিল কেউ।'

ক্যানিয়নের ভেতরে অবস্থিত বলে ভি-বারে আধার নামল তাড়াতাড়ি। রেড ওয়াল তার রং হারিয়ে ছায়ায় পরিণত হলো, বিশাল প্রান্তরের ওপর কালো ডেলভেটের মত রাত নামল। মাথার ওপর তারাজুলা আকাশ। পাথর-বাড়ি আর বাংক হাউসের জানালায় লুপ্তনের প্রিয়মাণ আলো।

আবার পাহারার দরকার পড়বে তাদের। বাসার ভেতর ঢুকে তাক থেকে রাইফেলটা তুলে নিল ভয়োল।

এটা সর্বদা হাতে রাখবে সে। গানবেল্টও নেয়া দরকার কিন্তু দোটিনায় পড়ল: মেয়েলোক আছে, তা ছাড়া বাসায় গানবেল্ট বড় একটা পরে না সে।

রাতকে সে কখনও শত্রু মনে করেনি, কিন্তু এখন সন্দেহ জাগছে মনে।

ক্যানিয়ান পার হওয়ার উপায় বেন জানে। সেটা কী, জানে না সে, তবে রাস্তাটা আর কারও চোখে পড়ে যেতে পারে এটাই তার ভাবনার একমাত্র কারণ। এই ব্যাপারে বেন আগাগোড়া গোপনীয়তা বজায় রেখেছে বলেই

রাস্তাটার হৃদিশ কেউ পায়নি। তা ছাড়া ক্যানিয়ন অতিক্রম করার মত কোন কারণ তার থাকতে পারে এটাও সন্দেহ করেনি কেউ।

লিভিং রুমের বাতি নিভিয়ে রান্নাঘরে গেল সে। ইতিমধ্যেই সেখানে রাতের আহারে বসে গেছে মেয়েরা।

বড্ড নিথর রাত। বসল সে। সবাই কেমন যেন চুপচাপ, অথচ রোজ কথার তুফান ছোটো। কেবল বাসন রাখার মিষ্টি টুংটাং শব্দ আর মাঝে-মধ্যে নিচুস্বরে কোন কিছু চাওয়া। কান খাড়া করে রাখল ভয়েল, বাইরের ক্ষীণতম আওয়াজও যেন না এড়ায়।

রান্নাঘরের আর কর্মীরা এখন থাকলে ভাল হত।

আসলে ওরা নেই বলেই দুর্ঘটনা ঘটতে যাচ্ছে। নাকি এটা তার মিছেমিছি চিন্তা? এমনও তো হতে পারে যে ওই লোকটা আসলে রাজকুমার প্রকৃতির ছিল। এমন মানুষও সে দেখেছে। হয়তো-বা উদ্বেগের কোনই কারণ নেই।

পাইন গাছে ফিসফাস, অ্যাসপেন পাতায় মৃদু কাঁপন-হালকা বাতাস বয়ে গেল ভূগভূমির ওপর দিয়ে। ক্যানিয়নের ওপাশে উন্মুক্ত প্রান্তরে একটা অ্যান্টিলোপ কান খাড়া করল, শুনছে।

নিরাম প্রকৃতিতে ঢেউ তুলল একটা শব্দ, ক্ষীণ, বহুদূর থেকে এগিয়ে আসছে কিছু। ধীরে ধীরে মিলিয়ে গেল শব্দটা, ফের মাটিতে শুয়ে পড়ল হরিণটা।

মেঘের আড়ালে চাঁদ ঢাকা পড়ল, ফের বাতাস, একটা ঝরা-পাতা খানিক দূরে উড়ে গিয়ে পড়ে গেল। বাতাস থেমে গেছে। সাঁ করে নেমে এল একটা বাদুড়, অন্ধকারে আহার খুঁজছে।

ভি-বার মহিলারা শুয়ে পড়েছে। বাড়ির শেষ বাতিটা নিভিয়ে ঝুলবারান্দায় গিয়ে দাঁড়াল ভয়েল রান্নাঘর। চারদিকে ভয়াল নৈঃশব্দ্য।

বাড়ির ভেতর দিয়ে পেছন দিকে গেল, সিঁড়ি বেয়ে নামল ব্যাংক হাউসে। বাইরের উঠোনে গার্ফিল্ড বসে আছে।

‘এক কাজ করো। বাসার সামনের দিকে অথবা ঝুলবারান্দায় গিয়ে দাঁড়াও,’ বলল ভয়েল। ‘ওখান থেকে শুনতে পাবে ভাল।’

গার্ফিল্ড উঠে রাইফেল হাতে নিয়ে সামনের দিকে গেল। একদম ছেলেমানুষী। ভয়েল কীসের ভয় করছে? রাইফেলটা মেঝেতে রেখে পাইপ ধরাল সে।

তারার দিকে তাকাল। তারি সুন্দর। একজন পুরুষ মানুষ এই দেশে হরহামেশা তারা গোণে। কারণ শতঝামেলার মাঝে আনন্দ উপভোগের সময় পায় না সে।

গার্ফিল্ড জানে না, জীবনে আর কোন দিন তারা গোণার সৌভাগ্য তার হবে না। জানে না আর কয়েক ঘণ্টা বাদেই তার লাশ লুটাবে ধুলোয়।

চোন্দ

আস্তে আস্তে চোখ মেলল হ্যারি কার্টার। মরার মত পড়ে থেকে, মনে করার চেষ্টা করল এখন সে কোথায়। কেন।

উঠে বসল। ওই তো তার পিস্তল, রাইফেল। ছোট্ট একটা কুঁড়ে, পাথরের তৈরি। ছুটন্ত নদীর শব্দ শুনে পাচ্ছে সে। এই নদী তার পার হওয়ার কথা, তবে ওই শব্দ শুনে বুঝতে পারছে না কীভাবে সম্ভব হবে সেটা। বুড়ো ইন্ডিয়ানটা ফায়ারপ্রেসের পাশে বসে পাইপ ফুকছে। হ্যারির দিকে তাকাল সে।

‘কিছু খেয়ে নিলে ভাল করতে। চাঁদ উঠছে।’ একটু থেমে বলল, ‘এমনকী তোমার বাবাও কখনও রাতে পার হওয়ার চেষ্টা করেনি।’

তোমার ইংরেজিটা বেশ ঝরঝরে,’ বলল হ্যারি। উপলব্ধি করল তার নিজের ভাষা ততটা ভাল নয়।

পাইপ ধরা হাতটা নাড়ল বুড়ো। ‘ছেলেবেলায় এক মিশনারির গাইড ছিলাম। খুব ভাল মানুষ ছিল। সৎ। ইন্ডিয়ানদেরকে এমন জিনিস শেখাতে চেষ্টা করেছিল যা বহু আগে থেকে তার চেয়ে অনেক ভাল জানে তারা। কেবল ভাষাটাই যা আলাদা।’

‘তোমাকে কিন্তু চমৎকার বলতে শিখিয়েছে সে।’

‘হ্যাঁ। ছ’বছর রোজ তার সাথে ইংরেজিতে কথা বলেছি। ডাক্তারি বিদ্যেও শিখিয়েছে অল্প-বিস্তর। আমার মা আবার এ-বিষয়ে খানিকটা জ্ঞান দিয়েছে তাকে। ভেষজ শাস্ত্রে খুব পারদর্শী ছিল মা।’

‘একবার সে জিজ্ঞেস করেছিল আমি চার্চে যাই না কেন। জবাবে বলেছিলাম, আমি পাহাড়ে যাই। পাহাড়ই আমার চার্চ। ওখানে বসে সূর্যোদয়-সূর্যাস্ত আর মেঘের ভেলা দেখি। বলেছিলাম, “তোমার চার্চে যেতে পারি যদি তুমি আমারটায় আসো।” আমার বিশ্বাস পরে সে আমাদের রীতিকেই ভালবেসে ফেলেছিল।’

হ্যারির দিকে ঘুরল বুড়ো। ‘সাংসারিক কাজে যখন হাঁফিয়ে উঠবে, কোন পাহাড় বা নির্জন জায়গায় চলে যেও। একা। ফাঁকা থাকলে চার্চও ভাল। অন্তত আমার তাই ধারণা।’

খাওয়া শেষ করে বুড়োর সাথে একটা ট্রেইল ধরে ওপর দিকে উঠতে লাগল হ্যারি। একটা সরু কার্নিশের সামনে এসে থামল। ‘এই সেতু বানাতে বেন কারির দু’বছর সময় লেগেছিল,’ জানাল বুড়ো। ‘সে ছাড়া কেউ পার হয়নি এটা, তা-ও কয়েকবার মাত্র।’

আতঙ্কিত চোখে অন্ধকারের মধ্যে তাকিয়ে রইল হ্যারি।

নীচে প্রবল গর্জনে ছুটে চলেছে নদী। ওখান দিয়ে পার হবে? অসম্ভব। কেউ পারবে না। কোন মানুষের পক্ষে ওই স্রোতে ভেসে থাকা সম্ভব নয়। দৈব

সহায় না হলে নৌকোয় চেপেও ভাটিতে যাওয়া যাবে না। নদী এখানে বেশ সঙ্কীর্ণ। ফাটলের মুখে পানি এসে জমা হচ্ছে, তারপর সবেগে ধেয়ে যাচ্ছে। এটাই স্বাভাবিক, এখন বসন্ত, বরফ গলতে শুরু করেছে পাহাড়ে।

‘ওই যে! দেখতে পাচ্ছ? সেতুটা ওইখানে। মোটা তারের কাছি, দু’পাশে পাথরখণ্ডের সাথে দু’মাথা বাঁধা।’

নিকষ কালো ক্যানিয়নের ওপাশে তাকাল সে। নিশ্চিন্দ্র আঁধারের ভেতর দিয়ে আবছাভাবে দুটো কেবল দেখা যাচ্ছে। ইস্পাতের। নদীর ওপাশে অন্ধকারের মাঝে হারিয়ে গেছে। একটা থেকে অপরটা প্রায় পাঁচ ফুট উঁচুতে। হারির কপালে ঘাম ফুটল, ভয় বিস্ফারিত চোখে চেয়ে রইল। এই প্রথম ভয় কী জিনিস অনুভব করেছে সে।

‘তুমি বলছ...বেন কারি ওই সেতু পার হয়েছে?’

‘কয়েকবার।’

‘তুমি?’

কাঁধ ঝাঁকাল বুড়ো নাভাজো। ‘দুই তীরের মধ্যে কোন তফাত নেই। তাই ওপাশ থেকে কোন কিছু আনতে হলে ঘুরপথে যাব আমি। তাড়াহড়োর কিছু নেই।’

নীচের পড়ন্ত জলরাশি থেকে পানির ছিটে উঠে আসছে, কুয়াশার মিহি অথচ ঘন। রহস্যময়। কাছিজোড়ার দিকে তাকাল হ্যারি। ওর মন বলছে, না! জিত দিয়ে দু’ঠোঁট ভিজিয়ে নিল, হঠাৎ করে শুকিয়ে গেছে। এত কিছুর পরেও বেন কারি পেরেছে।

মাঝখানের দূরত্ব কত? কতক্ষণ লাগবে পেরতে?

ক্যানিয়নের ভেতরে দাঁড়িয়ে আছে সে। চারপাশে লাল মাটি ভেদ করে মাথা তুলেছে গ্রানাইটের দেয়াল। যুগ যুগ ধরে বহু ঝড়ঝাপ্টা সহিছে এ-সব দেয়াল। আকাশে মিটমিট জ্বলছে কয়েকটা তারা। সামনে সীমাহীন অন্ধকার ছাড়া কিছুই চোখে পড়ল না ওর। কেবল দুটো নিশ্চয়ই মজবুত। বেন কারির আড়াইমণী ভার সহিতে পারলে তারটাও পারবে। এক মণ কম ওজন তার।

পিঠে আড়াআড়িভাবে রাইফেলটা ঝোলাল সে। আবার ভাবল এক মুহূর্ত, না, এ ছাড়া উপায় নেই। কার্ব পেরিন ভি-বারে যাচ্ছে। তার আগেই পৌঁছুতে হবে ওকে। ওপরের কেবল ধরে নীচেরটায় সন্তর্পণে এক পা রাখল ও। পেশীতে টিল দিল। এক সেকেন্ড পর পেছনে তাকাল। নেই, বুড়ো নাভাজো চলে গেছে।

মৃদু বাতাস চুমু খেল ক্যানিয়নের দেয়ালে, ভৌতিক শব্দ উঠল, পরক্ষণেই মিলিয়ে গেল নিঃসীম আঁধারে। লম্বা শ্বাস টানল হ্যারি কার্টার। উঁচু জায়গা তার বরাবর অপছন্দ, অতল অন্ধকারে নীচের গভীরতা বোঝা যাচ্ছে না দেখে মনে মনে কিছুটা খুশি হলো সে। মাঝে-মধ্যে ভাঙা জ্যোৎস্নায় রূপোলি জল চিকচিক করে উঠছে, যেন খেলা করছে একঝাঁক ট্রাউট। এক ইঞ্চি সরল সে। এখনও সময় আছে, ইচ্ছে করলে ফিরে যেতে পারে টডস্টল ক্যানিয়নে। কিন্তু ড্রুসিলা আর জুলিয়ানার কী হবে? ওদের মায়ের? বাধানকমীরা কি জানে, মৃত্যু নিঃশব্দে এগিয়ে আসছে তাদের দিকে?

আরেকটু সরল, এবার এক পাশে। আর এক সুতো, তারপরেই অতল খাদ।

পানি থেকে কতটা দূরে আছে সে? দুশো ফুট? ক্যানিয়নের ভেতর অনেকটা চলে এসেছে সে, তবু পাঁচশো ফুট হওয়াই স্বাভাবিক। ওর মনে পড়ল ছেলে বেলায় এই সেতুর ব্যাপারে কিছু কথা শুনেছিল সে। রাউন্ডির মুখেই শুনেছিল, ক্যানিয়নের দেয়ালে একটা লোহার আংটা লাগানো দেখে বেনকে এর কারণ জিজ্ঞেস করেছিল সে। সন্দেহ নেই, আইডিয়াটা ওখান থেকেই নেয়া হয়েছে। নীচে ওঁৎ পাতা বিপদ থেকে মন অন্যদিকে সরিয়ে রাখতে চেষ্টা করল ও। বহু বার এ-রকম নদী সে দেখেছে, কিন্তু এমন পরিস্থিতিতে পড়েনি কখনও। এগিয়ে গেল সে। কাছির কয়েক জায়গা ভেজা, উৎক্ষিপ্ত জলরাশির ছিটে লেগেছে। ওর পা পিছলে গেল একবার, ওপরের কাছি শক্ত মুঠিতে ধরা ছিল তাই পতন থেকে রক্ষা পেল। অতিসাবধানে একটু একটু করে নিজেকে তুলল ও, পায়ের নীচে কেবলের ছোঁয়া অনুভব করতে চেষ্টা করল।

এখন সে নদীর মাঝ বরাবর চলে এসেছে, এখান থেকে পানির দূরত্ব সবচেয়ে কম। এরপরে শুরু হবে চড়াই, কেবলের ওপর দিয়ে পা ঘষটে এগিয়ে যেতে হবে। খুব সাবধানে রওনা হলো ও। এখান থেকেই সে ওপাশের পাহাড়ের চূড়া আবছা দেখতে পাচ্ছে।

নামার উপযোগী জায়গা কি আছে ওখানে? ভেজা, পিচ্ছিল নয়তো? একবার, মনে পড়ল ওর, এক শৈলনিবাসে যাওয়ার পথে ওপরের যে-পাথরটার সঙ্গে মই বাঁধা ছিল তার ঠিক নীচেই ধাপ শেষ হয়ে গিয়েছিল। পাথরটা ছিল খাড়া, মসৃণ। দেয়ালে বুক ঠেকিয়ে হাতের ওপর ভর দিয়ে উঠতে হয়েছিল তাকে। প্রতিপদে ছিল পাঁচশো ফুট গভীর খাদে পড়ে যাবার ভয়। তখনও ব্যাপারটা পছন্দ করেনি সে, এখনও করছে না।

ইঞ্চি ইঞ্চি করে চূড়ার কাছে পৌঁছল সে। কম্পিত পায়ে কেবল থেকে গিরিগুহায় নামল। নিরাপদে এপারে আসতে পেরে এতটা হালকা বোধ করল যে প্রথম চোটে অপেক্ষমাণ ইন্ডিয়ানটার প্রতি নজরই পড়ল না ওর।

উঠে দাঁড়াল নাভাজো। একটি কথাও না বলে একটা কেবিনে নিয়ে গেল ওকে। একটা শাখা ক্যানিয়নের ভেতর কেবিনটা অবস্থিত। দরজার কাছে তামাটে রঙের একটা স্ট্যালিয়ন বাঁধা, ইন্ডিয়ানটাকে হাত নেড়ে বিদায় জানিয়ে স্ট্যালিয়নের পিঠে চেপে বসল হ্যারি। চলতে শুরু করল পাহাড়ী ঘোড়া, এদিককার পথঘাট ওটার চেনা।

পেরিন কি রাতেও চলবে? হ্যারির সন্দেহ আছে এতে। কোন তাড়া নেই ওর। তার শিকারেরা অরক্ষিত অবস্থায় আছে, ওদের ভাগ্যে কী ঘনাচ্ছে সে-ব্যাপারে কিছু জানে না ওরা। তা ছাড়া বাইরে থেকে কোন সাহায্য আসার সম্ভাবনাও নেই। ধীরে ধীরে ওপর দিকে উঠে যাচ্ছে ট্রেইলটা। সন্দেহ নেই, এই ঘোড়ার পিঠে বেন নিজেকে চেপেছে। কোথায় যাচ্ছে জানে এটা, সে-ও গন্তব্যে পৌঁছানোর জন্যে অধীর হয়ে উঠেছে।

ট্রেইলটা চওড়া হতেই হাওয়ার বেগে ছুটতে শুরু করল ঘোড়াটা।

অসমতল বরেন্দ্র ভূমি, মাঝে-মধ্যে সিডার আর দুর্বা ঘাস-ছাওয়া জমি। তবে আজ রাতে ঘাস চোখে পড়ছে না, কেবল ইতস্তত ছড়ানো ঘন কালো ছোপ। সিডারের অস্তিত্ব টের পাচ্ছে গন্ধ থেকে।

পূর্ব আকাশ ফিকে হয়ে আসছে আস্তে আস্তে। রাত পুইয়ে যাচ্ছে। একটা ডোবার সামনে ঘোড়ার রাশ টানল সে। তুষার-গলা জল জমেছে ডোবায়। ক্যান্টিন খুলে জল পান করল সে। স্ট্যালিয়নটা খেলো তুষারজল। ছোট পুটুনির ভেতর থেকে খানিকটা জার্কি বের করে চিবুতে লাগল, রাইফেলটা ইতিমধ্যেই পিঠ থেকে খসিয়ে পায়ের ওপর রেখেছে।

খুব সাবধানে এগুতে হবে তাকে। রাক্ষসটা ঠিক কোথায় অবস্থিত সে জানে না, তা ছাড়া পেরিন পৌছে গিয়ে থাকতে পারে এরই মধ্যে। যতই কাছে যাবে ঘোড়ার গতি মন্ত্র করতে হবে, যাতে খুরের জোর শব্দ না ওঠে।

ও জানে কেমন ধরনের লোকজনের মোকাবেলা করতে যাচ্ছে সে। অত্যন্ত দক্ষ লোক সব। ভয়ঙ্কর।

ধূসর ভাবটা কেটে গেছে, তবে সূর্য ওঠেনি এখনও। রাশ টেনে স্ট্যালিয়নের গতি প্রায় হাঁটার পর্যায়ে নামিয়ে আনল হ্যারি। ঘোড়াটা অবশ্যি গা ঝাড়া দিয়ে ছুটতে চাইছে।

এবার তাকে গুনতে হবে, কান ঝাড়া রাখতে হবে কোন শব্দ, নড়াচড়া বা দূরাগত গুলির আওয়াজের জন্যে...

চিন্তাচ্ছন্ন মনে চুল আঁচড়ে ক্লিপ সাঁটল ড্রুসিলা র্যাগান। পাশের কামরায় ওর মায়ের চলাফেরার আওয়াজ গুনতে পাচ্ছে সে। মেক্সিকান পরিচারিকাদের গোছগাছ করার শব্দও আসছে।

জুলিয়ানা বাইরে একটি কিশোর কাউবয়ের সাথে কথা বলছে। ছেলেটা ঘোড়ার দেখাশোনা করে।

হঠাৎ জুলিয়ানার পায়ের আওয়াজ পেল ও। দরজায় এসে দাঁড়াল সে, দু'গালে রক্তিম আভা। 'তোর হয়নি এখনও?' জিজ্ঞেস করল সে। 'খিদেয় আমার নাড়িভুঁড়ি জ্বলছে।'

'আসছি।' তারপর জুলিয়ানা ঘুরতেই প্রশ্ন করল, 'ওকে তোর কেমন লাগল রে, জুলি? ওই-যে আমাদেরকে বাকবোর্ড ভাড়া করে দিল যে-লোকটা? সুন্দর না দেখতে?'

'ওহ? হ্যারি কার্টারের কথা বলছিস। বুঝেছি, এ-জন্যেই তোর তন্দ্রা কাটেনি এখনও। অথচ তুই-ই সচরাচর আগে উঠিস ঘুম থেকে। হ্যাঁ, চমৎকার চেহারা। আরেকটা জিনিস লক্ষ করেছিস? ওকে দেখে বাবার কথা মনে হয়েছে আমার। না, চেহায়ায় নয়, হাবভাবে।'

নাস্তার টেবিলে বসে ড্রুসিলা সিদ্ধান্ত নিল হ্যারি কার্টারের ব্যাপারে ভয়েল কাকার সাথে আরেক দফা আলাপ করবে সে।

ভয়েল জানে, হ্যারি কার্টারের সাথে ওদের দেখা হয়েছে ওয়েভারে,

সোনাবাহী ট্রেনের খবরও জানা আছে তার, তাই নিজের অভিব্যক্তি যথাসাধ্য স্বাভাবিক রাখতে চেষ্টা করল সে। 'ওর নাম হ্যারি কার্টার বলেছিলে, না? চিনি না। পরনে বাকস্কিন শুনে মনে হচ্ছে কোন শিকারী হবে, কিন্তু সঠিক কিছু বলা যাচ্ছে না।

'কাইবাব এলাকার শিকারী হতে পারে। আবার ওর দেখা পাবে তোমরা, এমন সম্ভাবনা কম। ক্যানিয়নের ওপাশটা ভীষণ দুর্গম, ভয়াল।'

'বাকবোর্ডের ড্রাইভার জানাল ওটা নাকি আউট-লন্ডের আবাস,' বলল জুলিয়ানা।

'হতে পারে। খুব খারাপ জায়গা।' তারপর একটা সত্যি কথা বলল, 'আমি ওখানে যাইনি কখনও।'

খাওয়া থামিয়ে কান পেতে কিছু শোনার চেষ্টা করল সে। মনে হলো ঘোড়ার পদশব্দ, কিন্তু এত সকালে বেন আসার কথা নয়। অচেনা কেউ এসে থাকলে ভাগাতে হবে, দ্রুত। তবে মেহমান বড় একটা আসে না।

শব্দটা আবার পেল সে, এবার কাছে। উঠে দাঁড়াল ভয়েল। 'এখানেই থাকো তোমরা!' অনিচ্ছাসত্ত্বেও একটু রুদ্ধ শোনাল তার গলা।

প্রথমটায় মনে করেছিল পুলিশ, পরক্ষণেই কার্ব পেরিনকে চিনতে পারল সে, অনেকবার দেখেছে—তবে পেরিন সম্ভবত চেনে না ওকে। জনাকয়েক ঘোড়সওয়ার, সবাই বেনের লোক। অথচ বেন তাকে জানিয়েছে, ভি-বারের খবর বা এর সাথে তার সম্পর্কের কথা কেউ জানে না।

ঝুলবারান্দায় বেরিয়ে এল সে। 'কী চাই?' মৃদু গলায় বলেই হঠাৎ খেয়াল করল সঙ্গে কোন অস্ত্র আনেনি। 'কী সাহায্য করতে পারি?'

বাথান কমীরা গেল কই? সাস্ত্রী ব্যাটাই-বা সতর্ক করেনি কেন তাকে?

'ঝামেলা না পাকালেই ভাল করবে,' রুঢ় গলায় বলল কার্ব পেরিন। 'মুখ বুজে থাকলে তোমার কোন ক্ষতি না-ও হতে পারে। আমরা খবর পেয়েছি মেয়েছেলে আছে এখানে। ওদের চাই আমরা। আর তোমাদের গবাদি পশু।'

রুখে দাঁড়াল ভয়েল ব্যাগান। একা। 'যত তাড়াতাড়ি পারো কেটে পড়ো। এখানে তোমরা অবাস্ত্বিত।'

চুপ করল, দেরি করিয়ে দিতে চাইছে। 'এখানে যেসব মহিলা আছেন তারা সবাই অভিজাত ঘরের। আমাদের মেহমান।'

ঘোড়া থেকে রাগত ভঙ্গিতে নামার উপক্রম করল ডাক্তার, হাতে উইনচেস্টার। ঠিক ওই সময়ে খাটালের এক কোণে এসে দাঁড়াল গার্ফিল্ড। 'অ্যাই!' চৈটিয়ে উঠল সে। 'হটো!'

বাকি ঘোড়সওয়ারেরা নেমে ছড়িয়ে পড়ছে আস্তে আস্তে। মাথা ঠাণ্ডা রাখল গার্ফিল্ড। রাইফেল উচিয়ে এগিয়ে এল সে। 'বললাম না, ভাগো!'

একটা নড়াচড়ার আভাস পেতেই ওর দু'চোখ জ্বলে উঠল, রেকাবের ওপর এক পা রেখেই গুলি চালান ডাক্তার। গুলিটা হজম করে পাল্টা ফায়ার করল গার্ফিল্ড। ডাক্তার পেছনে একটা লোক ঘুরে মুখ খুবড়ে পড়ল মাটিতে। গার্ফিল্ড রাইফেলের বোল্ট টানল, ডাক্তার গুলি করল ওকে। দু'কদম পিছিয়ে গেল

গার্কিন্ড, হাঁটু মুড়ে বসে পড়ল, প্রাণপণ চেষ্টা করছে রাইফেল সোজা করতে। আরেকটা গুলিতে লুটিয়ে পড়ল মাটিতে, তবু সংগ্রাম চালিয়ে গেল সে।

গোলাগুলির ব্যাপারটাকে বিশেষ আমল দিল না পেরিন। যেন কিছুই হয়নি এমন ভঙ্গিতে এগিয়ে এল সিঁড়ির কাছে। তাকাল ওপর দিকে। ওর মুখে কষে এক ঘুসি হাকাল ভয়েল ব্যাগান। আচমকা হাতুড়ির বাড়ি খেয়ে এক পা পিছিয়ে গেল পেরিন। যেখানে লেগেছে সেখানে হাত রেখেই সরিয়ে নিল, রক্ত ঝরছে।

‘এ-জন্যে তোকে খুন করব আমি!’

‘এত সোজা না, পেরিন!’

পরিস্কার চ্যালেন্ডের সুর, বজাকে চিনতে পারল পেরিন। চমকে উঠল সে।
হ্যারি? এখানে?

ওকে টডস্টল ক্যানিয়নে বন্দি করে রেখে এসেছে সে। এখানে এল কী করে ব্যাটা? এর অর্থ, বেন কারি আবার হাল ধরেছে।

হ্যারি কার্টারকে খুন করতে হবে তার। এবং এক্ষুণি!

‘এখানে এসে চরম বোকামি করেছ তোমরা। বেন কারি এখনও মরেনি। এটা তার জায়গা। তোমাদেরকে প্রতিহত করার জন্যে আমাকে পাঠিয়েছে সে। বেন কারির সাথে লাগার ইচ্ছে না থাকলে এই মুহূর্তে পালাও। কেউ কিছু বলবে না তোমাদের।’

কার্ব পেরিন পিস্তলের দিকে হাত বাড়াল।

পনেরো

কার্ব পেরিন জানে হ্যারি কার্টারকে খুন করতে চলেছে সে।

পিস্তলে নিজের দক্ষতা সম্পর্কে তার মনে কখনোই সংসয় ছিল না কোন, এখন তো আরও নেই। ছোঁড়া ভেবেছে কী নিজেকে?

বাঁটে হাত রাখল পেরিন, ঠোঁটের কোণে জ্বর হাসি। হোলস্টার থেকে বের করল পিস্তল, চকিতে দেখতে পেল হ্যারির পিস্তলের মুখে এক ঝলক আগুন, পরক্ষণেই ওর বুকে সজোরে ধাক্কা মারল কিছু।

হতবুদ্ধি হয়ে গেল ও, স্থলিত চরণে এক কদম পিছু হটল। আচমকা আঘাতে লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়েছে ওর শট, ওর সামনেই সোজা মাটিতে গিয়ে বিধেছে গুলি। পিস্তলের নিশানা স্থির করতে চেষ্টা করল সে, এমন সময়ে আবার ধাক্কা লাগল বুকে, আধপাক ঘুরে গেল পেরিন।

ব্যাপার কী? পিস্তল সোজা করতে প্রাণপণ চেষ্টা করল পেরিন, হঠাৎ ভীষণ ভারি মনে হচ্ছে ওটাকে। একটা অদ্ভুত অনুভূতিতে ছেয়ে গেছে ওর পাকস্থলী, এমনটা তো কখনও হয় না? হঠাৎ হাঁটু ভেঙে বসে পড়ল সে, মনে করতে পারল না কীভাবে এমন অবস্থা হয়েছে। তার হাঁটুর কাছে একটা কালচে ডোবা সৃষ্টি হয়েছে, নিশ্চয়ই তার পা পিছলে গেছে।

উঠতে চেষ্টা করল সে। হ্যারি কার্টারকে তার খুন করার কথা, খুন করতেই হবে।

আধ-বোজা চোখে সামনে তাকাল সে। উদ্যত পিস্তল হাতে হ্যারি কার্টার দাঁড়িয়ে, গুলি ছোঁড়া বন্ধ রেখেছে। হ্যারি ভেবেছেটা কী? সে কি মনে করে তার, কার্ব পেরিনের, সময় দরকার? ঝট করে উঠে দাঁড়াল সে, টলছে। পায়ে সাড়া নেই কোন, শ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছে।

ওই রক্ত...তার রক্ত। গুলি লেগেছে তার। হ্যারি কার্টার তাকে হারিয়ে দিয়েছে। তা-কে হারিয়েছে? আশ্চর্য! ওর পিস্তলের নল উঠতে শুরু করল ধীরে ধীরে, তারপর পড়ে গেল হাত থেকে। আরও একটা পিস্তল আছে তার। সে...

ওটার দিকে হাত বাড়াল সে, পরমুহূর্তেই লুটিয়ে পড়ল ধুলোয়, চিৎ হয়ে। দু'চোখ উল্টে গেল, চিৎকার করে প্রতিবাদ জানাতে চেষ্টা করল, কিন্তু গলায় স্বর ফুটল না। কার্ব পেরিন মরে গেছে।

ওদিকে কার্ব পেরিনকে ভীষণ দেরিতে পিস্তল ওঠাতে দেখে ডাক্তার একছুটে বাড়ির ভেতর ঢুকে গেল। কাইফার তার নেতাকে পড়ে যেতে দেখে নিজের পিস্তল বের করল। কিন্তু কিছু করার আগেই ভয়েল র্যাগানের গুলিতে মারা পড়ল বেচারী। কপাটের পাশেই রাইফেলটা রাখা ছিল, দস্যুদের অসতর্কতার সুযোগে তুলে নিয়েছে ভয়েল।

অনোরা ছত্রভঙ্গ হয়ে নিজেদের ঘোড়া নিয়ে চম্পট দিল। পেছন থেকে একবারই মাত্র গুলি ছোঁড়ার সুযোগ পেল হ্যারি। শেষ গুলিটা করবে, এমন সময় চিৎকারটা শুনতে পেল সে।

নারীমাংসের লোভেই বাথানে এসেছিল ডাক্তার, বাসার ভেতর ঢোকাও সেকারণেই। সবারই মনোযোগ যখন গোলাগুলির দিকে, সেই ফাঁকে ভেতরে ঢুকেই জুলিয়ানাকে দেখে ফেলে সে। জুলিয়ানা তখন ভয়ে শোবার ঘরের দিকে ছুটে পালাচ্ছিল। ঘরের জানালা ছিল খোলা। ওকে জাস্টে ধরে জানালা দিয়ে বাইরে ছুঁড়ে দিল ডাক্তার। ও মাটি থেকে ওঠার আগেই ডাক্তার বেরিয়ে এসে ওকে পাকড়াও করল। দ্রুত জিনের ওপর তুলে ফেলল, তারপর দক্ষ হাতে গোটা কয়েক প্যাচ দিয়ে হাত-পা বেঁধে ফেলল। গালে উল্টোহাতে চড় মেরে মাঝপথেই ওর চিৎকার থামিয়ে দিল সে, তারপর পেরিনের ঘোড়ায় চড়ল। ওর নিজেরটার চেয়ে এটার জাত অনেক ভাল। জুলিয়ানার ঘোড়ার লাগাম ধরে ওখান থেকে সাঁই করে ছুটে বেরিয়ে গেল সে।

হ্যারি ঘুরেই বাসার দিকে ছুটে এল, বুঝতে পারছে ওই চিৎকার ভেতর থেকেই এসেছে। ওদের যখন এক ঝলক দেখতে পেল সে তখন পাইন বনে হারিয়ে যাচ্ছে ওরা। ও দেখল দুটো ঘোড়া। একটার চালক আছে, অন্যটা...?

‘জুলিয়ানা কোথায়?’ চেষ্টা করে জিজ্ঞেস করল সে।

ড্রসিলাকে ইতিমধ্যেই বারান্দায় দেখতে পেয়েছিল। বাড়ির পেছন থেকে ছুটে বেরিয়ে এল ভয়েল র্যাগান। ‘জুলিকে ধরে নিয়ে গেছে,’ চেষ্টা করে বলল সে। ‘আমি ঘোড়া নিয়ে আসছি।’

‘তুমি এখানেই থাকো। বাসার দিকে খেয়াল রাখো! আমি যাচ্ছি ওকে

উদ্ধার করতে!

‘নিজের ঘোড়ার দিকে রওনা দিল সে, পিস্তলে টোটা পুরছে সেই সাথে। আরেকটা ঘোড়ার দিকে এগিয়ে গেল ড্রু র্যাগান।’

‘যাও, বাসায় যাও!’ হুকুম দিল হ্যারি।

‘ও আমার বোন!’ ঝাঁপিয়ে উঠল ড্রু। ‘উদ্ধারের পর নারীর সেবা-যত্নের প্রয়োজন হতে পারে ওর!’

‘এসো তা হলে, তবে অনেকটা পথ যেতে হবে কিন্তু।’

বিশাল মাস্টাংটার মুখ ঘুরিয়ে একলাফে ওটার পিঠে চড়ে বসল সে। বেন কারির সেরা ঘোড়াগুলোর একটা বেছে নিল ড্রু। ওগুলো কেবল ফ্রিপ্রাই নয়, দমও অফুরান।

হ্যারির মনে চিন্তার ঝড় বইছে। ডাক্তার কি টডস্টুলে ফেরার চেষ্টা করবে? তাই যদি হয়, তবে হ্যারি একটু বেকায়দায় পড়বে। ওর মাথাব্যথা বিশেষ কাউকে নিয়ে নয়—তিনজনকে নিয়েই।

গোটা পরিস্থিতি খতিয়ে দেখল সে, ডাক্তার চোখ দিয়ে বিচার করার চেষ্টা করল। জুলিয়ানা যে বেন কারির মেয়ে ডাক্তার এটা জানে না, আর বর্তমান অবস্থায় সম্ভবত সে ওসব পরোয়াও করবে না। তবে এটা ঠিকই বুঝবে যে বেন আবার ক্ষমতায় ফিরে এসেছে, সুতরাং টডস্টুল ক্যানিয়নে ফেরার প্রশ্ন অবান্তর। তা ছাড়া, মেয়েটাকে ও একাই ভোগ করতে চাইবে। খুন করবে বলে মনে হয় না, কারণ কোন মহিলার গায়ে হাত তুললে নিস্তার নেই। ধরা পড়লে ফাঁসিতে ঝুলতে হবে।

বহুকাল আগে রাউণ্ডি ওকে শিখিয়েছিল, কেবল ট্র্যাক অনুসরণ করা ছাড়াও একজন মানুষের পিছু নেয়ার আরও অনেক রাস্তা আছে। মানবমনের জটিল মতিগতিও বোঝা চাই। ডাক্তার যে-ভাবে ভাববে, সেইভাবে চিন্তা করতে চেষ্টা করল ও।

একটা পলাতক আউট-লার কাছে আর যাই থাকুক, বেশি খাবার থাকবে না। অতীতের হামলাগুলো থেকে সে নিশ্চয়ই জেনেছে কোথায় গেলে জল মিলবে। গোপন ডেরার ঠিকানাও তার জানার কথা। এগুলোর কয়েকটায় লোক আছে, অন্যগুলো ফাঁকা। বেন কারির দেখানো ম্যাপের কল্যাণে হ্যারি সবগুলো ডেরার ঠিকানাই জানে।

ট্রেইলটা হঠাৎ দিকপরিবর্তন করে, তীক্ষ্ণ বাঁক নিয়ে ঘন জঙ্গলের ভেতর ঢুকে গেল। রওনা হওয়ার পর থেকে ড্রুসিলা একটাও কথা বলেনি, পেছন ফিরে ওর ধূনিমলিন মুখের দিকে তাকাল হ্যারি—গালে শুকনো অশ্রুধারার দাগ। সপ্রশংস দৃষ্টিতে লক্ষ করল, রাইফেল সঙ্গে নিতে ভোলেনি মেয়েটা। হাজার হলেও বেন কারির মেয়ে, যে-কোন পুরুষের যোগ্য সাথী।

ট্রেইলের দিকে নজর ফেরাল সে। ডাক্তার নিশ্চয়ই বুঝতে পারছে তাকে অনুসরণ করা হচ্ছে বা হবে, ট্রেইলের কোন চিহ্ন না রাখতে সচেষ্টা হবে সে। এ-ব্যাপারে অনভিজ্ঞ নয় সে। বেন কারির দলের একজন হিসেবে অতীতের ডাকাতিগুলো থেকে প্রচুর অভিজ্ঞতা লাভ করেছে।

আর এখন ঠিক তাই হয়েছে। বেমালাম উবে গেছে ডাক্তার।

মরু এলাকায় এসে বালুর ওপর নামল হ্যারি। সুগভীর বালুর স্তর আর অগণিত পশুর ট্রেইলের ভেতর থেকে বাঙ্কিত পদচিহ্ন খুঁজে বের করতে বেশ কয়েকটা মূল্যবান মিনিট ব্যয় করতে হলো ওকে। বালু না সরিয়ে তীক্ষ্ণ চোখে ট্রেইলের দিকে তাকাল ও। বালুস্রোতের গতি অনুসরণ করে অবশেষে আবছা একটা খুরচিহ্ন শনাক্ত করতে পারল। সামনের দিকে গেছে ওরা। বেশিক্ষণ ডাক্তার এই মরু এলাকায় থাকবে না, গভীর বালুতে হাঁটতে গিয়ে ক্লান্ত হয়ে পড়বে ঘোড়া। ঘোড়ার শক্তি অপচয় করতে চাইবে না ও।

এরপর শুরু হলো দুঃস্বপ্নের কাল। সোজা এগিয়ে গেছে ডাক্তার, তারপর ডানে বাঁক নিয়েছে। ট্র্যাক মুছে ফেলার যথাসাধ্য চেষ্টা করেছে। কোন কোন জায়গায় ঘোড়া থেকে নেমে ট্র্যাক মুছে দিয়েছে। রাউন্ডির সমতল ট্রেনিং বিফলে গেল না, রাডহাউন্ডের মত ওর পেছনে লেগে রইল হ্যারি।

ওকে অনুসরণ করতে গিয়ে ড্রু খেয়াল করল, যে-সব জায়গায় কিছুই দেখতে পাচ্ছে না ও, সেখানেও হ্যারি কোন না কোন চিহ্ন ঠিকই খুঁজে বের করেছে। একবার আবছা খুরের চিহ্ন, আরেক জায়গায় গাঁছের ছোট ডাল ভাঙা দেখে ডাক্তার ট্রেইল বের করল হ্যারি।

ধীরলয়ে সময় বয়ে যাচ্ছে, পশ্চিম আকাশে হেলে পড়েছে সূর্য। বোনকে খুঁজে পাওয়ার আগেই রাত নামবে অনুভব করে, তার অমঙ্গল আশঙ্কায় ড্রু শরীর হিম হয়ে এল।

পেছন ফিরে ওর দিকে তাকাল হ্যারি। ‘তুমি আসার জন্যে জেদ ধরেছ,’ বলল সে, ‘কিন্তু রাতেও পথ চলব আমি।’

‘অন্ধকারে ওদের ট্রেইল চিনবে কেমন করে?’

‘দেখতে পাব না, তবে আমার বিশ্বাস ওরা কোথায় যাচ্ছে আমি জানি।’

আধার ঘিরে ধরল ওদের। ঘামে চপচপ করছে হ্যারির শার্ট, শরীরের সাথে সঁটে গেছে। রাতের বাতাসে শীত অনুভব করছে সে, তবু কঠোর সংকল্পে এগিয়ে চলল। একটা সুবিধে তার আছে। কোন ডাকাতিতে অংশ নেয়নি সে, কাজেই সবকটা গোপন ডেরা তার চেনা, এমন সন্দেহ করতে নাও পারে ডাক্তার। বেন কারি আর রাউন্ডির সাথে সে যে সবগুলো আড্ডায় গেছে, কোথায় কী আছে ওর জানা-এ-সবের কিছুই জানে না ডাক্তার।

বিশাল ঘোড়াটাকে দেখে মনে হচ্ছে না দীর্ঘ পথশ্রমে একটুও ক্লান্ত হয়েছে, তবু মাঝে-মধ্যে ড্রু শুনতে পাচ্ছে হ্যারি ঘোড়াটাকে উৎসাহ দেয়ার চেষ্টা করছে। খোলা একটা প্রান্তরের কাছে এসে হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়ল সে, এত আচমকা যে আরেকটু হলেই তার ঘাড়ের ওপর পড়ত ও।

‘ড্রু,’ ফিসফিসিয়ে বলল সে, ‘সামনেই ছোটখাটো বাথান আছে একটা। একজন কিংবা তার বেশি লোক থাকতে পারে ওখানে, তোমার বোনসহ ডাক্তারও নিঃসন্দেহে আছে। আমি দেখতে যাচ্ছি।’

‘আমিও যাব।’

‘এখানেই থাকো! আমি শিস্ দিলে ঘোড়া দুটো নিয়ে যাবে। এ-ধরনের

কাজে আমার দক্ষতা আছে, তা ছাড়া নিঃসাড়ে পৌঁছুতে হবে ওখানে।'

বুট খুলে পায়ে মোকাসিন পরে নিল ও। ওর জিনের খলেতে জুতোজোড়া সর্বদাই সাথে রাখে সে। একমুহূর্ত আগেও ওখানেই ছিল সে, পরক্ষণেই হারিয়ে গেল আধারে—নিঃশব্দে। হঠাৎ অদূরের একটা জানালায় বাতি দেখা গেল...এত তাড়াতাড়ি কেবিনে পৌঁছানোর কথা নয় ওর, ভাবল ডু।

ভূতের মত আধারে মিশে আস্তাবলে পৌঁছুল হ্যারি। কয়েকটা ঘোড়া আছে বটে, তবে আধারে চোখ চলছে না। একটা রেইলে বাঁধা ছিল। ঘোড়াটার মাথায় হাত রাখল ও। ঘামে ভেজা।

ক্ষীণতম শব্দও না তুলে চকিতে জানালার কাছে এসে দাঁড়াল হ্যারি। সাবধানে দেয়ালের গায়ে মাথা সাঁটিয়ে আড়চোখে ভেতরে উঁকি দিল।

পিস্তল হাতে একটা লোক বসে। চৌকো মুখ। হ্যারি দেখল পিস্তলটা টেবিলের ওপর রেখে তোয়ালে দিয়ে ঢেকে দিল লোকটা।

নিঃশব্দে ঘুরে বাড়ির সামনের দিকে গেল হ্যারি। ভেতরে ঢুকল।

ভেতরের লোকটা, সন্দেহ নেই, ঘোড়ার খুরের শব্দ, বা স্পারের ঝনঝন কিংবা বুটের আওয়াজ শুনবে আশা করেছিল। হ্যারির আচমকা উপস্থিতিতে চমকে উঠল সে, কম্পিত হাতে তোয়ালের নীচে রাখা পিস্তলের দিকে হাত বাড়াল।

পায়ের গোড়ালি দিয়ে ওর পেছনে দরজা বন্ধ করে দিল হ্যারি। লোকটা ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে রইল ওর দিকে। বাকস্কিন পরিহিত এই কালোকেশ যুবককে আইনের লোক বলে মনে হচ্ছে না। খানিকটা হকচকিয়ে গেলেও সতর্ক রইল সে।

'তুমি ওঅল্ট সাটন? মারা পড়তে না চাইলে ওই টেবিল থেকে হাত সরাও! হটো!'

ঝটপট পিছিয়ে গেল সাটন, হ্যারি পিস্তলের ওপর থেকে তোয়ালে সরিয়ে নিল। 'কুমতলব করলে আমি খুন করতাম তোমাকে।'

'কে তুমি? কী চাও এখানে?'

'খুব ভাল করেই জানো কী চাই আমি। আমার নাম হ্যারি কার্টার, বেন কারির ছেলে। এই র‍্যাক্স তার। তোমাকে দিয়েছে করে খেতে। আর তুমি কিনা বেঈমানি করছ এখন! ডাক্তার কোথায়?'

সাটন মাথা নাড়ল। 'জানি না,' বলল সে।

'মিথ্যক!' আস্তাবলে ওর ঘোড়া দুটো আছে। 'কোথায় গেছে আমাকে বলবে তুমি, সাটন, নয়তো গুলি করব আমি।'

অস্বস্তিতে পড়ল ওঅল্ট সাটন। ডাক্তারকে সে বেন কারির লোক বলেই জানে। তাজা ঘোড়ার জন্যে এখানে এসেছিল সে। এই যুবককে আগে কখনও দেখেনি সে, তবে সাটনের জানামতে বেন কারি এবং সে নিজে ছাড়া এই বাথানের প্রকৃত মালিক কে কেউ জানে না। এই লোক মিথ্যক হয়ে থাকলে জানল কেমন করে?

'শোনো, মিস্টার, কোনও ঝামেলা চাই না আমি। বিশেষ করে আমার বন্ধু

বেনের সাথে। তার দয়াতেই আমার বাড়বাড়ন্ত। হ্যাঁ, ডাক্তারকে আমি দেখেছি, তবে সে বলেছে আইন তার পিছু নিয়েছে।

‘আমাকে দেখে কি আইনের লোক বলে মনে হয়? ভয়েল ব্যাগানের ভাইঝিকে অপহরণ করেছে ডাক্তার। ওরা বেন কারির বন্ধু। ওকে খুঁজে বের করতে হবে আমার!’

‘ভয়েল ব্যাগানের ভাইঝিকে অপহরণ করেছে? তাই তো বলি, মিস্টার, দুটো ঘোড়া চাইছিল কেন সে!’

দরজা খুলে তীক্ষ্ণ শিশ বাজাল হ্যারি। ‘কোথায় গেছে?’

‘জানি না। ঘণ্টা খানেক আগে এসে জিন সমেত দুটো ঘোড়া, কমল আর কিছু খাবার চায় সে। দুটো ক্যান্টিন নিয়ে সরে পড়েছে।’

দোরগোড়ায় এসে দাঁড়াল ড্রুসিলা, ওর দিকে তাকাল সাটন। ‘আমি চিনি তোমাকে,’ বলল সে, ‘শুভ সন্ধ্যা।’

‘জলদি আমাদেরকে খেতে দাও কিছু। তারপর আস্তাবলের সেরা দুটো ঘোড়া নিয়ে এসো। যাও, দেরি কোরো না!’

টেবিলের ওপর রুটি-মাংস রেখে বেরিয়ে গেল সাটন। সাটনকে আস্তাবল থেকে একছুটে দুটো বিশাল ঘোড়া নিয়ে আসতে দেখল হ্যারি।

দরজার কাছে ও-দুটোকে নিয়ে এল সাটন। রসদভর্তি একটা থলে বেঁধে দিল জিনের পেছনে।

‘তোমার সাহায্যের কথা বেনকে বলব আমি,’ বলল হ্যারি। ‘ডাক্তার কোথায় যেতে পারে, কোন ধারণা আছে তোমার?’

‘ম...’ ইতস্তত করতে লাগল, বোঝা যাচ্ছে ভয় পাচ্ছে সাটন। ‘আমি বলেছি জানলে আমাকে খুন করবে, তবে পীচ মেডো ক্যানিয়নের কথা জিজ্ঞেস করছিল ও।’

‘পীচ মেডো?’ জ্র কোঁচকাল হ্যারি। এই গৈরিক পাথুরে দেশে ওই ক্যানিয়ন একটা কিংবদন্তী, রাউন্ডির মুখে ওটার কথা শুনেছে সে। ‘ঠিক কী জিজ্ঞেস করেছে?’

‘কোথা দিয়ে যেতে হয় আমি জানি কিনা।’

‘তা কী বলেছ তুমি?’

নিক্রপায়ের ভঙ্গিতে হাত ছুঁড়ল সাটন। ‘কী বলব? এখানে আসার পর থেকেই ওই ক্যানিয়ন সম্পর্কে নানান রটনা শুনেছি। খুঁজেওছি। যা শোনা যায় সে-সব সত্যি হলে কে করবে না বলো?’

বাইরে এসে ড্রু বাহুতে হাত রাখল হ্যারি। ‘ড্রু? সামনে দুর্গম পথ, ইচ্ছে করলে ফিরে...’

‘প্রশ্নই ওঠে না।’

‘বেশ, এ-জন্যে অবশ্য আমি অখুশি নই। বরং তোমার সঙ্গ ভালই লাগছে। বস্তুত...’ ওর কণ্ঠস্বর মিলিয়ে গেল।

আরও অনেক কথা বলতে চেয়েছিল ও, ড্রুসিলা দুরূহে পারল। সে জানে, ও ক্রান্ত। হ্যারি বাথানে আসার আগপর্যন্ত বন্ধুর পথশ্রম সম্বন্ধে কোন ধারণাই

তার ছিল না। তবে ওর মুখে ক্রান্তির ছাপ স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে সে।

সুযোগ পেলেই পাশাপাশি চলছে ওরা। হ্যারি পরিস্থিতি ব্যাখ্যা করছে। 'ডাক্তার পথে কোথাও আর থামবে, আমার মনে হয় না। কয়েক মাইলের ভেতর আর কোন ভাল লোকোনের জায়গা নেই। তা ছাড়া, টের পাবে ওর পিছু নেয়া হয়েছে। যদিও বুঝতে পারবে না কে বা কয়জন আসছে। তবে আমি কায়মনোবাক্যে প্রার্থনা করছি, ও যেন বুঝতে পারে আমি ওর পিছু নিয়েছি।'

'কেন?'

'কারণ আমাকে খুন করতে চায় ও। সে-চেঁটায় কোথাও থামতে পারে।'

ষোলো

নিঝুম রাত। ওদের সঙ্গী কেবল দুটো ঘোড়া, আর প্রহরী তারার মেলা। 'আর কতদূর?'

'জানি না,' বলল হ্যারি। 'তবে ডাক্তার ওটার খোঁজ পেয়ে থাকলে লোকোনের জন্যে আদর্শ জায়গা বেছেছে সে। আইনকে কলা দেখাতে দস্যুরা প্রায়ই এ ধরনের জায়গায় আশ্রয় নেয়। কিংবা কোন ইন্ডিয়ান, ট্র্যাপার বা কোন ভাগ্যান্বেষীর কাছ থেকে জানতে পারে। ভবিষ্যতে কাজে লাগতে পারে ভেবে ঠিকানাটা মুখস্থ করে রাখে।'

'পীচ মেডো ক্যানিয়নটা কী?'

'জনশ্রুতি, একটা নদীর কাছে এটা অবস্থিত। কলোরাডো পর্বতমালার গভীর শাখা গিরিখাতগুলোর একটা। প্রচলিত রটনা অনুযায়ী বহুবছর আগে এটা আবিষ্কার করে কেউ। তবে তার আগে স্প্যানিশরা খুঁজে পেয়েছিল। আর স্প্যানিশদেরও আগে ইন্ডিয়ানরা। ওখানে গোটা কয়েক শৈলাবাসের ধ্বংসাবশেষ রয়েছে। তবে মালভূমি থেকে সেখানে যাবার কোন রাস্তা নেই। ইন্ডিয়ানরা একটা চোরাপথের সন্ধান জানত, আর স্প্যানিশরা যেত নদী পথে।

'যে ভাগ্যান্বেষী খুঁজে পেয়েছিল ওটা, সে লোকজনের কাছে গল্প করে যে ওখানে পানীয় জল এবং ছোট্ট একটা গোচারণ ভূমি রয়েছে। কেউ ওখানে পীচ গাছ লাগিয়েছে, সম্ভবত সঙ্গে যে-ফল নিয়ে গিয়েছিল তারই বিচির চারা হবে। ওই লোকটাকে এরপর আর দেখা যায়নি। জায়গাটাও খুঁজে পায়নি কেউ। ফলে ওটা জনরবই রয়ে গেছে। ইন্ডিয়ানরা এখন আর ওরকম কোন জায়গার অস্তিত্ব স্বীকার করে না, তবে এর কারণ বোধহয় ওরা চায় না আর কোন লোক খুঁজে পাক ওটা। হয়তো আমাদের ধোঁকা দেয়ার জন্যে এটা ডাক্তার একটা চাল, আবার এমনও হতে পারে যে সত্যিই ও হয়তো কিছু জানে।'

'এই অন্ধকারে অনুসরণ করবে?'

'না, ঠিক তা নয়। এখন রাত, এই দুর্গম পাহাড়ি এলাকায় জোরে ছুটে পারবে না সে। ক্যানিয়নের বাইরে ও না যাওয়া পর্যন্ত আমরা পিছিয়ে থাকব।

সকাল হলে ওর ট্রাইল ধরব।’

‘জুলিয়ানার জন্যে চিন্তা হচ্ছে আমার।’

‘স্বাভাবিক। তবে আমার ধারণা, ও জানে যে ওকে অনুসরণ করা হচ্ছে।
তাই, সম্ভবত ক্যানিয়নে না পৌঁছানো অবধি থামবে না ও।’

ক্যানিয়নের ভেতর দিয়ে কয়েক মাইল পথ গেল ওরা। এর কথা বেন এবং
রাউডি দুজনের কাছেই শুনেছে সে। দু’দিকে মসৃণ দেয়াল উঠে গেছে অনেক
উঁচুতে। পালানোর কোন রাস্তা নেই। তবে ক্যানিয়ন থেকে বেরুনোর সময়ে
তাকে সতর্ক থাকতে হবে।

ক্যানিয়নের শেষ মাথায় পৌঁছে ঘোড়া থেকে নামল সে। এর পরেই শুরু
হয়েছে বহুদূর বিস্তৃত আধা মরুভূমি। ‘আগুন জ্বালানো যাবে না, বলল সে,
‘কারণ পশ্চিমে একজন লোক অনেক দূর পর্যন্ত দেখতে পায়। এবং আমরা চাই
যে ও মনে করুক ওকে খুঁজে পেতে কষ্ট হচ্ছে আমাদের।’

নিজের ভাঁজ করা পনচোটো (poncho) একটা পাথরের পাশে মাটিতে
বিছিয়ে দিল সে। ডুর দিকে একটা কমল বাড়িয়ে দিল। ‘বিশ্রাম নাও,’ বলল,
‘উপকারে আসবে।’

শীত করছিল জুসিলার, গায়ে জড়িয়ে নিল কমলটা। ‘তোমার শীত করে
না? এক সাথে বসলে ভেতরটা গরম হবে। কমলটাও ব্যবহার করতে পারব
দু’জনে।’

একটু ইতস্তত করল সে, তারপর ওর পাশে বসে কমলটা কাঁধ পর্যন্ত টেনে
নিল। দারুণ ক্লান্ত সে, কিন্তু পাছে ঘুমিয়ে পড়ে সেই ভয়ে জোর করে চোখ খুলে
রাখল। জুলিয়ানাকে ছেড়ে দিয়ে ডাক্তার তাকে খুন করার জন্যে ফিরে আসতে
পারে। ঘোড়া দুটোর পিঠ থেকে জিন নামিয়ে রেখেছে সে। তবে ওরা পালাবে
না, ধারে কাছে কেবল এই জায়গাতেই যা একটু ঘাস আছে।

তবু ঘুমিয়ে পড়ল সে। কবুতরের ডিমের বরন থেকে আকাশ এক সময়
কচি লেবু পাতার মত হয়ে এল। আচমকা জেগে গেল হ্যারি। কান খাড়া করল,
তাকিয়ে দেখল মহাআনন্দে ঘাস চিবুচ্ছে ঘোড়া দুটো। ঘীরে-সুস্থে কমলের নীচ
থেকে বেরিয়ে এল সে।

ঘোড়ার পিঠ চাপড়ে আদর করল, তারপর জিন চড়াল। মাঝে-মধ্যে ডুর
দিকে চোরাচাউনি হেনে দেখল ঘুমুচ্ছে মেয়েটা, সারা মুখে প্রশান্তির প্রলেপ।
এই নির্জন প্রান্তরে সুন্দর একটা মেয়ের সাথে রাজিয়াপন করেছে সে-যার কোন
পিতৃপরিচয় নেই, এতিম, একজন আউট-লর পোষ্যপুত্র-কথাটা মনে হতেই
অভিভূত হয়ে পড়ল হ্যারি।

নিশ্চয়ই তার নড়াচড়ার ফলে মেয়েটা জেগে গেছে, পুরুটু বুকের ওঠানামা
বন্ধ হয়ে গেছে, পরক্ষণেই চোখ মেলল ও। সলজ্জ হাসি হেসে তার দিকে
তাকাল। ‘ভীষণ ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলাম।’ উঠে বসে একটা পাথরখণ্ডের আড়ালে
তার আগুন জ্বালানো দেখতে লাগল। খটখটে শুকনো ডালপালা দিয়ে আগুন
জ্বলেছে সে, যাতে সামান্যতম ধোঁয়াও না ওঠে। আগুনের ওপর ছোট কফি
পাত্রটা বসিয়ে দিয়েছে।

ধলে হাতড়ে গোটাকয়েক ন্যাড়া বিস্কুট আর খানিকটা জার্কি পেল। 'যা পারো এই বেলা খেয়ে নাও,' বলল হ্যারি। 'এরপর আর কোথাও থামব না আমরা।'

বুট জোড়ায় পা গলিয়ে মেয়েটা উঠে দাঁড়াল, মাথা ঝাঁকিয়ে অবিন্যস্ত চুল ঠিক করে নিল।

আঙনের পাশে বসে ঈগল-চোখে সামনের ভূখণ্ডের দিকে তাকাল হ্যারি। এই এলাকা সম্পর্কে যা শুনেছে মনে করতে চেষ্টা করল।

পেছনে কোন ট্রেইল না রেখে দ্রুত এগিয়ে যাবে ডাক্তার। এতক্ষণে হয়তো সে তার গন্তব্যে পৌঁছে গেছে, বা অল্প কিছু দূরে আছে। ফের রওনা দিয়ে সেই আগের তিনটে ঘোড়ার ট্র্যাক অনুসরণ করল ওরা। কাজটা সহজ হলো, কারণ মালপত্র বোঝাই যে-ঘোড়াটা ডাক্তার চালাচ্ছে হ্যারি সেটা চেনে। তা ছাড়া, ট্র্যাকগুলোও পরিচিত।

দ্রুত এগিয়ে ব্যবধান কমিয়ে আনছে ওরা। নীল আকাশে সোনার সূর্যের বসতি। সকালের মিঠে রোদে ওদের পেশীর জড়তা কিছুটা দূর হলো।

ট্রেইলটা ছোট্ট একটা উপত্যকা পার হয়ে একটা পচা ডোবার পাশ দিয়ে পাহাড়ে প্রান্তরে হারিয়ে গেছে। তারপর গিয়ে ঢুকেছে পাইন বনে। কোনখানেই ক্যাম্পের চিহ্নমাত্র চোখে পড়ল না তার। নম্রভাবে জুলিয়ানা নিশ্চয়ই পথশ্রমে নেতিয়ে পড়েছে। দস্যু নিঃসন্দেহে জানে কোথায় সে যাচ্ছে এবং তার গন্তব্যও বেশি দূরে নেই। সে-জন্যই জোরকদমে ঘোড়া ছোট্টাচ্ছে সে। শক্তি বাঁচানোর চেষ্টা করছে না।

ট্রেইল অনুসরণ কষ্টসাধ্য হয়ে উঠছে ক্রমশ। হ্যারি গতি মন্থর করল তারপর থেমে গেল একসময়ে।

বেমালুম অদৃশ্য হয়ে গেছে ট্র্যাক, ঘোড়া তিনটে যেন চূড়োর ওপাশে ঝাঁপ দিয়েছে।

'জিনের ওপর বসে থাকো। আমাদের চারদিক ঘুরে দেখতে হবে একটু।'

উবু হয়ে জমি পরখ করল হ্যারি তারপর হেটে শেষবারের মত ট্র্যাকটা যেখানে দেখেছে সেখানে গেল। পাছে পরীক্ষা করে দেখার প্রয়োজন হয় সে-জন্যই ওই ট্র্যাক নষ্ট করেনি সে।

ওই ঘোড়াগুলোর প্রত্যেকটার চলার ভঙ্গি এখন তার পরিচিত। চোখ দিয়ে প্রতিটা খুরের মাঝখানের দূরত্ব মাপতে চেষ্টা করল।

কিস্সু নেই...

এবার আশপাশের পাইন গাছগুলো দেখতে লাগল। কোথাও সন্দেহজনক কিছু চোখে পড়ল না। সামনের ট্রেইল ছেড়ে জঙ্গলে ঢুকল। নিজের ঘোড়াগুলোর চারপাশে চক্কর দিল একটা। মাটি, গাছের গুড়ি সব কিছু তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে পর্যবেক্ষণ করল। কোন ট্র্যাক নেই।

কোমরে হাত রেখে চূপ করে দাঁড়াল, জ্র কুঁচকে ডাবতে লাগল। ওরা চলে গেছে, পেছনে কোন ট্রেইল ফেলে যায়নি।

জ্র লক্ষ করছিল ওকে, শঙ্কিত হয়ে উঠল এবার। কথা বলতে যাবে কিন্তু

কেনা

এক হাত তুলে বারণ করল হ্যারি। 'খামো! একটু চিন্তা করতে দাও আমাদের।' সামনে এবং ডান দিকের ট্রেইলের প্রতিটা ইঞ্চি পর্যবেক্ষণ করল। কোন সূত্রই পেল না। দু'জন সওয়ারিসহ ঘোড়া তিনটে স্রেফ হাওয়ায় মিলিয়ে গেছে, যেন ডানা গজিয়েছে।

বাঁয়ে গভীর পাইন বন, এত নিবিড় যে যাওয়ার কোন রাস্তা নেই। গুহানকার গাছপালা, ঝোপঝাড় পর্যবেক্ষণ করে দেখেছে সে, কোন ঘোড়সওয়ার ওদিকে যদি যায়ও, তবে বেরবার পথ পাবে না সে।

সামনের ট্রেইলে যেহেতু কোন চিহ্ন নেই, নিশ্চয়ই ডানেই গেছে ওরা। আবার জঙ্গলে ঢুকল সে, এবারেও ব্যর্থ হলো। ব্যাপারটা অসম্ভব, তবু সেটাই ঘটেছে।

'পেছন দিকে ফিরে যায়নি তো?' ডু জিজ্ঞেস করল।

'সে-রকম কিছু দেখছি না। আমার বিশ্বাস...' হঠাৎ চুপ ঘেরে গেল ও, গাল দিল নিজেকে। 'আমি একটা আস্ত হাঁদা। তোমার টুপিটা দেখি।'

টুপিটা দিল ও, বুঝতে পারছে না কিছু। ঝরা-পাইন পাতার ওপর টুপিটাকে পাখার মত নাড়তে লাগল সে। বাতাসে সরে গেল পাতাগুলো। কয়েক মিনিট এভাবে চালিয়ে গেল, তারপর আচমকা থামল।

'পেয়েছি!' আঙুল দিয়ে দেখাল। 'এই যে!'

ঘোড়া নিয়ে আগে বাড়ল ডু। পাইন পাতা সরে যাওয়ায় স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে ট্রাক।

'ডাক্তার ভীষণ চালাক। ফাঁকা রাস্তায় এগিয়ে গেছে, তারপর পাইন ঝোপ ঘেঁষে ফিরতি পথ ধরেছে। কিছুদূর গিয়ে ঘোড়া থেকে নেমেছে। তারপর, সম্ভবত, মোজাপায়ে এখানে এসে পাইন পাতা দিয়ে ট্রাক ঢেকে দিয়েছে। বাকি কাজ সেরেছে বাতাস।'

আবার ঘোড়ায় চেপে পেছন দিকে রওনা হলো ওরা, তবে মাঝে-মধ্যে নেমে ট্রাক পরীক্ষা করছে সে। পাইন বনের ভেতর ট্রেইলটা হঠাৎ করে একটা সরু রাস্তায় বাক নিল। নিবিড় গাছগাছালির মধ্য দিয়ে এগিয়ে গেল ওরা। একবার একটা গাছ দেখাল হ্যারি, রেকাবের ঘমায় ছাল উঠে গেছে এক জায়গায়।

'যতটা নিঃশব্দে পারো এগোও,' ফিসফিস করে বলল হ্যারি। 'জোরে কথা বোলো না। অনেক দূর থেকে শোনা যাবে। পথে অ্যামবুশ করতে পারে ও।'

'তোমার কি মনে হয় যে ও জানে আমরা অনুসরণ করছি?'

'কোন সন্দেহ নেই তাতে। আমি যে একজন ট্রাকার, ও জানে। তবে ভাল না মন্দ জানে না।'

এখন আর ট্রেইল চিনতে অসুবিধে হচ্ছে না, দ্রুত এগিয়ে যাচ্ছে ওরা। ওর সঙ্গিনী ঘোড়সওয়ারের চিন্তা মন থেকে তাড়াতে বেগ পেতে হচ্ছে হ্যারি কার্টারকে। মেয়েটা যখন জানবে তার বাবা একজন আউট-ল তখন কী ভাববে সে? আর ওকেও যে একজন আউট-ল হিসেবেই গড়ে তোলা হয়েছে সে-ব্যাপারেই বা কী মনে করবে?

পাইনের সারি হালকা হয়ে এল, ওদের সামনে এখন বিশাল রহস্যময় নীল প্রান্তর। জিন থেকে নেমে মোকাসিন পায়ে হেঁটে এগিয়ে গেল হ্যারি। ক্যানিয়নের প্রান্তে গোটা কয়েক সিডার আর দু'একটা পাইন গাছ। চারপাশে চোখ বুলিয়ে আচমকা দাঁড়িয়ে পড়ল সে, অনুভব করল ঘাড়ের কাছে রোম দাঁড়িয়ে গেছে।

ওরা কি নেমে গেছে ওখান দিয়ে? পাথরখণ্ডের ওপর হাঁটু ভেঙে বসল সে। হ্যাঁ, পাথরের কিনারে খুরের ছাপ লেগে রয়েছে। আরেকটু এগিয়ে নীচের দিকে তাকাল। গ্রানাইটের দেয়াল কয়েকশো ফুট নেমে গেছে, তবে ট্রেইল আছে, ফুট তিনেক চওড়া পাহাড়ী কার্নিশ একটা।

ফিরে এসে বুঝিয়ে বলল। মাথা দুলিয়ে সায় দিল ডু। 'তুমি পারলে আমিও পারব।' একটু থেমে যোগ করল, 'হ্যারি, ও হয়তো ওঁৎ পেতে আছে আমাদের জন্যে। গুলি করতে পারে।'

কাঁধ ঝাঁকাল সে। 'রওনা দেয়ার সময়েই সেটা আমি জানি, ডু। এরা খারাপ লোক, তা ছাড়া আমাকে ঘৃণা করার মত কারণ ডাক্তার আছে। কোন সন্দেহ নেই, আমাকে খুন করতে চেষ্টা করবে ও।'

'তুমি কিন্তু না এলেও পারতে, হ্যারি।'

আবার কাঁধ ঝাঁকাল সে। 'এ নিয়ে বেশি ভাবিনি আমি। তোমার বোনকে অপহরণ করা হয়েছে। আমি ছিলাম সেখানে, এবং জানতাম কী করতে হবে। ব্যস।'

'তুমি কে, হ্যারি? মনে হলো ভয়েল কাকা তোমায় চেনে, তারপর সেই লোকটা, যে তোমাকে খুন করতে উদ্যত হয়েছিল, সেও চিনত। তোমাকে বলতে শুনেছি আমি, বাথান হামলায় ওদেরকে বাধা দেয়ার জন্যে বেন কারি পাঠিয়েছে তোমাকে। বেন কারি কে? তুমি কি একজন আউট-ল, হ্যারি?'

অতি ধীরে ক্যানিয়নের ওপাশে তাকাল হ্যারি। 'না,' অবশেষে বলল, 'যদিও সে-ভাবেই শিক্ষা দেয়া হয়েছে। নিজের ছেলের মত আমাকে পেলেছে বেন কারি, ভেবেছিল তার পরে দলনেতার আসনে আমাকে বসাবে।'

'ওদের সাথেই থাকো তুমি?'

'যখন বনে-বাদাড়ে থাকি না। বেন কারি নিজে আমাকে সব কিছু শিখিয়েছে। বন্দুক চালনা, ট্র্যাকিং, ঘোড়ায় চড়া-এমনকী সিন্দুক ভাঙা পর্যন্ত।'

'এই বেন কারি লোকটা দেখতে কেমন?' ডু জিজ্ঞেস করল।

একটু ইতস্তত করে হ্যারি বলল, 'আর যে-কোন ক্ষেত্রে একজন মহান লোক হিসেবে বিবেচিত হতে পারত সে। তার নিজের কর্মক্ষেত্রে সে তা-ই। দস্যু-সম্রাটদের যুগে জন্মালে তার কপালেও নিশ্চয়ই খেতাব জুটত একটা।'

'সে যখন পশ্চিমে আসে তখন আইন বলতে এখানে কিছুই ছিল না। এককথায় জোর যার মুল্লুক তার। প্রথম জীবনে, আর সবার মতই, ছোটখোটো একটা বাথান চালু করে সে। অথচ তার ক্ষমতা বেশি ছিল না। তবে শক্তিমানেরা তার পেছনে লাগতে এলে সে বাধা দেয়। উচিত শিক্ষা দেয়, ফলে তাকে আউট-ল হিসেবে চিহ্নিত করে তারা।'

‘এই ভূমিকা মেনে নেয় সে। তবে, বেন ওই শুটকিতক মানুষদের একজন, যারা অল্পে সম্ভ্রষ্ট হয় না। খুব শিগগিরই বিশাল একটা দল গড়ে তোলে সে, এবং একজন পাকা সেনাপতির মত তার আক্রমণ রচনা করে।

‘ইদানীং আর নিজে অংশ নেয় না, পর্দার আড়াল থেকে কলকাঠি নাড়ে। আমার সন্দেহ আছে আর কোন আউট-ল এটা পারত কিনা, কারণ দস্যুরা কারও অধীনে থাকতে চায় না, এবং পকেটে টাকা থাকলে আলো ঝলমলে শহরে গিয়ে ফুটি করতে চায়।’

‘মানুষ খুন করেছে কখনও?’

‘দু’জন, আমার জানামতে। এর একটার পেছনে যুক্তিসঙ্গত কারণ ছিল। আর দ্বিতীয়টা? তাড়া ছিল তার।’

‘ওর হয়ে কৈফিয়ত দিচ্ছ? শত হলেও সে একজন দস্যু এবং খুন।’

‘ঠিক, তবে কৈফিয়ত দিচ্ছি না। সে এমন একজন মানুষ যে সর্বদা তার নিজের পায়ে চলে। অন্যের সাহায্য দরকার হয় না।

‘হয়তো ভুল করেছে, কিন্তু আমার প্রতি সে বরাবর সদয়। যখন আমার যাওয়ার কোন জায়গা ছিল না আমাকে আশ্রয় দিয়েছে, স্নেহ-মমতা দিয়েছে।’

‘হ্যারি, লোকটা কি দেখতে প্রকাণ্ড? বিশালদেহী এক বৃদ্ধ?’

‘চোখ অন্যদিকে সরিয়ে নিল সে। তার মানে ও জানে?’

‘বেশ কিছু ক্ষেত্রে আমার দেখা সবচেয়ে বিশাল মানুষদের মাঝে সে একজন...চলো, রওনা হই বরং।’

অনেকটা শূন্যে পা ফেলার মত দাঁড়াল ব্যাপারটা, তবে ঘোড়া দুটো যথেষ্ট শান্তভাবে মেনে নিল সেটা। শত হলেও এরা পাহাড়ী ঘোড়া, পা রাখার জায়গা যতক্ষণ পাচ্ছে এগোবেই।

অপ্রশস্ত সর্পিল ট্রেইল বেয়ে নামছে ওরা। এখানে-সেখানে মানুষের কর্মকাণ্ডের ছাপ দেখতে পাচ্ছে হ্যারি। শক্তিশালী কোন বিক্ষোভক দ্রব্যের সাহায্যে এই ট্রেইলটা বানানো, আগে ছিল না এটা।

ওরা যখন নামতে শুরু করে তখন পড়ন্ত বিকেল, এখন ক্যানিয়নের দেয়ালে ছায়া বড় হচ্ছে ক্রমশ, ক্ষুধার্ত থাবায় গ্রাস করে নিচ্ছে শেষ সূর্যের আলো। অপেক্ষাকৃত চওড়া একটা জায়গায় এসে নামল ওরা। ডান হাতে রাইফেল ধরে রেখেছে হ্যারি, তড়িৎ ব্যবহারের জন্যে তৈরি হয়ে আছে। যে-কোন মুহূর্তে অঘটন ঘটতে পারে, ঘোড়ার পিঠে সংকীর্ণ ট্রেইলে আটকা পড়তে চায় না সে। আহত ঘোড়া পিছিয়ে গেলে পড়ে যাওয়ার আশঙ্কা আছে।

আবছা অন্ধকারে যতদূর সম্ভব দৃষ্টি মেলে দিল হ্যারি, কোন ঘর-বাড়ি, আগুন বা নড়াচড়া চোখে পড়ে কিনা দেখার চেষ্টা করল। কিছুই দেখতে পেল না।

‘এমনও তো হতে পারে, আদৌ এখানে আসেনি ওরা? তাকে ফাঁকি দিতে ডাক্তার একটা কারসাজিও তো হতে পারে এটা?’

‘আপনমনেই মাথা নাড়ল সে। অসম্ভব, তাকে জিততেই হবে। জুলিয়ানা, আর ডাক্তার কথা ভাবল সে। ওই লোকের সাথে কিছুতেই এঁটে উঠতে পারবে

না মেয়েটা। ডু, ও থাকলে...

নিজের মনে হাসল সে। ডু হলে, সে জানে, ডাক্তারকে বাপের নাম ভুলিয়ে দিত। মেয়েটা সুন্দরী, কিন্তু ভেতরে ইস্পাত-কঠিন দৃঢ়তাও আছে সেই সাথে।

এখন ওরা নদী বয়ে যাওয়ার শব্দ পাচ্ছে, তবে কেবল ধরে পার হওয়ার সময়ে যে-রকম গর্জন শুনেছিল সে-রকম নয়, দ্রুত অথচ শান্ত। সুরেলা।

নদীর তীর ঘেঁষে উঁচু পাঁচিল ঘেরা প্রায়-লুকোনো একটা ক্যানিয়নের দিকে চলে গেছে ট্রাকটা। ক্যানিয়নের দু'দেয়ালের মাঝে ছোট্ট একটা ফাটল দেখা যাচ্ছে, তবে পূর্বদিকটা একটু চওড়া যেন। ট্রাক ধরে এগিয়ে গেল সে। আঁধার নামতে আর দেরি নেই।

সামান্য বাক নিয়েছে ক্যানিয়নটা, দেয়ালে প্রতিফলিত আগনের আলো দেখতে পেল। লাগাম দুটো ডুর হাতে ধরিয়ে দিল। 'ঘোড়ার কাছে থাকবে তুমি।'

'ও...ওরা নাকি?'

'যে কেউ হতে পারে।' থেমে বলল, 'ওকে খুন করতে হবে আমার, তুমি জানো।'

'নিজে মরো না যেন।'

রওনা দিল সে, পেছন থেকে তার বাহু খামচে ধরল মেয়েটা। 'হারি, আমাকে যেতে দাও। আমার কথা হয়তো রাখবে ও।'

'রাখবে না। তুমি জানো সেটা। আমাকেই কাজটা সারতে হবে।'

'কেন এতসব করছ তুমি? ও তোমার বোন নয়।'

'না...তবে তোমার।'

বালি কিংবা পাথুরে পথে ওর মোকাসিন কোন শব্দ তুলল না। আগনের কাছে একজনকে নড়তে দেখল সে। পরক্ষণেই জুলিয়ানাকে দেখতে পেল, দু'বাহুতে মাথা রেখে আগনের কাছে বসে। ওর দিকে তাকাল ডাক্তার, তারপর অর্ধেক গলায় বলল, 'এই কফিটুকু খেয়ে নাও। এখানেই থাকবে তুমি, এই পীচ মেডো ক্যানিয়নে। এখন থেকে তুমি আমার মেয়েমানুষ!'

আগনের পাশ থেকে উঠে দাঁড়াল সে। 'মনসন আর ক্র্যাড! শেয়ালের মত পালাল শালারা! সাহস বলতে কিসসু নেই! মেয়েমানুষের জন্যেই এসেছিলাম আমি, পেয়েওছি!'

'আমাকে ছেড়ে দিচ্ছ না কেন তুমি?' কান্নাভরা মুখ তুলল জুলিয়ানা। 'আমার বাবা বড়লোক। তোমাকে প্রচুর টাকা দেবে।'

'তোমার বাবা? আমি ভেবেছিলাম ভয়েল র্যাগান তোমার কাকা?'

'তাই। বেন র্যাগান আমার বাবা। ক্যানিয়নের উত্তর প্রান্তে তার বাথান।'

'উত্তরে? মরমন না হলে তো সম্ভব নয় এটা।' আচমকা সরাসরি ওর মুখের দিকে তাকাল সে। 'তোমার বাবা কেমন দেখতে বলো তো?'

'বিশালদেহী, পাকা চুল। চওড়া চোয়াল...' ডাক্তার দিকে চোখ পড়তেই কথা বন্ধ করল ও। 'কী হয়েছে তোমার?'

'তোমার বাবা অর্থাৎ ওই বেন র্যাগান-গালে একটা কাটা দাগ আছে, তাই

না?’

‘হ্যাঁ, হ্যাঁ! তার কাছে নিয়ে চলো আমাকে। প্রচুর টাকা দেবে তোমাকে।’

অট্টহাসিতে ফেটে পড়ল ডাক্তার। ‘তা আর বলতে! তার মানে বুড়ো শয়তানটার বুকেই ধাবা বসিয়েছি আমি, অ্যা?’ হলদেটে দাঁত দেখা গেল। ‘খাসা। হারামিটার তা হলে সংসারও আছে? আমি তো ভেবেছিলাম ওর সম্বল কেবল ওই পা-চাটা কুকুরটা, ওই হ্যারি কার্টার!’

সতেরো

কিম বেকা পৌছে গেছে শহরে। তিন বছর হলো ডেনভারের কোন বারে হেলান দিয়ে দাঁড়ায়নি সে। কোর্টহাউসের উল্টো দিকে গাহানস্ বারে যাচ্ছে সে। ওখানে তাকে সবাই চেনে, বন্ধু-বান্ধবরা আড্ডা দিতে আসে। তা ছাড়া, খবর তথ্য সংগ্রহের একটা ঘাঁটি ওটা, আর তার উদ্দেশ্যও তা-ই।

পকেটে টাকা আর হাতে প্রচুর সময় থাকায় ধীরে-সুস্থে এগুচ্ছে বেকা। কয়েক দান পোকার খেলেছিল, এখানে-সেখানে মদ পান করছে খানিকটা, সেরা কয়েকটা রেস্টোরাঁয় ঢুকে খাবার খেয়েছে। পুরোনো সাথীদের সাথে আলাপ করেছে, রাস্তায় কথা বলেছে মেয়েদের সাথে। তবে, গাহানস্ বারে পৌছনোর আগে সত্যিকার অর্থে কোন খবরই শুনতে পেল না সে।

বেকা বয়েসে তরুণ, সুদর্শন। আচার-ব্যবহার বন্ধুসুলভ। কোর্তা থেকে ব্যাজটা খুলে পকেটে রেখে দিয়েছে, কারও মনে সন্দেহ জাগাতে সে চায় না।

বারে ঢুকে একটা বিয়ারের ফরমাস দিয়ে আশপাশে চোখ বুলাল। জর্জ ডেভল বদখত চেহারার দুটো লোকের সাথে অদূরের একটা টেবিলে বসে ড্রিংক করছে। বারের আরেক মাথায় বিল কডি বন্ধু-বান্ধব নিয়ে আড্ডা মারছে। বেকার স্মরণশক্তি ঠিক থাকলে সব কিছু আগের মতই আছে। আরেকটা বিয়ারের অর্ডার দেবে এমন সময় একটা লোক এসে ওর পাশে দাঁড়াল। ‘নতুন কোন মালের খবর আছে?’ জিজ্ঞেস করল লোকটা।

ঘাড় ফিরিয়ে বেকা দেখল ডক মিডলটন হাসিমুখে দাঁড়িয়ে। ডককে পশ্চিমের সবচেয়ে সফল ঘোড়াচোর হিসেবে ধরা হয়, তবে তারা দু’জনেই জানে বেকাও কম যায় না কোন অংশে, সম্ভবত আরও ঘাঘুই হবে।

‘নাহ, তোমার নজরে পড়ার মত কিছু নয়,’ বলল বেকা। ‘আসলে প্রতিযোগিতায় তোমার সাথে টিকতে না পেরে ইস্তফা দিয়েছি আমি।’

হাসল ডক। ‘তোমার সমস্যা ছিল একটাই, সেরা ঘোড়া পছন্দ করতে তুমি,’ বলল সে। ‘আমি নিয়েই বেচে দিতাম। আর তুমি সেখানে দেশের সেরা ঘোড়াগুলো নিজের কাছে রাখতে চাইতে। অথচ ওই সব ঘোড়ার কথা সকলেই মনে রাখে। চুরি করে নিস্তার নেই।’

বারের দিকে পেছন ফিরে দাঁড়াল ডক, কনুইতে ভর দিয়ে তাকাল

বন্ধেরদের দিকে। 'ব্যাঙ্ক পরোনি দেখছি। কাজ ছেড়ে দিয়েছ নাকি?'

'না,' বলল বেকা। 'আমি ভাল হয়ে গেছি, ডক। তাই আমার একটা উপকার করো তুমি, ভুলেও কখনও আমার এলাকায় পা দিও না। পুরোনো বন্ধুকে জেলে পুরতে খুব খারাপ লাগবে আমার।'

'যদি ধরতে পারো তবেই।' ডকের মুখভঙ্গি বদলে গেল, ঘুরে আয়নার দিকে মুখ করে দাঁড়াল সে। 'টমাস এডির সাথে কাজ করছ তুমি, তাই না?'

'হ্যাঁ।'

'লোকটাকে ভাল লাগে আমার। আগে যখন বাথান করত তখন প্রায়ই ওর ওখানে খেতে যেতাম।' ডক পাশ ফিরে ওর চোখের দিকে তাকাল। 'তোমার এখন বাড়ি থেকে দূরে থাকার সময় নয়, কিম। টমাসের সব রকমের সাহায্যের দরকার পড়বে।'

'কেন, ডক?'

'বেন কারির নাম শুনেছ?'

'শুনেছি, তবে বেশি কিছু জানি না।'

বিরাট দল, সবচেয়ে বড়। তবে গুজব, দলে ভাঙন ধরেছে। শোনা যাচ্ছে তোমাদের শহরের ব্যাংকটাই ওদের পরবর্তী লক্ষ্যস্থল। আর যে-দলটা ওই পথে যাচ্ছে তাদের মুখেই শুনলাম, বেন নাকি তার কর্তৃত্ব হারিয়েছে। সে নাকি ভীকু, গোলাগুলি চায় না।'

'কবে হবে?'

'দু'একদিনের ভেতর। সম্ভবত আগামীকাল। ক্র্যাতকে মনে আছে? হ্যাঁ, সে-ও আছে। ও বলে বেড়াচ্ছে টমাস বাধা দেয়ার চেষ্টা করলে তাকে নাকি খুন করবে সে।'

কোর্টার যেখানটায় ব্যাঙ্ক আটকায় বেকা সেখানে আঙুল দিয়ে খোঁচা মারল ডক মিডল্টন। 'আমি পরিনি কখনও, তবে যারা পরেছে তাদের কেউ কেউ অভ্যস্ত ভাল মানুষ। ওদের অনেকের কাছে ভাল ব্যবহার পেয়েছি আমি।'

'এই তো আসার সময়'-গলাটা আরও খাদে নামিয়ে দিল সে-'রাস্তায় ব্যাট ম্যাটারসন-এর সঙ্গে দেখা হলো। হাত মেলালাম আমরা, পুরোনো দিনের গল্প করলাম, তারপর সে বলল আমি যেন ডেনভারে বেশি ঘোরাঘুরি না করি। অনেক লোক আমাকে চেনে।'

'ও জানে, হ্লিয়া আছে আমার নামে কিন্তু, শত হলেও, ইন্ডিয়ানদের বিরুদ্ধে দু'বার এক সাথে লড়েছি আমরা। খুব ভাল মানুষ ও।'

কিম বেকা মাথা দোলাল। 'চিনি ওকে। ভাল মানুষ।' সবেগে ওর মাথায় চিন্তা চলছে। নিজের এলাকা থেকে অনেক, অনেক দূরে আছে সে, অথচ টমাসের দরকার হবে তাকে, ভীষণভাবে দরকার হবে। কোন উপায় নেই...

গাল বকল সে। ট্রেনের কথা মনে থাকে না কেন তার? আসলে এর ব্যবহারে অভ্যস্ত হয়ে ওঠেনি এখনও। টেলিগ্রাফের বেলাতেও একই কথা খাটে। যুহুর্ডের ভেতর নিজের পরবর্তী পদক্ষেপগুলো হিসেব করে নিল সে। প্রথমে টেলিগ্রাফ অফিস, তারপর ট্রেনের একটা টিকিট। 'ধুস্ শালা!' তিক্ত সুরে বলল

সে। 'অনেক আরাম-আয়েশ হলো, এবার যেতে হবে।'

'তোমার জায়গায় আমি হলে, টমাস এডিকে বন্ধু হিসেবে পাওয়ার জন্যে এখানে ঘুরে সময় নষ্ট করতাম না।'

বিয়ার পান শেষ করে বারে পয়সা ছুঁড়ে দিল বেকা। 'ধন্যবাদ, ডক। তোমার উপকার ভুলব না আমি।'

টমাসকে বলো, ওর কথা ভুলিনি আমি। মনসন আর ক্ল্যাভ ওয়া, কিন্তু টমাস এডি ভাল লোক।'

বার থেকে বেরিয়ে টেলিগ্রাফ অফিসে গেল কিম বেকা। তার পাঠাল সে।

পাঁচজন না, সাত কিংবা আট। মনসন আর
ক্ল্যাভ। কাল অথবা পরশু। এখন পথে
কেবি

'পূবে যাওয়ার পরবর্তী ট্রেন কয়টায় ছাড়বে?'

কাউন্টারের ওপাশ থেকে ডিসপাচার তাকাল ওর দিকে। 'কাল সকালে। আটটায়।'

'আজ রাতেই দরকার আমার।' ডেপুটি মার্শালের ব্যাজটা দেখাল বেকা। আমি আর আমার ঘোড়া আঁটে এমন একটা রেলকার হলেই চলবে। ভূমি বললে ডেভ কুককে জানাতে পারি আমি।'

'কী ব্যাপার?'

খুলে বলল বেকা, সংক্ষেপে। ডিসপাচার জবাব দিল, 'মনসন, ক্ল্যাভ, না? ট্রান্সমিটার আনছি আমি। দেখি কী করা যায়।' উঠে দরজার দিকে যেতে যেতে বলল, 'এর আগে ট্রেন ডাকাতি করেছে ওরা। বছর পাঁচেক আগে ক্ল্যাভ আমাদের এক লোককে খুন করেছে।'

এক ঘণ্টা পর। পূবের পথে ছুটে চলেছে বেকা। ও বসে আছে একটা ডাইনিং কারে। মালগাড়িতে তুলে দিয়েছে ঘোড়াটাকে। ভাগ্য সহায় হলে যথাসময়ে পৌঁছুতে পারবে সে।

কয়লার ইঞ্জিন, স্টককার আর ডাইনিংকার-এই মিলিয়ে বেকার ট্রেন। তবে, আশার কথা রাস্তা একদম ফাঁকা।

স্টোভে কফি জ্বাল হচ্ছে। একটা কাপ নিয়ে কফি ঢেলে নিল বেকা। বাইরে, ওই প্রান্তরের কোন এক জায়গায় মনসন আর ক্ল্যাভ আছে। টমাসের শহরের দিকে সদলে ছুটে যাচ্ছে ওরা।

টমাসকে অবশ্য সাত-আটজনের কথা বলে হুঁশিয়ার করে দিয়েছে সে। তবে সবটাই অনুমান-নির্ভর। বেন কারি এক সাথে পাঁচজনের বেশি পাঠায় না, কিন্তু বেন এখন ক্ষমতায় নেই, আর ক্ল্যাভ সাক্ষপাৎ নিয়ে চলতে পছন্দ করে। একবারে যা পারে সব নিতে চেষ্টা করবে সে, এ-জন্যে জোর হামলা চালাবে ওরা।

মনসন আর ক্ল্যাভ খুন করার জন্যে গুলি ছুঁড়বে।

টমাস যদি ওর টেলিগ্রাফ পায় তবে সে নিজেও একটা কিছু পরিকল্পনা নেবে। দু'একজন সাহসী লোক জুটিয়ে নেবে। স্টোরের উল্টো দিকেই ব্যাংক, আর স্টোরের পাশের দালানে তার অফিস। ওখানে একজন লোক মোতায়ন করলে, সে ব্যাংকের মূল এবং সাইড ডোর কাভার করতে পারবে। টমাস তার জেল-অফিসে বসলে সেখান থেকে ব্যাংকের এপাশ-ওপাশ দু'দিকেই নজর রাখতে পারবে। আর ব্যাংকের পেছনে যে বিশাল গোলাঘরটা রয়েছে, সেখানে এবং আরেকটু সামনে লোক রাখলে পুরো এলাকাটাই এসে যাবে তাদের আওতায়।

কফি শেষ করে ব্যাংকের ওপর লম্বা হয়ে শুয়ে পড়ল সে। কোন কোন জায়গায় লোক মোতায়ন করা উচিত বা কী ধরনের ব্যবস্থা নিতে হবে চিন্তা করতে করতে ঘুমিয়ে পড়ল।

ট্রেনের গতি মন্থর হতেই জেগে গেল। উঠে বসল ঝট করে। পকেট থেকে ঘড়ি বের করে দেখল। ডেনভার থেকে মাত্র এক ঘণ্টার পথ এসেছে তারা।

ট্রাকের প্রতি নজর রাখছিল ব্রেকম্যান। 'কিম,' বলল সে, 'গুলি করো। সামনে লাইনের ওপর ঘোড়াসহ একটা লোক দাঁড়িয়ে। ট্রেন থামাতে ইশারা করছে।'

গানবেন্টটা কোমরে ঝুলিয়ে রাইফেল তুলে নিল বেকা। 'একজন? ঠিক দেখেছ তুমি?'

'বাহ? এরকম ফাঁকা জায়গায় দেখতে ভুল হয় কখনও? লোকটাকে দেখে মনে হচ্ছে একটা ট্রেন তার ভীষণ দরকার।'

'ঠিক আছে, থামাও।'

ব্রেকম্যানের সঙ্কেতে ট্রেনের গতি আরও কমে গেল। জানালার ফ্রেমে উইনচেস্টারটা রেখে বসে রইল বেকা। লোকটাকে এবার স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে সে, যদিও চেহারা চেনা যাচ্ছে না পুরোপুরি। তবে এ ঘোড়াটা...!

আস্তে আস্তে থেমে গেল ট্রেন।

'আই, কে ওখানে? নাম বলো! সাবধান, রাইফেলের নল তাক করা আছে তোমার দিকে!'

'আমার নাম...' মাঝপথে কথা থামিয়ে এগিয়ে এল লোকটা। 'কিম নাকি? আমি চার্লি ফ্যারেল। তোমাদের ব্যাংক লুট হতে যাচ্ছে।'

'জানি। সে-জন্যেই তো ফিরছি আমি। চলে এসো।'

'রওনা হয়েছিলাম ডেনভার যাব বলে। সাপার খেতে উইগিনস রেস্তোরাঁয় যেতে টেলিগ্রাফ অপারেটরের সাথে দেখা হলো। খবরটা পেয়ে এখন টমাসের সাথে যোগ দিতে যাচ্ছি।'

কফির জন্যে স্টোভের দিকে এগিয়ে গেল সে। কাপে ঢেলে নিল খানিকটা। ঘন কালো। গরম। বেকাও এক কাপ নিল। নিজের প্যান খুলে বলল সে। 'আমার ধারণা, টমাসও এভাবেই লোক সাজাবে।'

'মনসন আর ক্র্যাত? শক্ত চিজ,' বলল চার্লি।

পেয়ালায় চুমুক দিল বেকা। 'টেলিগ্রাফ আর ট্রেন চালু হওয়ায় লুটেরাদের

কপাল পড়েছে।

‘পরিস্থিতি বদলে যাচ্ছে এর ফলে,’ সায় দিল চার্লি। ‘আমাদের কথাই ধরো, দু’বছর আগে হলে কোন মতেই ঠিক সময়ে পৌঁছুতে পারতাম না।’

‘এখনও পারব না হয়তো।’

এক নাগাড়ে ছুটছে ট্রেন। পালা করে ঘুমিয়ে নিয়েছে দু’জন। এখন গল্প করছে। জানালা দিয়ে মাঝে-মধ্যে দেখছে দ্রুত পিছলে সরে যাচ্ছে রুক্ষ প্রান্তর।

এই এলাকার ওপর দিয়ে ওয়াগন ট্রেন, গবাদি পশুর বহর গেছে। তারও আগে এটা ছিল ইন্ডিয়ান এলাকা। অ্যাপাচিদের বিভিন্ন গোত্র বাস করত এখানে, তাদের অধিকাংশই কোমাঞ্চদের হাতে মারা পড়েছে।

বেকা সে-কথা বলতেই ঘাড় নেড়ে সায় দিল চার্লি। ‘শ্বেতাস্রদের চেয়ে স্বজাতির হাতেই ইন্ডিয়ানরা মারা পড়েছে বেশি,’ বলল সে। ‘বিলুপ্ত-প্রায় কয়েকটা গোত্রের দু’একজনের সাথে আলাপ হয়েছে আমার।’

জানালায় ফাঁক দিয়ে বাইরে তাকাল সে। সমতল ভূমির ওপর দিয়ে একটা অ্যান্টিলোপ ছুটে যাচ্ছে, চকিতে থেমে পেছন ফিরে তাকাল, তারপর আবার দৌড় দিল। একটা নিচু টিলার মাথা থেকে ছটা মোষ অবাক চোখে দেখছে ট্রেনটাকে।

‘আশা করি তোমার তার পেয়েছে সে,’ বলল চার্লি। ‘তবে এমনিতেও ও ইন্ডিয়ান লোক। ওকে বেকায়দায় ফেলতে পারবে না কেউ।’

‘ব্যাংকটার প্রতি যে ওদের নজর পড়েছে এ-কথা সে জানে,’ বলল বেকা।

ছাত উপরে ডাইনিং কারে ফিরে এল ব্রেকম্যান। ‘পানির জন্যে থামতে হবে। তোমরা তৈরি থাকো। কেউ ওঠার চেষ্টা করতে পারে।’

দিনের আলো নিভে এল। পানির ট্যাংকের পাশে থেমে আছে ট্রেন। যোজন-বিস্তৃত প্রান্তর। এখানে-সেখানে খানা-খন্দক। বহু দূরের একটা জানালায় বাতি দেখা যাচ্ছে। এই ফাঁকা ময়দানে, সাহসী লোক সন্দেহ নেই।

পানির পাইপ খুলে জায়গায় নিয়ে রাখল ব্রেকম্যান। বেকা আর ফ্যারেল উঠে পড়ল গাড়িতে।

‘প্রথম যখন পশ্চিমে আসি,’ বলল চার্লি ফ্যারেল, ‘ক্যাটল ড্রাইভে যোগ দিয়েছিলাম। ওরিনও ছিল সঙ্গে। অ্যাবিলেন পর্যন্ত গিয়েছিলাম আমরা। তারপর এই এলাকায় এখান থেকে সোজা দক্ষিণে। বুনো গরু-মোষ ধরে বিক্রি করতাম।’

‘ভূমি-বন্টন লড়াইয়ে ভূমি অংশ নিয়েছিলে, তাই না?’

‘হ্যাঁ। ওরিন আর আমি। ওরিন ওখানকার শেরিফ ছিল কিছু দিনের জন্যে। তারপর আইনের ওপর বিশদ পড়াশুনো করে রাজনীতিতে যোগ দিয়েছে।’

‘চলো এই বেলা ঘুমিয়ে নেই। সকাল হয়ে যাবে পৌঁছুতে।’

‘ব্রেকম্যান জানাল সূর্য ওঠার পরপরই শহরে ঢুকব আমরা।’

‘বেন কারি সব সময় ঠিক ব্যাংক খোলার মুখে হামলা চালায়,’ বলল বেকা। ‘রাস্তায় লোক কম থাকে, আর ব্যাংকেও তখন ওই দিনের লেনদেনের জন্যে ভল্ট থেকে টাকা বের করা হয়।’

ঘুমিয়ে পড়ল ওরা, জাগল ভোরের আলো ফোটান একটু আগে। চার্লি ফ্যারেল তার অস্ত্রশস্ত্র পরখ করে নিল।

বেকা জানালার কাছে গিয়ে বাইরে উঁকি দিল। এক মুহূর্ত তাকিয়ে থেকে ডাকল, 'চার্লি?'

পাঁই করে ঘুরল চার্লি, ওর গলার অস্বাভাবিক টান তার কান এড়ায়নি। 'কী ব্যাপার?'

'দ্যাখো।'

চার্লি নিচু হয়ে তাকাল।

দেখা যাচ্ছে ওদের, পাশাপাশি তিনজন, বাকি সবাই পেছনে। বেকা গুনল জোরে জোরে। '...সাত, আট...নয়। নয়জন মোট। আশা করি টমাস লোক জোগাড় করতে পেরেছে।'

নয়জন ঘোড়সওয়ার এগিয়ে যাচ্ছে টমাস এডির ফাঁদে পা দিতে।

'একটা ব্যাপারে নিশ্চিত আমরা,' নিরুত্তাপ গলায় বলল চার্লি।

'কী?'

'সময় মতই পৌঁছুছি।'

আঠারো

কফি পান শেষ করে উঠে দাঁড়াল টমাস এডি, টুপির দিকে হাত বাড়াল। 'যাই, অফিসে গিয়ে বসি বরং।'

ঘুরে স্ট্রীর দিকে তাকাল। 'কোথাও যাবে নাকি, বেস? চার চোখ এক হলো। রোজকার মত অপূর্ব লাগছে ওকে দেখতে। আজ পর্যন্ত এমন একটা দিনও যায়নি, যে-দিন ওকে স্ত্রী হিসেবে পাওয়ায় বিধাতাকে ধন্যবাদ দেয়নি সে।

'কোথায় যাব?'

'আমি ভাবলাম মেরি বা আর কারও বাসায় যাবে হয়তো।'

'বাসাতেই থাকব।' স্বামীর কোটের কলার ঠিক করে দিল ও। 'সাবধানে থেকো, টম। সর্বদা ভয়ে ভয়ে থাকি আমি।'

'ভয় কী, আমি ভাল থাকব।'

বাঁশি বাজাল একটা ট্রেন, ঝট করে ঘুরে দাঁড়াল সে। 'আজব ব্যাপার! আজ সকালে তো কোন ট্রেন আসার কথা নয়।'

বাইরে উঁকি দিল সে, কেবল একটা লোকোমোটিভ, স্টককার আর একটা ডাইনিং কার দেখতে পেল। ব্যাপারটা কী?

রাস্তায় এসে স্টেশনের দিকে তাকাল। ডিউটি ক্লার্ক প্র্যাটফর্মে গিয়ে দাঁড়িয়েছে, দেখছে আগুয়ান ট্রেনটাকে। খাপ থেকে পিস্তল বের করল টমাস এডি। রাস্তার দিকে তাকাল, কিন্তু কাফেটা তার দৃষ্টি আড়াল করে রেখেছে

অনেকটা।

অপর কাফেটার সামনে দু'জন লোক দাঁড়িয়ে। ওটা রাস্তার উল্টো দিকে, তার বাসা আর রেল রাস্তার মুখোমুখি। ওটার পেছনেই মেরি অ্যানের বাসা। ওখানে কেউ জটলা পাকাচ্ছে না, তবে সুতোর মত ধোয়ার রেখা উঠছে চিমনি থেকে।

প্র্যাটফর্মে এসে দাঁড়াল ছোট ট্রেনটা। পুরোপুরি থামার আগেই ডাইনিংকার থেকে নামল দু'জন লোক।

দৌড়ে গিয়ে স্টককারের দরজা খুলতে শুরু করল ওরা। ওদের একজন কিম বেকা, অপরজন?

চার্লি ফ্যারেল!

টমাস বাসায় ঢুকে তাক থেকে উইনচেস্টারখানা তুলে নিল। বেস তাকাল ওর দিকে। মুখ ফ্যাকাসে।

‘টমাস, কী ব্যাপার?’

‘ঝামেলা,’ বলল সে। ‘কিম ফিরে এসেছে, সঙ্গে চার্লি। ছুটে আসছে ওরা।’ চেঘারে টোটা ভরে বলল, ‘এখানে এলে বলো আমি অফিসে আছি।’

‘অপেক্ষা করলে ভাল হত না?’

‘সত্যি যদি কোন বিপদ আসে, তবে আগে থেকেই শহরবাসীদের সতর্ক করে দেয়া আমার কর্তব্য। সম্ভবত বিপদ আসছে, অত্যন্ত দ্রুত, নয়তো এ-রকম তাড়াহুড়ো করে আসত না ওরা।’

আবার বাইরে এল সে, কাফে আর পোস্ট অফিসের মাঝবানের ফাঁকা জায়গাটার দিকে এগিয়ে গেল। বড় রাস্তায় নামতেই দেখল পোস্ট অফিসের সামনে ফুটপাথ ঝাড় দিচ্ছে প্রিসি।

‘প্রিস,’ দ্রুত গলায় বলল সে, ‘রাস্তা থেকে সরে যাও। মনে হচ্ছে বিপদ আসছে আমাদের।’

‘টমাস, তুমি যদি ভেবে থাকো যে আমি ভয়...!’

‘প্রিস, গোলাগুলি হওয়ার আশঙ্কা আছে। সম্ভবত ডাকাত আসছে। রাস্তা থেকে সরে যাও তুমি, আর সাহায্য করতে চাইলে দৌড়ে গিয়ে জর্জ আর হায়াতকে খবর দাও।’

‘পারব না, মার্শাল। আমার রাইফেল আনতে যাচ্ছি আমি। তুমি বলো ওদের!’

কোর্তার খোট ধরে টানছে কেউ, ঘুরে দাঁড়াল টমাস। বিলি ম্যাককয়, টমের বন্ধু। ‘আমি যাই?’

‘আচ্ছা। দৌড়ে যাও, সবাইকে তৈরি থাকতে বলো। আমার ধারণা ব্যাংক লুট করতে আসছে।’ ঘুরে চোঁচিয়ে বলল, ‘ভেতরে যাও সবাই!’

জেল গেটে নেল ফস্টারের সাথে দেখা হলো। লোকটা এখানকার জেলার, আবার মাঝে-মাঝে তার সহকারীর দায়িত্ব পালন করে। ‘এখানেই থাকো,’ ওকে বলল টমাস।

শেষ পর্যন্ত কিছু না ঘটলে আহাম্মক বনে যাবে সে। কিম আর চার্লি নাস্তার

জানোও তো ছুটে আসতে পারে। কিন্তু বিশেষ ট্রেনে কেন?

রাস্তার দিকে দৃষ্টি নিষ্ক্ষেপ করল সে। কাকের সামনে জিন চাপানো তিনটে ঘোড়া দাঁড়িয়ে, রাস্তার ও মাথায় মেক্সিকান কাকের সামনে একটা। মুদি দোকানের সামনে একটা বাকবোর্ড। সরাবার সময় নেই, কপালের লিখন মেনে নিতে হবে ঘোড়াগুলোকে।

কিম বেকা এসে ঢুকল। 'ওরা আসছে, টমাস। শহরে ঢোকার মুখে দেখলাম ওদের। মোট ন'জন, মনসন আর ক্ল্যাভ নেতৃত্ব দিচ্ছে।'

'কত দূরে আছে?'

'কত দূরে মানে? আমাদের ট্রেন দেখে ভয় খেয়ে না থাকলে যে-কোন মুহূর্তে এসে পড়বে। আর আমার মনে হয় না ওরা ভয় পাওয়ার বান্দা।'

শহর থেকে দু'মাইল দূরে। সঙ্গীদের সাথে শেষ মুহূর্তে গোটা প্ল্যান আরেকবার ঝালাই করে নিচ্ছে মনসন। 'তোমরা জানো কী করতে হবে। ক্ল্যাভ, আমি আর পার্কি সোজা ব্যাংকের দিকে এগিয়ে যাব। ক্লনডাইক, তুমি আস্তাবলের পেছন দিয়ে ঢুকবে। আমাদের ঘোড়া দেখার ভার তোমার। আর বাকি যারা রইল, তারা রাস্তার দিকে নজর রাখবে।'

'গোলমাল হলে?'

'বন্দুক আছে তোমাদের কাছে। বুড়ো কর্তার দিন শেষ।' বলল মনসন। 'এখন নেতা আমি আর ক্ল্যাভ। তেরিমেরি করলে বাছাধনদের টের পাইয়ে দেব মজা।'

'চলো, চলো!' অধৈর্য সুরে তাড়া দিল ক্ল্যাভ।

ক্লনডাইক দোটানায় পড়ে গেল। 'মনি, ওই ট্রেনটা কিন্তু ভাল ঠেকছে না আমার।'

'বাজে চিন্তা বাদ দাও তো! দেখছ না মাল গাড়ি। নাও চলো!'

অফিস-ঘরের দরজার সামনে দাঁড়িয়ে আছে টমাস এডি, ওর পেছনে কারাকক্ষ। জানালায় নেল ফস্টার। ব্যাংকের ছাতে হায়াত জনসন, কনফেডারেট অশ্বারোহী বাহিনীতে একজন মেজর ছিল সে। এক্সপ্রেস অফিসে আছে জর্জ রেজার। ও একজন শার্পশটার, ইন্ডিয়ানদের বিরুদ্ধে গোটাকয়েক যুদ্ধে অংশ নিয়েছে।

রাস্তার দিকে তাকাল সে। তিনজন আসছে, পাশাপাশি, একবারে রাস্তার মাঝখান দিয়ে। যেখান থেকে আস্তাবলের পেছন দিকে চলে গেছে একজন, সেখানে ধুলো উড়ছে।

'নেল?' রাস্তা থেকে চোখ না সরিয়েই ডাকল সে। 'আস্তাবলের পেছন দিয়ে আসছে একজন। তুমি সামলাও ওকে।'

টমাস এডি দরজার বাইরে পা রাখল, বড় রাস্তার কিনার বরাবর হেঁটে গেল।

শেষ দু'জন ঘোড়সওয়ার শহরে ঢুকতেই ম্যাককয়দের বাসার আড়াল থেকে বেরিয়ে এল চার্লি ফ্যারেল, ওর বুকের ব্যাজ স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। ডাকাত দলের অনোরা ওদের পঞ্চাশ গজ সামনে রয়েছে, ওদের দৃষ্টি রাস্তা এবং আশপাশের

বাড়িঘরের দিকে নিবন্ধ।

‘শোনো, বাছারা, আমি চার্লি ফ্যারেল। কথা আছে তোমাদের সাথে। ঘোড়া থেকে নেমে এ-দিকে এসো। মাথার ওপর হাত তুলে আসবে কিন্তু।’

চার্লি ফ্যারেল? মোরার বন্দুকবাজ?

ড্যানি ডিনসমোরের মনে হলো তার পেটের ভেতর পাক দিচ্ছে কিছু। অসুস্থ বোধ করছে সে। ব্যাপার কী? ফ্যারেল এখানে কেন?

দোটিনায় পড়ল সে। জ্বর কাছে চিকন ঘাম দেখা দিল। ওর পাশেই ছিল ক্লাইড বুসি। ক্লাইড সাহসী, তবে...

‘এ-সব কী?’ প্রতিবাদ করল সে।

ধমক লাগাল চার্লি। ‘ভাল চাও তো নেমে এসো, এক্ষুণি!’

‘গানবেল্ট ফেলে দেব?’ জিজ্ঞেস করল ড্যানি।

মনে হলো হাসল চার্লি, তবে হাসিটা পছন্দ হলো না ড্যানির। কোন্ দুঃখে আউট-ল হতে চেয়েছিল সে?

‘না, না! থাকুক। আমি চাই না কেউ বলুক নিরস্ত্র লোককে গুলি করেছে আমি!’

ক্লাইড কোন উচ্চবাচ্য করল না। অতিসাবধানে ঘোড়া থেকে নামল দু’জন।

প্রথম তিন ঘোড়সওয়ার যখন টমাসের প্রায় পাশে এসে গেল, বাঁ-হাতে তুলল সে। ‘এক মিনিট দাঁড়াও! আমি টমাস এডি। এই শহরের শেরিফ। কথা আছে তোমাদের সঙ্গে।’

মনসনের মাথায় একটা সঙ্কেত বেজে উঠল। এডি? এর কাছেই তো ঘোড়াগুলো রাখা আছে। হলোটা কী? রিগিন নামের এক বুড়ো হাবড়া না শেরিফ ছিল এখানে!

তবু দাঁত কেলিয়ে হাসল মনসন। ‘দুঃখিত, শেরিফ, কথা বলার সময় নেই। বরং এক কাজ করো, তোমার গানবেল্ট ফেলে দিয়ে আমাদের আগে আগে ব্যাংক অবধি যাও। আচ্ছা?’

পেছন ফিরল মনসন। ‘রাস্তায় কাউকে দেখলে গুলি করবে!’

বেশ আমোদ পাচ্ছে সে, নিশ্চিত যে মফস্বল শহরের কোন শেরিফ...

পিস্তল বের করতে দেখেনি সে। টমাস এডিকে তখনও বুক চিতিয়ে থাকতে দেখে হোলস্টারের দিকে হাত বাড়াল মনসন। বিদ্যুৎ বেলে গেল টমাসের দেহে, পিস্তল বের করেই বাঁয়ে সরে গেল। গুলি করল মনসন, উদ্ভেজনার বশে লক্ষ্যভ্রষ্ট হলো। তার ঘোড়ার গলায় আঁচড় কেটে বেরিয়ে গেল টমাসের গুলিটা। সবেগে গা ঝাড়া দিল কালো ঘোড়াটা, পড়ে গেল মনসন।

গোলাগুলির শব্দে মুখরিত হয়ে উঠল রাস্তাঘাট। ভয় পেয়ে চিচি রবে পেছনের পায়ে ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে গেল বাকি ঘোড়াগুলো। বারুদের গন্ধে ছেয়ে গেল চারদিক।

আস্তাবলের পেছন দিয়ে আসার সময় গুলির আওয়াজ পেল ক্রনডাইক, ‘দেখল পড়ে যাচ্ছে তার গুরু, ছুটে পালাচ্ছে ওর ঘোড়া। ব্যাংকের ছাত থেকে

গুলি হুঁড়ছে কেউ, পোস্ট অফিসের সামনে একজনকে বসে থাকতে দেখল ও, হাতে বিশাল পয়েন্ট ফাইভ জিরো রাইফেল। বুড়ো বয়সে যে-লোক রোদ পুইয়ে কাটাতে চায় তার জন্য এটা আদর্শ জায়গা নয়। ঘোড়ার মুখ ঘুরিয়ে গোলাবাড়ির দিকে ছুটল সে, ইচ্ছে ওখানে থেকে মওকা বুঝে চম্পট দেবে।

ক্লনডাইক কখনও বিশালদেহী নেল ফস্টারের নাম শোনেনি। চিতার মত নিঃশব্দ চলাফেরা ফস্টারের। হাসে খুব কম। সে জানে না, যে-বছর তার জন্য সেই বছরেই ফস্টার তার নয় নম্বর খুনটা করেছে-অবশ্যই আত্মরক্ষার জন্যে। যা বুঝতে পারছে ক্লনডাইক, তা হলো, তার চারপাশে গোলাগুলি হচ্ছে, এবং সে সটকাতে চাইছে। দ্রুত। পালাবার জন্যে ঘোড়া ছোটাল সে, ঠিক পথেই দু'কদম এগুলো ঘোড়াটা। দোরগোড়া থেকে শার্পস-এর ঘোড়া টিপল ফস্টার। ঘোড়ার নড়াচড়ায় গুলিটা একটু নিচু দিয়ে গেল। ক্লনডাইকের জিনের ক্যান্টল্য়ে লেগে উর্ধ্বমুখী হলো বুলেটটা। ধাতব পদার্থের ঘষা খেয়ে মাথা ভোঁতা হয়ে গেছে একটু, ঘোড়সওয়ারীর খুলির পেছনটা উড়িয়ে নিয়ে গেল।

ক্লনডাইকের নিঃশ্রাণ দেহ আরও আধমাইল জিনের ওপরেই রইল, তারপর লটিয়ে পড়ল ধুলোয়। কিছুদূর এগিয়ে খামল ঘোড়াটা, পিঠে প্রভুকে না পেয়ে পিছিয়ে এল একটু, অপেক্ষা করতে লাগল।

যেখানে পড়েছিল সেখানেই পড়ে রইল ক্লনডাইক। একদা তেজী ক্লনডাইকের সমস্ত তেজ শেষ হয়ে গেছে। চোখ দুটো খোলা, স্থির চেয়ে আছে আকাশের পানে। 'আমার ইচ্ছে... শেষ ইচ্ছে...'

মেঘের আড়ালে ঢাকা পড়ল সূর্য। একটা ফড়িং এসে বসল ওর শার্টে, উড়ে গেল আবার। কয়েক গজ দূরে ওর ঘোড়াটা ঘাস খেতে শুরু করল।

ওদিকে রাস্তায়। রূপোর বেলেট বাকলটা নিয়ে ক্ল্যাতেব গর্বের অন্ত ছিল না। কিন্তু আজ সেটাই ওর কাল হয়ে দাঁড়াল। এক্সপ্রেস অফিসের সামনে একটা থামের গায়ে হেলান দিয়ে বসেছিল জর্জ রেজার। তার সৈনিক জীবন বহুকাল আগেই গত হয়েছে, তবে রাইফেলের হাত নষ্ট হয়নি।

বাকলটা ঝিক করে আমন্ত্রণ জানাতেই সেটা গ্রহণ করল জর্জ। এমনিতে শান্ত, নিরীহ টাইপের লোক, সঙ্কোয় বাসায় বসে কফির সাথে কাগজ পড়তে ভালবাসে। কিন্তু তাই বলে তার শহরে এসে কিছু গুণাপাণ্ডা দৌরাড্যা করে যাবে, এটা বরদাশত করতে পারে না সে। রাইফেলের বুলেট দুটো যেখান দিয়ে চুকল সেখানে অনায়াসে একটা রূপোর ডলার রেখে দেয়া চলে, কিন্তু বেরুনোর রাস্তাটা কুমাল দিয়েও ঢাকা যাবে না।

মুখ খুবড়ে পড়ে গেল ক্ল্যাতেব, কেউ-ই বুঝতে পারল না বাকি দু'জনকে শেষ করল কে। কারণ কয়েকজন গুলি হুঁড়ছে এক সাথে-এবং প্রত্যেকেরই নিশানা অব্যর্থ।

যেমন হঠাৎ শুরু হয়েছিল তেমনি নীরব হয়ে গেল সব কিছু। বাতাসে কেবল ধুলো আর বারুদের পোড়া গন্ধ।

রাস্তা দিয়ে একটা ঘোড়া হেটে গেল। আরেকটা দালান-কোঠার মাঝ দিয়ে ছুটে পালাল। বাকিগুলো যেখানে ছিল সেখানেই দাঁড়িয়ে রইল-অটল প্রভুভক্তি।

টমাস এডি তার পিস্তলে নতুন করে টেটি ভরল। লোকজন বেরিয়ে এসেছে রাস্তায়। পোস্ট অফিস থেকে ছুটে এল প্রিসি। 'শেরিফ এডি! লজ্জা হওয়া উচিত তোমার। যাতে এ-সব না ঘটে সে জন্যেই তোমাকে নির্বাচিত করেছি আমরা। লোকে কী বলবে এখন?'

'সরি, ম্যাম,' বলল টমাস। 'এখানে গোলমাল পাকাতে নিষেধ করেছিলাম আমি। কিন্তু না শুনে কী করা!'

নেল ফস্টার বাইরে এল। রাইফেলটা ডেস্কের ওপর রেখে এসেছে। 'যাই, বাকবোর্ড নিয়ে এসে লাশগুলো তুলে ফেলি।'

চার্লি ফ্যারেল এগিয়ে এল, সাথে দু'জন আউট-ল। বলির পাঠার মত কাঁপছে। লাশগুলো দেখে ওদের মুখ বিবর্ণ হয়ে গেল। প্যান্ট ভেজার উপক্রম হলো ড্যানি ডিনসমোরের। অতি কষ্টে নিজেকে রুখল সে, এত লোকের সামনে...

ক্লান্ত, মনসন মরে গেছে।

কিম বেকা নিজের পিস্তলের দিকে তাকিয়ে রয়েছে। দুটো গুলি ছুঁড়েছে সে, কখন কীভাবে মনে নেই। কারও গায়ে লাগাতে পেরেছে কিনা তাও খেয়াল করতে পারেনি।

শুকনো ঠোঁটজোড়া ভিজিয়ে নিল ড্যানি। 'আমাদের কী হবে?' টমাসের দিকে আড়চোখে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করল।

যারা অন্যের কষ্টোপার্জিত পয়সা লুটতে চায় তাদের প্রতি ওর কোন মমতা নেই। 'তোমাদের? কপাল ভাল হলে বিশ বছরের বেশি খাটতে হবে না।'

ফ্যানফ্যান করে ওর দিকে তাকাল ড্যানি। এখন বাইশ চলছে তার। ও ভেবেছিল দস্যুজীবনে উত্তেজনা আছে। মুখ ফিরিয়ে রাস্তায় লুটানো লাশগুলোর দিকে তাকাল। এদের কাউকেই বিশেষ পছন্দ করত না সে, বিশেষত মনসনকে। কিন্তু ওদের সাথে এক ছাতের তলায় বাস করেছে-খেয়েছে, ঘুমিয়েছে, গল্প করেছে।

এখন ওরা মৃত।

বিশ বছর! যখন ছাড়া পাবে তখন ওর বয়েস হবে চল্লিশের ওপরে। যৌবন করে যাবে। বুড়িয়ে যাবে সে, সে...

ম্যাগ-এর কী হবে? কোন দিনই জানতে পাবে না ও, তার কী হয়েছে! এবং কিছুদিন পর ভুলে যাবে ওকে।

'মিস্টার,' অনুনয় ফুটল ওর গলায়, 'আমি...'

'ভুল জায়গায় পা দিয়েছিলে তুমি,' বলল টমাস। 'নিজের পায়ে নিজেই কুড়োল মেরেছ। মানুষ ঠেকে অনেক কিছু শেখে, তুমি শেখোনি।'

এগিয়ে গিয়ে চার্লির দিকে হাত বাড়িয়ে দিল সে। 'ধন্যবাদ,' বলল, 'অনেক ধন্যবাদ।'

'চলো, তোমাকে এক কাপ কফি খাওয়াব আমি,' বলল চার্লি।

'পরে,' বলল টমাস, 'বউয়ের সাথে কথা বলে আসি আগে। গোলাগুলির শব্দ শুনেছে ও।'

দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে ছিল বেস। পাখরের মত। মুখে রক্ত নেই। 'টমাস? টম? তোমার কিছু হয়নি তো?'

'কোন চিন্তা নেই, বেস। এখুনি যেতে হবে আমাকে, গোছগাছ করতে হবে সব কিছু। গোলাগুলি হয়েছে অল্প বিস্তর।'

'ওনেছি। কেউ কি...? মানে...?'

'কয়েকজন আউট-ল। চার্লি ফ্যারেল ধরেছে ওদের দুটোকে।'

'এ-সব আমার সহ্য হয় না, টমাস। একদম না! এভাবে মানুষ হইনি আমি, টমাস। বাড়ি যেতে চাই আমি। পুবে ফিরে যেতে চাই। এ-সব থেকে দূরে চলে যেতে চাই।'

'জানি, বেস, কিন্তু ওখানে গিয়ে আমি কী করব?'

'জানি না। একটা কিছু করলেই হলো। এর চেয়ে ঢের ভাল সেটা।'

'বেশ'-ঘুরে দাঁড়াল সে-'চিন্তা করে দেখব। এখন হাতের কাজ সারতে হবে আগে।'

কাফের দিকে এগিয়ে গেল সে, দরজার কাছে এসে থামল। লাশগুলো ইতিমধ্যেই সরিয়ে ফেলা হয়েছে, মাটি ছড়িয়ে দেয়া হয়েছে রক্তের ওপর। পরিত্যক্ত ঘোড়াগুলো বাঁধাছাঁদাও শেষ।

পুবে গিয়ে সে করবেটা কী? করার আছেই-বা কী?

বন-টন কাফের দরজায় দাঁড়িয়ে ছিল চার্লি। 'ভেতরে এসো, টম। হায়াত জনসন আর জর্জও আছে। কফি খাব আমরা।'

দরজার দিকে ঘুরল সে, পেছনে তাকাল আরেকবার। এটা তার শহর, আরও একবার বিপদমুক্ত হয়েছে।

উনিশ

আগনের আলোয় তপ্ত লাভার মত দেখাচ্ছে ক্যানিয়নের দেয়াল। দূরে কোথাও একটা কয়োট ডেকে উঠল। পাইন বনে ঝিরঝির শব্দ তুলেছে বাতাস, কাঁপছে আগনের শিখা।

'খেতে বসো। তুমি আর আমি, আমরা অনেক দিন থাকব এক সাথে। কী রকম ব্যবহার পাচ্ছি আমি তার ওপর নির্ভর করছে কদ্দিন বাঁচবে তুমি। বুঝেছ? বেশি ঝামেলা করলে নিকেশ করে দেব।'

'তুমি-ই প্রথম নও, আরও মেয়েছেলে মেরেছি আমি। অবশ্যি তারা ছিল বাজারে। তোমার মত মাল পাইনি কখনও।'

'এ জন্যে ফাঁসিতে ঝুলবে তুমি।'

রক্ত সুয়ে হাসল সে। 'অ্যা? জানছেটা কে বলি। তুমি ছাড়া পাচ্ছ না, আর এই জায়গাও কেউ চেনে না। গত পঞ্চাশ বছরে কেউ আসেনি এখানে।'

অন্ধকারের ভেতর একটা ঘোড়া টি-হি শব্দে ডেকে উঠল, পা ঠুকল

মাটিতে। আগুনের পাশ থেকে মুখ তুলল ডাক্তার, গুনছে কান খাড়া করে।

‘মনসনরা,’ জোরগলায় আপনমনে বলল সে, ‘নিশ্চয়ই ওই ব্যাংক খেতে গেছে! সোজা কাজ! ঘটে বুদ্ধি থাকলে এরপর ওরা মেক্সিকোতে চলে যাবে।’

জুলিয়ানার দেহে চোখ বুলল সে। ‘তোমার বাপ নিজেকে রাজা মৌমাছি ভেবেছিল!’ দম নিয়ে ওপর নীচ মাথা ঝাঁকাল। ‘কিছু দিন ছিল ও তাই। স্বীকার করছি, ব্যাটা প্ল্যান করতে পারে বটে।’ জুলিয়ানার মুখের দিকে তাকাল। ‘তুমি জানো, তোমার বাবা মরে গেছে? পেরিনের লোকজন এতক্ষণে মেরে ফেলেছে তাকে। পাথর বাড়িতে সে ছাড়া কেউ ছিল না।’

কোমর সোজা করে বসল জুলিয়ানা। ‘এত নিশ্চিত হয়ো না,’ বলল ও, ‘সুযোগ পেলেই তোমার পিছু নেবে সে। তুমি কি মনে করো এ-জায়গা সে চেনে না? তার চেয়ে এই দেশটাকে আর কে ভাল চেনে?’

কটমটিয়ে ওর দিকে তাকাল ডাক্তার। ‘ইঠাৎ এ-কথা মনে হলো কেন তোমার?’

‘পীচ মেডৌ ক্যানিয়ন?’ ভয়ে মরিয়া হয়ে উঠেছে জুলিয়ানা, আর এটাই ওকে মাথা খাটাতে সাহায্য করছে। ‘তার মুখে শুনেছি এর কথা,’ অদ্ভূত বদনে মিথ্যে কথা বলল ও।

ডাক্তার অস্বস্তিতে ভুগছে এখন, অনুভব করল ও। এতক্ষণ নিজেকে নিরাপদ ঠাউরে ছিল সে, কিন্তু ওর মস্তব্য সন্দেহের বীজ বুনে দিয়েছে। শেষ কোন ভরসা যদি ওর থাকে তবে সেটা ওই সন্দেহের মাঝখানে। নিজেকে সে নিরাপদ মনে করেছিল, কিন্তু ও যদি এখন তার মনে ভয় ঢুকিয়ে দিতে পারে...

‘না, এ জায়গার কথা জানে সে! কেউ জানে না! তা ছাড়া এতক্ষণে তার দফা ঠাণ্ডা হয়ে গেছে। চুলোয় যাক সব নিয়ম-কানুন! এইটে করো, ওইটে করো না! শালা, মাথা খারাপ করে দিয়েছিল একেবারে!’

‘তোমার ওই পেরিন,’ বলল জুলিয়ানা, ‘অক্লা পেয়েছে! পেছন ফিরে দেখেছি আমি। ওর লাশের উপর দাঁড়িয়ে ছিল হ্যারি কার্টার।’

আগুনের পাশে আসনপিড়ি হয়ে বসল ডাক্তার। ট্রেন লুটতে গিয়ে মরবে রিগার মলিনা, মনসন আর ক্ল্যাভ চলে গেছে, আর পেরিন যদি মরে থাকে, তবে তার ক্ষমতা দখল ঠেকায় কে?

জুলিয়ানা ভয় পেয়েছিল, তবে এখন পাচ্ছে না আর। ওর হাল হয়েছে খাচায় আটকা পত্তর মত, পালাবার জন্যে মরিয়া হয়ে উঠেছে। ড্রু হলে ঠিক উপায় বের করত একটা...কিন্তু ও কী করবে? যে করেই হোক পরাস্ত করতে হবে দস্যুটাকে। কীভাবে?

আগুন...কোন রকমে শয়তানটাকে যদি আগুনে ঠেসে ধরতে পারে সে! ধাক্কা দিলে কেমন হয়! আহা, যদি একটা পিস্তল পেত এখন! ড্রুর মত না হলেও মোটামুটি চালাতে জানে ও।

অথবা একটা ছুরি, মওকা আসার আগপর্যন্ত লুকিয়ে রাখা যাবে। ধারাল পাথরখণ্ড হলেও চলত। ইন্ডিয়ানরা ব্যবহার করত। একটা ধারাল পাথরখণ্ডের আশায় আশপাশে তাকাল ও।

মুখের একপাশে কোপ বসাবে...না, গালে নয়। গলায় বসাতে হবে। ওকে খুন করার চেষ্টা চালাতে হবে, অথবা মারাত্মক জখম করতে হবে, তাকে...

‘আই, মাগি! খা বলছি!’

‘ভোরের আলো ফুটলেই আরও সামনে যাব। একটা জায়গা...’

‘এখানেই থাকবে, ডাক্তার। এখানেই!’

‘বিশ্বাস হচ্ছে না তার। ফ্রাইং প্যানটা নামিয়ে রেখে ধীরে ধীরে সোজা হলো ডাক্তার। পিস্তলটা খাপ-মুক্ত আছে তো?’

‘ও! তা হলে রাউন্ডের কথাই ঠিক।’ কালক্ষেপণ করতে চাইছে ডাক্তার। যাতে একটা সুযোগ পায় সে। ‘ও বলত তুমি নাকি মসৃণ পাথরের ওপর দিয়ে সাপ হেঁটে গেলেও ট্রাক করতে পারো।’

‘তা এসেই যখন পড়েছ, কী করবে আর?’

‘প্রাণে বাঁচতে চাইলে গানবেল্ট খুলে ফেলো, ডাক্তার!’

‘নাহ্, তুমি খুব নরম, হ্যারি। বেনের মত দলনেতা হতে পারবে না তুমি! বেন কোন সুযোগ দিত না, সোজা বুলেট ঢুকিয়ে দিত! এখনও অনেক শেখার আছে তোমার, ছোকরা। বড্ড কোমল তুমি! অথচ সেটা বোঝার আগেই মরবে, ভারি খারাপ লাগছে আমার।’

‘পেরিন সবর্দা সেরা বন্দুকবাজ ভাবত নিজেকে। ওকে কখনও হারাতে পারিনি আমি!’ ডান হাতটা তুলে তামাকের ছোপলাগা দাড়িতে বিলি কাটল সে। একই সাথে বাঁ হাত চলে গেল পিস্তলের বাঁটে, আগুন ঝরাতে ঝরাতে উঠে এল।

অনায়াস ভঙ্গিতে পিস্তল তুলল হ্যারি কার্টার। গুলি করল। দ্রুত অথচ নির্ভুল নিশানা। ডাক্তারের বাঁয়ে সরে আবার গুলি করল।

বোকার মত ওর দিকে চেয়ে রইল ডাক্তার, শিথিল মুঠি থেকে বসে পড়ল পিস্তল। হাঁটু দুমড়ে গেল, বালিতে মুখ ঝুঁজে পড়ে গেল সে। একটা হাত আগুনের ওপর পড়ল, চামড়া পোড়া গন্ধ বেরুল। হ্যারি এক কদম এগিয়ে জুতোর ডগা দিয়ে আগুনের ওপর থেকে সরিয়ে দিল হাতটা।

তারপর পিস্তলে গুলি ভরে খাপে রেখে দিল।

রাইফেল হাতে ছুটে এল ডু। ‘ও, হ্যারি! আমি ভেবেছিলাম মরে গেছ তুমি! ভেবেছিলাম...!’

‘জুলিয়ানা!’ বোনের পাশে বসে পড়ল ও। হ্যারি ঘোড়াগুলোর কাছে ফিরে গেল। অনেকক্ষণ জিনের গায়ে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে রইল।

কিছুক্ষণ বাদে, মেয়েদের আসার শব্দ পেয়ে বলল, ‘সামনেই একটা ভাঙা কুঁড়ে আছে। ওখানে যাও। আমিও আসছি এখুনি। আগুন জ্বালব। কাল ভোরে বাড়ি ফিরব আমরা।’

ডাক্তার যেখানে পড়ে আছে সেখানে গেল সে। ওকে পাঁজাকোলা করে একটা নিচু বালির টিবির কাছে নিয়ে রাখল। তারপর বালু দিয়ে ঢেকে দিল লাশটা। ‘আপাতত এই ঢের, ডাক্তার। আবার যখন আসব আমরা, কথা দিচ্ছি, আমি নিজে কবর দেব তোমাকে।’

কফি বানানোই ছিল, কেতলিটা কুঁড়ে ঘরে নিয়ে এল সে।

পরে একসময় জিজ্ঞেস করল ডু, 'হ্যারি, এখন কী করবে তুমি?' গনগন করে জুলছে কয়লা।

'টডস্টুলে ফিরে যাব,' বলল সে। কফিতে চুমুক দিয়ে প্রথমে কাপ তারপর ওর দিকে তাকাল। 'বেনের কাছে ফিরে যেতে হবে আমাকে। ওর নিরাপত্তার ব্যবস্থা করতে হবে।'

'তারপর?'

'কোথাও গিয়ে নতুন জীবন শুরু করব।'

'নিশ্চয়ই আউট-ল হিসেবে নয়?'

'কখনোই তা ছিলাম না। হতেও চাইনি।' সরাসরি ওর চোখের দিকে তাকাল সে। 'ডু, মানুষকে সমাজ নিয়ে বাস করতে হবে, আর এটা তখনই সম্ভব হবে, যখন সবাই কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে কাজ করবে। এই সুন্দর পৃথিবীতে আউট-লদের কোন স্থান নেই। ওরা যা চায়, সেটা কোনদিন সম্ভব নয়।'

'বেন ভুল করেছে। গোড়া থেকেই। আর সেই বাচ্চা বয়েসেই আমি বুঝতে পেরেছিলাম সেটা।'

'তা হলে?'

'ও-ই আমার সব। আমার যাবার জায়গা ছিল না কোন। আমাকে স্নেহ-মমতা দিয়ে ভরিয়ে তুলেছে সে।'

টডস্টুলের ফাঁকা রাস্তায় খেলা করছে সাদা। সূর্যকিরণ ক্যানিয়নের ভেতর ঢুকল হ্যারি কার্টার, জিনের সাথে রাইফেল বাঁধা। তার পেছনে ডু র্যাগান।

জুলিয়ানা ব্যাঞ্চে রয়ে গেছে কিন্তু ডুসিলা রাজি হয়নি। বেন কারি ওর বাবা, তার কাছে যাবে ও। দস্যু শিবির হলেও পরোয়া নেই। তা ছাড়া হ্যারির সাথেই ফিরে আসবে আবার।

ডেভ লেনকার যদি এসে থাকে, ভাবল হ্যারি, তবে শহরটাকে যথেষ্ট ঠাণ্ডাই বলতে হবে। হিচিং রেলের কোন ঘোড়া বাঁধা নেই, সেলুনের দরজা হাট করে খোলা।

মৃদু বাতাসে নড়ল কিছু। হ্যারির চোখ পড়ল সে-দিকে। শার্টের হেঁড়া অংশ, ওটার মালিক মরে গেছে। লোকটা অচেনা।

নীরব রাস্তা ধরে যাচ্ছে সে, নিস্তব্ধতার মাঝে খুরের শব্দ বেশ জোরে শোনা যাচ্ছে। একটা জানালা দিয়ে একটা লোকের হাত বেরিয়ে আছে। পিস্তলটা মাটিতে পড়ে। আরেকটা বাড়ির সিঁড়িতে রক্তের ছোপ।

'লড়াই হয়েছে,' বলল হ্যারি, মৃদু স্বরে। 'মারাত্মক রকমের। খারাপ কিছু দেখার জন্যে মনকে তৈরি রাখো।'

বোর্ডিং হাউসের দোরগোড়ায় একটা লোক হাত-পা ছড়িয়ে পড়ে আছে।

পাথরের সিঁড়ির গোড়ায় থামল ওরা। হ্যারি নামতে সাহায্য করল ডুকে। 'একান্তই যদি আসো, আমার একটু পেছনে থেকো।'

সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠে চওড়া বারান্দা হয়ে বিশাল লিভিং রুমের দরজার সামনে পৌঁছে থমকে দাঁড়াল ওরা। থ হয়ে গেল।

একটা টেবিল ঘিরে পাঁচজন বসে ভাস পেটাচ্ছে। স্টোভে কফির কেতলি ফুটছে।

ডাক্তার সয়্যার, রাউন্ডি, গার্লিন, কলি সবাই আছে। গার্লিনের মাথার ব্যান্ডেজ, এক পা টানটান করে মেলে রেখেছে কলি। বেন কারিও তা-ই করেছে, সোফায় বসে আছে সে। সবাই হাসছে।

ছুটে গিয়ে বাপের পাশে বসে পড়ল ডু। 'উফ, বাবা! দারুণ ভয় পেয়েছিলাম আমরা!'

'খবর কী?'-জিজ্ঞেস করল হ্যারি। 'ডেড লেনকার আসেনি?'

'এসেছিল। রিগার মলিনা মেরেছে ওকে! ওয়েভারে পৌঁছে রিগার টের পায় কার্ব ঠকিয়েছে ওকে। ট্রেন আক্রমণ করার আগেই গার্ডের সংখ্যা জানতে পেরে ফিরে আসে।

'ফিরে যখন দেখল আমি খোঁড়া হয়ে পড়ে আছি, পেরিন পালিয়েছে, লেনকারকে একাই সামলাবে বলে তৈরি হলো ও।

'ওর তুলনা হয় না, হ্যারি! জীবনে এমন দৃশ্য আমি দেখিনি। খাঁচার পোরা। ফিগু ভান্নুকের মত বারান্দাময় পায়চারি করেছে সে। অপেক্ষা করেছে লেনকারের জন্যে। গাল দিয়েছে সবাইকে। "একা ফেলে গেছে তোমাকে! লেনকার ভেবেছে কী, বুড়ো হয়ে গেছ তুমি! অ্যা? ওকে দেখাচ্ছি মজা!"

'নীচের রাস্তায় ডুয়েল লড়েছে ওরা। ওর আগেই লেনকার পিস্তল বের করে ফেলে। পরপর দুটো গুলি করে সে রিগারকে। কিন্তু ও হার মানেনি। হাতের দুই পিস্তল খালি না হওয়া পর্যন্ত সমানে গুলি চালিয়ে গেছে।

'লেনকার কম করে হলেও পাঁচটা গুলি লাগিয়েছে রিগারের গায়ে, কিন্তু লেনকার যখন লুটিয়ে পড়েছে মলিনা ওর মুখে থুতু দিয়েছে। "দু'মুখো সাপের এটাই প্রাপ্য," বলেছে ও। রিগার নিঃসন্দেহে মহৎ লোক, হ্যারি!'

'আমাকে ওরা বোকা বানিয়েছে, হ্যারি,' মুখ খুলল রাউন্ডি। 'বিপদ আসছে আঁচ করে ভাবলাম বেনের সঙ্গেই থাকি। তোমাকে যে পেছন থেকে কাবু করবে, বুঝতে পারিনি।

'তারপর শুনলাম লেনকার আসছে। ওর স্বভাব আমার জানা, তাই ট্রেন ধরে এগিয়ে গেলাম ওকে ঠেকাতে। হ্যারি, জীবনে কখনও মানুষ মারিনি আমি কিন্তু, বিশ্বাস করো, লেনকারকে মারার চেষ্টা করেছিলাম।

'লেনকার এরপর সদলে ক্রীকের ধার দিয়ে বেনকে খুন করে ওর সোনা লুটতে আসে।'

'ডাক্তার ছিল এখানে,' বলল গার্লিন, 'এবং কলি। রাউন্ডি পালিয়ে এসে আমাদের সাথে যোগ দেয়। সে এক লড়াই বটে! আমাদেরও লেগেছে সামান্য, তবে ওদের মত নয়।'

কার্ব পেরিনের সাথে সংঘর্ষ এবং ডাক্তারকে পিছু ধাওয়া করার কথা

সংক্ষেপে বর্ণনা করল হ্যারি।

‘যারা বেঁচেছে,’ বলল রাউন্ডি, ‘পালিয়েছে।’

‘জীবনে একটা লোকই বোকা বানিয়েছে আমায়,’ বলল বেন কারি, ‘সে রিগার মলিনা। ও যে এতটা বিশ্বস্ত, কল্পনাও করিনি আমি। আমার দুঃসময়ে একা কুখে দাঁড়িয়েছে। স্পষ্ট যেভাবে পানি গুষে নেয়, সেভাবে সীসে হতম করেছে ও।’

অনসন্ধ্যাবে কার্ডে শাফল দিল ডাক্তার সন্ধ্যার। ‘বেন,’ বলল সে, ‘আমার মতে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব এখান থেকে চলে যাওয়া আমাদের সবর উচিত।’

ডুর মুখের দিকে তাকাল বেন কারি। ‘এখন তোরা জানিস। তোদের বাবা আউট-ল। তোদেরকে জানতে দিতে চাইনি আমি। ভেবেছিলাম দল ভেঙে দিয়ে তোর মায়ের সাথে ওই ভি-বারে গিয়ে বাকি জীবনটা কাটিয়ে দেব।’

‘করলে না কেন?’ জিজ্ঞেস করল ডু।

‘বুঝতে পারিনি দল এত বড় হয়ে যাবে,’ বলল বেন। ‘একটার পর একটা ঘটনা ঘটতে থাকায় দল এত বড় হয়ে ওঠে যে তখন আর ভাঙা সম্ভব হয়নি।’

‘এখন সব শেষ হয়েছে, বেন। এমন সব লোককে এক করেছিলে তুমি যারা এক থাকতে ভালবাসে না। তোমার ইচ্ছে, কিছুটা হলেও; পূরণ করেছে তুমি। এখন কিছু লোক মটকে পড়েছে, এবং হয়তো জনারণ্যে মিশে যাবে। তুমিও পারো সেটা।’

‘কী সেই তখন থেকে শাফল দিচ্ছ, ডাক্তার,’ বলল গার্লিন। ‘বাটো, বাটো।’

ডুকে নিয়ে বারান্দায় এল হ্যারি। নীচে টডস্টুল ক্যানিয়নের দিকে তাকাল। নীচের বস্তুতে কোন আলো নেই। প্রচুর লাশ পড়ে আছে ওখানে, ওরা বারের মত ওই বস্তুতেই নিশ্বাস নিয়েছে।

ভেতর থেকে ভর্কের আভাস আসছে। ‘ছেলেটা ভাল, বেন। শিক্ষিত। আমি যা জানি সব শিখিয়েছি।’

‘সব!’ ফেটে পড়ল রাউন্ডি। ‘পুণ্ডিগত বিদ্যায় যদি সব হত তবে কোথায় থাকত আজ তোমার মেয়ে? বলো?’

আকাশে হাজার তারার মেলা। এ-ধারে অন্ধকার বারান্দায় দাঁড়িয়ে ডুকে বলল হ্যারি, ‘ট্র্যাকের চিহ্ন পড়তে পারি আমি, কিন্তু মেয়েলোকের মনের কথা বুঝি না। আমাকে শিখিয়ে নিতে হবে তোমার, ডু।’

হাসল ও, হাতে হাত রাখল। ‘হ্যারি, প্রথম যে-দিন ওয়েভারে দেখা হয়েছিল আমাদের, সে-দিনই আমার মনে বাতি জ্বলে দিয়েছ তুমি। কোন সাহায্যের দরকার হবে না তোমার!’

মুখোমুখি দাঁড়াল ও। ‘হ্যারি, এই দেশটাকে ভালবাসি আমি। এখানকার প্রতিটা গৈরিক গিরিখাত, সবুজ সিঁড়ার, পাইন, দূর বিস্তৃত প্রান্তর...সব! কিছু গবাদি পশু নিয়ে পীচ মেডো ক্যানিয়নে চলে গেলে কেমন হয়?’

‘কেবিন বানিয়ে থাকব, পীচের চাষ করব, বাথান গড়ব। তুমি তো

বলেছ আমরা যে-রাস্তায় গেছি তার চেয়েও ভাল ট্রেইল বের করতে পারবে তুমি।’

ওদিকে ভেতরে গার্লিন তখন বলেছে, ‘মনসন আর ক্ল্যাড যেখানেই যাক শিগগিরই ওদের খোঁজ পাব আমরা।’

‘ওই ক্ল্যাডকে,’ বলল বেন, ‘এবার দল থেকে বের করে দিতাম আমি। খালি হামবড়াই করে বেড়াত।’

‘এর অসুবিধে হচ্ছে,’ মন্তব্য করল গার্লিন, ‘আইনেরও কান আছে।’ বেনের দিকে তাকাল সে। ‘ওই ব্যাংকটার প্রতি সব সময়েই নজর ছিল তার।’

হাতের তাস দেখল বেন। বদলাবে না সে। গার্লিনের দিকে তাকাল। ‘ওটা বাতিল করে দিতাম আমি। আগে ওই শহরের মার্শাল ছিল রিগিন। ও দুর্ঘটনায় নিহত হওয়ার পর মার্শাল হয়েছে টমাস এডি। ওর বাথানেই ঘোড়া রেখেছিলাম আমি।’

ডাক্তার দুটো তাস বদলাল, খেয়াল করল সে। ট্রয় ফুটল নাকি?

‘এডির ওয়্যাগনে বসে কফি খেয়েছি আমি। প্রথম দর্শনেই বুঝেছিলাম ওর সাথে লাগতে যাওয়া ঠিক হবে না। তাই ও যখন মার্শাল হলো ওই পরিকল্পনাটা বাতিল করার সিদ্ধান্ত নেই আমি।’

‘সকাল হোক,’ বলল ডাক্তার, ধীরে-সুস্থে তিনটে নয় মেলে ধরল, ‘এখান থেকে চলে যাব আমরা।’ বোর্ডের পয়সা-কড়ি কোলের কাছে টেনে নিল। ‘যাক, ভালয় ভালয় সব চুকে গেছে বেন। তুমি আমি, আমরা সবাই অতীত। ওই যে বাইরে দাঁড়িয়ে আছে যারা, তারা আগামী।’

সোফায় আরাম করে হেলান দিল বেন। ‘ঠিক বলেছ। আমরা সবাই: তুমি, আমি, ওয়্যাড, আর্প, বিলি দ্য কিড, বিল হিকক, আমরা এমন এক দুনিয়াতে কাটিয়ে গেলাম যে-দুনিয়া আমরা গড়িনি।’

‘বিলির কথাই ধরো, ওকে আমি ছোট থেকে চিনি। খারাপ ছেলে ছিল না। কিন্তু সে-যুগে লিংকন কাউন্টিতে কোন পক্ষ না নিয়ে উপায় ছিল না। বিলি সঠিক পথেই গিয়েছিল। টানস্টাল আর ম্যাকুইন ভাল ছিল, অথচ সেই যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী দুশোজনের মধ্যে কেবল বিলেরই সাজা হলো।’

গার্লিন তাস গোছাচ্ছিল, হঠাৎ থেমে গেল। ইস্কাপনের নয়ের পেছনে সূক্ষ্ম একটা নখের দাগ লক্ষ করল সে। ঝট করে বাকি তাসগুলো ঘাটল সে। রুইতন এবং হরতনের নয়তেও অনুরূপ চিহ্ন দেখল।

‘ডাক্তার!’ গর্জে উঠল সে। ‘শালা, চার-চোখো দস্যু! তুমি...!’

হাসল বেন, মাটিতে পা রাখল। ‘গার, অ্যাডিনে ডাক্তারকে চেনা উচিত ছিল তোমার। টাকা নয়, জেতাটাই ওর কাছে বড় কথা। ও ক’বার দান চড়িয়েছে বলো?’

কাঁধ ঝাঁকাল গার্লিন, হাসছে। ‘যেতে দাও...’

নীরব নক্ষত্রপুঞ্জের কাছে কাতর ফরিয়াদ জানাল একটা কয়োট। মোটা হাড়িতে ভর দিয়ে উঠে দাঁড়াল বেন।

বাইরে, বারান্দায় হ্যারি আর ড্রু ঘনিষ্ঠভাবে দাঁড়িয়ে আছে। এক মিনিট

আঁধারের ভেতর চেয়ে থাকল হ্যারি, তারপর বলল, 'কেন নয়?'
নীচের নিকষ কালো রাস্তার দিকে তাকাল সে। কাল ফাঁকা হয়ে যাবে এই
জায়গা, বেঁচে থাকবে শুধু আপন প্রেতাত্মার মাঝে।
'গার্লিন?' ডাকল হ্যারি। 'রিগার মলিনার কবরে একটা ফলক আটকে
দিও। বুঝেছ? লিখবে: "ভাল লোক ছিল।" '

এই পিডিএফটি তৈরি করা হয়েছে -

www.facebook.com/groups/boiloverspolapan ও Banglapdf.net এর সৌজন্যে ।

এটি তৈরি করেছেন - মাহমুদুল হাসান শামীম

Facebook

:www.facebook.com/mahmudul.h.shamim

Group:www.facebook.com/groups/boiloverspolapan

Website : Banglapdf.net

এক

মাইকেল কেইন নিশ্চিত নয় তার আজকের এই পরিণতির জন্য কে দায়ী-পরিস্থিতি, নাকি সে নিজেই সচেতনভাবে তার জীবনকে এ-পথে পরিচালিত করেছে। অবশ্য তেমন ইতরভেদ এতে হয় না। তার একমাত্র পরিচয়, সে একজন বন্দুকবাজ; ভাড়া করা যায় এরকম একটা খুনে যন্ত্র বিশেষ। এই পেশায় সফলকাম হতে যা-যা লাগে-অসীম ধৈর্য, চোখ-ধাঁধানো ক্ষিপ্ততা আর ছন্দোময় পেশী-শক্তি সবই ওর আছে।

মাত্র সাতাশ বছর বয়সেই পশ্চিমের সেরা বন্দুকবাজদের কাতারে নিজের জায়গা করে নিয়েছে কেইন। বর্তমানে ওর যা নামযশ, ওর দ্বিগুণ বয়সেও খুব কমসংখ্যক লোকই তা অর্জন করতে পেরেছে। কেইন এমন এক স্তরে পৌঁছেছে যেখানে কাজের সন্ধানে হাপিত্যে শ করতে হয় না ওকে; কাজই ওকে খুঁজে নেয়। একটা সময় ছিল যখন সে এই দিনেরই স্বপ্ন দেখত। কিন্তু আজ ওর দৃষ্টিভঙ্গি বদলে গেছে।

এ-মুহূর্তে কেইনের হাতে বিশেষ কাজ নেই, গেল এক হপ্তা ধরে আলসেয় দিন কাটাচ্ছে ডেনভারে বসে। ট্যাবর গ্র্যাভয়ে গিয়ে যাত্রা দেখেছে একদিন; ওর স্বভাবের ব্যতিক্রম ঘটিয়ে মদ্যপান করেছে; তারপর আরেকদিন পোকার খেলেছে রাতভর। তবে এখন আবার পথে নামার জন্য অস্থির হয়ে উঠেছে ও। অন্য কোথাও চলে যেতে চাইছে। যেকোনো দুচোখ যায়।

সন্কে নাগাদ হোটেলে ফিরে এল কেইন, ঘরের চাবি নিতে রিসেপশন ডেস্কে থামল। চোখ তুলল কেরানি, ওকে চিনতে পেরে জোর করে হাসি ফোটাল মুখে। কেইন বিরক্ত হলো, তাকে চিনলেই অধিকাংশ লোক এরকম ব্যবহার করে। ওরা ভয় পায় ওকে, তাই তোয়াজ করে চলে যেন কোন ঝামেলা না হয়। কিন্তু আসলে কেইন নিজেও যে চায় না কোনরকম ঝামেলা, একথা কেউই তলিয়ে ভাবে না একটিবারও।

ডেস্কের এপাশে ওর চাবি ঠেলে দিল কেরানি। বলল, 'এক লোক তোমার খোঁজ করেছিল, মিস্টার কেইন। তোমার হৃদিস জানা না থাকায় কিছু বলতে পারিনি।'

'কে?'

'নাম বলেনি, মিস্টার কেইন। কী দরকার তাও বলেনি। একদম ছেলে-ছোকরা। কাপড়চোপড় দেখে মনে হলো মফস্বলের লোক।'

'রাতটা আমি ঘরেই থাকব। কাল সকালে চলে যাচ্ছি।' কথা শেষ করে আর একমুহূর্ত দাঁড়াল না কেইন, চাবি নিয়ে সিঁড়ি বেয়ে দোতলায় উঠে নিজের

ঘরে গেল।

বিছানার ওপর ওর ওঅর ব্যাগটা তুলল কেইন, পিস্তল বের করে ওয়েস্টব্যান্ডের নীচে গুঁজে রাখল। ডেনভারে এসেছে অবধি সঙ্গে কোন পিস্তল রাখেনি ও। কোন প্রয়োজন হয়নি তার। একমাত্র হোটেল কেরানি ছাড়া এখানে অন্য কেউ ওর পরিচয় জানে না। কেরানি ওর নামটা চিনতে পেরেছিল। গত কয়েক মাসের মধ্যে এই একটা হুগা বেশ স্বস্তিতে কাটাতে পেরেছে সে, কিন্তু আর পারবে না। বিশেষ করে একজন লোক যখন ওকে খুঁজছে।

নীচের রাস্তার পানে তাকিয়ে ঠায় অনেকক্ষণ জানালায় দাঁড়িয়ে রইল কেইন। গাড়ি-ঘোড়া চলাচলের শব্দ শুনতে পাচ্ছে ও, রাস্তার বাতিতে দেখছে ব্যস্তসমস্ত হয়ে লোকজন যাচ্ছে এখানে-সেখানে। আনমনে কেইন আন্দাজ করতে চেষ্টা করল কোথায় যাচ্ছে ওই লোকগুলো। কোন মায়ার বাঁধন এখানে আটকে রেখেছে ওদের।

অলস ভাবনা, জানা কথা কেইনের স্বভাব মোটেও বদলাবে না এতে। একসঙ্গে এত লোকের বাস এর আগে কোথাও সে দেখেনি। কিন্তু ওদের কারও সাথেই নিজের জায়গা ও বদল করবে না। শহরে জীবন কাছে টানে না ওকে। তবে ও জানে, ওইসব লোকের মাঝে কিছু সুখী মানুষও আছে, তাদেরকে ওর ঈর্ষা হয়। যেভাবে ওরা ঘণ্টার পর ঘণ্টা ঘাড় গুঁজে কাজ করে ডেস্কে বসে, কিংবা নির্বিবাদে তামিল করে পরের হুকুম ওদের সেই গোবেচারার স্বভাবকে না; ওর ঈর্ষা হয় ওদের হাসিখুশি পরিবার দেখে, ওরা নির্ভয়ে মানুষের সাথে মিশতে পারে বলে।

একটা সিগারেট বানাল কেইন, আপনমনে হেসে মনকে প্রবোধ দিল। সংসার ধর্ম ওর জন্য না। মাইকেল কেইনকে মানায় না এসব। ওর জীবনের প্রতিটি মুহূর্ত অনিশ্চিত, কখন কোথা দিয়ে মৃত্যু আসবে কেউ বলতে পারে না আগাম। বিধবা হতে পারে জেনেও কোন মেয়েকে সে বিয়ের প্রস্তাব দেবে কীভাবে? পিতা হওয়া চলবে না ওর, ছেলেমেয়ে যেকোন সময়ে এতিম হয়ে যেতে পারে।

ধূমপান শেষ করল কেইন, জানালার চৌকাঠে যষে আগুন নেভাল। নিজের অজান্তে কান খাড়া করে আছে ও, আশা করছে এখুনি টোকা পড়বে দরজায়। অনুমান করতে চেষ্টা করল কেইন, ওকে কেন খোঁজ করছে লোকটা। যারা কাজ নিয়ে আসে তারা ছাড়া, সাধারণত তিন ধরনের মানুষ খোঁজ করে থাকে ওর: যারা ওকে খুন করে নাম কিনতে চায়; ও যাদের হত্যা করেছে তাদের প্রতিশোধপরায়ণ ঘনিষ্ঠ আত্মীয়স্বজন বা বন্ধুবান্ধব; আর কেউ কেউ আসে ওর শাগরেদ হতে।

লম্বা করিডরে পায়ের আওয়াজ শুনতে পেল কেইন, একটু বাদে আলতো টোকা পড়ল ওর দরজায়। কাঁধ ঝাঁকাল কেইন, শ্রুতপায়ে মেঝে অতিক্রম করে দরজায় গেল। যেসব ছোটখাট শহরে কিংবদন্তীতে পরিণত হয়েছে ওর নাম সেখানে প্রায়শ এমনটা ঘটে। কিন্তু ডেনভারে তা ঘটবে বলে আশা করেনি ও, ভেবেছিল এখানকার মানুষের ভিড়ে সে হারিয়ে যেতে পারবে। দরজা খোলার

সময়ে হাজারো আফসোস হলো ওর, ভাবল নাম ভাঁড়িয়ে হোটেলের ওঠাই উচিত ছিল।

বছর আঠারো-উনিশেকের এক ছিপছিপে তরুণ দাঁড়িয়েছিল দোর-গোড়ায়, চেহারা থেকে এখনও কৈশোরের সারল্য মুছে যায়নি। স্থির চোখে কেইনের দিকে তাকাল যুবক।

‘তুমি মাইকেল কেইন?’

‘হ্যাঁ।’

‘তোমার যদি তেমন ব্যস্ততা না থাকে, আমার কিছু কথা আছে।’

একপাশে সরে দাঁড়াল কেইন। ‘ভেতরে এসো।’

‘আমি রবার্ট হার্ভে।’ হাত বাড়িয়ে দিল যুবক। ‘ডিলন মেসা থেকে আসছি।’

করমর্দন করল কেইন, হার্ভের বলিষ্ঠ পাজার ছোঁয়ায় আন্তরিকতার আভাস পেল। দেখেই ও বুঝতে পারছে এই ছোকরা কোনরকম নামের মোহে ছুটে আসেনি, ওর সাথে এর কোন পূর্ব-শত্রুতা নেই। পশ্চিমে এর মত আরও বহু ছেলে রয়েছে, ল্যারিয়েট ছোঁড়া আর গরুর গায়ে মার্কী দেয়ার কাজে দক্ষ হয় এরা, দেখামাত্র ভাল ঘোড়া চিনতে পারে। কিছুক্ষণ আগের সেই ঈর্ষা এখন আবার অনুভব করল কেইন-চেষ্টা করলে সেও এই রবার্ট হার্ভের মত হতে পারত।

‘কেন এসেছ বললে না?’ কেইন প্রশ্ন করল।

দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে একদৃষ্টিতে ওকে মাপছিল হার্ভে। কেইনের কথায় চমক ভাঙল ওর, বলল, ‘আমি যা ভেবেছিলাম তুমি দেখতে সেরকম না।’

কেইন মৃদু হাসল, ইশারায় ঘরের একমাত্র চেয়ারটা দেখিয়ে দিল। ‘বস,’ বলে নিজে ধপাস করে বসে পড়ল বিছানায়, কনুইতে ভর দিয়ে পেছনে ঝুঁকল। ‘কী দেখবে ভেবেছিলে?’

‘জানি না।’ জড়সড় হয়ে চেয়ারে বসেছে হার্ভে, হাত দুটো ফেলে রেখেছে কোলের ওপর। ‘বোধহয় লম্বা ভাগড়া কিছু একটা। আমি এর আগে কখনও কোন পিস্তলবাজ দেখিনি কিনা। আমাদের এলাকার পিয়ারসন ভাইয়েরা অবশ্যি কঠিন লোক। অন্তত ওদের ভাবভঙ্গি তেমনি-সবসময় বোঝাতে চায় তিন জায়গায় ওদের নামে হুলিয়া আছে।’

‘আমার নাম পুলিশের খাতায় নেই,’ কেইন বলল।

‘জানি, সেজন্যই এসেছি তোমার কাছে।’

‘কেন?’ আবার জিজ্ঞেস করল কেইন, ছেলেটাকে ভাল লেগে গেছে ওর। হার্ভের সারল্যে মুগ্ধ হয়েছে।

‘তোমাকে একটা কাজ দিতে চাইছিলাম আমি, কিন্তু এখন তোমাকে দেখে মনে হচ্ছে তুমি না জেনেওনে কোন কাজ নেবে না।’

মিনিট পাঁচেক আগে হলে কেইন বলত হার্ভের কথাই ঠিক, সামান্যতম বাকুদের গন্ধ আছে এরকম কোন কাজ সে করবে না। কিন্তু এখন উলটো সুর বাজল ওর গলায়। ‘তুমি বল, আমি শুনছি।’

মার্সেনারি

মেঝেতে বুটের ডগা ঘষল হার্ভে, খানিক ইতস্তত করে বলতে শুরু করল। 'আমরা ডিলন মেসায় থাকি, মন্টেরোসার পশ্চিমে। গরু-বাছুরের দেশ। চারটে বড় বড় আউটফিট, ওটিকতক ছোটখাট বাথান আর কিছু খামার-এই নিয়ে ডগড্যান্স শহর। এখানেই থাকে উইলিয়ম বুচার, ডগড্যান্সের মুকুটহীন সম্রাট। বাজে লোক, কিন্তু কীভাবে যেন সব বড় বড় ব্যবসায়ীকে ওর মুঠোর ভেতর পুরে ফেলেছে। আমার বাবাও আছেন ওতে।'

'কাজটা কী তুমি কিন্তু এখনও বলনি?' কেইনের কণ্ঠে বিরক্তির ছোঁয়া লাগল।

'আমার বাবাকে রক্ষা করা, কেন-যেন মনে হচ্ছে শিগগিরই একটা গোলমাল বাধবে ওখানে।' কোটের পকেট থেকে একটা ওয়ালেট বের করে বিছানায় ছুঁড়ে দিল হার্ভে। 'এক হাজার ডলার আর কোল্যাটাসের টিকিট আছে ওতে। ডগড্যান্সে যাওয়ার জন্য ওটাই সবচেয়ে কাছের স্টেশন। আজ রাতেই ট্রেন আছে একটা। মন্টেরোসায় পৌঁছে বদল করবে, তারপর কোল্যাটাসে গিয়ে সেখানে স্টেজে করে ডগড্যান্স।'

'তুমি মনে হচ্ছে ধরেই নিয়েছ কাজটা আমি নিচ্ছি।' হার্ভের আত্মবিশ্বাস দেখে কেইন কৌতুক অনুভব করছে।

'তোমাকে দেখার আগে পর্যন্ত তাই ভেবেছিলাম। তবে এখন কেবল আশাবাদী, তুমি রাজি হবে। আরেকটা কথা। তুমি কিন্তু ঘুণাক্ষরেও বলতে পারবে না তুমি আমাদের লোক। তা হলে বুচার তোমাকে থাকতে দেবে না ওখানে। বুচার ভাল ভাল বন্দুকবাজ জোগাড় করার চেষ্টা করছে। তুমি গিয়ে বলবে তুমি সে-খবর পেয়েই এসেছ। তুমি যখন ওখানে পৌঁছাবে তখন কম্বাইনের মিটিং চলছে। কম্বাইন মানে বড় আউটফিটগুলোকে নিয়ে বুচার যেকমিটি গঠন করেছে।'

'কিন্তু আমি তো এত কম টাকায় কাজ করি না।'

'আমার এক যমজ বোন আছে, জ্যাকুলিন। তুমি ডগড্যান্সে পৌঁছালে ও তোমাকে বাকি এক হাজার ডলার দিয়ে দেবে। এর চেয়ে বেশি দেয়ার ক্ষমতা আমাদের নেই। আমার ও জ্যাকির অল্প কিছু গরু আছে। তারই কিছু বেচে তোমাকে আমরা টাকাটা দিচ্ছি।'

উঠে জানালায় গিয়ে দাঁড়াল কেইন। অতীতেও সে অনেক গোলমেলে প্রস্তাব পেয়েছে, কিন্তু সেগুলোর কোনটাই এত জটিল ছিল না। তবু, কৌতূহল দমন করতে পারছে না ও। তা ছাড়া হার্ভে না বললেও কেইন বুঝতে পারছে ওর সাহায্য ওদের প্রয়োজন। রাস্তার দিকে তাকাল ও, মনে হলো সম্ভবত শহরে থাকার ফলেই ওর অভূতপূর্ব ক্রমশ চরমে উঠছে। এখান থেকে পালাতে হবে, দুহাজার ডলারের প্রস্তাবটা নেহাত মন্দ না।

'আমি এখানে আছি জানলে কীভাবে?'

'রকি মাউন্টিন নিউজে খবরটা দেখে জ্যাকি আমাকে বলেছে।'

জানালার দিকে পিঠ ফেরাল কেইন, দেখল হার্ভে চেয়ে আছে ওর পানে, প্রত্যাশায় চোখ দুটো জ্বলজ্বল করছে। একটু চিন্তাভাবনার সময় পাওয়ার জন্য

কেইন জিজ্ঞেস করল, 'ভাল জাতের গরু আছে তোমাদের রেঞ্জ?'

'নাহ্। সব রন্ধি মাল।'

'কিনলেই হয়।'

'বুচার রাজি না। বড় আউটফিটগুলোর ব্যবসায়িক পলিসিও কম্বাইন ঠিক করে-বুচার তার চেয়ারম্যান।'

'ঠিক আছে যাব আমি,' কেইন বলল। 'ওখানে গিয়ে যা ভাল বুঝব তাই করব। আমাকে কোনরকম উপদেশ দেয়া চলবে না।'

খুতনি চুলকাল হার্ভে। 'কী ঘটতে যাচ্ছে আমি জানি না।' কম্বাইনের পরের মিটিংয়ে ঠিক করা হবে সেটা। তবে বুচারকে আমি একদম বিশ্বাস করি না। ও চাইছে ডগড্যাপের আশেপাশে যেসব ছোট ছোট হোমস্টেডার আছে তাদের তাড়িয়ে দিতে। আমি আর জ্যাকি এর কোন কারণ খুঁজে পাচ্ছি না। আমাদের ধারণা এর পেছনে বুচারের কোন কূট মন্তলব আছে।'

'তোমার কথায় মনে হচ্ছে আমার দায়িত্ব গোলমাল বন্ধ করা। সাধারণত, লোকে কিন্তু এর উলটো কারণেই আমাকে নিয়োগ করে।'

'জানি,' ঝাঝাল সুরে বলল হার্ভে। 'বেশির ভাগ পিস্তলবাজের কোন নীতি থাকে না-টাকাই তাদের কাছে সব। তবে তোমাকে আমার সেরকম মনে হয়নি। তা যদি হও, কাজটা তুমি নিয়ো না।'

অধিকাংশ পিস্তলবাজ যেমন হয়, কেইনও এতকাল তেমনি কোনরকম নীতি বা বিবেকের ধার ধারেনি। ওর নিয়োগকর্তা মানুষ হিসেবে কেমন এটা কখনও খতিয়ে ভাবেনি ও। কিন্তু আজ উপলব্ধি করল ওর ভেতর যে-অসন্তোষ মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছে তা শুধু এক হুগা শহরে বাস করার পরিণাম নয়, এর কারণ অনুসন্ধান করতে হবে ওর অতীত জীবনের মাঝে। কারোকে যদি তার অতীত ভুলতে হয়, ও জানে, তা ভুলতে হবে একবারে এবং চিরকালের মত। ওর সামনে এবার বোধহয় তার সুবর্ণ সুযোগ এসেছে।

কেইন বলল, 'আমি যাব, হার্ভে।'

সে-রাতে মাইকেল কেইনের ভাল ঘুম হলো না। ট্রেনের একঘেয়ে কুউউ-ঝিকঝিক শব্দে ঝালাপালা হয়ে গেল কান, নীচের একটা বার্থে ওয়ে ছটফট করতে লাগল ও। অকস্মাৎ, এবং জীবনে এই প্রথম অদ্ভুত এক অভিজ্ঞতার মুখোমুখি হয়েছে কেইন। এ-যাবৎ যত লোক ওর হাতে খুন হয়েছে তারা সবাই এখন ভিড় জমাচ্ছে ওর চোখের পর্দায়, বিদ্রূপ করছে ওকে, তর্জনী নাচিয়ে চিৎকার করে বলছে, 'তুমি নরম হয়ে গেছ, কেইন, ভীষণ নরম-জাউ ভাতের মত।'

ধড়মড়িয়ে উঠে বসল কেইন, চিৎকার করে তাড়াল প্রেতাত্মাদের, পরক্ষণে উপলব্ধি করল ও ঘুমিয়ে পড়েছিল। আবার চিত্ত হলো সে, লজ্জায় মিশে যেতে ইচ্ছে হচ্ছে মাটির সাথে, সবিস্ময়ে ভাবছে স্বপ্নে প্রেতাত্মারা ওকে 'জাউ ভাতের মত নরম' কথাটা কেন বলল। তারপর, শেষ যে-লোকটাকে ও খুন করেছে তার কথা যখন মনে পড়ল তখন বুঝতে পারল এর অর্থ। ব্যাপারটা পশ্চিম নেবরাস্কার ঘটনা। মামুলি এক কৃষক ছিল ওই লোক। সন্দেহ নেই, অন্যায় মার্সেনারি

কিছু ছিল না ওদের লড়াইয়ে। (অন্তত নিজেকে তাই বুঝিয়েছে কেইন।) খামার মালিক পিস্তলের দিকে হাত বাড়িয়েছিল। তবে ওটা নিছক একটা অজুহাত মাত্র, মাইকেল কেইনের সামনে আত্মরক্ষার বিন্দুমাত্র সুযোগ পায়নি সে।

কোন ব্যাপারে মনস্তাপ করা কেইনের স্বভাববিরুদ্ধ, যে-ভুল হয়ে গেছে শত অনুশোচনাতেও তা শোধরাবে না। অতীতের ঘটনাবলী ওর জীবনে এখন এক দুঃসহ মানসিক যন্ত্রণার শামিল। অতীতের সাথে সম্পর্কচ্ছেদ করতে হলে একটা আচমকা আঘাতে তা সম্পন্ন করতে হবে, কথাটা আবারও ভাবল কেইন। বব হার্ভে আর তার যমজ বোন জ্যাকিকে সাহায্য করলে সম্ভবত সফল হবে ওর সেই উদ্দেশ্য। একবার যখন মনস্থির হয়ে গেল, সঙ্গে সঙ্গে ঘুমিয়ে পড়ল মাইকেল কেইন।

দুই

চাঁদের কলঙ্ক বলতে যা বোঝায়, পশ্চিমের মানচিত্রে কোল্যাটাস হচ্ছে তাই-নোংরা, অপরিষ্কৃত একটা সেটেলমেন্ট। ট্রেনটা যখন ওকে নামিয়ে দিয়ে পুবে ডেভিল রিভারের উজান ধরে স্যান হুয়ান পর্বতমালার বড় বড় মাইনিং ক্যাম্পগুলোর উদ্দেশ্যে চলে গেল তখন জনবসতির দিকে নজর ফেরাল কেইন। একটা স্টোর, ইতস্তত বিকিণ্ড কিছু বাড়িঘর, আর স্টেশনের পাশেই কয়েকটা শিপিং-পেন বা গরু বাছুর চালানোর খোঁয়াড়। ব্যস, আর কিছু নেই।

জায়গাটা কেইনের অপরিচিত। কলোরাডোর পুবের অঞ্চল ও মোটামুটি চেনে। এমনকী কোন একদিন কিনবে এ-আশায় সাউথ পার্কে ছোটখাট একটা বাথানও পছন্দ করে রেখেছে। কিন্তু কেইনের দুর্ভাগ্য, ওর শাইয়েনের ব্যাংক অ্যাকাউন্টে সেই চাহিদাপূরণের মত টাকা আজও জমা হয়নি।

পশ্চিমের ঢালে যা দেখল-মন্টেরোসার চারপাশে গানিসন ভ্যালি, আর নয়নাভিরাম স্নেফলস রেঞ্জ-তাতে ওর চোখ জুড়িয়ে গেল। ডালাস সানিট অতিক্রম করার সময়ে ট্রেনের জানালা দিয়ে একনজর দেখেই সে বুঝতে পেরেছিল প্রকৃতি অকৃপণহাতে তার সৌন্দর্য বিস্তার করেছে এখানে। এবার ও ক্যানিয়নের সুউচ্চ দুই দেয়ালের দিকে তাকাল, এখানে-সেখানে লাল পাথর আর হলুদ অ্যাসপেনের ঝোপঝাড় রয়েছে। তারপর কেইন চোখ ফেরাল নদীর দিকে, এমনভাবে ছুটে চলেছে যেন ডলোরেস রিভারের সাথে মিলনের ব্যাপারে তাড়া আছে ওর। উজানের বড় বড় শস্যপেষাই কলগুলো তাদের আবর্জনা ফেলে না থাকলে ভাল মাছ পাওয়া যাবে এই নদীতে, ভাবল সে।

বেশ কিছুক্ষণ হলো একটা মেয়ে স্টেশনের ছায়ায় দাঁড়িয়ে লক্ষ্য করছিল ওকে। এখন ওর দিকে এগোতে-এগোতে জিজ্ঞেস করল, 'তোমার নাম মাইকেল কেইন?'

ঘাড় ফেরাল কেইন, ডান হাত হ্যাটের কিনারা ছুঁয়ে আছে। 'হ্যাঁ, আমিই

কেইন।'

স্মিত হাসল মেয়েটা, যেন বিরাট এক বোঝা নেমে গেছে বুক থেকে। 'তোমাকে দেখে আমি ভীষণ খুশি হয়েছি, মিস্টার কেইন।' হাত বাড়িয়ে দিল ও। 'আমি জ্যাকুলিন হার্ভে।'

কেইন করমর্দন করল, খুশি হয়েছে মেয়েটির আন্তরিকতায়। 'তোমার ভাই বলেছিল তুমি ডগড্যান্সে দেখা করবে। এখানে তোমাকে দেখতে পাব আশা করিনি।'

'ভাবলাম মন্টেরোসা থেকে ফেরার পথে একটু অপেক্ষা করেই যাই,' সহাস্যে বলল জ্যাকি। 'তুমি আসবেই তা ভাবিনি, আবার হালও ছেড়ে দেইনি।'

মেয়েটা সুন্দরী। প্রথম দর্শনেই মনে হলো কেইনের। ভরাট যৌবন, উন্নত চিবুক, কালচে নীল চোখ, চুলের রঙ ঈষৎ বাদামি। পিঙ্গল বললে বর্ণনা যথাযথ হয়, ভাবল কেইন। খর্বকায়, পাঁচ ফুটের বেশি উচ্চতা হবে না, আঁটসাঁট রাইডিং ড্রেসে সুস্পষ্টভাবে ধরা পড়েছে দেহের প্রতিটি বাঁক। চকিতে কেইনের মনে হলো শুধু সুন্দরী বললে সবটা বোঝায় না। জ্যাকুলিন হার্ভের ক্ষেত্রে নয়। ওর মাঝে এক ধরনের সৎ আভিজাত্য আর চারিত্রিক দৃঢ়তার আভাস পেল কেইন যা সচরাচর মেয়েদের মধ্যে দেখা যায় না। জ্যাকুলিনের প্রতি সমীহ জেগে উঠল ওর ভেতরে।

কিছুক্ষণ চুপ করে রইল কেইন, আলাপ-পরিচয়ের উপযুক্ত ভাষা খুঁজছে। মেয়েটার সাথে ভদ্রভাবে কথা শুরু করতে চাইছে ও। খানিক ইতস্তত করার পর বলল, 'আমার আসা উচিত হবে কিনা বুঝতে পারছিলাম না। তোমার ভাই আমাকে খোলাখুলিভাবে কিছু বলেনি।'

'বলা সম্ভবপর ছিল না ওর পক্ষে,' তাড়াতাড়ি সামাল দেয়ার প্রয়াস পেল জ্যাকুলিন। 'আমিও পারব না। এটা অনেকটা অন্ধকারে হাতড়াবার মত ব্যাপার। জুলন্ত বারুদের স্তূপের ওপর বসে আছ তুমি, অথচ ফিউজ খুঁজে পাচ্ছ না।'

'তোমরা চাও ওই ফিউজ আমি খুঁজে বের করে, ছিড়ে ফেলি-তাই তো?'

'তাই। বব নিশ্চয় বলেছে বাকি এক হাজার ডলার আমার কাছে পাবে তুমি। ডগড্যান্সে গিয়েই ব্যাংক থেকে তুলে দেব, কেমন?'

'সবুর কর, সলতেটা আগে পেয়ে নিই,' কেইন বলল।

টোল পড়ল জ্যাকির গালে, কেইনের কথা পছন্দ হয়েছে। 'বেশ, তুমি যা ভাল বোঝ।' স্টেজের চাকার ঘর্ঘর শব্দ শুনতে পেয়ে ঘুরে দাঁড়াল ও। 'চার্লি মনে হয় এক্ষুণি রওনা দেবে।'

স্টেশনের সামনে এসে থামল স্টেজ, ড্রাইভার হাঁক দিল, 'উঠে পড়।'

ড্রাইভারকে দেখে হাসি পেল কেইনের। একদম মানানসই নাম। বেঁটে, মোটাসোটা গড়ন, মুখের ভেতর তামাক থাকায় বেটপাকারে ফুলে আছে একটা গাল। ঝাঁটা গোঁফ রেখে চেহারায় গান্ধীর্ষ আনার চেষ্টা করা হয়েছে, কিন্তু তাতে বরং হাস্যকর দেখাচ্ছে আরও।

জ্যাকুলিনকে হাতে ধরে স্টেজে তুলে দিল কেইন, তারপর ওর ওঅর

ব্যাগটা ছুঁড়ে দিল কোচের ভেতর, সচরাচর যেসব ব্যাপারে কখনও মনোযোগ দেয় না আজ সেগুলো খেয়াল করছে টের পেয়ে ভেতরে-ভেতরে বিস্ময়বোধ করছে ও। স্টেজে চাপল কেইন, দরজা বন্ধ করে দিল টেনে। ব্রেক লিভার ছেড়ে দিল চার্লি, তারপর হেঁড়ে গলায় চিৎকার করে একবার লাগাম ঝাঁকাতো ঘোড়াগুলো ছুটেতে শুরু করল।

পেছনের সিটে কেইনের পাশে বসেছে মেয়েটা, ঘাড় ফিরিয়ে রেখেছে যেন ওকে দেখতে পায়। কোনরকম লজ্জা বা জড়তার লেশমাত্র নেই জ্যাকুলিনের ব্যবহারে, কেনার আগে জহুরি যেমন কষ্টিপাথরে যাচাই করে নেয় সোনা তেমনিভাবে জরিপ করছে কেইনকে। প্রথমে একটু বিরক্ত হলো কেইন, তারপর মনে মনে হাসল। মজা পাচ্ছে ও। যাচাই করার ব্যাপারে দেরি করে ফেলেছে মেয়েটা—বহু আগেই বিক্রি হয়ে গেছে সে।

‘জান,’ কেইন বলল, ‘তোমার নাকে তিল আছে একটা।’

‘তোমাকে এভাবে দেখা বোধহয় উচিত হচ্ছে না।’ ভুরু কঁচকাল জ্যাকুলিন, চোখ সরিয়ে নিল। ‘কিন্তু কী করি বল, মাইকেল কেইনের যে চেহারা আমি কল্পনা করেছিলাম তার সাথে তোমার কোন মিল নেই।’

‘তোমার ভাইও ঠিক একথাই বলেছে। ও ভেবেছিল আমি নিশ্চয় দশাসই পালোয়ান হব একটা।’

‘কোন ভুল নেই, একদম ববের কথা,’ সহাস্যে বলল জ্যাকি। ‘আমি নিজেও অবশ্যি তাই ভেবেছিলাম। কিন্তু এখন দেখছি হোলস্টার বাঁধার ঢঙ ছাড়া তোমার আর সবকিছু কাউন্সিলদের মত। তবে বয়সের তুলনায় তোমাকে একটু বুড়োটে দেখায়।’

‘শরীরের ওপর বেশি অত্যাচারের ফল,’ শ্মিতমুখে কৈফিয়ত দিল কেইন।

‘তাই হবে। বব আর কী বলেছে তোমাকে?’

ডেনভারে রবার্ট হার্ভের সাথে কাজের ব্যাপারে ওর যেসব কথাবার্তা হয়েছে কেইন তা খুলে বলল জ্যাকুলিনকে। তারপর যোগ করল, ‘এত অল্পে হবে না। মজুরি হালাল করতে হলে খোলাখুলিভাবে সবকিছু জানতে হবে আমাদের।’

‘তুমি শুধু গোলমালের উৎসটা খুঁজে বের কর,’ গম্ভীর গলায় বলল জ্যাকি। ‘বাবাকে বাঁচাতেই তোমাকে আমাদের আনা। বাবা আজকাল মদ ধরেছেন। কিছু একটা হয়েছে ওঁর। সেটা কী আমি জানি না। হয়তো হতাশায় পেয়ে বসেছে। ডিলন মেসায় উনিই এসেছেন সবার আগে। একপাল গরুবাছুর নিয়ে বাবা যখন প্রথম ওখানে এলেন আমি আর বব তখন শিশু। নিজের পছন্দসই জায়গা বাছাইয়ের সুযোগ তিনি পেয়েছিলেন—কিন্তু তা কাজে লাগাতে পারেননি।’

জ্যাকির কথাগুলো পছন্দ হলো না কেইনের। মনোবল, শক্তি এসবের কদর করে ও, কিন্তু সাধারণত যারা ওকে নিয়োগ করে থাকে তাদের অধিকাংশই হয় এই হার্ভের মত মানুষ। টাকা থাকে এদের, থাকে প্রভাব-প্রতিপত্তি; এরা হয় স্থানীয় গুরু ব্যবসায়ী সমাজের লোক; অনেক সময় এদের ওপরেই নির্ভর করে স্থানীয় লোকদের উন্নতি, মানুষ প্রত্যাশার দৃষ্টিতে চেয়ে থাকে এদের পানে; আর

ব্যাগটা ছুঁড়ে দিল কোচের ভেতর, সচরাচর যেসব ব্যাপারে কখনও মনোযোগ দেয় না আজ সেগুলো খেয়াল করেছে টের পেয়ে ভেতরে-ভেতরে বিস্ময়বোধ করেছে ও। স্টেজে চাপল কেইন, দরজা বন্ধ করে দিল টেনে। ব্রেক লিভার ছেড়ে দিল চার্লি, তারপর হেঁড়ে গলায় চিৎকার করে একবার লাগাম ঝাঁকাতো ঘোড়াগুলো ছুটেতে শুরু করল।

পেছনের সিটে কেইনের পাশে বসেছে মেয়েটা, ঘাড় ফিরিয়ে রেখেছে যেন ওকে দেখতে পায়। কোনরকম লজ্জা বা জড়তার লেশমাত্র নেই জ্যাকুলিনের ব্যবহারে, কেনার আগে জুহুরি যেমন কষ্টিপাথরে যাচাই করে নেয় সোনা তেমনিভাবে জরিপ করেছে কেইনকে। প্রথমে একটু বিরক্ত হলো কেইন, তারপর মনে মনে হাসল। মজা পাচ্ছে ও। যাচাই করার ব্যাপারে দেরি করে ফেলেছে মেয়েটা—বহু আগেই বিক্রি হয়ে গেছে সে।

‘জান,’ কেইন বলল, ‘তোমার নাকে তিল আছে একটা।’

‘তোমাকে এভাবে দেখা বোধহয় উচিত হচ্ছে না।’ ডুরু কোঁচকাল জ্যাকুলিন, চোখ সরিয়ে নিল। ‘কিন্তু কী করি-বল, মাইকেল কেইনের যে চেহারা আমি কল্পনা করেছিলাম তার সাথে তোমার কোন মিল নেই।’

‘তোমার ভাইও ঠিক একথাই বলেছে। ও ভেবেছিল আমি নিশ্চয় দশাসই পালোয়ান হব একটা।’

‘কোন ভুল নেই, একদম ববের কথা,’ সহাস্যে বলল জ্যাকি। ‘আমি নিজেও অবশ্যি তাই ভেবেছিলাম। কিন্তু এখন দেখছি হোলস্টার বাঁধার ঢঙ ছাড়া তোমার আর সবকিছু কাউন্সিলদের মত। তবে বয়সের তুলনায় তোমাকে একটু বুড়োটে দেখায়।’

‘শরীরের ওপর বেশি অত্যাচারের ফল,’ শ্মিতমুখে কৈফিয়ত দিল কেইন।

‘তাই হবে। বব আর কী বলেছে তোমাকে?’

ডেনভারে রবার্ট হার্ভের সাথে কাজের ব্যাপারে ওর যেসব কথাবার্তা হয়েছে কেইন তা খুলে বলল জ্যাকুলিনকে। তারপর যোগ করল, ‘এত অল্পে হবে না। মজুরি হালাল করতে হলে খোলাখুলিভাবে সবকিছু জানতে হবে আমাকে।’

‘তুমি শুধু গোলমালের উৎসটা খুঁজে বের কর,’ গম্ভীর গলায় বলল জ্যাকি। ‘বাবাকে বাঁচাতেই তোমাকে আমাদের আনা। বাবা আজকাল মদ ধরেছেন। কিছু একটা হয়েছে ওঁর। সেটা কী আমি জানি না। হয়তো হতাশায় পেয়ে বসেছে। ডিলন মেসায় উনিই এসেছেন সবার আগে। একপাল গরুবাছুর নিয়ে বাবা যখন প্রথম ওখানে এলেন আমি আর বব তখন শিশু। নিজের পছন্দসই জায়গা বাছাইয়ের সুযোগ তিনি পেয়েছিলেন—কিন্তু তা কাজে লাগাতে পারেননি।’

জ্যাকির কথাগুলো পছন্দ হলো না কেইনের। মনোবল, শক্তি এসবের কদর করে ও, কিন্তু সাধারণত যারা ওকে নিয়োগ করে থাকে তাদের অধিকাংশই হয় এই হার্ভের মত মানুষ। টাকা থাকে এদের, থাকে প্রভাব-প্রতিপত্তি; এরা হয় স্থানীয় গরু ব্যবসায়ী সমাজের লোক; অনেক সময় এদের ওপরেই নির্ভর করে স্থানীয় লোকদের উন্নতি, মানুষ প্রত্যাশার দৃষ্টিতে চেয়ে থাকে এদের পানে; আর

সমাজের উচুতলার এইসব মানুষদের সমস্ত সমস্যাকে কঠিনহাতে দূর করে যারা, মাইকেল কেইনের মত সেইসব বন্দুকবাজদের কপালে জোটে একধরনের ঈর্ষা-মাখানো শ্রদ্ধা, যে-শ্রদ্ধার উৎস ভয়-এবং কখনও কখনও ঘৃণাও।

নীরবে কেটে গেল বেশ কিছু সময়। তারপর জ্যাকুলিন বলল, 'অন্যরা পরে এসেছে। আবনার লরির স্ল্যাশ ট্রায়ান্সেল প্রায় উত্তেজিত ক্রীকের মাথায়। রেড ম্যানিয়ন এখানকার শেরিফ। ওর মার্কী ম্যালেট ফোর, আমাদের আর লরির বাথানের মাঝখানে পড়েছে ম্যানিয়নের রেঞ্জ। বুচার এসেছে সবশেষে, এবং সকলের মধ্যে ও-ই হচ্ছে সবচেয়ে ঘাঘু। ওর সি.সি. আউটফিট ডগড্যাসের ঠিক পাঁচ মাইল পূবে, একদম মেসার মাঝখানে। শীতকালে সবচেয়ে ভাল ঘাস পায় ও।'

'পানি কেমন আছে তোমাদের ওদিকে?'

'প্রচুর। মূল উৎস উত্তেজিত ক্রীক, ডগড্যাসের ছ-সাত মাইল ভাটিতে গিয়ে ডেভিল রিভারে পড়েছে। এ ছাড়া ছোটখাট অনেক পাহাড়ি ঝরনা আছে, পুরো গরমকালে পানি থাকে।' কাঁধ ঝাঁকাল জ্যাকুলিন, এমনভাবে যেন এখানেই ইতি টানতে চায় এ-প্রসঙ্গের। 'তবে টাকা বানিয়েছে একা বুচার। বাবা এবং আরও যারা আছে তাদের সবাইকে হাত করেছে ও যাতে ওর কথায় অন্যরা ওঠ-বস করে। ভালভাবে খেয়ে-পরে বাঁচতে হলে একজন মানুষের যা-যা লাগে তার ওপর দিয়ে আছে বুচারের, তবু ওর খাঁই মেটে না-সবকিছু নুটেপুটে নিতে চায়। তাই ছোট ছোট যেসব র‍্যাঙ্গার আর খামার মালিক রয়েছে তাদেরকে এখন তাড়াবার পায়তারা করছে।'

কেইনের কাছে ব্যাপারটা নতুন কিছু নয়; সেই পুরনো, অতি পরিচিত ঘটনার পুনরাবৃত্তি মাত্র। স্থানীয় সমাজের নেতা হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেছে এমন লোকেরা হরহামেশা এরকমটা করে থাকে। সাফল্যের মাঝেই সম্ভবত লুকিয়ে থাকে লোভ; আর বেশির ভাগ সময়ে দেখা যায় মফস্বল অঞ্চলের আইনকানুন নিয়ন্ত্রণ করে এইসব লোভী লোকেরা। মানুষের এই আরেকটা স্বভাবজাত দুর্বলতা কেইন মোটেও বরদাশত করতে পারে না। খুন করার জন্য যে-লোক টাকা ঢালছে তার সামনে মানুষ নতজানু হতে কুণ্ঠিতবোধ করে না, অথচ যে-লোক ট্রিগার টেপে তাকে তারা দেখে ঘৃণার চোখে।

বেশ কিছুক্ষণ মৌন থাকার পর আবার জ্যাকুলিন বলল, 'ওনেই বোধহয়, বুচার একটা কমিটিমত গঠন করেছে, এর নাম দিয়েছে সে কম্বাইন। এতে যদি সে একা থাকত, সব ঝঙ্কি-ঝামেলা তাকেই পোয়াতে হত, আর লোকেও তাকে দোষারোপ করত। কিন্তু কম্বাইনের মুখপাত্র হওয়ায় সবাই মনে করেছে বড় বড় গুরু ব্যবসায়ীরা ওর পেছনে আছে।'

'কাজটা, মনে হচ্ছে, একটু কঠিনই,' কেইন বলল। 'তোমার ভাই আমাকে বলেছে আমি যেন বুচারের হয়ে কাজ করার ভান করি, কিন্তু এতে সমস্যা আছে একটা। বুচার যদি কোন হুকুম দেয় তখন আমি বেকায়দায় পড়ে যাব।'

অর্ধপূর্ণ দৃষ্টিতে কেইনের মুখের দিকে তাকাল জ্যাকি। 'তুমি কি সবসময় পরের হুকুমে চলো?'

কেইন শ্রাগ করল। 'আমি আমার পিস্তল ভাড়া খাটাই। আমার কাজই হচ্ছে, আমাকে যা করতে বলা হবে তা করা।'

'আইন, ন্যায়-অন্যায় এসব নিয়ে ভাব না কখনও?'

'আইন, ন্যায়-অন্যায়! এসব ব্যাপারে কেইন কখনও বিশেষ ভাবেই একটা। কেউ কেউ এগুলো মেনে চলে বটে, কিন্তু অধিকাংশের কাছেই নিজেদের স্বার্থহানি হতে পারে এমন যাবতীয় কিছু বেআইনি, অন্যায়। যেমন এখানে, যাদের হাতে চাবুক আছে আইন তাদের পক্ষে কাজ করবে, ন্যায়-অন্যায়ের মাপকাঠিও তৈরি হবে তাদের সুবিধা অনুযায়ী।'

'জানি না,' খানিক বাদে বলল কেইন। 'আমার মনে হয় সবটাই নির্ভর করে দৃষ্টিভঙ্গির ওপর।'

এপাশ-ওপাশ মাথা নাড়াল জ্যাকুলিন। 'তোমার দৃষ্টিভঙ্গি যাই হোক, একজন অসহায় রাস্তাঘরকে বন্দুকের জোরে উচ্ছেদ করবে কেউ একে নিশ্চয়ই তুমি ন্যায়বিচার বলবে না? আমি জানি বাবা সমর্থন করেন না এগুলো। যখন সুস্থ থাকেন, বুচারকে ঘৃণা করেন তিনি। কিন্তু ওর বিরুদ্ধে দাঁড়াবার সাহস তার নেই।'

'তুমি চাও আমি তাকে সেই সাহস জোগাই?'

বাতাসে হাত খেলাল জ্যাকি। 'তুমি কদুর কী করতে পারবে আমি জানি না। সেজন্যেই বব তোমাকে বেশিকিছু বলতে পারেনি। আমিও পারব না।'

রাস্তার কিনার ঘেঁষে উঠে যাওয়া ক্রিফের দিকে আনমনে তাকাল কেইন, ডেনভারে রবার্ট হার্ভের সাথে কথা বলার সময়ে যা মনে হয়েছিল, আজ পর্যন্ত যত কাজ নিয়েছে সে তার মধ্যে এটাই হচ্ছে সবচেয়ে গোলমালে, এখন সেটাই আবার মনে হচ্ছে ওর। এর আগে যেসব কাজ ও করেছে সেগুলোতে ন্যায়-অন্যায় বিচারের কোন সুযোগ ছিল না ওর সামনে। নিয়োগকর্তার হুকুম অনুযায়ী কোন লোককে গিয়ে হয়তো শমন জারি করেছে নিজের জায়গা ছেড়ে চলে যেতে হবে তাকে, কিংবা কোন ওঅটর হোলের পাশ থেকে সরে যেতে হবে, লোকটা তা পালন করে থাকলে ভাল, নইলে তাকে হত্যা করে নিজের পাওনাগণ্ডা বুঝে নিয়ে চলে এসেছে কেইন। কিন্তু এবারের ব্যাপারটা একেবারে অন্যরকম, কেন-যেন কাজটা মনে ধরেছে ওর।

'আমি আমার সাধ্যমত চেষ্টা করব,' বলল কেইন, 'তবে মাঝে মধ্যে তোমাদের পরামর্শ দরকার হতে পারে।'

শ্মিত হাসল জ্যাকুলিন, যেন হাঁপ ছেড়ে বেঁচেছে। 'অন্যকে পরামর্শ দেয়ায় আমি চিরকাল পাকা-তবে মুশকিল হচ্ছে, বেশির ভাগ লোকের পছন্দ হয় না সেটা।'

কেইনের একবার ইচ্ছে হলো বলে, ওর পরামর্শ তার পছন্দ হবে কারণ এজন্য টাকা পাচ্ছে সে, কিন্তু শেষপর্যন্ত তা আর বলল না। এখন আবার পাহাড়ের দিকে তাকিয়ে আছে সে, আশপাশে ছড়ানোছিটানো বোন্ডার আর সিডারের ঝোপ দেখছে, উপলব্ধি করতে পারছে জ্যাকুলিন আর তার ভাই একটা চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দিয়েছে ওর দিকে। ওর দায়িত্ব গোলমাল বন্ধ করা, সৃষ্টি করা নয়;

একজন লোককে তার চারিত্রিক দুর্বলতা থেকে রক্ষা করে ন্যায় প্রতিষ্ঠা করা।

হঠাৎ করে চওড়া হয়ে গেল উপত্যকা, রাস্তা আর নদীর মাঝখানে একফালি অ্যালফ্যালফা বন পড়ল। বায়ে তীক্ষ্ণ বাক নিল স্টেজ, একটা ফার্মহাউসের সামনে এসে ড্রাইভার রাশ টেনে হাঁক পাড়ল, 'মোর্যান, টেবিলে খানা লাগিয়েছ?'

'হ্যাঁ, গরম আছে এখনও,' সাড়া দিল একজন লোক। 'কী ব্যাপার, চার্লি, আজ তোমার তিন মিনিট লেট হলো?'

'লেট না ছাই,' তিরিফে সুরে বলল ড্রাইভার। 'তোমার ঘড়িটাই খারাপ। নিশ্চয় রেল কোম্পানিও ওই একই ঘড়ি ব্যবহার করে। কোল্যাটাসে পাঁচ মিনিট দেরিতে পৌঁছেছে ট্রেন।'

স্টেজ থেকে নামল কেইন, তারপর হাত বাড়িয়ে জ্যাকুলিনকে নামতে সাহায্য করল। আড়মোড়া ভাঙল জ্যাকি, হাই তুলল, আঙুল চালিয়ে কপালের ওপর থেকে চুল সরাল। 'স্টেজ জার্নি আমার একদম পছন্দ না। ঘোড়া জোগাড়ের কথা ভেবেছিলাম, কিন্তু তোমার ভাল লাগবে কিনা বুঝতে পারিনি। তা ছাড়া আমি কথা বলতে চাইছিলাম তোমার সঙ্গে।'

'আর তা ছাড়া তুমি জানতেও না যে আমি আসছি।'

'না,' বলল জ্যাকুলিন, 'তা জানতাম না।'

ফার্মহাউসের দিকে ইশারা করল খামার মালিক। 'টেবিলে সব বাঁড়া আছে, ম্যাম। খাওয়ার জন্য পনেরো মিনিট সময়।'

জ্যাকুলিনের পেছন-পেছন ভেতরে গেল কেইন, পরমুহূর্তে ড্রাইভার ঢুকল, তিন মিনিট দেরি হয়েছে বলায় এখনও গাল পাড়ছে মোর্যানকে। স্টেজ স্টপে সচরাচর যেমন হয়, কেইন দেখল এখানকার খাবার তার চেয়ে উন্নতমানের। বীফ স্টিক, বিস্কুট আর মোর্যানের খেতের সবজি। গোথাসে সব খেয়ে গরম গরম দুকাপ কফিপান করল ও, তারপর যখন ভাবছে আরেক কাপ খাবে কিনা তখন দেখল চার্লি চেয়ার ছাড়ছে।

হেঁটে দরজায় গিয়ে দাঁড়াল ড্রাইভার। হঠাৎ কেমন যেন সন্তুষ্ট দেখাচ্ছে। একটা উদ্ধত গলা ভেসে এল বাইরে থেকে। 'স্টেজে করে তুমি কাকে নিয়ে এলে, চার্লি?'

কেইনের বাহু খামচে ধরল জ্যাকি। 'লুড পিয়ারসন।'

কেইনের মনে পড়ল পিয়ারসন ভাইদের কথা ওকে বলেছিল বব হার্ভে; ও দেখল জ্যাকুলিন কাঁপছে। চার্লি তখন বলছিল, 'সেফ দুজন যাত্রী, লুড। জ্যাকি হার্ভে আর তার সঙ্গে নতুন এক লোক-ট্রেনে এসেছে।'

'নতুন লোকটাকে আমি একবার দেখব,' বলল উদ্ধত কণ্ঠ।

চার্লিকে ঠেলে একপাশে সরিয়ে, বাইরের কড়া রোদে বেরিয়ে এল কেইন। 'দেখ, বন্ধু।'

লুড পিয়ারসন দীর্ঘদেহী মানুষ, পোশাক-আশাকে আড়ম্বর আছে। মাথায় মুক্তো রঙের স্টেটসন হ্যাট, পরনে বাছুরে চামড়ার ভেস্ট আর সবুজ সিল্কের শার্ট, তাতে বোতামের বদলে মেক্সিক্যান মুদ্রা লাগানো। সোনার পাতে-মোড়া মার্সেনারি

কোন্ট রিভলভারটা চাউস একটা হোলস্টারে রাখা; বড় বড় দাঁতঅলা স্পার দুটো কপোর। এবার কেইনের দিকে ফিরল লুড, লোমশ জুয়ুগল কুঁচকে উঠেছে।

‘পিস্তলবাজ?’ কক্ষ সুরে জানতে চাইল সে।

‘কেউ কেউ তাই জানে আমাকে,’ কেইন জবাব দিল।

ঠিক তখনই দ্বিতীয় লোকটাকে দেখতে পেল ও, কোরালের পাশে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। লুড পিয়ারসনের সঙ্গে চেহারায় বেশ মিল রয়েছে ওর, তবে ও একটু বেঁটে, অল্পবয়সী এবং অতটা ফুলবাবু না। নিশ্চয় তাই, কেইন আন্দাজ করল, এবং দুজনের মধ্যে তুলনামূলকভাবে দক্ষ ফাইটার হবে। অতীতের অভিজ্ঞতা থেকে কেইন জানে যাদের চালচলনে হামবড়াই ভাব থাকে ভেতরে-ভেতরে তারা দুর্বল হয়। এবং সেই দুর্বলতা ঢাকতেই তাদের প্রয়োজন পড়ে বাইরের যত চাকচিক্যের।

‘তুমি উইলিয়াম বুচারের লোক?’ জিজ্ঞেস করল লুড।

‘হতে পারে।’

‘বেশ, তা হলে তুমি ডগড্যান্সের স্টেজ ধরবে না। বুচার অবশ্য অনেকদিন থেকেই বন্দুকবাজ তলব করার হুমকি দিচ্ছে, কিন্তু আমরা তা সহ্য করব না। বুঝেছ?’

‘আমরা মানে?’

‘ডিলন মেসার’ সবাই, যারা কন্টাইনে নেই। আমাদেরও বাড়িঘর আছে এখানে, এবং সেগুলো আমরা কারোকে দখল করতে দেব না। ওসব পিস্তলবাজকে আমরা ভয় পাই না।’

‘আমি ভাবছি ডগড্যান্সে আমাকে যেতেই হবে,’ শান্ত কণ্ঠে বলল কেইন।

‘কিন্তু আমি অন্যরকম ভাবছি।’ লুড ইশারা করল ড্রাইভারকে। ‘তুমি রওনা দাও, চার্লি। আর, জ্যাকি, তোমার বাবা আর বুচারকে তুমি বলে দিয়ো, এতে কাজ হবে না। আমাদেরকে ভিটেমাটিছাড়া করতে হলে ওদের নামতে হবে মাঠে, আর আমরাও বুলেটে তার জবাব দেব।’

কেইন দাঁড়িয়ে রইল চুপ করে। চার্লি উঠনের এপাশে এসে ড্রাইভিং বক্সে চড়ে বসল। জ্যাকি দাঁড়িয়ে রইল দোরগোড়ায়, অপেক্ষা করছে। চার্লি বলল, ‘চলে এসো, জ্যাকি।’

স্টেজের দিকে হাঁটা দিল কেইন, আড়চোখে নজর রাখছে কোরালের পাশে দাঁড়ানো লোকটার ওপর। লুড পিয়ারসন হৃদ্য হাডল, ‘তুমি আবার কোথায় চললে, মিস্টার?’

‘বললামই তো, ডগড্যান্সে যেতে হবে আমাকে,’ জবাব দিল কেইন, কণ্ঠস্বর এখনও শান্ত।

‘না, যাওয়া হবে না তোমার। তখন যদি আমার কথা না বুঝে থাক, এখন কান খুলে শুনে নাও। চার্লি কোল্যাটাসের ফিরতি ট্রিপ নিয়ে না আসা পর্যন্ত এই মোর্যানের বাসাতেই থাকছ তুমি। তারপর স্টেজে চেপে চলে যাবে অন্য কোথাও। এবার বোঝা গেছে?’

‘লুড, তুমি জান না তুমি কার সাথে কথা বলছ,’ সাবধান করল জ্যাকি।
‘ওর নাম মাইকেল কেইন।’

‘কেইন।’ চার্লি আতকে উঠল।

লুড পিয়ারসনের সমস্ত হস্তিগত যেন একফুৎকারে নিভে গেছে। মনে হচ্ছে ও যেন কুঁকড়ে গেছে, লাল চেহারা আর ততটা লাল দেখাচ্ছে না এখন। দুর্বলভাবে হাসতে চেষ্টা করল ও, মেকি বিনয়ের সুরে বলল, ‘ও আচ্ছা, তুমিই সেই বিখ্যাত মাইকেল কেইন। বুচার তা হলে ঠিকই বলেছিল, সেরা লোক আনবে।’

‘হ্যাঁ, কেউ কেউ অবশ্যি আমাকে সেরা বলেই জানে,’ স্বীকার করল কেইন। ‘তুমি কি এখনও চাও আমি থেকে যাই এখানে?’

‘কেন, নাহ। তখন আমি তোমার পরিচয় জানতাম না।’ নিজের ঘোড়ার দিকে এগোতে-এগোতে লুড যোগ করল, ‘জো, তুমিও চলে এসো। এখানে সুবিধে হবে না।’

কোরালের কাছে-দাঁড়ানো লোকটা তার বাহনের দিকে এগোল এক কদম, ওর শরীরের ডান পাশ দেখতে পাচ্ছিল না কেইন। তারপর আচমকা, বিনা বাক্যব্যয়ে, দুজনেই ঘুরে দাঁড়াল একসাথে, পিস্তল বের করেছে। কেইন অনুমান করল এরকম প্রতারণা ওরা বহু অনুশীলনের পর আয়ত্ত করেছে, এবং সম্ভবত এতে সুফলও পেয়েছে অনেকবার।

কিন্তু পিয়ারসনদের ফাঁদে পা দিল না কেইন। ড্র করল ও, এত দ্রুত যে তার কাছে পিয়ারসনদের ড্র-কে দুঃখজনকরকমের মন্তুর দেখাল। মাত্র একবার গুলি করল কেইন, অটুট নীরবতায় বিকট শোনালা সেই আওয়াজ, তারপর লুড পিয়ারসনের দিকে পিস্তল ঘুরিয়ে গর্জে উঠল, ‘থাম!’

লুড তার কোল্ট অর্ধেক বের করে ফেলেছিল। ওই অবস্থায় জমে গেল সে, চোয়াল ঝুলে পড়েছে, সব বাহাদুরি যেন উবে গেছে কর্পূরের মত। কোরালের গায়ে ঢলে পড়েছিল জো পিয়ারসন, খুঁটি ধরে সোজা হওয়ার প্রয়াস পেল, তারপর কাত হয়ে বার্ন ইয়ার্ডের খড়ের গাদার ভেতর পড়ে গেল।

‘তোমার পিস্তল ফেলে দাও, লুড,’ কেইন আদেশ করল।

হুকুম তামিল করল পিয়ারসন। চার্লি তখন বলছে ওকে, ‘আচ্ছা, তুমি তা হলে এভাবেই গায়ে পড়ে মানুষের সঙ্গে ঝগড়া কর, না, লুড? এবার বোধহয় শিক্ষা হবে তোমার। আমি হালফ করে বলতে পারি, কেইনের ড্র তুমি দেখতে পাওনি।’

‘তোমার লোককে তুলে নিয়ে ভাগ এখন থেকে,’ কড়া গলায় আদেশ করল কেইন।

নিশ্চল হয়ে আছে ওরা। চার্লি স্টেজকোচের ড্রাইভিং বক্সে, জ্যাকুলিন দরজায়, মোর্যান বার্নের সামনে, আর কেইন পিস্তলহাতে উঠনের মাঝখানে। লুড তার ভাইকে ঘোড়ার পিঠে আড়াআড়িভাবে চাপিয়ে স্যাডলের সাথে না বাঁধা পর্যন্ত ওদের কেউই নড়াচড়া করল না। একটিবারও পেছনে না তাকিয়ে, ঘোড়ায় চেপে চলে গেল লুড।

কেইন বলল, 'এবার মনে হয় আমরা যেতে পারি।'

ওকে পাশ কাটিয়ে স্টেজের কাছে চলে গেল জ্যাকুলিন। দরজা খুলে জ্যাকিকে উঠতে সাহায্য করল কেইন, তারপর যখন নিজেও উঠে বসল ওর পাশে তখন চার্লি স্টেজ ছেড়ে দিল। সেতু পেরিয়ে ক্যানিয়নের দক্ষিণ দেয়ালের চড়াইয়ে ওঠা পর্যন্ত চুপ করে রইল ওরা। তারপর জ্যাকুলিন নীরবতা ভেঙে বলল, 'তোমার সম্পর্কে যা শুনেছিলাম এখন দেখছি তার সবই সত্যি, মিস্টার কেইন।'

একটা সিগারেট বানাল কেইন, বুঝতে পারছে না কী বলবে। শেষমেশ জিজ্ঞেস করল, 'ওরা দুজন ভাই?'

মাথা ঝাঁকাল জ্যাকি। 'আউট-ল। শেরিফ জানে, কিন্তু কলোরাডোতে কোনরকম গোলমাল করে না বলে ম্যানিয়ন ঘাঁটায় না ওদের। উতে ক্রীকের ধারে ওদের বোন মলির ছোটখাট একটা ফার্ম আছে। সেখানে ওরা মাঝেমধ্যে থাকে। তা ছাড়া নদীর ওপারে যে আউট-ল হাইড-আউট আছে সেখানেও থাকে। ওই হাইড-আউটে যারা থাকে মলি তাদের খাবার-দাবার জোগায়।'

'হঠাৎ আমার ওপর চড়াও হলো কেন?' কেইন প্রশ্ন করল।

'ঠিক জানি না,' একটুক্ষণ চিন্তা করে বলল জ্যাকি। 'সম্ভবত ইরা শ্লেড স্টেজের ওপর নজর রাখতে বলেছে ওদের। ছোট ছোট যেসব ব্যাংগার আছে শ্লেড তাদের নেতা। ওরা জানে এখানে থাকতে হলে ওদেরকে লড়তে হবে।'

সিগারেট ধরাল কেইন, ম্যাচের কাঠিটা ভেঙে ছুঁড়ে ফেলে দিল জানালা গলিয়ে। স্টেজ স্টেশনের হত্যাকাণ্ড সম্পর্কে ও কোনরকম অনুশোচনায় ভুগছে না। পিয়ারসনরা ছলনার আশ্রয় নিয়েছিল; সম্ভব হলে ওরা খুন করত ওকে। তারপর জ্যাকির গম্ভীর মুখের দিকে আড়চোখে তাকাল ও, ভাবল ঘটনাটা না ঘটলেই ভাল ছিল। জ্যাকুলিন হার্ভে গোলমাল চায়নি; বরং তা যাতে না হয় সেজন্যেই নিয়োগ করেছে ওকে। অথচ সে, ডগড্যাপে পৌছাবার আগেই, খুন করেছে এক লোককে। ওই মেয়ের কাছ থেকে সমীহ আদায় করতে চায় কেইন, ভয় না।

'দুঃখিত,' খানিক ইতস্তত করে শেষপর্যন্ত কথাটা বলেই ফেলল কেইন, 'কিন্তু এ ছাড়া আমি আর কী-বা করতে পারতাম? সুযোগ পেলে ওরাই খুন করত আমাকে।'

'না-না, এতে আফসোসের কী আছে,' তীক্ষ্ণ সুরে বলে উঠল জ্যাকুলিন। 'কেউ তোমাকে দোষ দেবে না। পিয়ারসনদের ভয়ে এমনিতেই তটস্থ হয়েছিল এখানকার লোকজন-এমনকী শেরিফ পর্যন্ত।'

'তুমি যা ভাবছ আমার মনে হয় অবস্থা তার চেয়ে খারাপ,' কেইন বলল। 'বোধহয় এমন জায়গায় পৌছেছে যেখানে আর কিছুই করতে পারব না আমি।'

অনুসন্ধিৎসু দৃষ্টিতে ওর পানে তাকাল জ্যাকি। 'অসম্ভব না, তবে আমার ইচ্ছে তবু তুমি একটু চেষ্টা করে দেখ।' একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল ও। 'মিস্টার কেইন, তোমার পিস্তল ভাড়া খাটানো আর ন্যায়-অন্যায় সম্পর্কে খানিক আগে যে-কথাগুলো তুমি বললে সেগুলোই এতক্ষণ আমি ভাবছিলাম।'

চুপ করল জ্যাকুলিন, উদাস দৃষ্টি মেলে দিয়েছে বাইরে, বুঝতে পারছে না কী বলবে। যেহেতু ওর শ্রদ্ধা আদায় করা জরুরি মনে হচ্ছিল কেইনের, নিচু গলায় ও জিজ্ঞেস করল, 'কী ভাবছিলে?'

ওর দিকে নজর ফেরাল জ্যাকুলিন, চোখের তারায় জেদ। 'বলব তোমাকে। ন্যায়-অন্যায় বিচার না করে, তুমি যদি স্রেফ পরের হুকুমে মানুষ খুন কর, খোদা এবং মানুষ উভয়ের চোখেই তুমি বেঈমান।'

নদীর দিকে চোখ নামাল কেইন, দূর-নীচে সরু একটা ফিতের মত দেখাচ্ছে ওটা। ঘোড়াগুলোকে তাড়া দেয়া বন্ধ করেছে চার্লি। সিডার বনে বাতাসের ফিসফাস ছাড়া সমস্ত চরাচর যেন নিস্তব্ধ। এই স্তব্ধতার মাঝে সহসা যেন সত্যকে উপলব্ধি করল কেইন।

ও বলল, 'এবার থেকে ভাবব।'

তিন

এরকম জায়গা ইতিপূর্বে কখনও দেখেনি কেইন। চারদিকে শুধু ঘাস, দক্ষিণ সীমায় সারিবদ্ধ পাহাড়ি ধাপ, একের পর এক ওপর পানে উঠে গিয়ে উজ্জ্বল আকাশের পটভূমিতে দীর্ঘ কালো একটা রেখা সৃষ্টি করেছে। এই রেখায় কেবল একটা ভাঙন আছে, মাঝামাঝি জায়গায় গাছপালার মাথা ছাড়িয়ে একাকী দাঁড়িয়ে রয়েছে মোচাকৃতি একটা পাহাড়চূড়া, ন্যাড়া কঠিন শিলাখণ্ড, কোথাও তুষারের চিহ্নমাত্র নেই।

পূবে রয়েছে স্যান হুয়ান রেঞ্জ, ক্রাতের দাঁতের মত এবড়োখেবড়ো, পশ্চিম দিগন্ত স্পর্শ করেছে লা সাল পর্বতমালা। রাস্তা আর লা সালসুয়ের মধ্যবর্তী অঞ্চলে উপত্যকা হারিয়ে গেছে এক অন্ধকার, ক্যানিয়নসমষ্টির গোলকধাঁধায়, ভাঙাচোরা জায়গা, ডিলন মেসা থেকে দেখে মনে হয় দুর্গম। উত্তরে, ডেভিল রিভারের ওপাশে, আরেকটা শৈলশিরা বা রিজ, দেবদারু গাছে ছাওয়া। জ্যাকুলিনের কথা অনুযায়ী আউল-স্ হোল ওদিকেই কোথাও হবে।

একনাগাড়ে ছুটছে স্টেজ, পশ্চিমাকাশের সূর্য শ্বাসরুদ্ধকর তাপ ঢালছে এর গায়ে। চাকার ঘর্ষণ আর খুরের ঘায়ে ধুলো উড়ে কোচের ভেতর ঢুকে পড়ছে বলে নাকে-মুখে রুমাল চাপা দিয়ে আছে জ্যাকুলিন। ডগড্যাগের সীমানা অবধি আর একটি কথাও বলল না কেইন। তারপর জিজ্ঞেস করল, 'আচ্ছা, দক্ষিণের ওই পাহাড়টার নাম কী?'

রুমাল নিচু করল জ্যাকি। 'অ্যাঞ্জেলে পীক। শীতের বরফ জমার পর এপাশ থেকে দেখলে মনে হয় ঠিক যেন একটা পরী বসে আছে। এর পশ্চিমে দেয়াল আছে একটা, এখান থেকে দেখতে পাবে না। কয়েকশ ফুট উঁচু, খাড়া-তাই আমরা বলি হেল-স্ ওয়াল।'

'ডেভিল রিভার। হেল-স্ ওয়াল। অ্যাঞ্জেলে পীক।' একগাল হাসল কেইন।

‘একখানা দেশ বটে।’

‘ঠিক,’ সায় দিল জ্যাকি। ‘আমার মা মারা গেছেন আমরা এখানে আসার আগে। কিন্তু বব আর আমাকে উনি ন্যায়-অন্যায়, খোদা-শয়তান এগুলো সম্পর্কে যে-শিক্ষা দিয়েছেন তার সবই আমার মনে ছিল। তারপর আমরা যখন এখানে এলাম, এসব নিয়ে অনেক ভেবেছি আমি। আমার মনে হয় যারা এইসব পাহাড়, নদীর নামকরণ করেছে তারাও ধর্মের কথা ভাবত।’

‘বোধহয় তাই,’ বলে ওখানেই প্রসঙ্গের ইতি টানল কেইন।

আবার মুখে রুমাল তুলল জ্যাকি। যে-বাড়ি থেকে ডগড্যান্স শহরের শুরু সে-পর্যন্ত চূপ করে রইল ওরা। তারপর রুমালটা ভাঁজ করে পকেটে ঢোকাল ও। বলল, ‘সম্ভবত স্টারলাইটে এখন কন্সাইনের সভা চলছে। যদি চলে, তুমি তাতে যোগ দাও গিয়ে। বুচারের সঙ্গে তোমার যত তাড়াতাড়ি দেখা হয় ততই ভাল।’

কেইন অনাবিল হাসি ফোটাল মুখে। ‘আমি যখন বলব ওর তলব পেয়ে আমি এসেছি ও অবাক হবে না?’

‘হলেও, তুমি টের পাবে না,’ জ্যাকুলিন বলল। ‘বুচার সম্ভবত কোনকিছুতেই অবাক হয় না।’ একটু দোনোমনো করল জ্যাকি, তারপর যোগ করল, ‘একমাত্র সেটা যদি ওর বউ রাফেলার কোন কীর্তি না হয়।’

ওকে আরও কিছু বলতে চাইছিল জ্যাকুলিন, ধারণা করল কেইন, কিন্তু বলল না। সেও আর চাপ দিল না অথবা। কিছু কিছু জিনিস তাকে নিজের চেষ্টাতেই জানতে হবে। না জেনে কারও ব্যাপারে বিরূপ মন্তব্য করার মত মেয়ে জ্যাকুলিন না, কেইন নিশ্চিত।

দুই সারি ফলস ফ্রন্টের মাঝ দিয়ে এগোল স্টেজ, হোটেলের সামনে এসে থামল। কেইন নেমে জ্যাকুলিনকে সাহায্য করল নামতে। তারপর ফুটপাতে উঠে ডগড্যান্সের দিকে তাকাল। এক নজরেই ও দেখতে পেল পশ্চিমের অন্যান্য যেসব মফস্বল শহরে ইতিপূর্বে সে অস্থায়িভাবে থেকেছে সেগুলোর সাথে এর কোন প্রভেদ নেই। সামান্য কিছু বাড়িঘর; চওড়া এবড়োখেবড়ো একটা রাস্তা, পুরু স্তর জমেছে লাল ধুলোর; ভাঙা ফুটপাথ; বহু-ব্যবহারে জীর্ণ সব হিচিং রেইল এবং এধরনের ছোটখাট শহরে ব্যবসাকেন্দ্র বলতে যা বোঝায় এখানেও তাই আছে। গোটা তিনেক স্যালুন, দুটো জেনারেল স্টোর, ব্যাংক, লিভারি স্ট্যাবল, কামারশালা, আর দোতলা একটা দালান, মাথায় বিবর্ণ সাইনবোর্ড ঝুলছে। তাতে লেখা: ডগড্যান্স হোটেল। রোদ পোয়াচ্ছে কয়েকটা কুকুর, রাস্তার শেষমাথায় তিন-চারটে বাচ্চাছেলে মার্বেল খেলছে। ঝড়ের আগে যেমন হয়, থমথমে ভাব বিরাজ করছে সর্বত্র।

কেইন যেখানে দাঁড়িয়ে সেখান থেকে স্টারলাইট স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে ও। শহরের সবচেয়ে জাঁকজমকপূর্ণ স্যালুন, এবং সম্ভবত যারা কন্সাইনের পক্ষে রয়েছে তাদের সবচেয়ে পছন্দের জায়গা। রাস্তার আরেক মাথায় মুখোমুখি আরও দুটো স্যালুন রয়েছে। কেইন অনুমান করল ওগুলোর একটায় ছোট ছোট রান্ধাররা ভিড় জমায়, অন্য-টায় যায় খামার মালিকেরা।

স্টেজে করে কারা এল দেখতে রাস্তায় ভিড় জমিয়েছিল একদল লোক।
ওদের কেউ কেউ কুশল বিনিময় করল জ্যাকুলিনের সঙ্গে, ও কোথায় গিয়েছিল
ওনে মন্টেরোসা আর ডেভিল রিভারের উজানে যেসব সোনার খনি আছে
সেগুলোর খবরাখবর জানতে চাইল। কেইন তার ওঅর ব্যাগ তুলে নিয়ে
হোটেলের চুকল।

‘জরুরি কাজ আছে একটা,’ রেজিস্টারে নামসই করে বলল ও, ‘আমার
ব্যাগটা রেখে গেলাম।’

‘আচ্ছা।’ মাথা ঝাঁকাল কেরানি, রেজিস্টারটা ঘোরাল নিজের দিকে।
নবাগত খন্দেরের নাম দেখেই চমকে উঠল সে, বিস্মিত দৃষ্টিতে কেইনের দিকে
তাকাল। ‘আমরা যার কথা প্রায়ই শুনি তুমি নিশ্চয় সেই মাইকেল কেইন নও?’

‘তোমরা কার কথা শুনেছ জানি না, তবে আমিই কেইন।’

কেইন বাইরে বেরিয়ে এল, কেরানির চোখ অনুসরণ করল ওকে। এখনও
হোটেলের সামনে দাঁড়িয়ে আছে জ্যাকুলিন, কথা বলছে। কেইন পাশ কাটাতে
ও পিছু ডাকল, ‘মিস্টার কেইন, এদিকে এসো, মিসেস বুচারের সাথে তোমার
পরিচয় করিয়ে দিই।’

থমকে দাঁড়াল কেইন, ঘাড় ফেরাতে চোখে পড়ল জ্যাকির পাশে দাঁড়িয়ে
আছে এক দীর্ঘাঙ্গিনী মহিলা। শ্যামলা, মদির চোখ। দীর্ঘাঙ্গিনী বলল, ‘জ্যাকির
কাছে যখন শুনলাম বিখ্যাত মাইকেল কেইনের সঙ্গে ও একই স্টেজে এসেছে।
কোলাটাস থেকে ওকে ভীষণ হিংসে হচ্ছিল আমার। ওয়েলকাম টু ডপড্যাস
মিস্টার কেইন।’

কেইন তার স্টেটসমেনের কারনিস স্পর্শ করল, অস্ফুট স্বরে বলল, ‘দন্যবাদ,
মিসেস বুচার।’ ও ভাবছে রাফেলা বুচারকে প্রথম দেখায় ওর যা মনে হয়েছে
সবারই তা-ই হয় কিনা। মহিলার সৌন্দর্য প্রবল একটা ধাক্কা দিয়েছে ওকে।
নিখুঁত অবয়ব আর সীমাহীন প্রাণচঞ্চল্য থেকে ওই সৌন্দর্যের উৎপত্তি। কেইন
ভাবল ডিলন মেসায় বিল বুচারের যে-ক্ষমতা তার কতটা তার স্ত্রীর কাছ থেকে
ধার করা।

স্টারলাইটের দিকে এগোবে বলে ভাবছে কেইন এই সময় মিসেস বুচার
বলল, ‘আমাদের এই অখ্যাত শহরে নামকরা লোক খুব একটা আসে না। তাই
তুমি চলে যাওয়ার আগেই তোমার সঙ্গে আমি পরিচিত হয়ে নিতে চাই।’

‘আমার যেতে দেরি আছে, ম্যাম।’

‘ডগড্যাঙ্গে কে কদিন থাকবে তা আগাম কেউ বলতে পারে না,’ তড়িঘড়ি
বলে উঠল রাফেলা। ‘আজ তুমি আমার সাথে সাপার খেলে আমি খুশি হব।
আমার স্বামীও থাকবেন অবশ্যি, যদি তাঁর অন্য কোন কাজ না থাকে।’

ইতস্তত করতে লাগল কেইন, দৃষ্টি ঝট করে একবার ঘুরে এল জ্যাকুলিন
হার্ডের ওপর থেকে, মনে হলো ওর সম্মতি নেই। জ্যাকির ওই মাপা হাসির
পেছনে অন্যকিছু লুকিয়েছিল, বোধহয় ভাবছিল একসঙ্গে ওদের দীর্ঘক্ষণ
স্টেজভ্রমণের কথা। তবে সেটা যা-ই হোক না কেন, সমস্ত দ্বিধাদন্দ কাটিয়ে
উঠল জ্যাকি, সহজ সুরে বলল, ‘মিসেস বুচারের সঙ্গে তোমার ভালই লাগবে,

মিস্টার কেইন।’

‘আ...আমি বোধহয় আজ রাতে একটু ব্যস্ত থাকব,’ কেইন আপত্তি জানাল।

‘একেবারে প্রথম দিনেই,’ বলল মিসেস বুচার, যেন ব্যাপারটা অকল্পনীয়। ‘কী এমন কাজ?’

‘এখনও জানি না। তবে শিগগিরই জানব।’

আবার হ্যাটের কানায় হাত ছোঁয়াল কেইন, চলে গেল ওখান থেকে। সেই ঈষৎ ক্রকুটি এখন আবার ফিরে এসেছে জ্যাকুলিনের মুখে, সম্ভবত ভাবছে রাফেলা বুচারের ব্যাপারে ওকে তার আরও অনেক কিছু জানানো উচিত ছিল, ধারণা করল কেইন। বোধহয় সবকিছু জানে না বলেই আগ বাড়িয়ে কোন সমালোচনা করেনি জ্যাকি; তবে ডিলন মেসায় সমস্ত বাড়ির উৎসাহ হওয়ার মত বৈশিষ্ট্য রাফেলার আছে। কেইনের সন্দেহ হলো ওই মেয়ের মাথায় কী মতলব লুকিয়ে রয়েছে আদৌ তা কেউ জানে কিনা। জ্যাকুলিন সহজ-সরল মেয়ে, ছলনা জানে না; রাফেলা বুচার হবে এর সম্পূর্ণ বিপরীত। নারী চরিত্র বিচারে কেইন জহুরি নয়; পুরুষদের সে বুঝতে পারে, কিন্তু সুন্দরী মহিলাদের মোটেও বিশ্বাস করে না।

ব্যাটউইং ঠেলে স্টারলাইটে ঢুকল কেইন। তেমন বড় স্যালুন না, তবে দামী আসবাবে সাজানো। কারুকাজ-করা মেহগনি কাঠের বার আর ঝাড়লুঠন রয়েছে, পূর্ব দেয়ালে পাশাপাশি তিনটে পোকাক টেবিল পাতা। মাঝের টেবিলের ওপরে দেয়ালে ঝুলছে এক মহিলার আবক্ষ তেলচিত্র। সচরাচর মাইনিং ক্যাম্পগুলোতে এধরনের স্যালুন দেখতে পাওয়া যায়, কেইনের মনে হলো রাফেলা বুচার যেমন তেমনি এই স্যালুনটিও ডগড্যাঙ্গে বেমানান।

কেইন বারে এসে দাঁড়াতে বারম্যান জিজ্ঞেস করল, ‘কী চাই, মিস্টার?’

‘কম্বাইনের মিটিংটা কোথায় হচ্ছে?’

মাংসল হাত দুটো পালিশ-করা কাঠের ওপর রেখে সামনে ঝুঁকল বারম্যান, চোখের কোণে কৌতুক খেলা করছে। ‘তা জেনে তোমার কী দরকার, মিস্টার?’

স্যালুনে আর মাত্র একজন লোক ছিল। সলিটেয়ার খেলা বন্ধ করে পোকাক টেবিল থেকে উঠল সে, কেইনের দিকে এগোতে এগোতে জিজ্ঞেস করল, ‘অ্যালেক, ও মহাজনদের সাথে দেখা করতে চাইছে মনে হয়?’

মাথা ঝাঁকাল বারম্যান। ‘বোধহয় পিস্তল ভাড়া খাটাবে।’

‘বোধহয়।’ সলিটেয়ার খেলোয়াড় করমর্দনের ভঙ্গিতে হাত বাড়িয়ে দিল।

‘আমি ব্ল্যাক গ্যারিটি, বন্ধু। বলতে পার, বিল বুচারের ওঅচডগ।’

হাত মেলাল কেইন, গা ঘিনঘিন করে ওঠায় পরস্পরে ছেড়ে দিল। নরম তুলতুলে তালু, আঙুলগুলো সফ্র, লম্বা-লম্বা। যখনই এরকম কোন হাতের সঙ্গে করমর্দন করে এই অনুভূতি হয় ওর। গ্যারিটি লোকটা বেঁটে, শ্যামবর্ণ; কোটরগত চোখ দুটো মিশকাল, ভাষা দুর্বোধ্য। পেশাদার জুয়াড়ি, কেইন ভাবল। প্রিন্স অ্যালবার্ট কোটের তলায় গ্যারিটির শোন্ডার হোলস্টারখানা নজর এড়াল না ওর। অনুমান করল পিস্তলে ওর হাত নিশ্চয় চালু হবে, এবং সম্ভবত

উইলিয়ম বুচারের সাথে আঁতাত আছে। কেন-যেন রাফেলা বুচারের কথা মনে পড়ল ওর, ভাবতে চেষ্টা করল এই ব্যাক গ্যারিটির সঙ্গে মহিলার পোকার খেলা কেমন জমবে।

‘আশ্চর্য,’ বিড়বিড় করে বলল কেইন, ‘আমার ধারণা ছিল উইলিয়ম বুচারের কোন পাহারাদার কুকুরের দরকার পড়বে না।’

মুদু হাসল গ্যারিটি। ‘একটা ভাল কুকুরের দরকার সব মানুষেরই হয়-তা সে যত বড়ই হোক না কেন।’

‘তা বটে,’ সায় দিল কেইন। ‘আশপাশে কিছু কুকুর থাকলে বড় হওয়া অনেক সহজ হয়।’

ওপর-নীচ মাথা ঝাঁকাল গ্যারিটি, এখনও হাসছে। ‘তবে কুকুরগুলোর স্বভাব চরিত্র তার জানা চাই। নইলে পাগলা হলে শেষে মনিবকেই কামড়ে দেবে। তবে কিনা, মিস্টার, আমাদের বিল চালু মাল-খুব চালু। ওর সঙ্গে থাকলে এই রেঞ্জে বহুদিন থাকতে পারবে তুমি। আর যদি ওর বিরুদ্ধে যাও-’গ্যারিটি কাঁধ ঝাঁকাল-‘নিজেই দেখতে পাবে যদি তুমি ইরা স্টেডের লোক হও।’

‘তা নই। আমার নাম মাইকেল কেইন।’

গ্যারিটির পাতলা ঠোঁট থেকে হাসি মিলিয়ে গেল। ‘কেইন,’ ফ্যাসফ্যাসে গলায় বলল বারটেন্ডার, যেন এর চেয়ে জোরে বলার শক্তি ওর নেই।

‘নামটা বলতে তুমি অনেক দেরি করলে, বন্ধু।’ মাথা ঝাঁকিয়ে কামরার পেছনের একটা দরজা দেখাল গ্যারিটি। ‘ওরা ওখানে আছে। চলে যাও ভেতরে।’

‘ধন্যবাদ।’

ঘুরে দরজার দিকে সবে দুকদম এগিয়েছে কেইন, এমন সময়ে গ্যারিটি প্রশ্ন করল, ‘লোকে যা বলে তোমার হাত কি সত্যিই অতটা চালু? না সবটাই প্রচার, স্রেফ কপালজোরে টিকে আছ এখনও?’

‘পরীক্ষা করে দেখতে পার,’ বলে কেইন বারের কোনা ঘুরে এগোল, সন্দিগ্ধ চোখে ওর গমনপথের দিকে তাকিয়ে রইল গ্যারিটি।

নক করল না কেইন। সটান দরজা খুলে ভেতরে ঢুকল, পেছনে কপাট বন্ধ করে দেয়ালে পিঠ ঠেকিয়ে দাঁড়াল। কামরার চারপাশে দ্রুত নজর বোলাল ও, তারপর মাঝখানের লম্বা টেবিলে বসা চারজন লোকের ওপর এসে স্থির হলো চোখ। বেঁটে, লালমুখো হুটপুট লোকটা হবে টমাস হার্ভে। তার পাশে রয়েছে দীর্ঘদেহী এক লোক, ভেস্টের বুকে টিনের তারা সাঁটা রয়েছে দেখে কেইন বুঝল এ নিশ্চয় শেরিফ রেড ম্যানিয়ন। বাকি দুজনের ব্যাপারে নিশ্চিত হতে পারল না সে। একজনের বয়স ত্রিশের কাছাকাছি; একহারা শরীর, নাকের বাঁশি বাজপাখির ঠোঁটের মত বাঁকা। অপরজন মাঝবয়সী, খর্বকায়, দেয়ালে চেয়ার হেলিয়ে বসে আছে, একটা লম্বা সিগার ঝুলছে দুই ঠোঁটের মাঝখানে। মেঝের ওপর চেয়ারের সামনের পায়া দুটো সশব্দে নামিয়ে আনল শেষোক্তজন, চশমার পুরু লেন্সের ভেতর দিয়ে পিটপিট করে তাকাল কেইনের উদ্দেশে।

‘তুমি, মনে হচ্ছে, ভদ্রতা জান না, বন্ধু,’ বলল খর্বকায় লোকটা। ‘সাদা না দিয়েই ঢুকে পড়েছ।’

‘আমার পেশায় ভদ্রতা জানলে চলে না,’ সতেজে জবাব দিল কেইন। ‘তোমাদের মধ্যে বিল বুচার কার নাম?’

‘আমার,’ বলল খর্বকায় লোকটা।

ভেতরে-ভেতরে চমকে উঠল কেইন। ভুল অনুমান করেছিল ও, নাক-বাঁকা লোকটাকে বুচার বলে ভেবেছিল। কেইন বলল, ‘আমি মাইকেল কেইন। খবর পেয়েই চলে এসেছি।’

‘কেইন,’ খাবি খেল হার্ভে। ‘তোমার এখানে কী কাজ?’

‘সেটা বুচারকে জিজ্ঞেস কর,’ কেইন জবাব দিল।

সিগারের গোড়া চিবোচ্ছিল বুচার, ছোট্ট গোলাকার মুখখানা ভাবলেশহীন, চশমার অশুচি কাচ ভেদ করে চোখের ভাষা পড়া যাচ্ছে না। এবার সে বলল, ‘তোমার নিশ্চয় ডানা আছে, কেইন।’

‘নেই। পিস্তলবাজদের ডানা থাকে না।’ সামান্য ভাঁজ পড়ল কেইনের গালে। ‘মনে হলো কাজটা ভাল, তাই চলে এলাম। এইমাত্র নেমেছি স্টেজ থেকে।’

উঠে দাঁড়াল বুচার, যেন মনস্থির করে ফেলেছে। ‘সভা শেষ। কেইন যখন এসে পড়েছে; অ্যাঞ্জেল পীক থেকে আমাদের লোকদের আর নামিয়ে আনার দরকার নেই এখন। স্লেড আর তার দলবলকেও ভাতে-পানিতে মারতে হবে না। কেইনের যা খ্যাতি তা সত্যি হলে, দুচারদিনের মধ্যে ও একাই ঠাঙ্গা করে দেবে সবাইকে।’

রেড ম্যানিয়ন উঠে তার বিশাল হাত দুটো প্যান্টের দুই পকেটে ঢোকাল। ‘আমি কিন্তু এটা সমর্থন করতে পারছি না, বিল। এখানকার আইনশৃঙ্খলা রক্ষার দায়িত্ব আমার। এই বন্দুকবাজ যখন মাঠে নামবে তখন অবস্থা কী হবে ভাবতে পার?’

‘আমাদেরকে বুটহিলে কবর খুঁড়তে হবে কিছু,’ রুক্ষ সুরে বলল বুচার। ‘কেইনকে দেখে অবশ্যি কঠিন লোক বলে মনে হয় না, তবে শুধু শুধু ওর এত নামডাক হয়নি নিশ্চয়।’

লাজুক হাসি হাসল কেইন।

‘আমি তা হলে কী করব?’ জানতে চাইল ম্যানিয়ন। ‘মাহ ধরতে যাব?’

‘চমৎকার বুদ্ধি,’ বলল বুচার। ‘এবার তোমরা যাও। আমার কিছু কথা আছে কেইনের সঙ্গে।’

‘আমি সহ্য করব না এসব,’ জেদী স্বরে বলল ম্যানিয়ন। ‘কিছুদিন দেখব, তারপর—’

‘আমি যা বলব তা-ই করবে তুমি,’ শেরিফকে থামিয়ে দিল বুচার। ‘ওই ব্যাজের মায়া নেই তোমার?’

‘চলে এস, রেড,’ ডাকল হার্ভে। ‘বিল যখন বলছে অসুবিধে হবে না, তখন আর কোন অসুবিধে নেই।’

হার্ভে এগোল দরজার উদ্দেশে। এবার বাঁকা-নাক অনুসরণ করল ওকে, কিন্তু ম্যানিয়ন আগের জায়গাতেই স্থির দাঁড়িয়ে রইল, চোখ লাল। ও বলল, 'আমি চাপ সৃষ্টি করার পক্ষপাতি, বিল। আর কিছুদিন ধৈর্য ধরলে স্ট্রেড এমনিতেই সদলবলে পাততাড়ি গুটাবে। ফসল ভাল হয়নি, দেনার দায়ে ডুবে আছে ওরা, তুমি প্যাডি রায়ানকে টিপে দিয়েছ, কাজেই ব্যাংক ওদের টাকা ধার দেবে না। মাইনিং ক্যাম্পগুলো তোমার হাতে, ফলে ওখানেও সুবিধে হবে না ওদের।' আঙুল তুলে কেইনকে দেখাল শেরিফ। 'কিন্তু এই পিস্তলবাজটাকে আনা মোটেই—'

'ঢের হয়েছে,' ধমক লাগাল বুচার। 'তুমি যাও, মাছ ধরগে। নয়তো অ্যাঞ্জেল পীকে গিয়ে দেখ আমাদের লোকজন কেমন আছে। সোজা কথা, মেসা থেকে ভাগ। এবার যা হবে তাতে কোন শেরিফের সাহায্য লাগবে না আমাদের।'

'ঠিক,' কেইন বলল। 'এই টিনের তারা থাকলেই আমার সব কাজ ভুল হয়ে যায়।'

'এই লোকই যে কেইন তার কী প্রমাণ আছে?' জানতে চাইল ম্যানিয়ন। 'আমার কাছে তো একে টিনের বাঁশি বলে মনে হচ্ছে।'

'প্রমাণ চাইলে তোমাকে আমি দিতে পারি প্রমাণ,' মৃদু অথচ অর্থপূর্ণ গলায় বলল কেইন।

'আহ, রেড,' চাপা সুরে বিরক্তি প্রকাশ করল বুচার। 'প্রথম থেকেই তুমি আমার সঙ্গে আছ, এখন যদি ইরা স্ট্রেডের সাথে হাত মেলাতে চাও, পষ্ট করে বলে ফেল সেটা।'

'চল তো, রেড,' মিনতি করল হার্ভে। 'এস, গলা ভেজাবে।'

অনিচ্ছা সত্ত্বেও, শ্লথপায়ে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেল ম্যানিয়ন, হার্ভে তার অনুগামী হলো। বাঁকা নাক অপেক্ষা করল আরও একটুক্ষণ, হাসছে আপনমনে, যেন পুরো ব্যাপারটাই কৌতুককর। তারপর সে বাইরে গিয়ে পেছনে টেনে বন্ধ করে দিল দরজা। ওই লোক নিশ্চয় অ্যাবনার লরি, উত্তেজিত ক্রীকের মাথায় অবস্থিত শ্যাশ ট্রায়াঙ্গেলের মালিক। এতক্ষণ পর্যন্ত একটা কথাও বলেনি লোকটা, কেন-যেন কেইনের মন খুঁতখুঁত করতে লাগল। কথাবার্তা থেকে সাধারণত একজন মানুষের স্বভাব-চরিত্র বোঝা যায়। যেমন হার্ভে, বুচারের প্রতি ওর পূর্ণ সমর্থন রয়েছে। কিংবা রেড ম্যানিয়ন, প্রতিবাদ করলেও, রুখে দাঁড়াবার সাহস নেই। কিন্তু একজন মৌন মানুষকে পরিমাপ করা শক্ত।

চার

যখন বন্ধ হয়ে গেল দরজা, বুচার বসে কেইনকেও ইশারায় একটা চেয়ার দেখিয়ে দিল। তারপর স্বনবনে গলায় বলল, 'ভারি অসুস্থ ব্যাপার, কেইন।

আমি তোমাকে খবর পাঠাইনি, তুমি নিজেও তা ভাল করেই জান।'

ধপ করে একটা চেয়ারে বসে পড়ল কেইন, পকেট থেকে কাগজ আর ভাস্কর বের করে সিগারেট বানাতে। 'শুনলাম পিস্তলবাজ খোঁজ করছ তুমি তাই চলে এলাম। কই, এমন কথা তো শুনিনি তুমি আমার খোঁজ করছ না?'

'দু-এক জায়গায় নাম বলেছি অবশ্য,' স্বীকার করল বুচার। 'তোমার আর ডক হলিডের। কিন্তু আসলে আমি ধাপ্পা দিচ্ছিলাম। ভেবেছিলাম ভয় পেয়ে লোকজনসহ আগেই ভাগবে স্টেড, ব্যাপারটা গোলাগুলি অবধি গড়াবে না। এখন যখন তুমি এসে পড়েছ, আমার বিশ্বাস গোলাগুলি কিছু হবেই।'

'কেন, অবস্থা কি তেমনি?' কেইন প্রশ্ন করল।

'হ্যাঁ, আমার তাই বিশ্বাস,' একটুক্ষণ চুপ করে থেকে ধীরে ধীরে বলল বুচার, যেন নিতান্ত অনিচ্ছা সত্ত্বেও সত্যকে স্বীকার করছে। 'আমি তোমাকে শুধু একটা নির্দেশ দিচ্ছি। কোন ব্যাপারে অহেতুক বাড়াবাড়ি করবে না। সবাইকে আগে জানতে দাও তুমি এসেছ এখানে। তা হলে হয়তো শেষপর্যন্ত তোমাকে আর বারুদ খরচ করতে হবে না।'

'এই পেশায় আমি দীর্ঘদিন হলো আছি,' কেইন বলল। 'কখনোই বাড়াবাড়ি করিনি।'

'নিশ্চয়, নিশ্চয়,' সিগারের গোড়া চিবোতে লাগল বুচার, একদৃষ্টিতে পর্যবেক্ষণ করছে কেইনকে। খানিক বাদে সে বলল, 'আমি যা ভেবেছিলাম, তুমি দেখতে সেরকম না। হয়তো ম্যানিয়নের কথাই ঠিক। কীভাবে জানব আমরা যে তুমিই মাইকেল কেইন?'

'আমিই-বা কীভাবে জানব, তুমিই বিল বুচার? আমি ভেবেছিলাম তুমি সাত ফুট লম্বা হবে।'

রঙ ছড়াল বুচারের মুখে। 'আকারে কিছু আসে-যায় না। মানুষের কাজই হচ্ছে তার একমাত্র পরিচয়। আমি প্রচুর কাজ করেছি। এখানে বড় বড় যেসব বাথান আছে তার সবগুলো এক করলেও আমার সমান হবে না-অথচ আমি ওদের সকলের পরে এসেছি। অ্যাবনার লরির বাবা হয়তো আমাকে হারাতে পারত, কিন্তু বুড়ো নেই, মারা গেছে। বাকি তিনজন কেমন তুমি নিজের চোখেই দেখলে। এজন্য সাত ফুট লম্বা হওয়ার দরকার হয় না।'

'আমারও পড়ে না। আমি শুধু তোমাকে বোঝাতে চাইছিলাম, মানুষ যা ভাবে, সবার চেহারা সবসময় তা-ই হবে তার কোন মানে নেই। পিয়ারসন ভাইয়েরা আমার ওপর হামলা করেছিল মোর্যানের স্টেজ স্টেশনে। জো মারা গেছে, লুড তলে নিয়ে গেছে তার লাশ। এতে কিছু প্রমাণিত হয়?'

স্বস্তির নিশ্বাস ফেলল বুচার। 'হ্যাঁ, বহুকিছু। কীভাবে ঘটল ব্যাপারটা?'

কেইন জানাল, সব শুনে বুচার বলল, 'মারাত্মক একটা ভুল করেছ। লুডকেও তোমার শেষ করে দেয়া উচিত ছিল।'

'না,' কেইন বলল। 'লুডই এখন সবাইকে জানাবে আমার কথা।'

মাথা ঝাঁকাল বুচার। 'তোমার কথাই বোধহয় ঠিক। লুডটাকে আমি আবার একদম সহ্য করতে পারি না কিনা-সবতাতেই ওস্তাদি।' পকেট থেকে ম্যাচ বের

করল সি.সি. ব্যাঙ্কের মালিক, সিগার ধরাল। 'এই রেঞ্জ সম্পর্কে তুমি কতটা কী জানো?'

'জ্যাকুলিন হার্ভে আমার সঙ্গে ছিল স্টেজে। ও-ই বলেছে সব।'

মুখ বাকাল বুচার। 'জ্যাকি আর ওর যমজ ভাই, দুজনেই নরম दिलের মানুষ। বিলকুল বুড়ো হার্ভের মতই। তা, তুমি কাজটা করতে কত নেবে?'

কেইন আশট্রেতে তার সিগারেট গুঁজে দিল। 'কোন জিনিস না দেখেওনে আমি দামদস্তুর করি না। কাজ হোক আগে, তারপর না হয় ঠিক করা যাবে, কেমন?'

'তুমি সফল হবেই তার কোন গ্যারান্টি আছে?'

কেইন জানত, আগে বা পরে, ঠিক একথাটাই জিজ্ঞেস করবে বিল বুচার। টাকা লেনদেনের প্রশ্ন জড়িত এরকম যেকোন ব্যাপারে আগেভাগে আঁচ করতে চাইবে সে পাল্লা কোন দিকে ভারি। বুঝতে অসুবিধে হয় না, এ-কায়দাতেই ডিলন মেসায় নিজের অবস্থান সুদৃঢ় করেছে ও।

'একটা গ্যারান্টি দিতে পারি,' কেইন বলল, 'এই রেঞ্জের সব জঞ্জাল সাফ হয়ে যাবে।'

'বাস, তা হলেই হলো,' বুচার হাসল। 'তুমি যা ভাল মনে কর তাই করবে, আমাকে জড়াবে না কোনকিছুতে। সমস্ত ঝুঁকি তোমার, এবং সেজন্য তুমি মোটা টাকা পাবে। ঠিক আছে?'

ঘাড় কাত করল কেইন। 'আচ্ছা, এই ইরা শ্লেড লোকটা কেমন?'

'লুড পিয়ারসনের মত না। কোন হামবড়াই নেই। পরিশ্রমী। এখান থেকে মাইল দশেক পূবে মেসা এক জায়গায় ভেঙে গেছে। বেশ কিছু ক্যানিয়ন আছে ওখানে। ওগুলোরই একটায় শ-খানেক গরুবাছুর চরে ওর। জেদী মানুষ, মুখের কথায় কাজ হবে না। জবরদস্তি করতে হবে।'

কেইন উঠে পড়ল। 'হোটেল থেকে আসার সময় তোমার স্ত্রীকে দেখলাম।'

নরম হলো বুচারের চেহারা। 'সুন্দরী না?' ব্যর্থ কণ্ঠে শুধাল ও। 'এদিককার সবচেয়ে সুন্দরী মহিলা।'

'দাক্ষণ,' একমত হলো কেইন। 'তোমাদের সাথে আমাকে সাপার খাওয়ার দাওয়াত দিয়েছে, যদি তুমি শহরে থাক। আর তোমার যদি অন্য কাজ থাকে, আমাকে একাই যেতে বলেছে।'

কোন মানুষ এত তাড়াতাড়ি বদলে যেতে পারে এ-মুহুর্তে বুচারকে না দেখলে বোধহয় চিরকাল অজানাই থেকে যেত কেইনের। লোকটা যেন চকিতে কেইনের দৃষ্টির সামনে কুকড়ে ছোট্ট হয়ে গেল। একটু আগেও যে-লোক ছিল প্রবল আত্মবিশ্বাসী, কর্তৃত্বপূর্ণ, এখন সে কাঁপছে মৃদু; গালের একটা পেশী পালস বিটের সাথে সাথে তির তির করছে।

'প্রথমেই স্পষ্ট একটা কথা বলে রাখি,' নিচু গলায় ধীরলয়ে শুরু করল বুচার। 'আমার যা-কিছু সব রাফেলার জন্য, ওকে খুশি করতে ভবিষ্যতেও আরও বহুকিছু করব আমি। কোন কোন লোকের কাছে টাকা, ক্ষমতাই সব। কারণ এগুলো দিয়ে তারা আরও বড় হতে পারবে। কিন্তু আমি সেরকম না।'

আমি কেবল রাফেলাকে সুখী করতে চাই। তুমি বুঝতে পারছ আমার কথা?’

কেইন মাথা ঝাঁকাল। ‘পুরুষের ভালবাসা পাওয়ার যোগ্যতা ওর আছে।’

‘আমি ওকে পূজো করি,’ বলে চলে বুচার। ‘এ কেবল ভালবাসা না। তার চেয়ে বেশিকিছু। আমার বাথানকে আমি কলোরাডোর সবচেয়ে বড় বাথান করে তুলব। এজন্য যা-যা করতে হয় তার সব করতে আমি রাজি।’ দুই কব এক করে অনুনয়ের ভঙ্গি করল বুচার। ‘তুমি শুধু ওর কাছ থেকে দূরে থাকবে, কেইন, প্রিজ।’

‘অন্যের বউ ভাগানোর স্বভাব আমার নেই।’

কেইনের চোখে চোখ রাখল বুচার, যেন ওর আন্তরিকতা কতটা খাটি বুঝতে চাইছে। তারপর উঠে দাঁড়াল সে, গম্ভীর চেহারা, যেন কেইনের কাছে নিজের মনের কথা ফাঁস করে দেয়ায় এখন পস্তাচ্ছে। বুচার বলল, ‘তা করলে কিন্তু আমি তোমাকে খুন করব—সে তুমি কেইন হও আর যে-ই হও। আমি ভবিষ্যতের দিকে তাকিয়ে আছি, জানি আমার গন্তব্য কোথায়। কেউ তা বানচাল করতে চাইলে আমি সেটা বরদাশত করব না।’

হেঁটে দরজায় গেল র্যাঙ্কার, এবং কেবলমাত্র তখনই ব্যাপারটা লক্ষ করল কেইন। বুচারের বাঁ পা ছোট এবং বাঁকা। ওই স্বল্প কয়েক মুহূর্তে উইলিয়ম বুচার সম্পর্কে বহুকিছু ওর জানা হয়ে গেল। ওর স্ত্রী ওর দুর্বলতা এবং শক্তি দুটোই। ওই মহিলার জন্য সে কঠিন, নির্দয় হতে পারে; আর ওর অভাবে বুচার হয়ে যাবে পশু, তার জীবন লক্ষ্যহীন।

দরজার নবে হাত রেখে পেছনে তাকাল বুচার। ‘রাফেলার ব্যাপারে তোমাকে যা বললাম আর কারওকে বলবে না। বুঝেছ?’

‘আমি কুটনামি করি না।’

বুচার মাথা ঝাঁকাল যেন ওকে সে বিশ্বাস করেছে। ‘কীভাবে কী করবে ঠিক করেছে কিছ?’

‘না। সবই পরিস্থিতির ওপর নির্ভর করবে।’

‘দেখ, ধৈর্য জিনিসটা আবার আমার একদম নেই,’ অসন্তোষ প্রকাশ করল বুচার। ‘ভাল কাজের জন্য ভাল দাম দেব আমি, কিন্তু আধখামচা কিছু করলে একটা ফুটো পয়সাও পাবে না। এস। আমরা এবার রাফেলার কাছে যাব।’

বুচারের পেছন-পেছন স্যালুনে ফিরে এল কেইন, ভাবছে র্যাঙ্কার কেন তার স্ত্রীর কাছে নিয়ে যেতে চায় ওকে। ব্যাপারটা আদৌ পছন্দ হচ্ছে না ওর। অপর তিনজন, কেইন দেখল, চলে গেছে। গ্যারিটি পোকার টেবিল থেকে উঠে জিজ্ঞেস করল, ‘গলা ভেজাবে, বিল?’

‘না,’ বলে হস্তদন্ত হয়ে ব্যাটউইংয়ের দিকে এগোল বুচার, প্রতিবার বাঁ পা ফেলার সাথে সাথে একপাশে হেলে পড়ছে শরীর।

বাইরের রোদে বেরিয়ে এল ওরা। বুচার ঘুরে হোটেলের উদ্দেশে রওনা হলো। হোটেলের লবিতে ঢুকেই ও জিজ্ঞেস করল, ‘রাফেলা ওপরে?’

কেরানি মাথা ঝাঁকাল। ‘আমি অন্তত নামতে দেখিনি।’ কেইনকে চিনতে পেরে ওর ওর ব্যাগটা দেখাল সে। ‘তোমার চোন্দ নম্বর কামরা।’

কেরানির ছুঁড়ে-দেয়া চাবিখানা লুফে নিল কেইন, তারপর ওর ব্যাগ ভুলে নিল। ও যখন বুচারের পাশাপাশি হলো রাস্তার তখন মাঝ সিঁড়িতে উঠে গেছে। 'আমি জানতাম না তুমি এখানে ঘর নিয়েছ,' বলল বুচার, কণ্ঠে বিরক্তির সুর স্পষ্ট। 'স্টারলাইটেই তোমার থাকার ব্যবস্থা করতে পারত গ্যারিটি।'

'অসুবিধে হবে না,' বলল কেইন, ভাবছে বুচার কেন চায় না ও এখানে থাকুক।

কেইনের আগে করিডরে পৌঁছাল বুচার। ইশারায় একটা দরজা দেখাল ও। 'এটা তোমার কামরা। ব্যাগ রেখে আস।'

দরজা খুলে কেইন ওর ব্যাগটা ভেতরে ছুঁড়ে দিল। করিডরের শেষপ্রান্তে একটা ঘরের সামনে দাঁড়িয়েছিল বুচার। কেইন না আসা পর্যন্ত অপেক্ষা করল সে, তারপর দরজা খুলে ভেতরে ঢুকে হাঁক দিল, 'রাফেলা।'

দুই কামরার সুট। সামনেরটা পারলার। দুটো রকিং চেয়ার, টাউস একখানা কাউচ, আর কারুকাজ করা মেহগনি কাঠের সেন্টার টেবিল রয়েছে। রাস্তার দিকে যে-জানালা দুটো আছে তার মাঝ বরাবর শোভা পাচ্ছে বিরাট একটা পিয়ানো। মেঝেতে কালচে লাল গালিচা পাতা, এত পুরু যে বুচার হেঁটে কামরার ওপাশে যাওয়ার সময়ে ওর পায়ের আওয়াজ ঢাকা পড়ে গেল। ঘরের সমস্ত আসবাব সদৃশে জাহির করছে টাকার গরম, তবে সবকিছুই যেন বড় বেশি সাজানো—মেকি অভিজাত্যের বহিঃপ্রকাশ।

ভেতরের ঘরে যাওয়ার দরজাটা খোলাই ছিল। কেইন দেখল ওটা একটা শোবারঘর। দরজায় পা রাখল রাফেলা, ভুরু কুঁচকে আছে, তারপর কেইনের ওপর চোখ পড়তেই পাকা অভিনেত্রীর মত চকিতে বদলে গেল ওর চেহারা, মোহিনী হাসিতে উদ্ভাসিত হয়ে উঠল।

'আমি জানতাম না তুমি এসে গেছ, মিস্টার কেইন,' রাফেলা বলল। 'ভালই হয়েছে, তুমি আর বিল একসঙ্গে এসেছ। আমার ভীষণ খিদে পেয়েছে।'

বুচার তার প্যান্টের পকেটে হাত ঢোকাল। গুরুতে কোন কথা বলল না সে, কিন্তু কেইন ওর চোখে-মুখে ক্রোধের আভাস লক্ষ্য করল। একটু বিস্মিত হলো ও, কারণ এই রাগের কোন হেতু খুঁজে পাচ্ছিল না সে।

'ও আমাদের সাথে খাচ্ছে না,' বুচার বলল। 'আমি বাথানে ফিরে যাচ্ছি। তুমি যাবে?'

'না। তুমি খেয়ে গেলেই পারতে, বিল। জানই তো, এখানকার খাবার আমার খুব পছন্দ। তা ছাড়া শহরে আমাদের সবসময় আসা হয় না।'

দুহাতের মুঠি পাকিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে রাফেলা, ঈষৎ ক্ষুরিত ঠোঁটের ফাঁক দিয়ে দুই পাটি ঝকঝকে সাদা দাঁত দেখা যাচ্ছে। মহিলা তার স্বামীর চেয়ে পুরো এক বিঘত লম্বা, চেহারায় বন্যতার ছাপ সুস্পষ্ট। ওর গভীর কালো চোখজোড়া স্থির হয়ে আছে বুচারের ওপর। কেইন অনুভব করল রাফেলার ইচ্ছাশক্তি অনেক মজবুত, ওর সামনে নিজেকে দুর্বলবোধ করছে বুচার, অতিকষ্টে সংযত রাখছে তার অকারণ ক্রোধকে।

'ঠিক আছে,' একটুক্ষণ চুপ করে থেকে রাজি হলো বুচার। 'শহরেই খাব মার্সেনারি

আমরা। কেইনকে আমি সাথে এনেছি তোমাকে বলার জন্য ও আমাদের সঙ্গে খেতে পারবে না। তাই না, কেইন?’

‘তাই,’ সায় দিল কেইন। ‘তোমার দাওয়াতের জন্য ধন্যবাদ, মিসেস বুচার।’

কেইনকে থামতে ইশারা করল রাফেলা। ‘বিল ভীষণ হিংসুটে লোক। কেন আমি জানি না, তবে আমার দিক থেকে কোন ক্রটি নেই। মাঝে মাঝে মনে হয় আমি বাথানে থেকে পচলেই ও বোধহয় খুশি হয়। কিন্তু আমি তা থাকব না, বিল। বুঝতে পেরেছ?’

‘পেরেছি,’ চাপা সুরে বলল বুচার। ‘কিন্তু তার সাথে ওর কোন সম্পর্ক নেই। কনসাইনের কাজে এখানে কেইনের আসা, আমি চাই না তুমি তাতে ব্যাঘাত ঘটানো। তুমি যাও, কেইন, খেয়ে নাওগে। রাস্তার ওপাশের চীনা হোটেলটা বেশ ভাল।’

করিডরে বেরিয়ে এল কেইন, সিঁড়ি বেয়ে নেমে গেল নীচে। ও জানে, রাফেলা ওর কাজে ব্যাঘাত ঘটাবে এ-আশঙ্কা বুচার করছে না। স্ত্রীর ব্যাপারে লোকটা ভীষণ স্পর্শকাতর, সুতরাং একই সঙ্গে বিপজ্জনক এবং অস্থিরমতি।

খেতে-খেতে ব্যাপারটা নিয়ে যতই ভাবল কেইন ততই বিষিয়ে উঠল ওর মন। বুচারের প্রতি রাফেলার যদি কোন ক্রটি থাকেও তাতে কেইনের কিছু আসে-যায় না। বুচার নিজেও তা জানে, তবু কেইনকে সে একটা অপ্রীতিকর অবস্থার মাঝে টেনে এনেছে তার কারণ স্ত্রীকে ও একজন অপরিচিত লোকের সামনে হেয় করতে চাইছিল। এর ফলে কেইনের চোখে বুচার আরও ছোট হয়ে গেল। বউকে পূজা করে, লোকটার এহেন দাবি এখন বিশ্বাস করতে বাধছে ওর। বুচারের মত লোকেরা কারোকে ভালবাসতে পারে না; অথবা বাসলেও তা হয় আত্মকেন্দ্রিক নয়তো স্বার্থপর ভালবাসা-উভয়ের মন দেয়া-নেয়ার ব্যাপার থাকে না সেখানে।

কেইন যখন আবার রাস্তার বেয়েল তখন রাত। আলোয় ঝলমল করছে হোটেল আর তিনটে স্যালুন। লবি হয়ে সিঁড়ির দিকে যাওয়ার সময় ও দেখল রাফেলা আর বুচার পাছে ডাইনিং-রুমে বসে, রাফেলার চেহারা ক্ষুদ্র, মলিন। দোতলায় উঠে গেল কেইন, ভাবছে জ্যাকুলিন কিংবা তার ভাইয়ের সঙ্গে দেখা করা সম্ভবপর কিনা। ও বেশ বুঝতে পারছে এখনও বহু কিছু জানতে বাকি আছে ওর, এবং উলন মেসায় সে-গোপন্য চলেছে তার সাথে কোন-না-কোনভাবে বুচার দৃষ্টিভঙ্গি প্রতিফলিত হয়েছে।

টেবিল দ্যাম্পটা জ্বলে দিল ও। মফস্বল শহরের হোটেল কামরাগুলো যেমন হয় ওর ঘরটাও তেমন। আসবাব মোটামুটি একই রকমের: একটা স্ট্রেট-ব্যাকড চেয়ার, পাইন কাঠের খাট, লেখার টেবিল, দেয়াল ভাসমারি, আর চিড়-ধরা একটা বেসিন আর পানির সোরাই। দেয়ালে বপরীতি ওয়ালমেট ঝুলছে কিছ, সিলিংয়ে বুলেটের গর্ত রয়েছে একটা-সম্ভবত কোন মাতাল কাউন্সিলের কাণ্ড হবে।

জানালায় গিয়ে দাঁড়াল কেইন, সিগারেট বানিয়ে ধরাল। ন্যার-বিচার

সম্পর্কে জ্যাকুলিন যেসব কথা বলেছিল এখন সেগুলোই ভাবছে ও। জ্যাকিকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছে সে, এ-ব্যাপারে চিন্তা-ভাবনা করবে। কেইন জানে, এ-নিয়ে যথেষ্ট চিন্তাভাবনার প্রয়োজন আছে, তবে ও নিশ্চিত উইলিয়ম বুচারের কাছে এর কানাকড়ি মূল্য নেই। টমাস হার্ভেকেও তার পছন্দ হয়নি, ওর ধারণা হার্ভেকে ঝামেলা থেকে দূরে রাখতে যে-পরিমাণ কষ্ট হবে মানুষ হিসেবে হার্ভের মূল্য ততটা নয়। কেইনের সহানুভূতি ইরা শ্লেডের দিকে, বুচার যাকে কঠিন পরিশ্রমী এবং জেদী মানুষ বলে বর্ণনা করেছে।

কাজের পথে ওর সহানুভূতিকে অতীতে কখনও বাধা হয়ে দাঁড়াতে দেয়নি কেইন, কিন্তু জ্যাকি ন্যায়-অন্যায় সম্পর্কে ওকে ভাবতে বাধ্য করায় এখন ঠিক সেটাই ঘটছে। বিবেকের দংশনে ভুগছে ও। বুঝতে পারছে, লোভী মানুষের সীমাহীন লোভের মাঝে আর যা-ই থাকুক ন্যায় থাকতে পারে না। এমনকী তা যদি হয় টমাস হার্ভেকে বিপদমুক্ত রাখতে তাও নয়, অথচ ওই কাজের জন্যই ভাড়া করা হয়েছে ওকে।

দরজায় মৃদু করাঘাতের শব্দে বাস্তবে ফিরে এল কেইন। একটুক্ষণ অপেক্ষা করল সে, তারপর যখন আবার টোকা পড়ল তখন ঘরের ওপাশে গিয়ে দরজা খুলল, ডান হাত পিস্তলের বাঁট ছুঁয়ে আছে। ব্ল্যাক গ্যারিটি দাঁড়িয়েছিল চৌকাঠের ওপারে, ঠোঁটের কোণে মেকি হাসি।

‘হাতটা সরাতে পার, বন্ধু,’ গ্যারিটি বলল। ‘তোমার মত লোকদের নিয়ে এই এক সমস্যা। প্রথমেই ভাব যন্ত্রের কথা।’

‘ভেতরে এস,’ বলে একপাশে সরে দাঁড়াল কেইন।

ঘরে ঢুকল গ্যারিটি, এগিয়ে গিয়ে বিছানায় বসল। ‘দরজা বন্ধ করে দাও। তোমার সাথে আমার কিছু জরুরি কথা আছে।’

তাই করল কেইন, ভাবছে জুয়াড়ি কেন এসেছে এখানে। ধপ করে ঘরের একমাত্র চেয়ারটায় বসে পড়ল ও, ফের সিগারেট বানাল একটা। ভেতরে-ভেতরে আশ্চর্যবোধ করছে সে, কেন-যেন গ্যারিটিকে দেখলেই ওর রাফেলা বুচারের আদল মনে পড়ে যাচ্ছে। রাফেলা আরেকটু লম্বা এবং বয়সে ছোট, কিন্তু অদ্ভুত মিল আছে দুজনের চেহারায়ে। রাফেলার সৌন্দর্য নিখুঁত, দেখলে চোখ ধাঁধিয়ে যায়, আর গ্যারিটির মাঝে, পুরুষালি চোটপাট সত্ত্বেও, একধরনের মেয়েলি ভাব রয়েছে।

‘তুমি আর আমি দুজনেই জানি বিল তোমাকে তলব করেনি,’ কোনরকম ভণিতার ধার ধারল না গ্যারিটি। ‘তুমি নিজে থেকেই নাক গলিয়েছ এতে। কেন?’

কেইন নীরব রইল। ও অনুমান করেছিল বুচার আর গ্যারিটির মধ্যে ঘনিষ্ঠতা আছে, নইলে গ্যারিটি নিজেকে বুচারের ওঅচডগ বলে দাবি করত না। তাই বুচার ওকে আসল কথাটা জানিয়ে দেয়াল ও মোটেও বিস্মিত হয়নি।

‘কই, তুমি কিছু বলছ না যে?’ আবার জিজ্ঞেস করল গ্যারিটি।

‘যা বলার তুমিই বলছ,’ কেইন বলল। ‘আমি স্নেহ শুনে যাচ্ছি।’

‘তা হলে এবার তুমি বল, আমি শুনব।’ গ্যারিটির হাসি মিলিয়ে গেছে।

‘বিলকে তোমার কেমন মনে হয়?’

‘ওর সম্পর্কে কিছু মনে হওয়ার ব্যাপার নেই আমার। ও টাকা দেয়, আমি কাজ করি—ব্যস।’

‘বটে, বটে,’ গ্যারিটি অধৈর্য। ‘কিন্তু তোমাকে দেখে বোকা মনে হয় না, কেইন। তুমি যখন কারও কাজ কর তখন ঠিকই মেপে নাও তাকে।’

‘ধন্যবাদ,’ কেইন বলল।

‘বুঝেছি, তুমি মুখ খুলবে না।’ পকেট থেকে সিগার বের করল গ্যারিটি, গোড়াটা দাঁতে কেটে ফেলে দিল থুঃ করে। ‘ঠিক আছে, আমিই বলছি তোমার কী মনে হয়েছে। খোঁড়া একটা লোক, চশমা ছাড়া দেখতে পায় না চোখে। তবে এই রোগে ও-ই হচ্ছে সবচেয়ে পাওয়ারফুল। ওর একটা নোংরা কাজ করে দিতে হবে তোমাকে, সুতরাং তুমি ওর ভাল মাল খসাবে।’

‘বলে যাও। এখনও সবটা বলনি তুমি।’

‘তুমি দেখেছ ওর বউ দারুণ সুন্দরী, ওদের মধ্যে ছাড়াছাড়ি হতে যাচ্ছে এবং ও বউয়ের জন্য পাগল। তুমি বুঝতে পেরেছ কেন ও মারদাঙ্গা শুরু করেছে। বুঝতে পেরেছ বিলের অটেল আছে, তবু পরের জায়গা দখল করতে চাইছে কারণ বউয়ের কাছে সে নিজের ক্ষমতা জাহির করতে চায়।’

‘ছাড়াছাড়ির ব্যাপারে বিল কিছু বলেনি আমাকে।’

‘ও জানে না ব্যাপারটা,’ গ্যারিটি বলল। ‘অবস্থা কতটা খারাপ বিল জানে না, তবে ভয় পায়। অথচ বিলের কখনোই ভয় পাওয়া উচিত না। কারণ আমি ওর পাশে আছি। আর সেজন্যই আমি এসেছি তোমার কাছে। আমি চাই না কথাটা তুমি ভুলে যাও, কেইন।’

‘তোমার ধারণা আমি ওর পক্ষে নেই?’

‘আমি জানি তুমি ওর লোক না। মানুষ দেখলেই বুঝতে পারি আমি। আমার কাজই এটা। হার্ডের ছেলে-মেয়েকে আমি ভালই চিনি। ওরা বিলকে ঘৃণা করে, রাফেলাকেও। হয়তো এর পেছনে যথেষ্ট যুক্তিসঙ্গত কারণ আছে ওদের, বিশেষ করে টমাস যে-রকম অকর্মণ্য লোক। তবে কথা সেটা না। আমি বিলের পক্ষে আছি। তুমি যদি বেঈমানি কর ওর সাথে, আমি তোমাকে খুন করব, কেইন। কোন নিয়মকানুনের ভেতরে যাব না আমি, স্রেফ শটগান দেগে তোমার খুলি উড়িয়ে দেব।’

আচ্ছা, গ্যারিটি তা হলে ঠিকই আন্দাজ করে নিয়েছে সত্যি কথাটা। মনে-মনে চমকে উঠলেও, বাইরের চেহারা স্বাভাবিক রাখল কেইন। সহজ সুরে বলল, ‘তার মানে তুমি ভাবছ আমি বুচারের সাথে বেঈমানি করব। কেন?’

‘এটা বোঝা আর এমন কী শক্ত? দুই আর দুই যোগ করলে যোগফল চারই হবে। বাবের ডেনভার যাওয়া, জ্যাকি আর তোমার একই সঙ্গে স্টেজে আসা; তারপর বিল বলল ও তোমাকে তলব করেনি এবং তুমিও ওকে কোন কথা দাওনি। এমনকী কাজের কথাটা বলনি পর্যন্ত। সুতরাং, তুমি কি অস্বীকার করতে পারবে বব আর জ্যাকি হার্ডে তোমাকে ভাড়া করেনি?’

‘করলেও তুমি বিশ্বাস করবে না।’

‘না, তা করব না।’ সিগারটা ঠোটে ঝোলাল গ্যারিটি। ‘এবার আমার কথা শোন মন দিয়ে। ঠিকমত চললে আমি যেমন আছি তুমিও তেমনি ভাল থাকতে পারবে। বিলের নিজের কোন যোগ্যতা নেই, পরের সাহায্য পেয়ে ফুলে-ফেঁপে উঠেছে। তবে দুটো ভাল দিক আছে ওর। টাকা বানাতে জানে, আর নিজের লোকদের সঙ্গে বেসম্মানি করে না। হার্ডের ছেলে-মেয়ে তোমাকে কিছু দিতে পারবে না-বিল পারবে।’

‘তোমার এই ধারণা কি তুমি বুচারকে বলে দেবে?’

একটুক্ষণ সিগারের গোড়া চিবাঁল গ্যারিটি, কালো চোখজোড়া পর্যবেক্ষণ করছে কেইনকে। তারপর বলল, ‘কিছুদিন অপেক্ষা করব। দেখব তুমি কী কর।’ উঠল ও। ‘এস। রাফেলা তোমার সঙ্গে কথা বলতে চায়।’

‘বুচার আমাকে ওর কাছ থেকে দূরে থাকতে বলেছে।’

‘জানতে পারবে না। ও আমাকে বিশ্বাস করে।’ দরজার উদ্দেশে মাথা ঝাঁকাল গ্যারিটি, ‘তুমি না গেলে, রাফেলাই আসবে এখানে।’

দরজার দিকে পা বাড়াল গ্যারিটি। কেইন ইতস্তত করছে। এক দিনে রাফেলা বুচারকে ও যতটা দেখেছে সে-ই ঢের, কিন্তু কেইন চাইল না মহিলা ওর ঘরে আসুক। গ্যারিটিকে অনুসরণ করে করিডরে বেরিয়ে এল সে।

‘চলে যাও,’ বলল জুয়াড়ি। ‘দরজায় টাকা দিলেই খুলে দেবে। আমি বাইরে আছি। তবে, দেখ, সারা রাতের মত আবার থেকে যেয়ো না যেন।’

গ্যারিটিকে পাশ কাটাল কেইন, রাফেলার দরজায় টাকা দিল। পিয়ানো বাজাচ্ছিল রাফেলা। ডাকল, ‘ভেতরে এস।’ কেইন দরজা খুলতে ও বলল, ‘বস, মিস্টার কেইন।’ তারপর আবার সুরের ঝঙ্কার তুলল।

কাউচে বসে পড়ল কেইন। অতিপরিচিত একটা স্প্যানিশ প্রেমের সুর বাজাচ্ছে রাফেলা। সীমান্ত এলাকায় বহুবার শুনলেও, গানের কলিগুলো মনে করতে পারল না কেইন। রাফেলার মরাল গ্রীবা আর খাড়া পিঠের দিকে তাকিয়ে রইল ও; দেখল ল্যাম্পের আলোয় চিকচিক করছে মহিলার চুল, পিয়ানোর রিডে সাবলীল ভঙ্গিতে ঢেউ তুলছে সরু-সরু আঙুলগুলো। আচমকা একসঙ্গে অনেকগুলো রিড চেপে ধরে কর্ড বাজাল রাফেলা, তারপর পাই করে ঘুরল কেইনের পানে।

‘আমার স্বামীকে তুমি কেমন বুঝলে, মিস্টার কেইন?’ চড়া অথচ ক্লান্ত সুরে জিজ্ঞেস করল রাফেলা।

অদ্ভুত ব্যাপার, ভাবল কেইন, ব্ল্যাক গ্যারিটির মত এও একই প্রশ্ন জিজ্ঞেস করছে। কেইন বলল, ‘ওর সম্পর্কে কিছু ভাবা আমার দায়িত্ব না।’

‘তবু ভেবেছ,’ চোঁচিয়ে উঠল রাফেলা। ‘না ভেবে পারনি। আজ সন্ধ্যায় তুমি দেখেছ বিল একটা ছুঁচো, ভান করছে আমাকে সবকিছু দেয়ার, অথচ আসলে কিছুই দেয়নি। আমি একজন নারী, মাইক, আমার লজ্জা নেই বলতে আমারও একটা চাহিদা আছে। কিন্তু বিল নপুংশক।’

স্থির হয়ে বসে রইল কেইন, হাত দুটো কোলের ওপর ফেলে রেখেছে। অপলকে রাফেলাকে দেখছে ও, সব পুরুষেরই যেমন হবে তেমনি ওর বুক মার্সেনারি

উপালপাখাল হচ্ছে। সাদা সিল্কের আঁটসাঁট একটা স্কার্ট পরে আছে রাফেলা, পরিষ্কার হয়ে ফুটে উঠেছে দেহের প্রতিটি বাক, চড়াই-উতরাই। কেইন জানে বিশেষ কোন উপলক্ষ ছাড়া মেয়েরা এধরনের উত্তেজক পোশাক পরে না।

‘অবাক হয়ে না, মাইক,’ বলল রাফেলা। ‘মাঝে মাঝে এরকম সময় আসে যখন আমি কথা বলার জন্য হাঁপিয়ে উঠি, মনে হয় কথা না বলতে পারলে আমি বৃষ্টি পাগল হয়ে যাব। আমার কথা শোন, প্লিজ। আজ তিন বছর হলো বিয়ে হয়েছে আমাদের, এইসব পেয়েছি আমি।’ বাতাসে হাত খেলিয়ে ঘরের চারপাশের আসবাবগুলো দেখাল রাফেলা। ‘প্রয়োজনের বেশি কাপড়চোপড় পেয়েছি। থাকার জন্য বিরাট একটা বাড়ি আছে, ফাই-ফরমাস খাটার জন্য আছে দাসী। আর কী চাই? আমার সুখী হওয়া উচিত, তাই না?’ বিকারগ্রস্ত রোগীর মত হাসল ও। ‘কিন্তু আমি সুখী না।’

উঠল রাফেলা, শরীরে হিল্লোল ভুলে এগিয়ে এল কেইনের দিকে, কাউচে ওর পাশে বসল। ‘বুচারের হয়ে কাজ করে মারাত্মক একটা ভুল করছ তুমি। ও তোমাকে ব্যবহার করবে, তারপর যখন কাজ শেষ হয়ে যাবে তখন ছুড়ে ফেলে দেবে আন্তাকুঁড়ে। কন্ট্রাইনে অন্য যারা আছে তাদেরকেও ফেলে দেবে। ওর উচ্চাকাঙ্ক্ষা পূরণের জন্য ওদেরকে ওর দরকার, কিন্তু এমন একদিন আসবে যখন গোটা ডিলন মেসাই হয়ে উঠবে সি. সি. রেঞ্জ-যদি না বুচারকে তার আগেই কেউ থামায়। আমি জানি না হার্ভে, ম্যানিয়ন কিংবা লরির ভাগ্যে কী আছে, তবে অ্যাবনারের বাবার কিন্তু স্বাভাবিক মৃত্যু হয়নি।’

মুখ বাকাল রাফেলা। ‘বিল বুচারের কাজের ধরনই এমনি। ও তোমাকে দিয়ে যেসব কাজ করাবে লাখ টাকা দিয়েও সেগুলোর কলঙ্ক তুমি ঢাকতে পারবে না। বিশ্বাস কর, মাইক। তুমি নিজেও নিশ্চয় ওর স্বভাব তখন বুঝতে পেরেছ। ও আমাকে ওর মুঠোর ভেতর পুরে রাখতে চায়। স্রেফ দেখার জন্য-আর কিছু না।’ রাফেলা সামনে ঝুঁকে এল, যেন পিঠে ওর বুকের উষ্ণ চাপ অনুভব করে কেইন। ‘আমার বিশ্বাস তুমিই হচ্ছে একমাত্র লোক, যে ওকে ভয় পাও না।’

‘এখানে আসলে ভয় পাবার মত কিছু নেই,’ কেইন বলল।

‘তা হলে হয়তো-বা অন্যকিছু আছে।’ পিছিয়ে গেল রাফেলা, ঠোঁটে বাঁকা হাসি। ‘বন্দুকবাজদের ব্যাপারে আমার সবসময়েই ভীষণ কৌতূহল। তোমার শরীরে রক্ত আছে, না সবটাই ঠাণ্ডা পানি?’

উঠে পড়ল কেইন, বিব্রত সুরে বলল, ‘আমি আসতাম না, যদি-’

‘জানি।’ উঠে কেইনের মুখোমুখি হলো রাফেলা, মদির হাসি হাসছে, চোখে আমন্ত্রণ। ‘টাকাটাই সব, না? টাকার জন্য সবকিছু করতে পার তুমি-এমনকী নিজের আত্মা বিক্রি পর্যন্ত। বিল তোমার মনিব, এবং আমার স্বামী, কাজেই তোমার আর আমার মধ্যে কোন সম্পর্ক হতে পারে না। ঠিক আছে, মিস্টার কেইন, তাই হবে।’

‘আমি জানি একটা মেয়ের যা-যা থাকা দরকার তার সবই আছে তোমার,’ বলল কেইন। ‘কিন্তু বুচার তোমাকে বেঁধে রেখেছে। আমার যদি লোক চিনতে

ভুল না হয়ে থাকে, ওই বাঁধন সে খুলে দেবে না।'

'অন্তত যদিও সে বেঁচে আছে।' কেইনের বাহুতে হাত রাখল রাফেলা, 'মাইক, আমার ধারণা ছিল যেকোন পুরুষের মন আমি টলাতে পারব। কিন্তু এখন সেটা ভেঙে গেছে। আমি ভেবেছিলাম তোমার কাছ থেকে কথা আদায় করব, তুমি ইরা শ্লেডের বিরুদ্ধে বন্দুক ধরবে না। বিল তোমাকে ওই কাজটাই করতে বলবে সবচেয়ে আগে।'

'শ্লেড তোমার কে?' নিষ্ঠুর গলায় প্রশ্ন করল কেইন।

হাত সরিয়ে নিল রাফেলা, মুখে রঙ ছড়াচ্ছে। 'ওই একটা প্রশ্ন অন্তত কোরো না। আমারও মানসম্মান আছে।'

কথাটা কতদূর সত্যি যথেষ্ট সংশয় আছে কেইনের, তবে তা আর বলল না ও। বরং কাঁধ ঝাঁকিয়ে জিজ্ঞেস করল, 'বেশ, তা হলে বিল শ্লেডের ভালমন্দের ব্যাপারে তোমার আগ্রহ কেন?'

'তুমি বিশ্বাস করবে না, তবে বলব আমি।' অক্ষুট সুরে ফুঁপিয়ে উঠল রাফেলা। 'আমি চাই লোকে জানুক বিল বুচার একটা ক্লীব, পশু। কিন্তু তুমি থাকতে সেটা সম্ভবপর হবে না।'

নিশ্চল হয়ে দাঁড়িয়ে রইল কেইন, একদৃষ্টিতে ভাকিয়ে আছে রাফেলার থমথমে মুখের দিকে। ও বলল, 'কিন্তু বুচার আমাকে বলেছে ও তোমাকে পূজা করে। ওর সবকিছুই তোমার জন্যে করা।'

'ও একটা মিথ্যুক,' আগের মতই বিক্ষুব্ধ গলায় বলল রাফেলা। 'এমন একটা সময় নেই যখন ও নিজের স্বার্থের কথা আগে ভাবে না। তুমি নিজের দিকে তাকাও, মাইকেল কেইন, তোমার মনিবকে দেখ। তারপর যাও, দেখে আস গিয়ে শ্লেড আর তার প্রতিবেশীরা কোন্ অবস্থায় আছে। ভাল ঘাস থেকে ওদের দূরে সরিয়ে রেখেছে বিল। ওদের ঝুপড়ি, কঙ্কালসার গরুবাছুর এগুলো দেখার পরও যদি ইরা শ্লেডকে তোমার খুন করতে ইচ্ছে হয়-করো।'

রাফেলার মুখ দেখে কেইন আন্দাজ করতে পারল না এসবের কতটা ওর অন্তরের কথা। জ্যাকলিন হার্ভের মত মেয়ে হলে ও সম্ভবত বুঝতে পারত, কিন্তু রাফেলার ব্যাপারে নিশ্চিত হতে পারছে না। কেইন বলল, 'কাল আমি ওদের ওদিকে যাব, তবে শ্লেডকে খতম করব কিনা তা এখনি বলতে পারছি না।'

'যদি না করো, বিলের কাছ থেকে একটা ফুটো পয়সাও তুমি পাবে না। তুমি এখান থেকে চলে যাচ্ছ না কেন, মাইক? পিজ, তুমি চলে যাও, একা থাকতে দাও আমাদের।'

'তার আগে নিজের চোখে এখানকার অবস্থা দেখব একবার,' বলে কামরা ত্যাগ করল কেইন।

গ্যারিটি তখনও অপেক্ষা করছিল করিডরে। কেইনের ঘর অবধি এগিয়ে এল সে, বলল, 'রাফেলা চাইলে, পুরুষের মন গলাতে পারে। তোমারটাও কি গলিয়েছে?'

'না।' নিজের কামরায় ঢুকল কেইন। ঠোঁটের ফাঁকে সিগার ঝুলিয়ে, গ্যারিটি অনুসরণ করল ওকে। কেইন বিরক্তির সাথে জিজ্ঞেস করল, 'আবার কী মার্সেনারি

চাও?

‘ভাল একজন শ্রোতা পেলেন কথা বলতে আমার ভাল লাগে,’ গ্যারিটি জবাব দিল। ‘কখনও কখনও প্রশ্নও করি। কদাইনের অন্যদের তোমার কেমন মনে হলো?’

‘নিকুচি করি-’

হাত তুলে কেইনকে থামিয়ে দিল গ্যারিটি, আগের মতই হাসছে মুখ টিপে। ‘উত্তেজিত হয়ে না, বাছা। তুমি যখন বলবে না, বেশ, আমিই বলছি তোমাকে। টমাস হার্ভেকে তোমার ফালতু লোক বলে মনে হয়েছে, রেড যতই মাতব্বরি করুক, বিলের ওপর নির্ভর করেছে ওর শেরিফগিরি-কিন্তু লরিকে বুঝতে তুমি পারনি। তাই না?’

‘ঠিক,’ স্বীকার করল কেইন।

‘তা হলে আমার একটা কথা শোন। কেউই ওকে বুঝতে পারে না। উত্তেজিত হয়ে মাথায় বসে বাজপাখির মত নজর রাখছে সবার ওপর। বেশি কথা বলে না-কেবল দেখে যায়। তোমার জায়গায় আমি হলে, আমি ওর ওপর নজর রাখতাম।’ ঘাড় কাত করল গ্যারিটি। ‘চলি, শুভরাত্রি।’ বেরিয়ে গিয়ে দরজা টেনে দিল ও।

বিছানায় যাওয়ার পরেও সে-রাতে অনেকক্ষণ জেগে রইল কেইন, অস্থির চিন্তাভাবনায় বিক্ষিপ্ত হয়ে আছে মন। এখন সে বুঝতে পারছে কেন বব হার্ভে সবকিছু খুলে বলতে পারেনি ওকে। জ্যাকির বেলায়ও সেই কথাই খাটে। ওর ভাষায় ডিনামাইটের সলতের আগুন ধরিয়ে দিয়েছে কেউ একজন, তার বিস্ফোরণে ওরা সকলে মারা পড়বে। কে ধরাতে পারে আগুন? বুচার, রাফেলাকে দেখাবার জন্য যে সে অনেক বড় মাপের মানুষ? নাকি অন্য কেউ বুচারকে কোণঠাসা করে এই নাজুক অবস্থার সৃষ্টি করেছে?

কেইন যদি বেঁচে থাকতে পারে, সময়ে এর উত্তর সে পাবে। তারপর জ্যাকির কথা মনে পড়ল ওর, মেয়েটার ধর্মবিশ্বাস প্রবল, ন্যায়-অন্যায় এগুলো মানে। কেইন সহসা উপলব্ধি করল তাকে বেঁচে থাকতে হবে। তার পিস্তল ভাড়া খাটিয়ে টাকা রোজগারের জন্য নয়-জ্যাকুলিন হার্ভেকে পেতে হবে তাই।

পাঁচ

কাক-ভোরে বিছানা ছাড়ল কেইন, অবশ্য এর কোন প্রয়োজন আছে সেজন্য নয়। ছোটবেলায় যখন ও মিসৌরির একটা খামারে উদয়ান্ত পরিশ্রম করে জীবিকানির্বাহ করত তখন থেকেই এই অভ্যাস ওর গড়ে উঠেছে। পোশাক পালটে ভোরের আধো-আলোয় দাড়ি কামাল সে, তারপর করিডরে বেরিয়ে এসে দরজায় তালা দিল।

নীচতলায় এসে ও যখন দেখল ডাইনিং-রুম বন্ধ তখন লবি হয়ে রাস্তায়

গেল। ফুটপাতে কিছুক্ষণ অপেক্ষা করল কেইন, বাইরের আবছা আলোয় চোখ সহিয়ে নিচ্ছে। চীনা রেস্তোরাঁর পেছনে কাঠ চেরাইয়ের আওয়াজ শুনতে পেল ও, কাছেরপিঠে কোথাও থেকে ভেসে এল ঝাড়ের গর্জন, তারপর মোরগ ডেকে উঠল একটা। স্টারলাইটের ভেতরে কাশির শব্দ পাওয়া গেল, পরক্ষণে ব্যাটউইং টেলে বাইরে বেরিয়ে এল ঝাড়দার, হাতে ময়লা পানির গামলা। ঝপাৎ করে রাস্তায় পানি ঢেলে দিল সে, স্যালুনে ফিরে গেল।

ডগড্যাপ শহরটা তেমন সুন্দর নয়। আগের দিন স্টেজ থেকে নেমে যে-রকম ধমধমে ভাব দেখেছিল তাতে কেইনের মনে হয়েছে ভালও না। ঠিক ওই সময়ে কনসাইনের সভা চলছিল; বড় বড় আউটফিটগুলো, তাদের রেঞ্জে প্রচুর ঘাস থাকা সত্ত্বেও, পরিকল্পনা আঁটিছিল পরের জমি জবরদখল করার। এক অর্থে উইলিয়াম বুচার এ-শহরের সমস্ত ক্ষমতার প্রতিভা, কারণ ডিলন মেসা সে-ই নিয়ন্ত্রণ করে। ছোটলোক কিন্তু বড় হতে চায়; দুর্বল অথচ চায় সকালে ওকে শক্তিশালী মনে করুক।

রাস্তা পেরিয়ে চীনা রেস্তোরাঁয় গিয়ে ঢুকল কেইন। কাউন্টারের কোনা ঘুরে এগিয়ে এল রেস্তোরাঁ মালিক, অনেকটা নুয়ে অভিবাদন জানাল যেন ওকে পেয়ে নিজেকে ধন্য মনে করছে। কেইন খাবারের ফরমাস দিতে ও রান্নাঘরের ভেতরে অদৃশ্য হলো।

চিন্তাচ্ছন্ন হয়ে আছে বলে হতে পারে কিংবা রাতে ভাল ঘুম হয়নি বলে; তবে কারণটা যা-ই হোক না কেন, আজ সকাল থেকেই ভয়ানক মানসিক অশান্তিতে ভুগছে কেইন। যদিকে তাকাচ্ছে সেখানেই বিল বুচার অথবা তার প্রভাব প্রত্যক্ষ করছে। খাবার নিয়ে আসছিল চীনা লোকটা, কেইনকে ওর দিকে তাকাতে দেখে এমনভাবে জড়সড় হয়ে গেল যা কখনোই একজন স্বাধীন মানুষের করা উচিত না। রেস্তোরাঁ মালিকের স্বভাব ওইরকম না বুচার বা তার লোকেরা সবার কাছ থেকে তোয়াজ আশা করে বলে এটা হয়েছে, ঠিক বুঝে উঠতে পারল না ও।

নাস্তা সেরে আবার পথে নামল কেইন। সূর্য ইতিমধ্যে বেশ উঁচুতে উঠে গেছে, স্যান হুয়ানের চূড়াগুলো এখনও কিছুটা কুয়াশাচ্ছন্ন দেখালেও পশ্চিমের লা সাল পর্বতমালা ঝলমল করছে সকালের রোদে। একটা সিগারেট বানিয়ে ধরাল কেইন, কিন্তু ধূমপানে কোনরকম তৃপ্তি পেল না। সিগারেটটা ছুঁড়ে রাস্তায় ফেলে দিল সে, লিভারি স্ট্যাবলের দিকে ঘুরল। তারপর একজন বৃদ্ধের ওপর চোখ পড়ল, রাস্তা পেরিয়ে ওর পানেই আসছে। দাঁড়িয়ে গেল কেইন।

‘তোমার নামই তো মাইকেল কেইন?’ ফুটপাতে উঠে জিজ্ঞেস করল লোকটা।

‘হ্যাঁ।’

‘আমি প্যাডি রায়ান।’ খাবা-সদৃশ একটা হাত বাড়িয়ে দিল বুড়ো। ‘স্থানীয় ব্যাংকের মালিক, আর আমার মালিক হচ্ছে বিল বুচার।’

রায়ানের সঙ্গে করমর্দন করল কেইন, বুড়োর অকপট সারল্যে বিস্মিত হয়েছে। ও বলল, ‘তোমার কথা শুনেছি।’

‘আলবত শুনেছ,’ রায়ান বলল। ‘কালকের মিটিঙে নিশ্চয় এটাও শুনেছ হোমস্টেডাররা আর কোন ঋণ পাচ্ছে না আমার কাছ থেকে। ইয়া, সবটাই বিলের কারসাজি। নরকের মত বিশাল হতে চায় ও।’ স্টারলাইটের উদ্দেশে মাথা ঝাঁকাল ব্যাংকার। ‘এসো, গলা ভেজাবে। কথা আছে। শুনব তোমার এত নামডাক হলো কী করে?’

কেইন হাসল একগাল। ‘ওই একটা কথা বলতে পারব না। আমি নিজেই জানি না তো কীভাবে বলব।’

রাস্তা অতিক্রম করে স্টারলাইটের দিকে এগোল ওরা। বুড়ো বলছে, ‘জীবনে আমি অনেক বড় বড় বন্দুকবাজ দেখেছি, কেইন। আর আমার বয়সটাও কিন্তু নেহাত কম না। হিকক, ইয়ার্প, মাস্টারসন, হার্ডি। কাকে দেখিনি বল? ওদের মধ্যে ভালমন্দ দুই-ই ছিল। তবে কে কী রকম, তা একমাত্র খোদা আর শয়তানই জানে।’

ব্যাটউইং ঠেলে ভেতরে ঢুকল রায়ান। কামরার পেছন থেকে চোখ তুলল ঝাড়ুদার, বলল, ‘আমরা এখনও ব্যবসা শুরু করিনি।’

‘তুমি তোমার কাজ কর,’ বলল ব্যাংকার। ‘আমরা নিজেরাই নিতে জানি।’

বারের পেছনে চলে গেল রায়ান, বোতল আর দুটো গ্রাস নিয়ে কেইনের কাছে ফিরে এল। ‘তুমি হাল আমলের পিস্তলবাজ। সবাই বলছে, এখন নাকি তুমি সব থেকে চালু। তবে পুরানোদের মত কিনা তা জানার কোন উপায় নেই। আমি যাদের চিনতাম তাদের বেশির ভাগই মরেছে বুলেটে, তুমি এ-লাইনে থাকলে তোমারও একই দশা হবে।’

গ্রাস দুটো ভরে বোতলটা নামিয়ে রাখল রায়ান। দীর্ঘদেহী মানুষ ও, হলদেটে চামড়ায় বয়সের কারণে ভাঁজ পড়েছে, কথা বলার সময়ে পাকা দাড়িগুলো নড়ে। কেইন অনুমান করল বুড়োর বয়স সত্তরের কম হবে না, কিন্তু এখনও সোজা হয়ে হাঁটে; কালো চোখজোড়া স্বচ্ছ, অন্তর্ভেদী।

‘তোমার স্বাস্থ্য,’ বলে নিজের গ্রাস উঁচু করল রায়ান।

এক চোকে সবটুকু তরল পদার্থ পান করে বারের ওপর গ্রাস নামিয়ে রাখল ওরা, রায়ান তার হাড়িসার হাতের পিঠ দিয়ে মুখ মুছল। ‘আমি স্রেফ আরেকজন গোলামের সাথে একটু আলাপ করতে চাইছিলাম,’ বলল ও। ‘খুব অল্প টাকা দিয়ে খুলেছিলাম ব্যাংকটা। ফলে যখন অসুবিধেয় পড়লাম বিল অধিকাংশ শেয়ার কিনে নিল। সেজন্যই ওর বাঁশিতে আমাকে নাচতে হয়।’ কেইনের চোখের দিকে সরাসরি তাকাল বুড়ো। ‘অথচ মজা দেখ, সমাজে আমার সম্মান আছে, তোমার নেই। তুমিও নিশ্চয় জান সেটা?’

‘মাথা ঘামাই না,’ কেইন বলল।

মুখ বিকৃত করল রায়ান। ‘কেন ঘামাও না। কাল রাতের কথাই ধর। শুনলাম, মিসেস বুচার তোমাকে সাপারের দাওয়াত করেছে। অথচ, দেখা গেল, স্বামী-স্ত্রী খাচ্ছে ডগড্যান্স হোটেলে, আর তুমি একলা চীনা রেস্টোরাঁয়। কেন জান? কারণ সমাজে তোমার দাম নেই। রাফেলা হয়তো ভাবেনি, কিন্তু বিল ঠিকই ভেবেছে।’

হাত নেড়ে ব্যাপারটাকে আমল না দেয়ার ভান করল কেইন, বুড়ো ব্যাংকারকে বুঝতে দিতে চাইছে না কতখানি বেদনাময় ক্ষতে ঘা দিয়েছে সে। রায়ানকে আর মিথ্যে বলে লাভ নেই যে মানসম্মানের ব্যাপারে ও লালায়িত নয়। কেইন বলল, 'ড্রিংকের জন্য ধন্যবাদ। আমি বেরোব-'

'না, এখনই না,' রায়ান বলল। 'আমার কথা শেষ হয়নি এখনও। বুচার কেমন লোক, এবার সেটাই বলব। আমি ধারণাই করতে পারিনি এত বাজে একটা লোক এতদূরে উঠতে পারে, অবশ্য কিছুই ওর নিজের করা না। আমার আর রেড ম্যানিয়নের সাহায্য পেয়েছে। তা ছাড়া গ্যারিটি আছে। ওর ফোরম্যান, টড জারভিস লোকটাও সুবিধের না। এখন এসেছ তুমি। আমার ধারণা শেষপর্যন্ত তুমিই ওর পতন ডেকে আনবে, তবে বলা যায় না, বিল দারুণ চালু মাল-লোক খাটাতে জানে।'

'তোমার মতলবটা কী?'

আবার গ্লাসে পানীয় ঢালল রায়ান। কেইনের প্রশ্নের জবাব দেয়ার বদলে নিজেই প্রশ্ন করল একটা: 'কোথায় যাচ্ছ তুমি?'

'ইরা শ্লেডকে দেখতে।'

'বিল ওকে মেরে ফেলতে চায়। কাজটা কি আজই সারবে?'

'না।'

'তা হলে কী জন্য যাচ্ছ?'

'লোকটা কেমন তাই দেখতে।'

রায়ান তার গ্লাস হাতে তুলে নিয়েছিল, নামিয়ে রাখল। অপলকে কিছুক্ষণ লাল পানীয়ের দিকে চেয়ে রইল সে, ডান হাতে অন্যমনস্কভাবে বিলি কাটছে বারের ওপরে। খানিক বাদে চাপা সুরে ও বলল, 'আশ্চর্য, কোন কোন লোকের জুয়াভাগ্য অসাধারণ হয়। আমি সবসময় সৎভাবে খেলার চেষ্টা করি, ধরেই নিই প্রতিপক্ষের হাতে কী আছে আমি জানি। যদি ব্যর্থ হই মনকে এই বলে সান্ত্বনা দেই, আমি পাকা খেলোয়াড় না। কিন্তু বিল এতদম অন্যরকম। ও পুরোপুরি নিশ্চিত না হয়ে বাজি লড়ে না, দরকার হলে চুপি করতেও রাজি। এজন্য ওকে ধূগা করি আমি, অথচ সেটা বলার মত সংসাহস আমার নেই।' কেইনের চোখে চোখ রাখল ব্যাংকার। 'জান, এবার কথা কেন বলছি তোমাকে?'

এ পাশ-ওপাশ মাথা নাজান কেইন।

'গতকাল তুমি যখন টেবিল থেকে নাম আমি তোমাকে দেখেছিলাম। তোমার সঙ্গে ছিল জ্যাকি হার্ডে। ও আর ওর ভাই, বব হার্ডে, এখানে এরা দুজনেই না একটু একাডেমী বিলের বিরোধিতা করে। তাই নিজের সঙ্গে একটা বাজি ধরলাম আমি। জ্যাকি তোমার পরিচয় পেয়ে থাকলে, নিশ্চয় এখানকার আসল অবস্থা তোমাকে খুলে বোঝে। জ্যাকি কারোকে ভয় পায় না। এখন বাজিটা হচ্ছে, ও যদি সত্যি সত্যি তোমাকে সব বলে থাকে-তুমি কোন দিকে যাবে।'

গোটা ব্যাপারটাই যেন একটা নাটক দেখার মত। ভাবল কেইন। ওর ভূমিকা এখানে দর্শকের। রঙ্গমঞ্চে একের পর এক অভিনেতা আসছে, আর মার্চেনারি

ওদের কথাবার্তা থেকে ওদের সম্পর্কে সিদ্ধান্ত নিতে হচ্ছে তাকে। মাত্র একটা ভুলই চরম সর্বনাশ ডেকে আনতে পারে। জ্যাকি আর তার ভাইকে কিছুটা বুঝতে পেরেছে ও। এবং গ্যারিটিকে, কারণ জুয়াড়ি তার মতামত পরিষ্কার ভাষায় জানিয়ে দিয়েছে। রায়ানের ব্যাপারে নিশ্চিত হতে পারছে না কেইন। হয়তো কথা আদায় করতে গ্যারিটিই পাঠিয়েছে ওকে, এবং নিজে শটগানহাতে অপেক্ষা করছে পেছনের কামরায়। কেইন যদি বেফাঁস কিছু বলে ফেলে, সম্ভবত এখান থেকে প্রাণ নিয়ে বেরোতে পারবে না।

‘দাম চুকিয়ে দাও,’ বিরক্ত কণ্ঠে বলল কেইন। ‘তুমি হেরে গেছ বাজিতে। আমি আপাতত বুচারের পক্ষেই থাকছি।’

রায়ান উঁচু করল তার গ্লাস, কণ্ঠে প্রচ্ছন্ন বিদ্রূপ। ‘একজন সাহসী পুরুষের নামে, কেইন। তুমি যদি ইরার সঙ্গে দেখা হওয়ার পর শহরে ফিরে আসতে পার, আমি তোমাকে আবার খাওয়াব।’

ঘাড় কাত করে ব্যাংকারকে সংক্ষেপে বিদায় জানাল কেইন, ঘুরে গটগট করে বেরিয়ে গেল স্যালুন থেকে। নিজের চারপাশে ও কেবল বেসম্যানদের ছায়া দেখতে পাচ্ছে। কেইন বুঝে উঠতে পারল না, অন্যের ওপর নির্ভর করতে গিয়ে উইলিয়ম বুচার জীবনে কোনদিন সত্যিকারের শান্তি পেয়েছে কিনা।

লিভারি স্ট্যাবল থেকে একটা ঘোড়া ভাড়া করল ও, স্যাডলে চেপে পশ্চিমের পথে শহর ছাড়ল। ডগড্যান্স থেকে মাইলখানেক যাওয়ার পর দক্ষিণে মোড় নিল সে, ভাঙাচোরা দীর্ঘ একটা শৈলশিরা ধরে এগোল। রাস্তা থেকে সরে থাকাই বুদ্ধিমানের কাজ হবে, অনুভব করছে কেইন। শ্লেড ওর কথা শুনবে এ-ব্যাপারে ওর যথেষ্ট সংশয় আছে। ও মোটামুটি নিশ্চিত কন্সাইনের ওপর পালটা আঘাত হানার সিদ্ধান্ত নিয়েছে ওই লোক, এবং সেজন্যই পিয়ারসন ভাইদের নির্দেশ দিয়েছিল স্টেজ স্টেশনের ওপর নজর রাখতে, যেন সন্দেহজনক চরিত্রের কারোকে দেখলে তাকে ভাগিয়ে দিতে পারে।

জো পিয়ারসন মারা যাওয়ায় লুড এখন ভ্রাতৃহত্যার প্রতিশোধ নিতে পাগলা কুকুর হয়ে উঠবে। শ্লেড আর তার প্রতিবেশীরা সুযোগ পেলে মাইকেল কেইনকে আটক করে ফাঁসিতে ঝোলাতে দ্বিধা করবে না। তবে কার্যসিদ্ধির খবরতরে এই ঝুঁকিটুকু ওকে নিতেই হবে। এরকম বিস্ফোরণোন্মুখ পরিস্থিতিতে বিপদের আশঙ্কা সবসময়েই থাকে, বুচার জেনেশুনে শ্লেড আর তার দলবলকে কোণঠাসা করছে যাতে ওরা পাল্টা ব্যবস্থা নিতে বাধ্য হয়। একবার গোলাগুলি শুরু হলে, কোন এক পক্ষ শেষ না হওয়া পর্যন্ত তা থামবে না। ডিলন মেসার যা অবস্থা, তাতে আইন নিঃসন্দেহে কন্সাইনকেই সমর্থন জোগাবে।

তিন মাইল পথও যায়নি এরই মাঝে কেইন উপলব্ধি করতে পারল রাফেল। কেন ওকে শ্লেড আর তার প্রতিবেশীদের রেঞ্জ সরেজমিনে দেখে আসতে বলেছিল। ঘাড় ফেরালেই কন্সাইনের রেঞ্জ দেখতে পাচ্ছে ও, পূর্বে পাহাড়ের পাদদেশ অবধি পুষ্ট ঘাসের গালিচা বিছানো, হাওয়ায় সতেজ সবুজ ডগাগুলো মৃদুমন্দ আন্দোলিত হচ্ছে। গতকাল রাস্তা থেকে যা দেখেছিল ও, পশ্চিমে ভাঙাচোরা প্রান্তর, অসংখ্য ক্যানিয়ন আর ছোট ছোট মেসার সমষ্টি। ওদিকে

ঘাস কম আছে বলা হলে সত্যের অপলাপ হয়। খর্বকায় কিছু সেজঝোপ আর সিঁড়ার গাছ থাকলেও, ঘাস প্রায় একদম নেই। পুরো এলাকাটা একরকম পাথুরে, ইরা শ্লেডের মত যারা পরে এসেছে তাদেরকে বাধ্য করা হয়েছে ওখানে আশ্রয় নিতে। জায়গাটা এমনভাবেই অনুর্বর, তার ওপর অবস্থা এখন আরও শোচনীয়। কারণ অল্পখানিকটা ঘেসোজমিতে বিপুলসংখ্যক গরুবাছুর চরছে, এবং এর ফলাফল যা হওয়ার তাই হয়েছে। রাফেলার ভাষায়: 'কঙ্কালসার গরু উৎপাদন করছে।'

সকালের মধ্যেই বেশকিছু হাভিডসার বলদ চোখে পড়ল কেইনের। মার্কাগুলোও এবড়োখেবড়ো, হাতে-বাঁকানো শিক তাকিয়ে ছাপ দেয়া। শ্লেডের লেগি এস-সহ আরও কিছু অপরিচিত মার্কা দেখতে পেল ও। পাহাড়ি খাঁজ থেকে ঝোপঝাড় পরিপূর্ণ একটা ক্যানিয়নে নেমে এল কেইন, খটখটে মেঝে মাড়িয়ে চড়াইয়ের মাথায় উঠল। ঠিক তখনই প্রথম ঝুপড়িটা চোখে পড়ল ওর, পাথরের চালাঘর একটা, পেছনে বাঁশের কোরাল। আশপাশে কোথাও প্রাণের লেশমাত্র নেই।

ডগড্যান্স ত্যাগ করার আগে আস্তাবল মালিকের কাছ থেকে পথের হদিস জেনে নিয়েছিল কেইন, তাই বুঝতে পারল এটা শ্লেডের র‍্যাঞ্চ না। এগিয়ে চলল সে, এখনও দক্ষিণপশ্চিম দিকেই যাচ্ছে। ওর বাঁয়ে এখন পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে হেল-স্ ওয়াল, খাড়া লাল পাথুরে দেয়াল, গ্রীষ্মকালীন চারণভূমিতে ছোট ছোট র‍্যাঞ্চারদের যাওয়ার পথ আগলে রেখেছে। এখানে এমন কিছু নেই যার প্রতি লোভ করা যায়। অথচ কেইন নিশ্চিত অলাভজনক কোনকিছুর জন্য বুচার লড়বে না। সেক্ষেত্রে এটা খুবই সম্ভব যে হোমস্টেডাররা যেন কিছুতেই পুর্বের ঘেসোজমির দিকে হাত বাড়াতে না পারে সেজন্য আগেভাগে এখানে একটা লড়াই জিইয়ে রাখছে ও। কিংবা আরেকটা সম্ভাব্য ব্যাখ্যা হতে পারে: বুচারের লোভের কোন সীমা-পরিসীমা নেই-নাগালের ভেতর যা কিছু দেখে সবই করতলগত করতে চায়। যদি দ্বিতীয় সম্ভাবনাটা সত্যি হয়, কোথায় গিয়ে উইলিয়ম বুচার ক্ষান্ত হবে কেউ বলতে পারবে না তা, কেননা মৃত্যু না হওয়া পর্যন্ত সাধারণত থামতে জানে না এধরনের মানুষেরা।

কেইন যখন আরেকটা ক্যানিয়ন হয়ে পাহাড়ি একটা ধাপে বেরিয়ে এল তখন প্রায় বেলা দুপুর। গেল কয়েক মাইলের মধ্যে যতটুকু দেখেছে, ও লক্ষ করল, এখানে ঘাস তার চেয়ে ভাল। সামনেই গোটা দুয়েক কটনউডের ছায়ায় লগ কেবিন রয়েছে একটা। কেবিনের একদিকে সবজিবাগান, অন্যপাশে বার্ন। পেছনে ওটিকতক কোরাল। আস্তাবল মালিক যে-রকম বর্ণনা দিয়েছিল তা থেকে কেইন বুঝতে পারল এটাই ইরা শ্লেডের লেগি এস বাথান।

সোজা কেবিন অভিমুখে এগিয়ে গেল সে, জানে আগামী কয়েক মিনিটে ওর সাফল্য কিংবা মৃত্যু নির্ধারিত হয়ে যাবে। এধরনের ঝুঁকিপূর্ণ পরিস্থিতি মোকাবেলা করে সে অভ্যস্ত, যে-কাজ করতে এসেছে সেটা সুসম্পন্ন করতে হলে এই ঝুঁকি এড়াবার কোন উপায় নেই। দৃঢ়তা দেখাবার মাঝে কিছু সুবিধে আছে, এতে প্রতিপক্ষের সন্দেহ দূর হয়ে যায়।

ওআটর ট্রাফের সামনে নেমে ঘোড়াকে পানি খাওয়াল কেইন, তারপর উত্তরের পাহাড়ি ঝরনা থেকে যে পাইপ বেয়ে পানি আসছে ট্রাফে তা থেকে নিজেও খেল এক ঢোক। যখন শেষ হলো খাওয়া, মাথা উঁচু করল ও, দেখতে পেল কেবিনের দোরগোড়ায় এ লোক দাঁড়িয়ে, তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে ওকে পর্যবেক্ষণ করছে।

হিচ রেইলে লাগাম জড়িয়ে কেবিনের দিকে এগোল কেইন, জিজ্ঞেস করল, 'তুমি স্টেড?'

মাথা ঝাঁকাল লোকটা, ওর চোখ ঝট করে একবার ঘুরে এল কেইনের কোমরে-ঝোলানো পিস্তলের ওপর থেকে। 'আমি স্টেড। খাবার খুঁজছ?'

স্টেড তাকে ক্ষুধার্ত লাইন রাইডার বলে ভুল করেছে, ভাবল কেইন। এতে অবাক হওয়ার কিছু নেই, পশ্চিমের বাথান অঞ্চলগুলোতে হরহামেশা এরকম ভুল হয়ে থাকে। ও বলল, 'আমার খিদে পেয়েছে। দাম দিতে পারব।'

ইতিমধ্যে র‍্যাগারের কাছে এসে পড়েছে কেইন, মনে-মনে লোকটাকে বিচার করল সে। দীর্ঘকায় একহারা শরীর। পরিষ্কার একটা শার্ট আর প্যান্ট পরে আছে, মাথার চুল আঁচড়ানো। বোধহয় খাওয়ার আয়োজন করছিল, কেইন ভাবল। স্টেড যখন আর দশ ফুট দূরে আছে তখন দাঁড়িয়ে পড়ল ও। বাথান মালিকের ধূসর চোখে নিজের চোখ রাখল।

'আমি ভাবছি তুমিই কেইন কিনা,' খানিক ইতস্তত করে একসময় বলল স্টেড।

'তাই।'

'আমাকে খুন করতে বুচার তোমাকে পাঠিয়েছে, না? তুমি আমাকে পিস্তল বের করতে বলবে যাতে তুমি তোমার বিবেকের কাছে পরিষ্কার থাকতে পার। তারপর জো-কে যেভাবে মেরেছ আমাকেও খুন করবে সেভাবে।'

ডাইনে বাঁয়ে মাথা নাড়াল কেইন। 'না। আমি কথা বলতে এসেছি। তুমি ভুল তনেছ, পিয়ারসনদের সাথে আমাকে ওরকম কিছু হয়নি। আমি জো-কে না মারলে ও আর বুডই খতম করত আমাকে।'

'কিন্তু লুড আসাকে তা বলেনি,' স্টেড জানাল। 'সামরা চাই না তুগি এখানে আস। আজ বিকেলে জো-কে আমরা কবর দিচ্ছি।'

একটুক্ষণ চুপ করে রইল কেইন, র‍্যাগারের ডয় আর সান্দেহ দূর করার উপযোগী ভাষা খুঁজল, কিন্তু কোন কথা জোগাল না ওর ঘুরে। ও জানে ওর উপস্থিতি স্টেডের কাছে কতটা ভীতিজনক, এবং এজন্য সে ওকে দোষ দিতে পারছে না।

'আমার খিদে পেয়েছে,' শেষমেশ বলল কেইন। 'এখানে আমি ঝামেলা করতে আগিনি। থামতে এসেছি।'

কর্কশ সুরে হাসল স্টেড। 'নিশ্চয়, নিশ্চয়। তুমি তোমার এলাকা থেকে অনেক দূরে চলে এসেছ, কেইন। যাও, গিরে গিয়ে বুচার আর তার সাতপাঙ্গদের নিয়ে এসো। জ্বালিয়ে-পুড়িয়ে ছারখার করে দাও আমাদের ঘরবাড়ি, আমাদের খুন কর-তা হলেই তোমার দায়িত্ব শেষ হবে।'

কেইন তার টুপিটা মাথায় চাপাল আবার, ভাবছে সত্যি কথাটা বলা উচিত হবে কিনা। কথোপকথনের ভঙ্গিতে ও জিজ্ঞেস করল, 'জ্যাকি আর বব হার্ভেকে চেন?'

'হ্যাঁ, খুউব। যেমন বাপ তেমনি তার ছেলেমেয়ে।'

'না, জ্যাকি আর বব ওরকম না।'

'কী জানি? হয়তো তাই। হয়তো না। আমরা কারোকে বিশ্বাস করি না, কেইন। করতে পারি না। ডগড্যাপের সবাই এক-আমাদের শত্রু।' আঙুল তুলে কেইনকে অভিযুক্ত করল শ্লেড। 'আর এখন বুচার তোমাকে পাঠিয়েছে।'

'ওকে নিয়ে এসো,' কেবিনের ভেতর থেকে বলল এক মহিলা। 'ওর খিদে পেয়ে থাকলে আমরা ওকে খাওয়াব, তারপর ও চলে যাবে। এভাবে বাইরে দাঁড়িয়ে তর্ক করার কোন মানে হয় না।'

কাঁধ ঝাঁকাল শ্লেড। 'আমার স্ত্রী। তোমার পক্ষে ওকালতি করছে। নরম মন। তুমি অনাহারে থাকলেই আমি বেশি খুশি হতাম। এসো।'

শ্লেড ঘুরে ঢুকে গেল ভেতরে। কেইন পিছু নিল ওর, টুপি খুলে ফেলেছে। চুলোর কাছে দাঁড়িয়েছিল এক দীর্ঘাঙ্গিনী মহিলা, অনুসন্ধিৎসু দৃষ্টিতে কেইনকে মাপল সে। মহিলা বলল, 'অ, তুমিই কেইন। দিন কয়েক আগে কলোরাডোর আইন ফাঁকি দেয়ার জন্য যারা ইউট্যাহয় পালাল তাদের সঙ্গে তোমার চেহারার কোন ফারাক নেই।'

'আইন?' উপহাসে মুখ ঝাঁকাল শ্লেড। 'মানে তুমি রেড ম্যানিয়নের আইনের কথা বলছ?'

চুলোর দিকে ফিরল মিসেস শ্লেড। 'না-সত্যিকার আইনের কথা।'

কেইন দেখল ওদের খাওয়া হয়ে গেছে। এঁটো খালাবাসন পড়ে আছে টেবিলে, ঘরের ভেতর রান্না-করা খাবারের সুবাস ভাসছে। ওর খাবার বাড়ার কোন আয়োজন করছে না মহিলা, লক্ষ করল সে। দ্বিধাযুক্ত মুখে টেবিলের একপাশে দাঁড়িয়ে রইল ও, হাতে টুপি। শ্লেড টেবিলের আরেক পাশে রয়েছে, হাত প্যান্টের পকেটে। কক্ষ সুরে ও বলল, 'মারিয়ান, তাড়াতাড়ি খাবার দিয়ে বিদেয় কর ওকে। আমি মোড়া তৈরি করতে যাচ্ছি, একুনি না বেরোলে জো-কে কবর দিতে দেরি হয়ে যাবে।'

দরজার উদ্দেশে পা বাড়াল শ্লেড। কেইন ঘুরল ওর দিকে। 'আমি খালি পেটেও ডগড্যাপে ফিরে যেতে পারব। এখানে এসেছিলাম তোমাকে একটা কথা বলতে। কোনরকম ঝামেলা কোরো না-আমার বিশ্বাস পরিস্থিতি বদলাতে যাচ্ছে।'

ঘুরে কেইনের মুখোমুখি হলো শ্লেড, বিদ্রূপের হাসি হাসছে। ঠিক ওই সময়ে মহিলার দিকে পিঠ ফিরিয়েছিল কেইন, হঠাৎ শ্লেডের চোখ জ্বলে উঠতে দেখে সাবধান হয়ে গেল ও, উল্টো দিকে ঘুরতে শুরু করল। চোখের কোণে আবছাভাবে একটা উদ্যত ফ্রাইং প্যান দেখতে পেল সে, নিচু হওয়ার চেষ্টা করল, পরক্ষণে তাওয়াটা আছড়ে পড়ল ওর কপালের ওপর। বো করে ঘুরে উঠল কেইনের মাথা, হাঁটু ভাঁজ হয়ে পড়ে গেল মেঝেয়।

কেইনের চেতনা পুরোপুরি লোপ পায়নি। মুখ খুবড়ে পড়ে আছে মাটিতে।

শ্লেড চেপে বসেছে ওর পিঠের ওপর, র-হাইডের দড়ি দিয়ে হাত দুটো বাঁধছে পিছমোড়া করে। ওর বউ চিৎকার করে বলছে, 'তুমি সরে যাও, ইরা। হারামজাদাকে খুন করব আমি-মিথ্যে কথা বলার জায়গা পায়নি।'

একে ব্যথায় দপদপ করছিল কেইনের মাথা, তার ওপর মহিলার চিৎকারে যন্ত্রণা যেন বেড়ে গেল আরও বহুগুণ। এবার ওর পা বাঁধল শ্লেড, বলছে, 'না। বেঁধে রেখে যাব এখানে। রাতের অন্ধকারে শহরে নিয়ে গিয়ে ফাঁসিতে ঝোলাব। আমি চাই বুচার ওর লাশ দেখতে পাক।'

'বোকামি করছ তুমি,' তেলেবেগুনে জ্বলে উঠল মহিলা। 'ওকে কয়েদ করে রাখার মত কোন জায়গা নেই আমাদের। ও পালিয়ে যাবে, তারপর তোমার কী অবস্থা হবে ভেবেছ?'

'আমি জানি কীভাবে একজন মানুষকে বেঁধে রাখতে হয়,' ঝামটা মারল শ্লেড। 'ভাল করে চেয়ে দেখ একবার, যেভাবে বেঁধেছি, শত চেষ্টাতেও খুলতে পারবে না।'

বাইরে থেকে একজন লোক হাঁক দিল। 'ইরা? বাসায় আছ?'

হেঁটে দরজার কাছে গেল শ্লেড। 'হ্যাঁ, আছি। তবে এক্ষুনি বেরোব। একটা ভালুক এসেছিল ওটাকেই আটকাতে গিয়ে দেরি হয়ে গেল।'

'এত করে নিষেধ করছি, তবু বাঁচিয়ে রাখছে জানোয়ারটাকে, ঘোঁত-ঘোঁত করে উঠল মিসেস শ্লেড। 'এর জন্য পরে পস্তাতে হবে ওকে।'

'কাকে আটকেছ?' জিজ্ঞেস করল লোকটা।

'কেইনকে,' শ্লেড জবাব দিল।

'সর্বনাশ! বিল কিন্তু এটা পছন্দ করবে না।'

'জানি,' পরিতৃপ্ত গলায় বলল শ্লেড। 'ওর ঘোড়াটা আমি বার্নে বেঁধে রাখতে যাচ্ছি। আমাদেরকে বেরোতে হবে।'

'দাঁড়াও, ইরা। অবস্থা কিন্তু আরও খারাপ হবে এতে। তুমি কী ভাবছ জানি না, তবে ম্যানিয়ন একটা ছুতো পেলেই তোমার হালুয়া টাইট করবে। আর বিলও সেই অপেক্ষাতেই আছে।'

'কুছপরোয়া নেই,' শ্লেড আপন সিদ্ধান্তে অটল। 'আসুক ওরা। আর কাঁহাতক সহ্য করব?'

'ভুল করছ তুমি,' নবাগত বলল। 'আইনের সঙ্গেই যদি লাগবে, বিলকে খতম করলেই পার।'

'না, এ-ই ভাল,' শ্লেড বলল। 'খোদা আমাদের হাতে ওকে তুলে দিয়েছে। বিল যখন দেখবে ওর মাস্তান কটনউডের ডালে ঝুলছে, আপসে পথে আসবে।'

শ্লেড আর তার বউ বেরিয়ে গেল কেবিন ছেড়ে। কেইনকে রেখে যাওয়ায় এখনও গজগজ করছে মিসেস শ্লেড। কষ্টেস্টে মাথা জাগাল কেইন, সর্ষের ফুল দেখছে চোখে, তবু এরই ভেতরে কেবিনের সামনে স্যাডলে-বসা লোকটাকে চিনতে পারল। অ্যাবনার লরি।

ছয়

কেইন শুনতে পেল একটা একাগাড়ি উঠন ত্যাগ করছে, ওর মনে হলো যেন বহুদূর থেকে ভেসে আসছে ওই আওয়াজ। একটু বাদে লরিও চলে গেল। এখনও কেইনের চোখের সামনে লাল-হলুদ আলো নাচছে; অসহ্য যন্ত্রণায় ছিঁড়ে পড়তে চাইছে মাথা।

শ্লেডের কথাগুলো বাজছে ওর কানে। ওরা সকলের পর ওকে শহরে নিয়ে গিয়ে ফাঁসি দেবে। পালাতে হবে, যে-করেই হোক, কেইন ভাবল। নয়তো ওরা ওকে খুন করবে। বুচারের জন্য নিজের পৈতৃক প্রাণটা খোয়ানোর কোন অর্থ হয় না। টমাস হার্ভের কারণেও না। কাজেই এখন ওর একমাত্র কাজ: পলায়ন। গড়ান দিল কেইন, পরমুহূর্তে জ্ঞান হারাল।

কতক্ষণ অজ্ঞান হয়ে পড়েছিল মনে নেই ওর, তবে অবার যখন চোখ মেলল কড়া রোদে ঝাপসা হয়ে গেল দৃষ্টি। এখন বিকেল, সূর্য পশ্চিমে হেলে পরায় জানালা গলে রোদ সরাসরি ওর মুখে এসে পড়ছে। গড়াতে-গড়াতে রোদ থেকে সরে গেল কেইন, থামল গিয়ে একেবারে দেয়ালের কাছে। চোখ পরিষ্কার হয়ে গেছে, মাথার দপদপানি আর নেই, কেবল ভোঁতা একটা বেদনা রয়েছে।

প্রথমে সে ঠাहर করতে পারল না কোথায় আছে, তারপর নিমেষে সব মনে পড়ে গেল। মিসেস শ্লেড তাওয়া দিয়ে আঘাত করেছিল ওর মাথায়, ইরা শ্লেড ওকে ফাঁসিতে ঝোলাবার অঙ্গীকার করেছে, বিল বুচারকে হত্যা করার জন্য শ্লেডকে উসকানি দিচ্ছিল আবনার লরি-লরি, কম্বাইনের সভায় যে-লোক একটা কথাও বলেনি। ও এখানে কেন? অনেক ভেবেও এখানে লরির আগমনের হেতু বুঝতে পারল না কেইন। তবে একটা ব্যাপারে ও নিশ্চিত: লরি কম্বাইনের পিঠে ছুরি মারছি। কেইন যে-ধরনের লোককে সবথেকে বেশি ঘৃণা করে, এর ফলে লরির নাম উঠল সেই তালিকায়।

অতিকষ্টে এমনভাবে উঠে বসল কেইন যেন ওর পিঠ দেয়ালে ঠেকে থাকে। অল্পতেই হাঁফিয়ে উঠল ও, মাথা ঘুরতে শুরু করল, তাড়াতাড়ি দেয়ালে ঠেস দিয়ে রোধ করল পতন। ঘরের ভেতর কোথাও টিকটিক সুরে বেজে চলেছে একটা ঘড়ি, শুনতে পেল ও। ঘড়িটার অবস্থান বের করতে প্রায় মিনিটখানেক লাগল ওর, তারপর সময় জানার আশায় চোখ কুঁচকে তাকাল ওটার দিকে। বিকেল চারটা! আতঙ্কে হিম হয়ে এল কেইনের হাত-পা। ভয়ের একটা ঠাণ্ডা হ্রোত নেমে গেল শিরদাঁড়া বেয়ে, পাকস্থলীর ভেতর ছড়িয়ে পড়ল। মুহূর্তের জন্য ভীষণ অসহায়বোধ করল ও। বসে রইল পাথরের মত, নড়াচড়া করার শক্তি পাচ্ছে না, জানে কবরখানা থেকে ফিরে এসে ইরা শ্লেড যদি ওকে এখানে পায় নির্যাত খুন করবে।

শ্লেড তার প্রতিবেশীদের নিয়ে কখন ফিরবে ও আন্দাজ করতে পারল না।

মার্সেনারি

পিয়ারসনদের বাসা কতদূরে কিংবা কখন শেষকৃত্য অনুষ্ঠিত হবে কিছুই জানা নেই ওর। ও কেবল জানে বিকেলের অধিকাংশ সময় অতিবাহিত হয়ে গেছে এবং অত্যন্ত দক্ষহাতে বাঁধা হয়েছে ওকে। হাজার চেষ্টা করলেও, এতটুকু টিলে হবে না বাঁধন, বরং বেশি টানাটানি করলে মাংস কেটে আরও গভীরে বসে যাবে দড়ি।

ধীরে-ধীরে সুস্থ চিন্তাশক্তি ফিরে পেল কেইন, মনের ভয় দূর হলো খানিকটা। কতক্ষণ হলো সে আছে এখানে জানে না, তবে ধারণা করল সম্ভবত এক ঘণ্টার বেশি হবে। ঘরের চারপাশে নজর বোলাল ও, ছুরি অথবা কুঠারজাতীয় একটা অস্ত্র খুঁজছে। মোটামুটি ধারাল হলেই চলে, যাতে ঘষে-ঘষে হাতের বাঁধন কাটতে পারে, কিন্তু সেরকম কিছু দেখতে পেল না ও।

কেবিনটা খুব বড় না। একপ্রান্তে খাট আর কাঠের কেবিনেট রয়েছে। কেবিনেটের গায়ে অসংখ্য দাগ, বুঝতে অসুবিধে হয় না বহুবার এখানে-সেখানে সরানো হয়েছে ওটা। টেবিলের ওপর এখনও পড়ে আছে এঁটো খালাবাসন। এগুলো ছাড়া, চুলো আর খানদুই চেয়ার আর একটা বেঞ্চ আছে। আড়াআড়িভাবে একটা দোনলা বন্দুক ঝুলছে দেয়ালে। শেলফে কিছু খালি টিনের কৌটো আর খাবারের থলে সাজানো রয়েছে। যে-তাওয়া দিয়ে কেইনকে আঘাত করেছিল মিসেস শ্লেড, আরও কিছু বাসন-কোসনের সাথে সেটা পড়ে রয়েছে চুলোর পাড়ে। কিন্তু ও যা খুঁজছে সেরকম কিছু নেই ঘরে। কেইন জানে শ্লেডদের নিশ্চয় মাংস কাটা ছুরি আছে, কিন্তু আশপাশে কোথাও দেখতে পেল না সেটা। এবার কুঠারের কথা ভাবল ও। এ-জিনিস বাইরে থাকাই স্বাভাবিক, হয়তো কাঠের গাদায় গাঁথা আছে। কুঠারটা যদি দু-ধার হয়, ওপরের কানায় কোনমতে পিঠ ঠেকাতে পারলেই কেঁদাফতে হয়ে যাবে।

গড়াতে-গড়াতে দরজার কাছে গেল কেইন; তারপর কোনাকুনিভাবে ঘুরে মাথা রাখল তোকাঠের ওপর। এবার কীটের মত নুকে হেঁটে এগোল সে, দেহের উর্ধ্বাংশ অনবরত ওঁড়ানামা করছে। দরজা পেরোতে গিয়ে কেইনের মনে হলো যেন একফুগ নেগে গেল ওর। কেবিনের সামনে খোলা জায়গায় কিছুক্ষণ নিঃসোড়ে পড়ে রইল সে, হাঁপাচ্ছে জিভ বের করে, অজস্রধারায় ঘাম দেখা দিয়েছে সারা শরীরে, পড়ন্ত বিকেলের রোদে ভিজছে। এ-সময়ে এত গরম হতে পারে আগে জানা ছিল না কেইনের।

আবার গড়াতে শুরু করল ও, কেবিনের কোনা ঘুরে লাকড়ির পালার কাছে গিয়ে হাজির হলো। কুঠারটা যখন দেখতে পেল ভীষণভাবে দমে গেল কেইন। একেবারে লাকড়ির গাদার মাথায় তোলা আছে, ঘটনাচক্রে না হেঁড়ের দূরদর্শিতাই এর কারণ ঠিক বুঝতে পারল না সে। তবে যা-ই হোক না কেন, কুঠারটা ওর নাগালের বাইরে রয়েছে। অকস্মাৎ একটা ঘোড়ার পায়ের আওয়াজ পেল ও, সমতল জমি ধরে এদিক পানেই আসছে। নিশ্চয় শ্লেড, ভাবল কেইন, ওকে খতম করার জন্য ফিরে আসছে। নিজেকে ওর ফাঁদে-পড়া জন্তুর মত অসহায় মনে হলো। পরক্ষণে কেইনের খেয়াল হলো শ্লেড একাগাড়িতে চড়ে গেছে। তা হলে, বোধহয়, লরি কিন্তু ওর কাছেও কোনরকম সাহায্য পাওয়ার

আশা নেই, কারণ খানিক আগে ও এখানে এসেছিল কনাইনের সাথে বেইমানি করতে।

গাড়িয়ে কেবিনের দেয়ালের কাছে সরে গেল কেইন, পড়ে রইল ঘাপটি মেরে, ভাবছে এখানেই ওর জীবনের ইতি ঘটবে কিনা। আবার ভয় জেগে উঠল ওর ভেতরে, পাকস্থলিতে সুড়সুড়ি দিতে লাগল, চিকন ঘাম দেখা দিল কপালে।

কেবিনের সামনে পৌছে থেমে গেল ঘোড়াটা। একজন লোক হাঁক দিল, 'কেউ আছ ভেতরে?'

গলাটা চেনা চেনা মনে হলো কেইনের। লরির না। পরমুহূর্তে মনে পড়ল ওর। ওই ঘোড়সওয়ার আর কেউ নয়-বুড়ো ব্যাংকার, প্যাডি রায়ান। চেষ্টা করে ডাকল কেইন, 'এদিকে এসো, পেছনে।' তারপর পরম স্বস্তিতে হাঁফ ছাড়ল।

পলকে ঘোড়া থেকে নেমে কেবিনের পেছনে চলে এল ব্যাংকার, কিন্তু কেইনের মনে হলো বুড়োর বুঝি এইটুকু জায়গা অতিক্রম করতে এক ঘণ্টা সময় লাগল। চোখ নামিয়ে কেইনের দিকে তাকাল রায়ান, অনাবিল হাসিতে বদলে গেছে মুখের মানচিত্র। 'বাহ! তোমাকে কিন্তু দারুণ লাগছে দেখতে।'

'ঠাট্টা রাখ,' বিরক্তি প্রকাশ করল কেইন। 'আমার বাঁধন খুলে দাও আগে।'

হাসতে হাসতেই, পকেট থেকে একটা চাকু বের করে দড়িগুলো কেটে দিল ব্যাংকার। কেইন উঠে দাঁড়াল, মাথা ঘুরে ওঠায় কেবিনের দেয়ালে ঠেস দিয়ে টাল সামলাল। আড়মোড়া ভাঙল ও, হাত-পা ঝেড়ে রক্ত চলাচল স্বাভাবিক করতে চেষ্টা করল। তারপর জিজ্ঞেস করল, 'তুমি হঠাৎ এখানে?'

'দেখতে এলাম তুমি কেমন আছ।' একগাল হাসল রায়ান। 'ইরা শ্লেডকে তো আমি চিনি। তা, তুমি ফাঁসলে কীভাবে?'

সংক্ষেপে সব ঘটনা ওকে খুলে বলল কেইন, তারপর কেবিনের কোনা ঘুরে চলে গেল রায়ানের ঘোড়ার কাছে। 'তুমি কেবিনে যাও,' বুড়োকে বলে ওর ঘোড়া নিয়ে বার্নে ঢুকল সে, যে-স্টলে লিভারি স্ট্যাবলের ঘোড়াটা বাঁধা আছে তার পাশেরটায় বেঁধে রাখল ওকে।

কেবিনে ফিরে এসে কেইন দেখল ওকনো মুখে দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে রায়ান। 'কোথায় আমি তোমাকে বাঁচালাম,' কেইনকে দেখামাত্র শুরু করল বুড়ো, 'আর তুমি কিনা আমাকে-'

'তোমার কাছে আমার ঋণ শেষ হবে না কোনদিন,' মাঝপথে ওকে বাধা দিল কেইন। 'কিন্তু আমাদের পালালে চলবে না। জরুরি কাজ আছে। চল, ভেতরে যাই।'

ওর পেছন-পেছন কেবিনে ঢুকল ব্যাংকার, মুখ ব্যাজার।

'পিস্তল আছে?' বুড়োকে জিজ্ঞেস করল কেইন।

'না।'

দেয়াল থেকে দোনলা বন্দুকটা নামাল কেইন, যখন দেখল গুলি ভরা তখন ধরিয়ে দিল ব্যাংকারের হাতে। 'কেউ পায়তারা করার চেষ্টা করলে দেবে শেষ করে।'

'দেখ, আমি এমনিতেই ভিত্তি মানুষ,' মিনমিনে গলায় বলল রায়ান।

ব্যাংকারের কথায় আমল দিল না কেইন। ও জিজ্ঞেস করল, 'আচ্ছা, অ্যাবনার লরিকে তোমার কেমন মনে হয়?'

'একটা কথা বলতে পারি, ও গ্যারিটির মত না। গ্যারিটিকে বোঝা যায়, কারোকে বুক দিলে পিঠ দেখাবে না। কিন্তু অ্যাবনার, ওর ব্যাপারে কিছু বলা শক্ত। কেন?'

'এখানে এসেছিল কিছুক্ষণ আগে,' বলে বাকিটুকু ব্যাংকারকে জানাল কেইন।

একটুক্ষণ চুপ করে রইল রায়ান, তারপর বলল, 'আশ্চর্য।'

'এতে আশ্চর্য হবার কী আছে?' রায়ানের মুখের দিকে তাকাল কেইন।

'হিসেব মিলছে না,' আপনমনে বলে চলল ব্যাংকার, যেন কেইনের প্রশ্ন শুনতেই পায়নি। 'যে-লোক জাত গরু ব্যবসায়ী সে কীভাবে উল্টোপাল্টা কথা বলে?'

'হেঁয়ালি রাখ,' কেইন বিরক্ত। 'তোমার কথার মাথামুণ্ড কিছুই বোঝা যাচ্ছে না।'

'আরে, এত উত্তেজিত হচ্ছে কেন, বলছি,' একগাল হাসল রায়ান। 'তখনও অ্যাবনারের বাবা, বুড়ো জেক বেঁচে। একদিন আমি আর অ্যাবনার ঘোড়ায় চেপে বেড়াতে বেরিয়েছি। হঠাৎ ওদের রেঞ্জ থেকে নীচের মেসা দেখিয়ে অ্যাবনার বলল, "জান, প্যাডি, ওই মেসাতে যদি কেউ সারা মৌসুম পানির ব্যবস্থা করতে পারে সে রাতারাতি কোটিপতি হয়ে যাবে।"

'আমি তো শুনে হতবাক। যখন জিজ্ঞেস করলাম ওর এরকম ভাবার কারণ, একদম চুপ মেরে গেল অ্যাবনার।'

জানালা দিয়ে বাইরে নজর রাখছিল কেইন। চোখ না সরিয়েই জিজ্ঞেস করল, 'তার সাথে ওর এখানে আসার কী সম্পর্ক?'

'বুচার থাকতে ও সুবিধে করতে পারবে না। তাই হয়তো হোমস্টেডারদের উসকে রেঞ্জ ওর বাধাতে চাইছে, যাতে যুদ্ধে বুচারকে শেষ করা সহজ হয়। এর ফলে সাপও মরবে লাঠিও ভাঙবে না। শোন, এখানে পানির ওপর ওর অধিকারই আগে, কারণ উতে ক্রীকের মাথায় ওর রেঞ্জ। আর ওর বাড়ির ঠিক নীচেই বাঁধ দেয়ার চমৎকার জায়গা আছে একটা।'

এরপর ওদের কথা আর এগোল না। পূর্বের ক্যানিয়ন থেকে ছজন রাইডার বেরিয়ে এসেছে, পুরোভাগে স্লেড আর লুড পিয়ারসন। কেইন চাপা গলায় বলল, 'সাবধান, ওরা আসছে। বুঝতে দিও না আমরা আছি এখানে। চমকে দিতে হবে।'

পিস্তল বের করে কক করল কেইন। ওর পাশে এসে দাঁড়াল রায়ান, দরজার দিকে মুখ করে আছে, শটগানের দুটো হ্যামারই পেছনে টানা। ঘোড়সওয়াররা কেবিনের সামনে এসে নামল মাটিতে। লুড পিয়ারসনের গলা স্পষ্ট শুনতে পেল কেইন। 'ব্যাটাকে তুমি ধরে নিয়ে গেলেই ভাল করতে, ইরা। ঠিক জোয়ের কবরের ওপর ফাঁসিতে লটকাতাম।'

'এখনও পারবে,' স্লেড বলল। 'ও এখানেই—' দলবেঁধে ঘরে ঢুকল ওরা,

শ্লেড নেতৃত্ব দিচ্ছে। কেইনকে যেখানে রেখে গিয়েছিল সেদিকে তাকিয়ে থমকে দাঁড়াল ও, ফ্যাসফ্যাসে গলায় শেষ করল অসমাপ্ত বাক্য, 'নেই।'

'ঠিক তাই,' কেইন বলল। 'মাথার ওপর হাত তোল সবাই।'

চকিতে একযোগে ঘুরে কেইন আর রায়ানের মুখোমুখি হলো ওরা, কেবিনের আধো-অন্ধকারে চোখ পিটিপিটি করছে। তারপর ধীরে-ধীরে ছাতের পানে উঠে গেল সবগুলো হাত, পিয়ারসন নিচু স্বরে গাল বকছে।

'এই তো সব লক্ষী ছেলে,' বিদ্রূপ করল কেইন। 'এবার একহাত নামিয়ে গানবেন্টগুলো খুলে ফেল, তারপর পিছিয়ে যাও।'

বাজার মুখে আদেশ পালন করল ওরা। রায়ানের দিকে তাকিয়ে শ্লেড বলল, 'টাকা দেয়া বন্ধ করে তোমার আশ মেটেনি না? এখন এই খুনেটার সাথেও হাত মিলিয়েছ।'

'তুমি মিছেই রাগ করছ আমার ওপর। আমার বুদ্ধিতে কিছু হয়নি,' ব্যাংকার নিজের সাফাই গাইল। 'আমি এসেছিলাম তোমার সাথে কথাবার্তায় কেইন কদূর এগোল জানতে। এখানে এসে দেখলাম ও হাত-পা বাঁধা অবস্থায় পড়ে আছে। তারপর ও-ই আমাকে থেকে যেতে বাধ্য করেছে।'

দেয়ালে পিঠ দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে ওরা ছজন, প্রত্যেকের হাত মাথার ওপরে তোলা, চোখে-মুখে মৃত্যুভয়। লাগি মেরে ওদের গানবেন্টগুলো ঘরের এককোণে পাঠিয়ে দিল কেইন, তারপর পিছিয়ে রায়ানের পাশে এসে দাঁড়াল। কেইন বলল, 'পিয়ারসনের কথায় তুমি আমাকে ফাঁসি দিতে চাইছিলে, তাই না, শ্লেড?'

শুকনো ঠোঁটজোড়া জিভ দিয়ে ভেজাল লেগি এস মালিক, আড়চোখে তাকাচ্ছে পিয়ারসনের দিকে। 'হ্যাঁ। তবে একটা ব্যাপারে তুমি নিশ্চিত থাকতে পার। আবার যদি কখনও সুযোগ পাই, তোমাকে বাঁচিয়ে রাখার মত ভুল আর করব না।'

'হয়তো সে-সুযোগ তুমি পাবে না। আমার জায়গায় হলে, এতক্ষণে তুমি আমাকে খতম করতে, তাই না?'

'আলবত,' গরগর করে উঠল শ্লেড। 'তোমার মত একজন বন্দুকবাজ এ ছাড়া আর কী আশা করতে পারে?'

'ঠিক,' তিক্ত সুরে বলল কেইন। 'কিন্তু পিয়ারসন তোমাকে সত্যি কথাটা বলেনি।' কীভাবে কী ঘটেছিল শ্লেডকে জানিয়ে কেইন যোগ করল, 'তোমার মাথা মোটা, নইলে ঠিকই বুঝতে আমি তোমাকে খুন করতে আসিনি। তা যদি আসতাম, পয়লা চোটেই শেষ করতাম তোমাকে।'

'মিছে কথা বলছে ও,' ঘেউ-ঘেউ করে উঠল লুড পিয়ারসন। 'একদম ভাঁহা মিথ্যে।'

দীর্ঘদেহীর দিকে পিস্তল তাক করল কেইন। 'পিয়ারসন, তোমাকে একটা প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে। স্টেজ স্টেশনে তোমাকে কে পাঠিয়েছিল?'

'বলব না,' গোমড়া মুখে জবাব দিল পিয়ারসন।

'আমার বিশ্বাস বলবে,' হিসহিস করে উঠল কেইনের গলা। 'দশ সেকেন্ড

সময় দিচ্ছি। এর মধ্যে যদি না বল-খুন করব তোমাকে।’

কেইনের চেহারা এখন ভয়াল হয়ে উঠেছে, যে-কেউ দেখলেই বুঝতে পারবে ও সাধারণ কোন ভবঘুরে নয়। লুড পিয়ারসন বোধহয় ওই আবছা আলোতেই দেখতে পেয়েছিল পরিবর্তনটা; তাই দশ সেকেন্ড পর্যন্ত অপেক্ষা করল না, ককিয়ে উঠল সে, ‘তোমার দোহাই লাগে, আমাকে মেরো না।’

‘তা হলে আমার প্রশ্নের জবাব দাও।’

পিয়ারসনের কণ্ঠমণি বার দুয়েক ওঠানামা করল নিঃশব্দে, তারপর চাপা গলায় মুখ খুলল ও। ‘অ্যাবনার লরি।’

জ্যাকুলিন অনুমান করেছিল ইরা শ্লেড স্টেজ স্টেশনে মোতায়ন করেছে পিয়ারসনদের। কেইন ধরে নিয়েছিল ওর কথাই ঠিক। কিন্তু এখন লুডের কথা বিশ্বাস করল ও, কারণ পিয়ারসনদের মত মানুষদের ভাড়া করতে প্রচুর টাকা লাগে। অথচ শ্লেড আর তার প্রতিবেশীরা স্পষ্টতই গরীব।

শ্লেডের উদ্দেশে পিস্তল নাচাল কেইন। ‘এবার তোমার পালা। ‘বল, লরি কেন এসেছিল এখানে?’

‘বুচারের কাজকর্ম ওর পছন্দ না, কিন্তু কনাইনের মিটিংয়ে প্রতিবারই ভোটে হেরে যায়। এখানকার বড়লোক ব্যাংকারদের মধ্যে ও-ই আমাদের একমাত্র বন্ধু।’ রায়ানের উদ্দেশে আগুন ঝরাল শ্লেডের দুই চোখ। ‘এমনকী যাদেরকে আমরা বন্ধু ভাবতাম বিপদের সময় দেখলাম তারাও একেকটা বেঈমান।’

‘তাই?’ ব্যাংকার বলল বিড়বিড় করে। ‘তুমি একবারও কখনও ভেবে দেখেছ, ইরা, তোমার ভুল হয়ে থাকতে পারে?’

‘ভুল,’ টেঁচিয়ে উঠল শ্লেড, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে কান্নার মত শোনালা ওর গলা। ‘আমরা সবসময় দূরে থেকেছি, অথচ বুচার অভিযোগ করেছে আমরা নাকি ওর গরু চুরি করছি। বিলকুল ঝুট, রায়ান, তুমি নিজেও জান তা। এখন মনে হচ্ছে লরির কথাই ঠিক, আমরা এবার সরাসরি লড়ব বুচারের সঙ্গে। ইচ্ছে করলে তুমি ওকে কথাটা বলতে পার।’

‘আচ্ছা, এসব লরির কারসাজি না তো? হয়তো তলে-তলে অন্য কোন মতলব আছে ওর,’ কেইন বলল।

‘না, লরির মধ্যে কোন খাদ নেই,’ ক্রান্ত সুরে বলল শ্লেড। ‘আমাকে এসব বলে কোন ফায়দা হবে না।’

‘আচ্ছা, এক কাজ করলে কেমন হয়,’ কেইন প্রস্তাব দিল। ‘তবে তার আগে আমাকে জানতে হবে, তুমি কথা দিয়ে কথা রাখো কিনা।’

‘একটা ভাড়াটে বন্দুকবাজের সঙ্গে আমি কোন আপসরফা করব না,’ শ্লেড অনমনীয়। ‘জাহান্নামে যাও তুমি।’

‘দেখ, শ্লেড, কোনরকম তর্ক করার মত অবস্থায় তুমি নেই,’ কেইন শুরু করল। ‘আমি এখানে এসেছিলাম দুটো কারণে। এক, তোমাকে দেখতে। সেটা পূরণ হয়েছে। আমি বেশ বুঝতে পারছি তুমি মাথা-গরম মানুষ, ঘিলু বলে তোমার কিছু নেই। দুই, তোমাকে বলতে প্রতিটা লোকেরই তার বাসস্থান রক্ষা করার অধিকার আছে। বুচার তোমাদের সাথে অন্যায় করেছে।’

‘কার হয়ে কাজ করছ তুমি?’ স্লেড জানতে চাইল। ‘তোমার মত লোকের তো ন্যায়-অন্যায় বিচার করার কথা না!’

মৃদু হাসল কেইন। একটা সময় ছিল যখন স্লেডের এই অভিযোগ অবনত মস্তিষ্কে স্বীকার করে নিত ও, কিন্তু সেইসব দিন আজ গত হয়েছে। অতীতের সাথে সমস্ত সম্পর্ক ছিন্ন করেছে সে। এখন যা করছে সেজন্য মনে-মনে একধরনের তৃপ্তি বোধ করছে ও। এবং আশা করছে কোন একদিন জ্যাকুলিন হার্তে হয়তো জানতে পারবে ওর এই অনুভূতি।

‘তোমার তা জেনে কাজ নেই,’ বলল কেইন। ‘আমি বুঝতে পারছি এই মেসায় একটা কিছু গোলমাল আছে। তুমি আমাকে খানিকটা সময় দাও—আমি সব সমস্যার সমাধান করে দেব।’

‘নিকুটি করি সময় দেয়ার,’ হুঙ্কার ছাড়ল স্লেড। ‘আমরা চুপ করে বসে থাকি, আর সেই সুযোগে বুচার সদলবলে এসে আমাদের ঘরবাড়ি জ্বালিয়ে দিক, না? সেটি হচ্ছে না। পয়লা সুযোগেই ওকে আঘাত হানব আমরা।’

এপাশ-ওপাশ মাথা নাড়াল কেইন। ‘না, ও আগে আক্রমণ করবে না। বুচার অপেক্ষা করছে তোমরা একটা ভুল করবে এই আশায়। আমাকে তুমি আটচল্লিশ ঘণ্টা সময় দাও, স্লেড।’

‘রাজি হয়ে যাও,’ পরামর্শ দিল রায়ান। ‘আমার বিশ্বাস এতে তোমাদের ভালই হবে। টাকা দেয়া বন্ধ করার আইডিয়াটা আমার ছিল না।’

‘তুমি ভাবছ কীভাবে তোমার কথা আমি শুনব?’ জানতে চাইল স্লেড, চোখ কেইনের মুখের ওপর স্থির।

‘না করে উপায় নেই তাই,’ চাঁছাছোলা জবাব দিল কেইন।

হোমস্টেডারদের একজন বলল, ‘ওর কথাই ঠিক, ইরা। ওই পর্যন্ত অপেক্ষা করলে আমাদের কোন ক্ষতি হবে না।’

একটুক্ষণ নীরব রইল স্লেড, তারপর দায়সারা ভঙ্গিতে কাঁধ ঝাঁকিয়ে বলল, ‘বেশ, তাই হবে, কেইন।’

‘বাইরে চল,’ ইশারায় দরজাটা দেখাল কেইন। ‘আমরা এবার একটু হাওয়া খেতে যাব। রায়ান, আমাদের ঘোড়া দুটো নিয়ে এসো।’

উঠনে বেরিয়ে এল ওরা। স্লেডকে উন্মাদ বলে গাল পাড়ছে পিয়ারসন। কেইন বাদ সাধল না ওর কথায়, অস্ত্রোন্মুখ সূর্যের দিকে পিঠ ফিরিয়ে অপেক্ষা করতে লাগল। রায়ান ঘোড়া নিয়ে এলে স্যাডলে চাপল ও, তারপর বলল, ‘গুলি বের করে নিয়ে শটগানটা রেখে যাও এখানে। স্লেড, তুমি তোমাদের ঘোড়াগুলো ছেড়ে দাও। আমি চাই না, তোমরা কেউ তাড়া কর আমাদের।’

নীরবে হুকুম তামিল করল স্লেড, শূন্যে একটা গুলি ছুঁড়ে ঘোড়াগুলোকে ছত্রভঙ্গ করে দিল কেইন, তাড়া দিয়ে ভাগিয়ে দিল পশ্চিমে সিকি মাইল দূরের একটা পাহাড়ের দিকে। ইতিমধ্যে রায়ান চেপে বসেছিল নিজের স্যাডলে, এবার ও আর কেইন ছয় হোমস্টেডারকে হাঁটিয়ে নিয়ে চলল পুর্বের ক্যানিয়নের উদ্দেশে।

‘ঘোড়াগুলো উদ্ধার করতে সারা রাত লেগে যাবে আমাদের,’ অভিযোগের

সুরে বলল একজন।

‘আমি কোন আপস করিনি,’ খেঁকিয়ে উঠল লুড। ‘জোয়ের খুনের বদলা আমি নেবই।’

‘শহরে গেলেই পাবে আমাকে।’ ঝট করে কেইন ওর পকেট ঘড়িটা দেখল একবার। ‘ছয়টা বাজে, স্লেড। এখন থেকে আটচল্লিশ ঘণ্টা হিসেব করবে তুমি। শুধু একটা কথা ভুলে যেয়ো না। রেড ম্যানিয়ন হয়তো গরু চুরির ব্যাপারটা প্রমাণ করতে পারবে না। কিন্তু তোমরা যদি বুচারকে হামলা কর, তা হলে আর কোন প্রমাণই লাগবে না ওর।’

খর্বকায় একটা সিডারের ছায়ায় দাঁড়িয়ে গেল স্লেড, মাথা উঁচু করে আছে, তিক্ত চোখে মাপছে কেইনকে। ‘আমি কেবল একটা কথা জানি কেইন। আমার হয়ে লড়াই করার জন্য আমি কখনও কোন বন্দুকবাজ ভাড়া করব না। এটুকু সংসাহস আমার আছে।’

‘দুনিয়াতে নানা জাতের পিস্তলবাজ আছে,’ কেইন বলল। ‘আমি লুড পিয়ারসন না। ওকে একটু চাপ দাও, হয়তো লরি সম্পর্কে সাংঘাতিক সব তথ্য জানতে পাবে।’

‘আমি জানি কে আমাদের বন্ধু,’ গম্ভীর সুরে বলল স্লেড। ‘আটচল্লিশ ঘণ্টা সময় দিলাম তোমাকে। তবে পায়তারা কর না, করলে তার ফল ভাল হবে না।’

ঘোড়া ঘুরিয়ে নিল কেইন, ক্যানিয়নের পূর্ব দেয়ালের চড়াইয়ে উঠল। রায়ান ওর পাশে রয়েছে। যখন মাথায় পৌছাল ওরা, পেছন ফিরে তাকাল কেইন। দেখল, স্লেড সদলবলে হস্তদন্ত হয়ে বেরিয়ে যাচ্ছে ক্যানিয়ন থেকে। এগিয়ে চলল কেইন, জ্যাকি আর তার বাবা টমাস হার্ডের কথা ভাবছে। অদ্ভুত এক আনন্দে ছেয়ে আছে ওর মন, এবং এর পাশাপাশি জন্ম নিয়েছে আরেক নতুন উদ্বেগ। আসল কাজ শুরু হয়নি এখনও। আটচল্লিশ ঘণ্টা হয়তো পর্যাপ্ত সময় না—অথচ এর বেশি ঠেকিয়ে রাখা যাবে না ইরা স্লেডকে।

সাত

উত্তরে ডেভিল রিভার অভিমুখে যে-শৈলশিরাটা এগিয়েছে সেটা ধরে সঙ্কো নাগাদ ডগড্যাঙ্গ আর ইউট্যাহর মাঝে সংযোগ রক্ষাকারী স্টেজ রাস্তায় পৌছাল ওরা। পশ্চিমে, লা সাল পর্বতমালার পেছনে ডুবে গেছে সূর্য, আসন্ন রাত্রির থাবায় দিনের শেষ লাল আলোকরশ্মিটুকু মুছে যাচ্ছে দ্রুত।

কোনরকম কারণ ছাড়াই আচমকা প্যাডি রায়ান মন্তব্য করল, ‘একটা কথা কী জান, কেইন। হার্ডের ছেলেমেয়ে দুটোকে কিন্তু আমার ভাল লাগে। বব ছেলেটা বেশ কাজের, ইচ্ছে করলেই কেউ ওকে নাকে দড়ি দিয়ে ঘোরাতে পারবে না। আর জ্যাকির মত মেয়ে তো এ-যুগে পাওয়া কঠিন। ওকে বউ হিসেবে পেলে যেকোন পুরুষ সুখী হবে।’

আড়চোখে রায়ানের দিকে তাকাল কেইন, আধো-অন্ধকারে বোঝা যাচ্ছে না ওর চেহারা। বলল, 'ভগিতা রাখ।'

'না, তখন স্লেড যে প্রশ্নটা করল তার উত্তরই খুঁজছি আমি। আচ্ছা, সত্যি করে বল তো, কার হয়ে কাজ করছ তুমি?'

'এর সাথে হার্ভেদের কী সম্পর্ক?'

'অনেক কিছুই হতে পারে। তোমার পক্ষে স্বাভাবিক ছিল স্লেডকে নিকেশ করে সোজা শহরে ফিরে আসা। তা না করে তুমি উল্টো আচ্ছা ঝামেলায় জড়িয়েছ নিজেকে। তোমার হাবভাব দেখে মনে হয় না তুমি বুচারের লোক।'

'ধর তা নই, তাতে কী হলো?'

'তা হলে কার পক্ষে আছ? ন্যায়-অন্যায় বিচার করা তোমার নীতি না, কোন পিস্তলবাজই তা করে না।'

'আমার রীতিনীতি সম্পর্কে তুমি কিছুই জান না,' কেইন বলল বিরক্তির সুরে। 'একটা কাজ আমি সবসময়ই করি, কারও নুন খেলে তার মর্যাদা রাখি।'

'মানলাম।' ফোঁস করে একটা দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল রায়ান। 'তবে কাল রাতে গ্যারিটির সাথে দেখা হয়েছিল আমার। মাতাল ছিল। ওর কথাবার্তা থেকে মনে হলো ও সন্দেহ করছে বব আর জ্যাকি নিয়োগ করেছে তোমাকে। তারপর আজ স্লেডকে তুমি যে-কথা বললে, তাতে মনে হয় গ্যারিটির ধারণাই ঠিক।'

খানিকক্ষণ নিরুত্তর রইল কেইন। প্যাডি রায়ানকে আপাতদৃষ্টিতে যা মনে হয় আসলে সে বুচারের ততটা গোলাম নয়। যেকোন মুক্তবুদ্ধি মানুষের যা হবে, স্পষ্টতই ওর সহানুভূতি হোমস্টেডারদের দিকে। তবে এই সমস্যায় প্রচুর জটিল প্যাচ রয়েছে, যার সবগুলো এখনও ছাড়াতে পারেনি কেইন। এ-অবস্থায় একমাত্র জ্যাকুলিন হার্ভেকে ছাড়া অন্য কারোকে বিশ্বাস করা উচিত হবে না ওর।

'তুমি তোমার সন্দেহ নিয়েই থাক,' অবশেষে বলল ও। 'আরেকটা কথা বোধহয় তখন বলা হয়নি, আমাকে উদ্ধার করার জন্য ধন্যবাদ।'

এরপর কিছুক্ষণ আর কথা হলো না ওদের মধ্যে। অন্ধকার জাঁকিয়ে বসেছে, পুবে স্যান হুয়ানের মাথায় বিজলি চমকাচ্ছে ঘন-ঘন, আকাশ ছেয়ে গেছে মেঘে, বাতাসে বৃষ্টির গন্ধ। খানিক বাদে ডগড্যাঙ্গের বাতি দেখতে পেল ওরা এবং আধঘণ্টার মধ্যে পৌঁছে গেল শহরে। কেইন লিভারি স্ট্যাবলের সামনের রাশ টানল।

'আমি আমার ঘোড়া বাসায় রাখি,' রায়ান বলল। 'সকালে দেখা হচ্ছে?'

'বাইরে কাজ আছে আমার।'

'আচ্ছা,' বলে নিজের বাসার উদ্দেশে চলে গেল ব্যাংকার।

মৃত্যুপুরীর মত নীরব শহর। এর হয়তো বিশেষ কোন তাৎপর্য নেই, কারণ সপ্তাহ শেষ হতে কদিন বাকি আছে আরও। ডগড্যাঙ্গ অধিকাংশ মফস্বল শহরের মত হলে, একমাত্র শনিবার রাতে জমজমাট হয়ে উঠবে এখানকার জীবন। হয়তো এ-নিরবতা খুবই স্বাভাবিক ছিল, তবু দীর্ঘকাল যাবৎ বিপদের সঙ্গে ঘর করার ফলে বিপদ টের পাওয়ার যে-সহজাত ক্ষমতা গড়ে উঠেছে কেইনের তা

এখন ওকে হুঁশিয়ারি জানাল।

আস্তাবলে ঘোড়া রেখে অসল্যারকে পাওনা মিটিয়ে দিল কেইন, দরজায়-ঝোলানো লণ্ঠনের আলো এড়িয়ে বাইরে পা রাখল, সতর্ক দৃষ্টিতে রাস্তা জরিপ করছে। এই পেশায় একটা শিক্ষা হয়েছে ওর: সময়ে বাড়িতে সাবধানতা অবলম্বনে লোকসানের কিছু নেই, বরং বেঁচে থাকা অনেক সহজ হয়।

হোটেল, চীনা রেস্টোরাঁ আর তিন স্যালুনে বাতি জ্বলছে। ওইসব বাতি আর আস্তাবলের লণ্ঠন রাস্তার এখানে-সেখানে লাল ধুলোর ওপর হলুদ রঙ ঢেলে দিয়েছে। এমন কোন আলামত এখনও দেখতে পাচ্ছে না ও যা থেকে বুঝতে পারে কাছেপিঠেই ওত পেতে রয়েছে বিপদ-তবু সন্দেহের একটা কাঁটা খচখচ করতে লাগল কেইনের মনে।

কোথাও সন্দেহজনক কোনকিছু না থাকা সত্ত্বেও কেন মাঝে মাঝে বিপদের আশঙ্কা জেগে ওঠে মনে কেইন জানে না, তবে একথা সত্যি এই অনুভূতি বহুবার ওর প্রাণ বাঁচিয়েছে। কেউ কেউ হয়তো বলবে এটা নিছক কুসংস্কার, সুতরাং পরিত্যাজ্য; কিন্তু মাইকেল কেইনের কাছে এর মূল্য অপরিসীম।

রাস্তার ওপাশে কয়েক জায়গায় বোপঝাড় রয়েছে, আলোর ভেতরে জমাটবাধা অন্ধকার। ওখানে কেউ ওত পেতে থাকলে সে নিশ্চয় দেখতে পেয়েছে ওকে শহরে ঢুকতে, জানে রায়ান বাড়ি চলে গেছে এবং সেও শিগগিরই ফিরে যাবে তার হোটেলে। যে-মুহূর্তে ও হোটেল লবিতে পা রাখবে ভেতরের আলোয় স্পষ্ট রেখায়িত হয়ে উঠবে ওর অবয়ব, দক্ষ মার্কসম্যানের সহজ নিশানায় পরিণত হবে সে।

অপেক্ষা করতে লাগল কেইন, সময় বয়ে চলার সাথে-সাথে প্রতি মুহূর্তে বাড়ছে ওর উত্তেজনা। তারপর উপলব্ধি করল সে জ্যাকি আর ববের লোক, গ্যারিটি তার এই সন্দেহের কথা রায়ানকে বলার ফলেই ওর স্নায়ুর চাপ বেড়ে গেছে। রায়ানকে যখন বলছে তখন বুচারকেও নিশ্চয় একথা জানিয়েছে গ্যারিটি। সেক্ষেত্রে বুচার পাল্টা ব্যবস্থা নেবে তা বলাই বাহুল্য। কিংবা হয়তো গ্যারিটিই অনেক চিন্তাভাবনার পর সিদ্ধান্ত নিয়েছে কেবিনকে খতম করার। তা ছাড়া আরও একজন রয়েছে-রাফেলা-যার চরিত্র এখনও হেঁয়ালিপূর্ণ রয়ে গেছে ওর কাছে।

পাঁচ না ত্রিশ মিনিট কতক্ষণ অপেক্ষা করেছে ঠিক জানে না কেইন। কারণ এইসব সময়ে প্রতিটা মুহূর্তই যেন একেকটা ঘণ্টা হয়ে ওঠে। ও ধৈর্যশীল মানুষ নয়। কেউ যদি সত্যি সত্যি ওত পেতে থাকে ওর জন্য, সম্ভবত তার ধৈর্য ওর চেয়ে বেশি হবে। পিস্তল বের করে এগোল কেইন, একটা অন্ধকারাচ্ছন্ন বন্ধ দোকান ঘরের সামনে দিয়ে হাঁটছে। যদি আদপেই কোন অ্যামবুশকারী থেকে থাকে এর ফলে বেরিয়ে আসতে বাধ্য হবে সে, আর যদি সবটাই ওর উর্বর মস্তিষ্কের কল্পনা হয়, এই অবসরে সেটাও জানা হয়ে যাবে।

সামনেই হোটেল, দুই জানালা আর খোলা দরজা দিয়ে লবির আলো বাইরে এসে পড়েছে। প্রথম জানালার কিনারে এসে একমুহূর্ত অপেক্ষা করল কেইন, উবু হয়ে দ্বিতীয়টার কাছে পৌঁছাল। ঠিক তখনই সরাসরি রাস্তার উল্টো দিক

থেকে ছুটে এল বুলেট, কেইনের জামার একটা বোতাম খসিয়ে নিয়ে জানালার কাচ ভেঙে ভেতরে ঢুকে গেল।

চকিতে উপড় হয়ে শুয়ে পড়ল কেইন, তিনটা গুলি ছুঁড়ল পরপর, প্রতিবারে দুফুট করে সরে গেল নিশানা যাতে আমবুশকারী যেখানে আছে তার পুরো অংশটাই গোলাগুলির আওতায় পড়ে। পিস্তল বাগিয়ে অপেক্ষা করতে লাগল ও, কিন্তু আর কোন গুলি হলো না। যেভাবে সটান পড়ে গিয়েছিল কেইন তাতে খুনী হয়তো ভেবেছে ও মারা গেছে; কিংবা প্রথমবার লক্ষ্যভ্রষ্ট হওয়ায় ভয় পেয়ে চম্পট দিয়েছে।

ঝাড়া এক মিনিট পর একজন লোক উকি দিল রাস্তায়, তারপর দলে-দলে বেরিয়ে এল সবকটা স্যালুন থেকে। কিন্তু কেইন আর অপেক্ষা করল না। পিস্তলটা হোলস্টারে ভরে একছুটে লবিতে প্রবেশ করল সে, সম্ভ্রান্ত কেরানির প্রশ্রুবাণ উপেক্ষা করে সিঁড়ি বেয়ে দৌড়ে উঠে গেল দোতলায়।

রাফেলার দরজার তলা দিয়ে বাতি দেখা যাচ্ছিল। কপাটের ওপর জোরে জোরে আঘাত করল, শুনতে পেল হাইলি জুতো পরে এক মহিলা এগিয়ে আসছে। দরজা খুলে সম্ভ্রান্ত দৃষ্টিতে ওর দিকে তাকাল রাফেলা। ওর ঘাড়ের ওপর দিয়ে ভেতরে নজর বোলাল কেইন, জানালার কাছে গ্যারিটিকে বসে থাকতে দেখে বুঝতে পারল, রাফেলা বা গ্যারিটি এদের কেউই গুলি করেনি ওকে। যেখান থেকে গুলি হয়েছে ওদের কারও পক্ষেই সেখান থেকে দৌড়ে পেছনের রাস্তা দিয়ে হোটেল ফিরে আসা সম্ভবপর নয়।

‘তাজ্জব ব্যাপার,’ রাফেলা বলল। ‘ভেতরে এসো।’
‘সময় নেই,’ জবাব দিল কেইন। ‘আমি অন্য একটা কাজে ব্যস্ত আছি।’
যুরে চলে আসছিল ও, কিন্তু গ্যারিটির ডাক শুনে থেমে গেল। ‘দাঁড়াও,’ বলে দরজার কাছে এগিয়ে এল জুয়াড়ি। ‘কী ব্যাপার, গুলির আওয়াজ শুনলাম?’
‘আমাকে মারতে চেয়েছিল কেউ একজন। পারেনি।’
‘বুঝেছি,’ গ্যারিটি বলল। ‘তুমি ভেবেছিলে কাজটা রাফেলার।’
‘অথবা তোমার।’

‘আশ্চর্য, মিস্টার কেইন,’ আহত হওয়ার ভান করল রাফেলা। ‘আমি কোন পুরুষকে মারতে বন্দুক ব্যবহার করি না; তার কোন দরকার হয় না।’
মুচকি হাসল কেইন। জবাব দেয়ার জন্য মুখ খুলতে যাচ্ছে এই সময়ে ওর হাত খামচে ধরল রাফেলা। ‘শ্লেডের দেখা পেয়েছিলে?’

‘হ্যাঁ।’
‘বেঁচে আছে এখনও?’ জানতে চাইল গ্যারিটি।
‘আছে।’

বিড়বিড় করে গাল বকল গ্যারিটি। ‘তা হলে আমার ধারণাই ঠিক। একথা শোনার পর বুচার কী করবে জান?’

‘কিছুই না। ও আমাকে বাড়াবাড়ি করতে নিষেধ করেছিল। আমি করিনি বাড়াবাড়ি।’

ফের চলে আসার উদ্বোধন করল কেইন, এবার রাফেলা বা গ্যারিটি

দুজনের কেউই আর আটকাল না ওকে। সিঁড়ি হয়ে নীচতলায় নামার সময় কেইন লক্ষ করল তখনও দরজায় দাঁড়িয়ে আছে রাফেলা, হতচকিত দৃষ্টিতে মাপছে ওকে। গ্যারিটি যদি ওকে ওর সন্দেহের কথা নাও বলে থাকে এবার বলবে, ভাবল কেইন, এবং সকালে বুচারের কানে উঠবে সেটা।

জনাবার লোক লবিতে অপেক্ষা করছিল কেইনের জন্য। ও নেমে আসতে ব্যাজ-পর্যায়, মোটাসোটা গড়নের টাকমাথা এক লোক হেঁড়ে পলায় জানতে চাইল, 'কী ব্যাপার, এত গোলাগুলি হলো কেন?'

'তুমি কে?'

'জিম কেলসি। পাশের মার্কেটাইল স্টোরটা আমার। তা ছাড়া আমি এখানকার মার্শাল। আমি চাই না আমার শহরে কোন পিস্তলবাজ ঘুরঘুর করুক।'

'করলে কী করবে তুমি?'

'হয়তো এখন কিছু করব না,' মার্শাল বলল, 'তবে তুমি বে-লাইনে চললে অবশ্যই বাধা দেব।'

'আমি বে-লাইনে চলিনি। রাস্তার ওপাশ থেকে অ্যামবুশ করা হয়েছিল আমাকে।'

'তুমি তাকে মেরেছ?'

'না।' কেইন তার পিস্তল বের করে খালি টোটাগুলো ফেলে দিয়ে গুলি ভরল আবার। 'তুমি আসতে কিন্তু অনেক দেরি করেছে, মার্শাল।'

'রাস্তার মারামারিতে জড়িয়ে পড়ার জন্য বেতন দেয়া হয় না আমাকে,' আপনমনে বিড়বিড় করল কেলসি। 'তুমি এক কাজ কর। কাল সকালে স্টেজ ছাড়ছে। উঠে পড় তাতে।'

কেইন তার হাতের পিস্তলটার দিকে তাকাল, তারপর মার্শালের পেছনে-দাঁড়ানো শহরবাসীদের ওপর নিবদ্ধ হলো ওর দৃষ্টি। ওরাও নিশ্চয় জিম কেলসির বক্তব্যকে সমর্থন করছে। মেসায় যে-গোলমাল দানা বেঁধে উঠছে সেটা মোটেও পছন্দ করছে না ওরা। সকলেই জানে এ-লড়াইতে কন্সাইন জিতলে শেষপর্যন্ত শহরবাসীদেরই লোকসান হবে সবচেয়ে বেশি কেননা তখন বড় বড় আউটফিটগুলো একচেটিয়া কারবার করবে, কিন্তু তবু ওরা ওদের বিরুদ্ধে দাঁড়াবে না। তবে একটা ব্যাপার স্পষ্ট হয়ে গেছে কেইনের কাছে, ওর উপস্থিতি ডগড্যান্সের সাধারণ মানুষ সুনজরে দেখছে না, এবং শ্লেড আর তার দলবল ওদের সবার প্রিয়পাত্র।

মার্শালকে পাশ কাটিয়ে এগোল কেইন, রাস্তা পেরিয়ে চীনা রেস্টোরাঁয় ঢুকে সাপার খেল। যথেষ্ট মুখরোচক খাবার, তবু ওর কাছে বিশ্বাস ঠেকল। আবার যখন হোটেলে ফিরে এল সে তখন কেরানি ছাড়া অন্য সবাই বিদায় নিয়েছে। কেরানি ভাবলেশহীন মুখে তাকাল ওর পানে। চাবি নিয়ে দোতলায় উঠে এল কেইন। দেখল রাফেলার ঘরের বাতি নিভে গেছে। ও আন্দাজ করতে চেষ্টা করল ব্ল্যাক গ্যারিটি আর ওই মহিলার মধ্যে সম্পর্কটা কোন ধরনের।

নিজের কামরায় ঢুকে দরজায় তালা লাগিয়ে দিল কেইন। বাড়তি

সাবধানতা হিসেবে চেয়ারটা আটকে দিল নবের গোড়ায়। জানালায় পর্দা না থাকায় বাতি জ্বালল না ও। যে-লোক ওকে খুন করার পায়তারা করেছিল আবার সে একটা চেষ্টা নেবে না একথা বলা যায় না হলফ করে। সোজা বিছানায় চলে গেল কেইন, বালিশের নীচে পিস্তল রেখে শুয়ে পড়ল টানটান হয়ে, এবং তখনই উপলব্ধি করল সে ভীষণ ক্লান্ত।

এই অবসাদ যতটা না দেহের তার চেয়ে বেশি মনের। দিন নেই রাত নেই, সারাক্ষণ সতর্ক থাকতে থাকতে ক্লান্ত হয়ে পড়েছে সে, ওর চারপাশে যেসব হীনবল লোক ভিড় করে আছে, যেমন এই শহরের মানুষেরা, তাদের ওর সহ্য হচ্ছে না। উগড্যান্সের গোলমাল আপাতদৃষ্টিতে অন্যসব গোলমালের মত মনে হলেও ওগুলোর সাথে একটা পার্থক্য আছে এর, কিন্তু সেই পার্থক্য কোথায় বহু চিন্তা করেও বুঝে উঠতে পারছে না বলে নিজের ওপর রাগ হচ্ছে কেইনের। বব হার্ভের কাজের প্রস্তাব গ্রহণ করায় এখন অনুতাপ হলো ওর। যা ভেবেছিল, সোজা পথে চলবে, ঠিক সেটাই করা উচিত ছিল তার। এই দেশ ছেড়ে অন্য কোথাও গিয়ে অন্য কোন নামে বসবাস করা উচিত ছিল। তারপর অনুতাপবোধটা কেটে গেল। অন্ধকারে, নিশ্চিন্ততার ভেতর শুয়ে, সত্যকে স্বীকার করে নিল কেইন।

শ্রেষ্ট সোজা পথে চললেই অতীতের সমস্ত গ্লানিকে মুছে ফেলতে পারবে না সে। এজন্য তাকে বিচারকের আসনে বসতে হবে: ন্যায়-বিচার সম্পর্কে জ্যাকুলিন হার্ভে যে-কথাগুলো বলেছে ভাবতে হবে সেসব সম্পর্কে। জীবনের যে-লক্ষ্য ছিল ওর তা বদলে ফেলতে হবে সম্পূর্ণ; অতীতে সে যা-যা করেছে সেগুলোকে পরিবর্তন করতে হবে; এমন কিছু করতে হবে যাতে অতীতের ভুলের সংশোধন হয়।

পরিবর্তনের জন্য যে সব গুণাবলী দরকার তার সবই ওর আছে; তবে যেমনটি ভেবেছিল, সমস্ত দায়দায়িত্ব এড়িয়ে যদি সেভাবে চলত কখনোই তার অতীতকে মুছে ফেলতে পারত না সে। পরিবর্তনের লক্ষ্যে নিজের মনকে বাঁধার জন্য ডেনভারের আলস্যভরা একটা সপ্তাহ বব আর জ্যাকুলিনের সাথে ওর কথা বলার প্রয়োজন ছিল। জ্যাকি যা চায় তা সম্পন্ন করার সূতীব্র আকাঙ্ক্ষাই এখন অন্য সবকিছু ছাপিয়ে বড় হয়ে উঠল ওর কাছে। আগের মাইকেল কেইনের জীবনে একধরনের অপরাধবোধ ছিল, কিন্তু এবার থেকে যা-কিছু ঘটবে তার জন্য সে আর কোন গ্লানিবোধ করবে না।

যেকোন সত্যিকার পরিবর্তন মাত্রাই মনের বিপ্লব। কেইন বোঝে এটা। কেবল নিজের সম্পর্কে নিশ্চিত নয় ও। জলজ্যান্ত এক অতীত রয়েছে ওর যা সে কোনদিন বদলাতে পারবে না। তখন অস্থিরতা ছিল না কারণ ও যা করছিল তার ন্যায্যতার ব্যাপারে কোনরকম সংশয় ছিল না ওর মনে। জীবনের অতীত নামক খাতাটা মুছে ফেলা অসম্ভব, কিন্তু ভবিষ্যৎ নামে আরও একটা খাতা রয়েছে। ওই খাতায় কতগুলো পাতা আছে ও জানে না, জানে না কতগুলো শূন্য পৃষ্ঠা উন্মোচিত হবে ওকে-হয়তো এক, হয়তো বহু। হয়তো আগামীকালই মারা যাবে সে, কিংবা বেঁচে থাকবে আরও পঞ্চাশ বছর। তবে সেটা গুরুত্বপূর্ণ নয়;

ওরুত্বপূর্ণ হচ্ছে জ্যাকুলিন হার্ভে যা চায় সে ধরনের কাজ করার যোগ্যতা ওর আছে কিনা।

অনেকক্ষণ একভাবে বিছানায় শুয়ে রইল কেইন, ভাবল জ্যাকুলিনের কথা, কল্পনায় ওর সুঠাম-সুন্দর দেহখানা ফুটিয়ে তুলল। ধীরে ধীরে সমস্ত উত্তেজনা, মায়ুর চাপ ধুয়ে-মুছে গেল ওর ভেতর থেকে। বব আর জ্যাকির সাথে উগড্যান্সের অন্য মানুষদের পার্থক্যের কথা ভাবল ও; ওদের মাঝে জীবনযাত্রার মানে, রুচিবোধে, আর ন্যায়-অন্যায়ের ধারণা সম্পর্কে যেসব ফারাক রয়েছে সেগুলো নিয়ে ভাবল। পুরো ব্যাপারটাই পর্বতচূড়ার সাথে উষর মরুভূমির তুলনা করার মত। জ্যাকুলিনের ভেতর মেকি কিছু নেই, ফলে আর কারও মাঝে মিথ্যাচার থাকলে সেটা ও ধরে ফেলতে পারবে। মন থেকে ওর জীবনধারা গ্রহণ না করা অবধি কেইন কোনদিনই জ্যাকুলিনের মন জয় করতে পারবে না। এমনকী গ্রহণ করাতেই শেষ হয়ে যাবে না সব। জ্যাকুলিনকে তা বিশ্বাসও করাতে হবে।

তারপর তন্দ্রার মাঝে, সহসা আরেকটা নতুন চিন্তা জেগে উঠতে বাস্তবে ফিরে এল কেইন। আজ রাতে যে-লোক খুন করার চেষ্টা করেছিল ওকে সম্ভবত সে প্যাডি রায়ান। ওই বৃদ্ধ মানুষটি ওর প্রাণ বাঁচিয়েছে, ও জানে; বস্ত্রত রায়ানকে পছন্দ হয়েছে তার, বিশ্বাস করতে ইচ্ছে হয়েছে; এমনকী আবেগেরবশে ডিলন মেসায় ও কেন এসেছে তা প্রায় ফাঁস করে দিয়েছে ওর কাছে। তবু দীর্ঘ অভিজ্ঞতা থেকে কেইন জানে, যে-লোকটিকে সবচেয়ে বিশ্বাস করা যায়, অনেক-সময় দেখা যায় সুযোগ পেলে সে-ই হয়তো পিঠে ছুরি বসানো। ইরা শ্বেডের বাথানে কোন মতলবে গিয়েছিল রায়ান সে ব্যাপারে কিছুই জানে না ও। শেষপর্যন্ত বহু চিন্তাভাবনার পর, ঘুমাতে যাবার আগে একটা রুঢ় সত্য মেনে নিল কেইন: আপাতত প্যাডি রায়ান একটা হেয়ালিই রয়ে যাচ্ছে ওর কাছে।

অট

আগের দিন ভিভারি স্ট্যাবলের যে-বোড়াটা ভাড়া করেছিল সেই বোড়াটা নিয়েই পরদিন ভোরে কেইন শহর ছাড়ল। আকাশ এখনও মেঘলা, অন্ধকার আর্দ্র পৃথিবীতে আলো ফুটতে সময় নিচ্ছে। মাঝরাতের পরপর স্বপ্নমিমে বৃষ্টি হয়েছে কিছুক্ষণ, ফলে বাতাস ভারি হয়ে আছে ভেজা ঘাস আর সিভারের গন্ধে। পূবাকাশে বিজলি চমকচ্ছে থেকে-থেকে, মেঘ গর্জন করছে। এধরনের স্নাতস্নাতে ফ্যাকাসে দিন কেইনের একটুও পছন্দ না, ও কামনা করছে মেঘ সরে গিয়ে রোদ হেসে উঠুক যেন সে সূর্য দেখতে পায়।

শহর ছাড়ার ঘন্টাখানেক পর কেইন একটা বাথান পেরিয়ে এল। বেশ বড়সড় আউটারফিট, মোটা গাছের গুঁড়ি কেটে বানানো র‍্যাক হাউস আর ছড়ানো-

ছিটানো কিছু দালানকোঠা, কোরাল আর বার্ন রয়েছে। বাসার সামনে একসারি কটনউডের চারাগাছ। কেইন জানে এটা বিল বুচারের সি.সি. রেঞ্জ।

একধরনের স্থায়িত্বের আভাস রয়েছে যেন এখানকার সবকিছুতে। বাথানটা দেখে বুচারের স্বভাব-চরিত্র আঁচ করতে পারল ও। ব্যর্থতার চিন্তাকে ঘুণাক্ষরেও প্রশ্রয় দেয় না বুচার। তাই মজবুত করে বাড়ি বানিয়েছে, নিজের ও ভাবী বংশধরদের জন্য। যখন ওই কটনউডের চারাগুলো লাগায়, বুচার নিশ্চয় কল্পনায় দেখেছে কালে মহীকুহে পরিণত হবে ওগুলো, আর ওদের ছায়ায় বসে সে দেখবে তার নাতিপুত্ররা কেমন চালাচ্ছে তার হাতে-গড়া বহু লোকের রক্তরঞ্জিত বাথান। বিল বুচার ক্ষুদ্র মানুষ, সুতরাং তুলনামূলকভাবে তার স্বপ্ন বিরাট হবে বৈকি!

বুচারের সঙ্গে দেখা করা কেইনের এখন মোটেও ইচ্ছে না। বেশকিছু প্রশ্নের জবাব চাই ওর, তাই জ্যাকুলিন হার্ভের সাথে আলাপ করতে চায় আগে। স্টেজে চেপে যখন আসছিল স্থানীয় রাজনীতি সম্পর্কে কিছুই জানত না সে যে কোনরকম প্রশ্ন করবে, এমনকী জ্যাকি যদি এখানকার পরিস্থিতির পূর্ণাঙ্গ একটা চিত্র ওর সামনে তুলে ধরতও তবু সে বুঝতে পারত না তা। জ্যাকি বুঝতে পেরেছিল এটা, তাই বিশদভাবে কিছু বলার চেষ্টা করেনি।

সি.সি. রেঞ্জ ছাড়িয়ে মাইলটাক যাওয়ার পর এক জায়গায় দু-ভাগ হয়ে গেল রাস্তাটা। কেইন জানে, জ্যাকির বর্ণনা অনুযায়ী, দক্ষিণের রাস্তাটা চলে গেছে ম্যানিয়নের ম্যালেট ফোর আর লরির শ্র্যাশ ট্রায়াঙ্গেলের দিকে। ও পুর্বের পথেই রইল, এখন স্যান ছয়ানের চড়াই বেয়ে ক্রমশ উঠে যাচ্ছে ওপরে।

এবার বাকী নাক অ্যাবনার লরির কথা ভাবতে লাগল কেইন, ইরা শ্বেড যাকে ডিলন মেসায় তাদের একমাত্র বন্ধু বলে উল্লেখ করেছে। এ-দাবি ঠিক না, কেইন নিশ্চিত। যে-লোক তার নিজের দলের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করে সে কারও বন্ধু হতে পারে না। শ্বেডের এখন মরিয়্যা অবস্থা, তাই লরির মতলব সম্পর্কে কোনরকম প্রশ্ন তুলবে না। ভেসে থাকার জন্য ও এখন খড়কুটো পর্যন্ত আঁকড়ে ধরতে চাইবে।

কেইন যখন টমাস হার্ভের বো অ্যান্ড অ্যারো র‍্যাঞ্জে উপস্থিত হলো তখন বেলা অনেকটা গড়িয়ে গেছে। বুচারের বাথানের সাথে এর পার্থক্য দেখে ও চমকে উঠল। ছোটখাট কাঠের বাড়ি একটা, বড়জোর খানচারেক কামরা রয়েছে। একপ্রান্তে পাথরের বিরাট একটা ফায়ারপ্লেস, সামনের বারান্দায় দুটো জরাজীর্ণ র-হাউডের চেয়ার পাতা। উত্তরে বার্ন; গুটিকতক পোল কোরাল আর তার ওপাশে কিছু চালাঘর। বাড়ির পেছনে, পাহাড়ের অ্যাসপেন-ছাওয়া খাড়া ঢালে ছোট্ট ঝরনা, সগর্জনে মেসার ওপর পতিত হয়ে কিছুটা ধীরগতিতে বয়ে চলেছে ডেভিল রিভারের দিকে।

বো অ্যান্ড অ্যারোর মত র‍্যাঞ্জ এর আগেও বহু দেখেছে কেইন; তবে বুচারের সি.সি.র সাথে এর পার্থক্য ওকে বিস্মিত করেছে। মানুষ যখন প্রথম কোথাও এসে বসতি করে তখন শুরুতে তার ঘরদোরে যেসব বৈশিষ্ট্য থাকে, সন্তানদের মালমশলা, নির্মাণে তাড়াহড়োর ছাপ, তার সবই হার্ভের বাথানে

বিদ্যমান। জ্যাকুলিন বলেছিল ওর বাবাই ডিলন মেসায় সর্বপ্রথম এসেছে, অথচ এরপর বহু বছর কেটে যাওয়া সত্ত্বেও মনে হয় না বাড়িঘরের কোন সংস্কার হয়েছে।

এই একটা বাথান থেকেই পরিষ্কার বোঝা যায় টমাস হার্ভের চরিত্র, কেইন ভাবল। জীবনে কোনরকম সাফল্যই অর্জন করতে পারেনি লোকটা; কেবল মাটি কামড়ে পড়ে আছে। প্রথম যখন আসে এখানে তখনও হয়তো বুচারের অবস্থা ভাল ছিল; তবে তা থাকুক চাই না থাকুক, সে নিজের সাম্রাজ্য বাড়িয়েছে, টাকা বানিয়েছে। সি.সি. রোজে আছে স্থায়িত্বের আভাস; বো অ্যান্ড অ্যারোর সবকিছু ক্ষণস্থায়ী, যেন প্রতিমূহূর্তে টমাস হার্ভে নিজেকেই অর্থাৎ নিজেকে ব্যবসায়ে টিকে থাকতে দেখে।

চিমনি থেকে ধোঁয়া উঠছে, জীবনের চিহ্ন বলতে এখানে এটুকুই? মাটিতে নেমে ঘোড়া বাঁধতে বাঁধতে কেইন ভাবল জ্যাকুলিন সম্ভবত বাসাতেই আছে। তবে ওর ধারণা ঠিক কিনা তা জানার আগেই ও দেখতে পেল বার্ন থেকে বেরিয়ে আসছে টমাস হার্ভে, হাতে একটা লাগাম। একটুক্ষণ পরস্পরের দিকে তাকিয়ে রইল ওরা, অচেনা লোক দেখামাত্র অনেকের যা হয়, হার্ভের চোখে তেমনি সন্দেহ। জ্যাকুলিনের সঙ্গে দেখা করতে চাইছিল কেইন, পরক্ষণে ভাবল হার্ভের সাথে তার আগে কথা বলা উচিত হবে?

‘হাউডি,’ বলে হার্ভের দিকে হেঁটে গেল কেইন। হার্ভের পাঁচ ফুটের মধ্যে এসে থামল সে, বো অ্যান্ড অ্যারো মালিককে জরিপ করল। পঞ্চাশের কাছাকাছি হবে বয়স, মোটাসোটা মেদবহুল শরীর, গোলাকার মুখে নীলচে শিরা-উপশিরার জাল, রক্তবর্ণ চোখ দুটিতে বিদ্রোহের ভাব স্পষ্ট। একনজর দেখেই কেইন বুঝল প্যাডি রায়ানের কথাই ঠিক, টমাস হার্ভে লোকটা ‘অকর্মণ্য’।

‘আমি জ্যাকির সাথে দেখা করতে এসেছি,’ কেইন জানাল। ‘স্টেজে আলাপ হয়েছিল আমাদের।’

‘আমি অনুমান করেছিলাম তুমি ওর সঙ্গে দেখা করতে চাইবে,’ হার্ভে বলল, কণ্ঠে প্রচল্ল বিদ্বেষ। ‘এসো।’

ঘুরে বার্নের ভেতর গিয়ে ঢুকল সে। এককোণে লাগামটা ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে ডুসির বস্তার গাদার ওপর বসল। হার্ভের পিছু নিল কেইন, আস্তাবল থেকে ভেসে-আসা নাইট্রোজেনের ঝাঁঝাল গন্ধে নাক কোঁচকাল ও, দেখল ঘোড়ার নাদির পাহাড় জমে উঠেছে ভেতরে। হার্ভে কেবল অকর্মণ্য না, কেইন ভাবল, অলসও বটে।

বার্নের মাঝামাঝি জায়গায় দাঁড়িয়ে হার্ভেকে মাপতে লাগল কেইন, দুজনেই অস্বাভাবিকরকমের নীরব। বানিক বাদে উঠল হার্ভে, পেছনের একটা খড়ের গাদার কাছে গিয়ে হাতড়ে প্রায় খালি একটা হুইস্কির বোতল বেঁধে করল। তারপর কেইনের কাছে ফিরে এসে বোতলটা বাড়িয়ে দিয়ে বলল, ‘খাও।’

এপাশ-ওপাশ মাথা নাড়াল কেইন। ‘না, ধন্যবাদ। আমার কাজের ক্ষতি হয়।’

‘খুনের কাজ,’ ঘৃণায় মুখ বাঁকাল হার্ভে। তারপর একটোকে বোতলটা

সাবাড় করে ছুঁড়ে ফেলে দিল দূরে।

‘সেদিন কিন্তু তুমি শহরে খুনের বিরুদ্ধে কিছু বলনি,’ পালটা আক্রমণ শানাল কেইন।

প্যাণ্টের পকেট থেকে পাইপ আর তামাকের থলে বের করল হার্ভে, চোখ কেইনের ওপর থেকে অন্যদিকে সরে গেছে। ‘বিলের কোন ব্যাপারে আমি নাক গলাই না,’ একটু থামল ও, তারপর নেশার জোরে সাহস সংগর করে ‘যোগ করল, ‘তবে তোমাকে একটা কথা বলব, কেইন। বেশির ভাগ মানুষ ভয় পায় তোমাকে। ছেলেবেলায় মা যেমন আমাকে কোম্যাক্সিদের ভয় দেখিয়ে ঘুম পাড়াত তেমনিভাবে।’

কেইন অনুভব করল ওর মাথায় খুন চেপে যাচ্ছে। হার্ভে লোকটা আপাদমস্তক ভীতু, অথচ সেটা লুকাবার চেষ্টা করছে। ‘তার মানে তুমি বলতে চাইছ তুমি আমাকে ভয় পাও না। এই তো?’

‘পিস্তল ধরতে হলে পাব।’ কাঁপা-কাঁপা হাতে পাইপে তামাক ঠাসল হার্ভে, যতটা ভরল মাটিতে ফেলে নষ্ট করল তার চেয়ে বেশি। ‘কিন্তু তবু আমি চাই না তুমি জ্যাকির আশপাশে ঘুরঘুর কর।’

কেইন সিদ্ধান্ত নিল বো অ্যান্ড অ্যারো মালিককে সে একটা ধাক্কা দেবে। ‘ভাবতেই অবাক লাগে,’ ও বলল, ‘তোমার মত একটা লোকের অমন চমৎকার দুটো সন্তান হলো কী করে?’

ফাটা বেলুনের মত চুপসে গেল হার্ভে। মাথা হেঁট, হাতজোড়া ঝুলে পড়েছে হাঁটুর কাছে। ‘ওদের মাকে দেখলে তুমি একথা বলতে না।’

পানি হয়ে গেল কেইনের সমস্ত রাগ, উপলব্ধি করছে হার্ভে মন থেকে বলেছে কথাগুলো। ওর মাঝে লজ্জার আভাস পেল সে, হার্ভের জন্য ও করুণা অনুভব করল। তারপর ভাবল বুড়োকে সে আসল কথাটা জানাবে। হার্ভে হয়তো ফাঁস করে দেবে, তবে গ্যারিটি যখন এখানে ওর আসার কারণ আন্দাজ করে নিয়েছে তখন এমনিতেও বুচারের কানে উঠবে সেটা।

‘শোন,’ শুরু করল কেইন, ‘আমাকে এখানে এনেছে বুচার না-বব আর জ্যাকি। তোমাকে রক্ষা করতে। ওরা তোমার ভালমন্দের ব্যাপারে কত ভাবে, অথচ তুমি...’ এই পর্যন্ত বলে চুপ করল ও, হার্ভেকে ব্যাপারটা হজম করতে সময় দিল একটু, তারপর ডেনভারে রবার্টের সঙ্গে ওর দেখা হওয়া এবং ডিলন মেসা সম্পর্কে জ্যাকুলিন স্টেজে কী বলেছে ওকে তার সবই একেএকে খুলে বলল সে। হোমস্টেডারদের চারণভূমিতে গিয়ে ওর যা মনে হয়েছে, ওখানে কম্বাইনের জন্য লাভজনক কিছু নেই, তাও জানাল।

কান্দতে শুরু করল হার্ভে, মাতাল মানুষের কান্না নয়, সত্যকে মোকাবেলা করার সাহস হারিয়ে ফেললে লজ্জায় যেভাবে কান্দে একজন, বুড়ো এখন সেইভাবে কান্দছে। ঘুরে দরজার কাছে হেঁটে গেল কেইন। সিগারেট বানাল একটা, দৃষ্টি বাসার পেছনে পাহাড়ের দীর্ঘ খাড়া চড়াইয়ের দিকে। এখানকার সব জায়গায় যেমন আছে, ওখানেও তেমনি ঘাস মিলবে গ্রীষ্মকালে। বৃদ্ধি থাকলে, বুচার যেমন করেছে হার্ভেও তেমনি ব্যবসায়ে উন্নতি করতে পারত।

‘এদিকে এসো,’ জামার আঙ্গিনে চোখ মুছে হার্ভে ডাকল ওকে।

কেইন ঘুরে ওর মুখোমুখি হলো। ‘আমাকে কিছু বলবে?’

‘এখানে তোমার আসার কারণ জানতে পেলো বুচার তোমাকে খুন করবে।’

‘সেটা আমার মাথাব্যথা।’

পকেট থেকে আরেকটা ম্যাচের কাঠি বের করে নিভে-যাওয়া পাইপটা ধরাল হার্ভে। জোরে-জোরে বার কয়েক পাইপ টানল ও, যেন তামাকের কাছ থেকে সাহস ধার করতে চাইছে। তারপর বলল, ‘আমি এখানে এসেছি স্যান লুই ভ্যালি থেকে। বুচারও। ওখানে আমাদের দুজনের অবস্থা মোটামুটি সচ্ছল ছিল। বাধ্য হয়ে স্যান লুই ছাড়তে হয়েছিল আমাকে। রাগের মাথায় এক প্রতিবেশীকে খুন করেছিলাম।’

থামল হার্ভে, পাইপটা নামাল মুখ থেকে। ‘ওর পিঠে গুলি করেছিলাম আমি। বুচার জানত ব্যাপারটা। তারপর ও যখন এখানে এসে হাজির হলো, ব্র্যাকমেইল করল আমাকে। আমার টাকাপয়সা, বেশির ভাগ গরু-বাছুর কেড়ে নিল। সেই থেকে ও যখন যা বলে তাই করছি আমি।’ কেইনের চোখে চোখ রাখল হার্ভে। ‘এখন তুমি জানলে। ইচ্ছে করলে আইনের হাতে তুলে দিতে পার আমাকে, হয়তো সেজন্যই তুমি এসেছ।’

‘না,’ কেইন বলল। ‘সেজন্য না। আর একটা কথা। হোমস্টেডারদের বুচার তাড়াতে চাইছে কেন?’

‘জানি না, কেইন। সত্যি বলছি। তবে বুচারের কাজকর্মের ধরনই এমন।’

‘এবার আমি জ্যাকির সাথে দেখা করব।’

হার্ভে উঠে দাঁড়াল। ‘ওকে একা থাকতে দাও, কেইন। দরকার হলে তোমার কাছে হাতজোড় করব আমি-ও তোমার জন্য না।’

লোকটার দিকে চেয়ে রইল কেইন, ঘৃণাবোধ করছে, অথচ সে নিরুপায়-এই অকর্মণ্য লোকটাকে সাহায্য করতেই নিয়োগ করা হয়েছে তাকে। ‘জ্যাকির সাথে কথা বলতে হবে আমার,’ বলে ঘুরে দাঁড়াল ও, বাসার দিকে এগোল, ভাবছে এক লোককে পেছন থেকে গুলি করার কথা স্বীকার করেছে হার্ভে। আপনমনে হাসল কেইন, ভাগ্যের নির্মম পরিহাস, এসব লোকই আবার মানসম্মানের বড়াই করে।

সামনের দরজায় নক করল কেইন। এ-সময়ে বার্নের দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে অগ্নি দৃষ্টিতে ওর পানে তাকিয়েছিল হার্ভে। সহসা কেইনের মনে হলো, গতরাতে ডগড্যাঙ্গে যে-লোক গুলি করেছিল ওকে সে এই টমাস হার্ভে নয়তো? অন্ধকার থেকে কারও উদ্দেশ্য গুলি ছোঁড়া ওকেই মানায়। জ্যাকুলিন হয়তো ওর সম্পর্কে বাবার কাছে প্রশংসা করেছিল, তাই পাছে জ্যাকি ওর প্রেমে পড়ে যায় এই ভয়ে আগেভাগে পথের কাঁটা সরাতে চেয়েছিল হার্ভে। তারপর চিন্তাটাকে নিছক আকাশকুসুম কল্পনা বলে বাড়িল করে দিল কেইন। জ্যাকি তার প্রশংসা করবে এমন আশা করা উচিত না ওর।

জ্যাকি দরজা খুলল, হাসছে। ‘সুপ্রভাত, মিস্টার কেইন। তোমার প্রতীক্ষাই করছিলাম। কিছুক্ষণ আগে এদিকে আসতে দেখেছি তোমাকে।’

হ্যাটের কানা ছুঁয়ে জ্যাকিকে সম্মান জানাল কেইন, এই মেয়েটিকে পেতে চায় সে অথচ তার অতীত তার বিরুদ্ধে একথা উপলব্ধি করে সহসা বিব্রতবোধ করছে।

হালকা নীল রঙের একটা প্রিন্টেড স্কার্টের ওপর কালো অ্যাপ্রন পরে আছে জ্যাকুলিন, আন্তিন কনুই অবধি গোটানো। মাথার চুল এলোমেলো, কপাল আর নাকের মাথায় সাদা শ্বেদবিন্দু, গালে কিছু ময়দা লেগে রয়েছে।

‘তোমার সাথে কিছু কথা আছে আমার,’ শুরু করল কেইন।

‘ভেতরে এসো।’ একপাশে সরে দাঁড়াল জ্যাকি। ‘আমারও কথা আছে তোমার সঙ্গে। আমার বোঝার ভুল না হয়ে থাকলে সম্ভবত এখানকার অবস্থা এরই মধ্যে অনেকটা বুঝে ফেলেছ তুমি, এবং হয়তো বেশকিছু প্রশ্নও জমেছে মনে যেগুলোর উত্তর আমি দিতে পারব না।’

হার্ভে তনয়াকে অনুসরণ করে ওদের লিভিং-রুমের আরেক প্রান্তে গেল কেইন। ঘরটা বেশ পরিপাটি, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন; তবে আসবাবপত্র নিতান্তই কম। খানকতক ব-হাইডের চেয়ার, বহু ব্যবহৃত একটা সোফা আর পাইন কাঠের সেন্টার টেবিল। টেবিলের ওপর কয়েকটা পুরানো ম্যাগাজিন আর ক্যাটালগ রাখা। ফায়ারপ্লেসের ওপরে, দেয়ালে এক মহিলার ফ্রেমে বাঁধাই ছবি ঝুলছে। জ্যাকির মা, অনুমান করল কেইন। তারপর ভাবল ভদ্রমহিলা এখনও বেঁচে থাকলে হয়তো টমাস হার্ভে আজ অন্য ধরনের মানুষ হত।

‘একটু অপেক্ষা কর,’ জ্যাকি হাসল। ‘চুলোয় কেক বসিয়েছি।’

জ্যাকুলিনের পেছন-পেছন ইতিমধ্যে রান্নাঘরে এসে পড়েছে কেইন। চুলোর আঁচে গরম হয়ে আছে ভেতরটা, নাকে কেকের সুবাস লাগছে। টেবিলের ওপর একটা পাত্রে ক্রীম রাখা ছিল। ক্রীমটা চামচ দিয়ে ফেটতে শুরু করল জ্যাকি।

তারপর যখন খেয়াল হলো কেইন দাঁড়িয়ে এখনও, তখন বলল, ‘বস, মাইক।’

‘নিশ্বাস নিতেও ভয় হচ্ছে আমার,’ কেইন বলল।

জ্যাকুলিনের চোঁটের ফাঁকে ঝিক করে উঠল এক পাটি শুভ্র দাঁত। ‘এবার বল তোমার প্রশ্ন।’

আলতো পায়ে এগিয়ে গিয়ে চেয়ারে বসল কেইন, ভেবে পাচ্ছে না কীভাবে শুরু করবে আলাপ, মুগ্ধ চোখে দেখছে জ্যাকিকে। ও চুপ করে আছে লক্ষ করে মেয়েটা সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে তাকাল ওর দিকে। বলল, ‘জান, মাইক, ছেলেবেলায় আমি যখন কোন কথা বলতে চেয়ে চুপ করে থাকতাম আমার মা বলতেন বেড়ালে আমার জিভ কেটে নিয়েছে। এখন তোমার অবস্থা দেখে আমার তাই মনে হচ্ছে।’

‘বোধহয় তাই।’ তামাক আর কাগজের জন্য হাত বাড়িয়েও কী মনে করে যেন থেমে গেল কেইন। ‘প্রশ্ন অনেক। কোনটা দিয়ে শুরু করব ভেবে পাচ্ছনে।’

‘সিগারেট খেতে-খেতে স্বলে যাও।’ মুখোমুখি একটা চেয়ারে বসে পড়ল জ্যাকুলিন, চোঁটের কোণে মৃদু হাসি খেলা করছে। ‘তোমার স্বভাব একদম ববের

মত-সিগারেট ছাড়া কথা বলতে পার না। তুমি অভ্যাসের দাস, মিস্টার কেইন।

লাজুক হেসে সিগারেট বানাতে শুরু করল কেইন। 'মনে হয় তাই। সবচেয়ে বড় প্রশ্ন যেটা তার উত্তরের জন্য মেয়েলোকের সাহায্য দরকার। রাফেলা বুচারের ব্যাপারটা কী?'

প্রশ্নটা জ্যাকুলিনের মুখের হাসি মুছে দিল। একটুক্ষণ কেইনকে গম্ভীর মুখে জরিপ করল ও, কেইন অনুভব করল আকস্মিক বিতর্কায় জ্যাকির মন বিষিয়ে উঠেছে। অপরকে ঘৃণা করে নিজের মন কলুষিত করার মত মেয়ে ও না, কেইন ভাবল, তবু সে রাফেলা বুচারকে ভীষণ ঘৃণা করে।

'গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন,' শেষমেশ বলল জ্যাকি। 'তোমার কী মনে হয়?'

'জানি না।' জিত দিয়ে ভিজিয়ে সিগারেটের কাগজ জুড়ল কেইন, ঠোটে ঝোলাল। 'মানে, ওকে বিশ্বাস করি না আমি; তবে একজন মহিলাকে বুঝতে হলে আরেকজন মহিলার চোখ লাগে। যদি পুরুষ হত, নিজের বিচারবুদ্ধির ওপর আস্থা রাখতাম আমি; কিন্তু রাফেলা পুরুষ না।'

'আমার কথা তোমার বিশ্বাস হবে না। যদি বলি ব্যাপারটা আমার নিজের চোখে দেখা, তবু বিশ্বাস হবে না।'

'তুমি যা বলবে আমি তা-ই বিশ্বাস করব।' জ্যাকির ওপর চোখ রেখে, সিগারেট ধরাল কেইন। 'বলতে কী, এই মেসায় একমাত্র তোমাকেই আমি বিশ্বাস করি।'

জ্যাকুলিন জানাল, ডিলন মেসায় রাফেলার আগমন বছর তিনেক আগে। হোটেলের দু-কামরার একটা স্যুট নিয়ে থাকতে শুরু করে ও। শহরের কোন মহিলা ওকে দেখতে পারে না, তবে পুরুষরা এর উলটো। অ্যাবনার লরি আর বিল বুচার দুজনেই চলাচলি শুরু করে ওর সাথে। দুজনের সাথেই পালা করে প্রেম করে রাফেলা, তারপর সবকিছু শেষ হয় বুচারকে বিয়ে করার মধ্য দিয়ে।

'এরপর থেকে নিশ্চয় অনেক পরিবর্তন হয়েছে বুচারের?'

মাথা ঝাঁকাল জ্যাকি। 'অনেক। আগেও ছিল, তবে রাফেলাকে বিয়ে করার পর থেকে বিলের খাই-খাই বহুগুণ বেড়ে গেছে।'

'তার মানে এখন যে-গোলমাল তার শুরুও ওদের বিয়ের সময় থেকে?'

'হ্যাঁ। আমার বিশ্বাস সবকিছুর জন্য দায়ী রাফেলা, তবে সেটা প্রমাণ করতে পারব না, আর পারলেও তাতে লাভ হবে না।' দেয়াল ঘড়ির দিকে ঝট করে একবার তাকাল জ্যাকুলিন। 'সাড়ে দশটা। আমার সাথে একটু বাইরে যাওয়ার মত সময় হবে তোমার।'

'নিশ্চয়।'

উঠল জ্যাকুলিন। 'তুমি যখন বের হও, রাফেলা শহরে ছিল?'

'কাল রাতে ছিল। সকালের কথা বলতে পারব না।'

'বোধহয় তোমাকে মজার একটা জিনিস দেখাতে পারব আমি। এতে হয়তো তোমার প্রশ্নের জবাবও তুমি পেয়ে যাবে। তুমি অপেক্ষা করো, আমি কাপড় পালটে আসছি।'

কেইন চেয়ার ছাড়তে-ছাড়তে বলল, 'তোমার ঘোড়ায় জিন চাপাব?'

'তা হলে তো ভালই হয়। আস্তাবলে যে-সোরেল গেলিংটা আছে ওটাই আমার। বাবাকে বললেই উনি তোমাকে দেখিয়ে দেবেন।'

'ওঁকে বলা বোধহয় ঠিক হবে না। তোমার বাবা চান না আমি তোমার সাথে মাখামাখি করি।'

জুঁকুটি করল জ্যাকুলিন। 'আমার বয়স একুশ হতে চলল, অথচ বাবা সেটা প্রায়ই ভুলে যান।'

খানিক ইতস্তত করে কেইন বলল, 'এখানে আমার আসার কারণ আমি ওনাকে বলেছি।'

'ঠিক করনি-' রাগত সুরে শুরু করেছিল জ্যাকি, পরক্ষণে সামলে নিয়ে জিজ্ঞেস করল, 'কেন?'

'গ্যারিটি আঁচ করে ফেলেছে। ও এমনিতেও বুচারকে লাগাবে। আমি ভেবে দেখলাম তোমার বাবাকে বললে ক্ষতি কিছু নেই, বরং লাভ হতে পারে। তোমার সঙ্গে আমার দেখা করাটা উনি একদম পছন্দ করেননি, রাগ করছিলেন।'

'জানি। বাবা ওরকম করেন অনেকসময়। যাকগে যা হবার হয়ে গেছে, তবু তুমি না বললেই ভাল করতে।'

বার্নে এসে কেইন দেখল টমাস হার্ভে চলে গেছে। সম্ভবত বিল বুচারকে ওর আগমনের কারণ জানাতে, কেইন ভাবল। লোকটার ওপর ভীষণ রাগ হলো ওর। হার্ভেকে অপদার্থ বললে কমই বলা হয়। তবে অভিজ্ঞতা থেকে কেইন জানে ভাল বা মন্দ কোনকিছুই সম্পূর্ণ খাঁটি না, বরং জগতের সবকিছুর ভেতরে দুটোই কিছু-না-কিছু পরিমাণে থাকে। হয়তো আন্তরিকভাবেই টমাস হার্ভে মনে করেছে ডিলন মেসা থেকে মাইকেল কেইনকে তাড়াবার জন্য বুচারের সাহায্য প্রার্থনা করে প্রকারান্তরে সে তার মেয়ের উপকারই করছে।

নয়

ঘোড়া নিয়ে বাসার সামনে বেশিক্ষণ অপেক্ষা করতে হলো না কেইনকে। অচিরেই খাবারের খলেহাতে জ্যাকুলিন বেরিয়ে এল। পরনে পুরুষ মানুষের শার্ট-প্যান্ট, পায়ে রাইডিং-বুট। খলেটা স্যাডলের পেছনে তড়িঘড়ি বেধে, কেইনের সাহায্য ছাড়াই ঘোড়ায় চাপল জ্যাকি। কেইন স্যাডলে উঠতে-উঠতে ভাবল জ্যাকি হচ্ছে সেই জাতের মেয়ে যারা কখনও পুরুষের মুখাপেক্ষী হয় না। যত ভারিই হোক না কেন, নিজের বোঝা ও নিজেই বইবে।

সোজা দক্ষিণে রওনা হলো জ্যাকি, কোথায় যাচ্ছে বা কী দেখবার আশা করছে কিছুই বলল না খুলে। ওক গাছের সারির ভেতর দিয়ে এগোল ওরা, বো অ্যান্ড অ্যারো ছেড়ে আসার আধঘণ্টা পর একটা খাড়া ক্যানিয়নের উত্তর দেয়ালের মাথায় এসে রাশ টানল।

‘সিডার ক্রীকের উত্তর শাখা,’ জ্যাকুলিন বলল। ‘এখান থেকে চার-পাঁচ মাইল পশ্চিমে দক্ষিণ শাখার সাথে মিলিত হয়েছে, তারপর ডগড্যাসের ওপর দিয়ে একসঙ্গে গিয়ে পড়েছে উত্তে ক্রীকে।’

‘তোমার বাসার কাছে যে-ঝরনাটা দেখলাম তার নাম কী?’

‘বিয়র ক্রীক। শহরের প্রায় দুমাইল উত্তরে উত্তে ক্রীকের সাথে মিলিত হয়েছে ওটা। আগেই বলেছি তোমাকে, প্রচুর পানি আছে এখানে। মেসার পশ্চিম প্রান্ত শুকনো, তবে ওটা কোন সমস্যা না।’

ঘাড় কাত করে সাই জানাল কেইন। ‘হুম্। তার মানে, তোমরা যদি এই ঝরনাগুলো বাঁধ দিয়ে নীচে একটা রিজার্ভারের ব্যবস্থা করতে পার, মেসায় প্রচুর চাষাবাদের জমি পাবে।’

তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে ওর পানে তাকাল জ্যাকুলিন। ‘আমার ধারণা ছিল তুমি সবসময় গরু ব্যবসায়ীদের হয়েই কাজ করেছ?’

‘বেশির ভাগ সময় তাই করেছি। কেন?’

‘তা হলে আমার ধরে নেয়া উচিত তোমার কথাবার্তাও হবে একজন গরু ব্যবসায়ীর মত। এখানে চাষাবাদ করার ইচ্ছে আমাদের একটুও নেই। শহরের বাইরের উত্তে ক্রীকের ধারে ছোটখাট কয়েকটা খামার আছে, ওতেই চলে যায় আমাদের সবার।’

অনাবিল হাসি হাসল কেইন। ‘আমি সেচ প্রকল্প চালু করার কথা ভাবছি মনে করে থাকলে তুমি ভুল করবে।’

‘জানি। বন্দুক আর লাঙ্গল কখনও একসাথে চলে না।’

নীচে, ক্যানিয়নের ভেতরে যেসব বীভার পুকুর রয়েছে ঝুঁকে পড়ে সেগুলো একটুক্ষণ দেখল কেইন। তারপর গাঢ় স্বরে বলল, ‘বেশির ভাগ লোকে যা করে তুমি অন্তত সেই ভুল কোরো না, জ্যাকি। অতীতে আমি বন্দুকবাজি করেছি বলে এখনও তাই করব এর কোন মানে নেই।’

‘মানুষ কি বদলায় কখনও?’

‘জীবন বিশ্বাস ঠেকলে কখনও কখনও বদলায় বৈকি।’ সিগারেট বানাল কেইন, উপযুক্ত ভাষা খুঁজছে। ‘কোন কোন লোক স্বেচ্ছায় নিজের পথ বেছে নিয়ে সে-পথেই আজীবন চলে। আবার কেউ কেউ ঘটনাচক্রে জড়িয়ে পড়ে একটা কিছুতে, এবং সেখান থেকে আর বেরোতে পারে না। মনে করো, আমিও তেমনি জড়িয়ে পড়েছিলাম কিছুদিনের জন্য। বাবা-মা মারা যাওয়ার পর কিছু করার ছিল না আমার, তাই এক খামারে চাকরি নিলাম। মনিব আমাকে দিনরাত খাটাত। শেষে একদিন হাঁপিয়ে উঠে পালালাম সবকিছু ছেড়ে। তারপর থেকে এখন যা করছি তাতেই লেগে আছি। কিন্তু এ-কাজে আমি সুখী না।’

‘এ জীবন বোধহয় তোমার পছন্দও না, তাই না?’

‘তাই।’ সিগারেট ধরাল কেইন। ‘কোন ভবিষ্যৎ নেই, চোরাগোপ্তা গুলি খেয়েই মরতে হবে একদিন। নয়তো কোন রেঞ্জ ওঅরে।’ আড়চোখে আরেকবার জ্যাকিকে দেখল কেইন, ভাবছে ও যা বলতে চাইছে মেয়েটা তা বুঝতে পারছে কিনা। ‘এটাই আমার শেষ কাজ। একবার ভেবেছিলাম এটাও

নেব না।'

'তা হলে নিলে কেন?'

'টাকার জন্য। এত ঝটপট আর কোন্ কাজে দুহাজার ডলার আয় করতে পারব বল?'

'বুঝেছি, মৃদু কণ্ঠে বলল জ্যাকি। 'তা এই টাকা দিয়ে কী করবে তুমি?'

'র‍্যাঞ্চ কিনব। সাউথ পার্কে একটা ছোট্ট র‍্যাঞ্চ পছন্দ করে রেখেছি, সস্তায় পাওয়া যাবে। তবে সমস্যা একটাই, আমার হাতে টাকা আসার আগেই অন্য কেউ কিনে ফেলতে পারে ওটা।'

'র‍্যাঞ্চ করতে চাইলে প্রচুর খাটতে হবে,' বলল জ্যাকি।

'জানি। পরের জন্য খাটা এক কথা, আর নিজের জন্য আরেক।'

কেইনের দিকে একমুহূর্ত অপলকে চেয়ে রইল জ্যাকুলিন, পরিষ্কার বোঝা যায় ওর কথায় সে বিস্মিত হয়েছে। তারপর একসময় ও জিজ্ঞেস করল, 'কই বললে না, ডিলন মেসায় খামার করার কথা কেন বলছিলে?'

'দেখ, আমার পেশায় সব সমস্যাই সাধারণত একই ধরনের। বহু দেশ ঘুরেছি আমি। মাটি, প্রকৃতি এগুলো আলাদা, কিন্তু মানুষ সব জায়গায়ই কমবেশি এক, তাদের চাহিদাও এক।'

'তা হলে এখানে কি আলাদা?'

'অবশ্যই। কোন বিশেষ প্যাটার্নের মধ্যে পড়ছে না। আগেও বলেছি লোকে আমাকে ভাড়া করে ঝামেলা করার জন্য, কিন্তু তোমরা করেছ থামানোর জন্য। তুমি ন্যায়বিচারের কথা বলেছ যার সাথে আমার কোন পরিচয়ই নেই। তারপর ধর কম্বাইনের কথা, এমন সব জায়গা দখল করতে চাইছে যা নিয়ে ওদের বিন্দুমাত্র লাভ হবে না।'

'অর্থাৎ তুমি বলছ, কেউ গোলমাল পাকিয়ে ফাঁকতালে পুরো মেসটা কবজা করতে চাইছে, যাতে সে এখানে সারা বছরের জন্য পানির ব্যবস্থা করে, অন্য লোকের কাছে জমি বিক্রি করতে পারে? আমার কাছে কিন্তু ব্যাপারটা কষ্টকল্পনা মনে হচ্ছে।'

কাঁধ ঝাঁকাল কেইন। 'হয়তো তাই। আমার সন্দেহ হচ্ছে কারণ কোন নিয়মের মধ্যে পড়ছে না এখানকার ঘটনাগুলো।'

চুপ করে ব্যাপারটা নিয়ে একটুক্ষণ ভাবল জ্যাকি। 'এখানে আমি এমন কারোকে দেখছি না যার পক্ষে এ-কাজ করা সম্ভব। প্যাডি র‍ায়ানের টাকা আছে, তবে অটেল না। ডিলন মেসায় কোটিপতি বলতে একমাত্র বুচারকেই বোঝায়।'

কেইন একবার ভাবল জ্যাকুলিনকে জানায় অ্যাবনার লরি সম্পর্কে ওকে কী বলেছে র‍ায়ান, তারপর মত পালটে বলল, 'বাদ দাও। সবটাই আমার উদ্ভট কল্পনা।'

'চলো, আমরা বরং এগোই,' জ্যাকি বলল। 'হয়তো কোনই লাভ হবে না, তবু খামোকা বসে থাকার কোন মানে হয় না।'

ক্যানিয়নের গা বেয়ে কোনাকুনিভাবে নীচে নেমে গেল ও, ঝরনা তীর ধরে এগোল কিছুদূর, তারপর দুটো বীভার পুকুরের মাঝ দিয়ে ওপাশে গিয়ে

খাড়াইয়ে উঠল। কেইন নীরবে অনুসরণ করছে, কৌতূহলে আঁকুপাঁকু করছে মন, তবু যেচে কোন প্রশ্ন জিজ্ঞেস করল না।

আকাশ পরিষ্কার হয়ে গেছে, সূর্য এখন প্রায় মাথার ওপরে, গনগনে তাপ ছড়াচ্ছে ভেজা পৃথিবীতে। ওক গাছের পাতা লাল হতে শুরু করেছে, অর্থাৎ শেষ হয়েছে গরমকাল। কেইন ভাবল আজই হয়তো গ্রীষ্মের শেষ দিন। পাহাড়ি এলাকায় শীত আসে আচমকা। তুষারপাত শুরু হলেই অ্যাঞ্জেল পীক থেকে নেমে আসবে সমস্ত গুরুবাহুর, ওদেরকে নিয়ে কম্বাইনের লোকজন রওনা হবে মাইনিং ক্যাম্পগুলোর উদ্দেশ্যে।

দক্ষিণপশ্চিম দিকে এগোল ওরা, চারপাশে খোলামেলা ঘেঘোজমি। বাঁয়ে একটা বাথানের দালানকোঠা দেখা গেল। ওগুলো দেখিয়ে কেইন জিজ্ঞেস করল, 'ওটা কোন্ আউটফিট?'

'ম্যালেট ফোর,' জ্যাকি জবাব দিল। 'রেড ম্যানিয়ানের বাথান। বাসায় ওর বউ আর দুই ছেলেমেয়ে আছে, তবে ও বাড়িতে বেশিক্ষণ থাকে না। সম্ভবত কাউন্সিলদের সাথে অ্যাঞ্জেল পীকে রয়েছে। বুচার যখন কোন কুমতলব আঁটে রেডকে শহরের বাইরে পাঠিয়ে দেয় যাতে এখানে থেকে ও কোনরকম ঝামেলা বাধাতে না পারে।'

'বড় আউটফিট?'

'বুচারের পর ডিলন মেসায় ওর বাথানই সবচেয়ে বড়। তিনজন রাইডার আছে, লরির এক। বব ছাড়া আমাদের আছে দুজন। বাবা আজকাল আর একটা বাইরে বেরোন না। তাই ক্যাটল ড্রাইভ শুরু হওয়ার আগেই ডেনভার থেকে এসে পড়বে বব।'

'লরির আউটফিট তা হলে সবচেয়ে ছোট?'

ওপর-নীচ মাথা ঝাঁকাল জ্যাকুলিন। 'অল্পকিছু গুরুবাহুর আছে। আমার মনে হয় না এবার ও পঞ্চাশটা গুরুও পাঠাতে পারবে বাজারে।'

'রায়ান বলছিল ওর বাবা নাকি এখানে দারুণ প্রতাপশালী ছিল।'

'ঠিক। ও অ্যামবুশে মারা যাওয়ার পর থেকেই বুচারের এত ঠাটবাট।' একটা ট্রেইলের কিনারে এসে হাজির হলো ওরা যেটা ম্যালেট ফোর র‍্যাঞ্জেস দিকে চলে গেছে। রাশ টেনে আশপাশের ভেজা মাটি একটুক্ষণ জরিপ করল জ্যাকি। 'বৃষ্টির পর কেউ আসেনি এদিকে। রেড বোধহয় বাসায় না এসে ক্রীকের উজান ধরে কাউন্সিলে চলে গেছে। এ-পথে গেলে ঘোরা হয়।'

'লরি একা থাকে?'

'গরমে। খোদা মালুম বাসায় কী করে সময় কাটায় লোকটা; তবে আমরা সবাই জানি, ও কোন কাজকাম করে না।'

রাস্তা অতিক্রম করে আড়াআড়িভাবে এগোল ওরা, অল্পক্ষণের ভেতর হারিয়ে গেল পাইন আর সিডার বনের ভেতরে। মাটি এখন ক্রমশ খাড়া হতে শুরু করেছে, তাই ওরা চলার বেগ কমাল। তারপর ট্রেইল ছেড়ে সরাসরি বাঁ দিকে এগোল এবং মিনিট কয়েকের মধ্যে পৌঁছে গেল আরেকটা ক্যানিয়নে।

'সিডার ক্রীকের দক্ষিণ শাখা,' বলে রাশ টেনে নামল জ্যাকি। 'এখানে

বসেই গোয়েন্দাগিরি করব আমরা। কপাল ভাল হলে, একটা মজার জিনিস দেখতে পাব।’

স্যাভলের পেছন থেকে খাবারের থলেটা নামাল ও, মাথা ঝাঁকিয়ে কেইনকে ইশারা করল ওর পিছু নিতে। ঘোড়া দুটোর লাগামের খুঁটা মাটিতে পুঁতে রেখে এগোল কেইন। ইতস্তত-বিক্ষিপ্ত পাইন গাছ রয়েছে কয়েকটা, তারই একটার গোড়ায় খাবারের থলেটা ধপ করে ফেলে দিয়ে একটু থামল জ্যাকি। কেইন ওর পাশাপাশি হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করল ও, তারপর হাঁটু গেড়ে বসে হামাগুড়ি দিয়ে দেয়ালের কিনারে গেল।

‘আমরা ভাগ্যবান,’ বলল জ্যাকি। ‘দেখে যাও একনজর, তবে সাবধান ওরা যেন তোমাকে দেখতে না পায়।’

কেইন অনুসরণ করল। মেয়েটার পাশে উপুড় হয়ে শুয়ে পড়ল ও, উঁকি দিল ক্যানিয়নের ভেতরে। ক্রীকের ধারে একটা পাথরের ওপর অলস ভঙ্গিতে বসে আছে আবনার লরি, মাঝেমধ্যে একটা-দুটো নুড়িপাথর ছুঁড়ে মারছে ঝরনার পানিতে। ক্যানিয়নের উলটো দিকের দেয়ালে, লরির মাথার ওপরে পাহাড়ের একটা ধাপে ঘাস রয়েছে কিছু, সেখানে চরছে ওর ঘোড়াটা।

কেইন পিছিয়ে এল। ‘বুঝলাম না কিছু।’

‘সবুর করো, বুঝবে।’ থলে খুলে একটা বীফ স্যান্ডউইচ বের করে ওর দিকে বাড়িয়ে দিল জ্যাকুলিন। ‘বিশেষ কিছু না, আমি আসলে খাবার নিতে গিয়ে দেরি করতে চাইনি।’

‘এতেই চলবে,’ কেইন বলল।

আরও কিছু স্যান্ডউইচ আর দুটুকরো কেক একটা কাগজে মুড়ে এনেছিল জ্যাকি। মোড়কটা খুলে বিরক্তিতে মাথা নাড়াল ও। ‘যা ভেবেছিলাম, ভেঙে গেছে।’

‘স্বাদ ঠিক আছে,’ আয়েস করে কেক চিবুতে-চিবুতে বলল কেইন।

‘এই তন্নাটে আমার চেয়ে ভাল রাধুনি তুমি পাবে না।’ কথাটা এমনভাবে ঘোষণা করল জ্যাকি যেন এটা একটা প্রবসত্য। ‘বব ফিরে আসুক, তারপর একদিন রান্না করে প্রমাণ দেব।’

‘আমি তর্ক করছি না।’ একমুঠো ভাজা কেক তুলে নিয়ে মুখে পুরল কেইন। ‘একটুও না।’

কিনারে গিয়ে উঁকি দিয়ে আবার ফিরে এল জ্যাকি। ‘এখনও বসে আছে।’

অধৈর্য হয়ে উঠল কেইন। ‘আসল কথাটা বলতে তোমার আপত্তি—’

‘এসেই যখন পড়েছি,’ রুক্ষ সুরে বলল জ্যাকি, ‘আরেকটু অপেক্ষা করলে এমন কিছু ক্ষতি হবে না।’

হাসল কেইন। ‘তা হবে না। আচ্ছা, প্যাডি রায়ানকে তোমার কেমন মনে হয়? ওর কথা বিশ্বাস করা যায়?’

‘আলবত। প্যাডি অনেকটা তোমারই মত, জীবনের ওপর বীতশ্রদ্ধ হয়ে পড়েছে। বুচারকে ঘৃণা করে, তবু ওর সঙ্গে আছে তার কারণ বুচারের বিরুদ্ধে ওর একার পক্ষে কিছু করা সম্ভবপর না।’ খাবারগুলো কাগজে মুড়ে থলেতে

ভরল জ্যাকুলিন। 'প্যাডির সাথে আলাপ হয়েছে তোমার?'

মাথা ঝাঁকাল কেইন। 'হ্যাঁ। ও বলছিল লরি নাকি তার অধিকাংশ গুরুবাহুর বুচারকে দান করে দিয়েছে।'

'অথবা বেচে দিয়েছে। একমাত্র ওরাই বলতে পারবে আসল ব্যাপার কী। বুড়ো জেক লরি মারা যাবার অল্প কিছুদিন পরই স্যুশ ট্রায়াম্পলের বেশির ভাগ গুরুবাহুর নিয়ে নেয় বুচার। একজন ছাড়া লরির আর সব কর্মচারী এখন ওর কাজ করে। বুচারের দাবি, সে নাকি গুরুগুলো কিনে নিয়েছে। হয়তো তাই।' পাইনের একটা শিকড় ছিঁড়ল জ্যাকুলিন, কপালে চিত্তার ভাঁজ। 'অ্যাবনারকে দেখেছ তুমি?'

'হ্যাঁ, তবে ওকে বিশেষ কথা বলতে শুনিনি। সভায় হাজির ছিল, কিন্তু একবারও মুখ খোলেনি।'

'অ্যাবনার ওই রকমই। শোনে কিন্তু কিছু বলে না। আশ্চর্যের ব্যাপার, আমরা যদিও, ও-ও ততদিন হলো মেসায় আছে। অথচ আমরা বুচারকে বুঝতে পারলেও, ওকে একদম পারি না।'

'ওর বাবাও কি এরকম ছিল?'

'মোটাই না। বুড়ো জেক ছিল লোভী, তর্জন-গর্জন করত সারাক্ষণ। কিন্তু অ্যাবনার একদম বিপরীত। মনেই হয় না ও জেকের ছেলে।'

'রায়ান বলছিল ও বাইরের স্কুলে পড়তে গিয়েছিল।'

মাথা ঝাঁকাল জ্যাকুলিন। 'ফোর্ট কলিন্সে ছিল কিছুদিন। হয়তো এটাও দায়ী কিছুটা, তবে ও বরাবরই একটু আজব স্বভাবের। মেয়েদের সাথে মাখামাখি করে না। নাচে না। জেক অনেক চেষ্টা করে ছিল, কিন্তু কোন ফল হয়নি। যদি-বা কখনও নাচের আসরে যেত, চুপচাপ এককোণে দাঁড়িয়ে দেখত সবকিছু। স্কুল থেকে যখন ফিরে এল তখনও সেই রকমই। কোন কাজ করে না—একমাত্র গুরুবাহুর নিয়ে মাইনিং ক্যাম্পে যাবার সময় ছাড়া।'

হামাগুড়ি দিয়ে কিনারে গেল জ্যাকুলিন। মৃদু সুরে ডাকল, 'এদিকে এসো, মাইক।'

ওর পাশে গিয়ে ক্যানিয়নের ভেতরে উঁকি দিল কেইন। ত্রীকের উজান থেকে একজন ঘোড়সওয়ার আসছে। লরি উঠে দাঁড়িয়ে হাত নাড়ছে ওর উদ্দেশে। একটু বাদে একটা উইলো ঝোপের পেছন দিয়ে ঘুরে ফাঁকায় বেরিয়ে এল অশ্বারোহী। রাফেলা বুচার।

'আশ্চর্য, চাপা গলায় বলল কেইন।

'জানতাম তুমি একথাই বলবে,' জ্যাকি বলল। 'আগেই বলেছিলাম, না দেখলে বিশ্বাস করবে না কেউ।'

লরির পাশে এসে রাশ টেনে মাটিতে নামল মহিলা, প্রেমিককে জড়িয়ে ধরল। দীর্ঘক্ষণ ধরে পরস্পরকে আলিঙ্গন করে রইল ওরা, তারপর লরির বাহুডোর থেকে সরে এসে গালে হাত বোলাল রাফেলা। কিছু বলল ও, লরি হেসে আবার ওকে চুমু খেল।

এভাবে কারও অভিসার দেখা কেইনের স্বভাববিরুদ্ধ, নিজেকে ওর ভীষণ

ছোট মনে হলো। আড়চোখে জ্যাকুলিনের দিকে তাকাতেই চোখাচোখি হলো ওদের, দেখল মেয়েটা ভুরু কঁচকে আছে। জ্যাকি বলল, 'আমি জানি তোমার খারাপ লাগছে। সাথে করে এনেছি বলে হয়তো এখন রাগ হচ্ছে আমার ওপর।'

'না, তবে—'

'বলতে হবে না, মাইক। আমি জানি এটা করা উচিত না। কিন্তু আমার বিশ্বাস এর দরকার ছিল। ব্যাপারটা বুচার বোধহয় জানে না। রাফেলার ব্যাপারে ও অন্ধ, তবে আমার ধারণা নিশ্চয় কিছুটা সন্দেহ করে।' শ্রাগ করল জ্যাকুলিন। 'বুচার নিজেকে বড় হিসেবে জাহির করে তার কারণ, আমার মনে হয়, এভাবে ওর শারীরিক অক্ষমতা ও ঢাকতে চায়।' ইশারায় নীচের কপোত কপোতীকে দেখাল ও। 'হয়তো ভেবেছে আরও প্রতাপশালী হতে পারলে রাফেলাকে ধরে রাখতে পারবে নিজের মুঠোয়।'

কেইনেরও তাই বিশ্বাস। স্টারলাইটে নিজের সম্পর্কে বুচারের কথাবার্তা, এবং তারপর হোটেল কামরায় যেভাবে অহেতুক অপমান করেছিল রাফেলাকে সেগুলো মনে পড়তে মাথা ঝাঁকিয়ে সায় দিল ও। এ থেকে বোঝা যায় বউকে হারাবার ভয়ে সর্বক্ষণ তটস্থ হয়ে আছে লোকটা, কেইন ভাবল। হয়তো নিজে আঘাতপ্রাপ্ত হয়েছে বলেই রাফেলার ওপর তার শোধ তুলছে বুচার। এ-ব্যাপারে ব্যাক গ্যারিটির মন্তব্য কেইনের মনে আছে। সম্ভবত রাফেলা আর অ্যাবনার লরির এই মেলামেশার কথা গ্যারিটি জানে।

'মনে হচ্ছে গোলমালের উৎসটা তুমি ধরতে পেরেছ,' অবশেষে একসময় বলল কেইন। 'তবে এতে আমাদের কোন লাভ হবে কিনা বলতে পারছি না।'

রাফেলা এখন বসে আছে ক্রীকের পাড়ে, ওর কোলে অ্যাবনার লরির মাথা। তন্ময় হয়ে আলাপ করছে ওরা, কিন্তু এতদূর থেকে তার বিষয়বস্তু বোঝা গেল না। আচমকা উঠে বসল লরি, দুম করে একটা ঘুসি মারল হাতের তালুতে, চোঁচিয়ে বলল একটা কিছু। প্রবলভাবে মাথা নাড়াল রাফেলা, ওকে আবার টেনে নিল কোলে।

'অনেক দেখা হয়েছে,' বলে বুকে হেঁটে কিনার থেকে সরে এল কেইন।

জ্যাকুলিন পিছু নিল, লক্ষ করছে ওকে। 'এখন কী করবে?' জিজ্ঞেস করল ও।

'জানি না। আমার দায়িত্ব তোমার বাবাকে বিপদমুক্ত রাখা, যদিও সন্দেহ আছে সেটা সম্ভব হবে কিনা। আমার ধারণা উনি বুচারের খুব ঘনিষ্ঠ।'

জ্যাকির চেহারা কঠোর হলো। 'এবং তুমি ওঁকে না থামালে বুচার যা বলবে উনি তা-ই করবেন। এক্ষেত্রে বুচারকেই থামাতে হবে তোমার।'

টুপ ঘাড়ের পেছনে ঠেলে দিয়ে মাথা চুলকাল কেইন। 'অ্যাবনার স্কুল থেকে ফিরে আনার পর বুড়ো জেক অ্যামবুশে মারা পড়ে। তাই না?'

'হ্যাঁ, অ্যাবনার বাড়ি ফেরার প্রায় দুহণ্ডা পর। স্যার ট্রায়াস্কেলের পুরানো এক কর্মচারী বলেছে ঘটনার দিন সকালে বাপ-ছেলের মধ্যে তুমুল ঝগড়া হয়। অ্যাবনার বাপানের কোন কাজকর্ম করতে চাইছিল না। বুড়ো জ্যাক ওঁকে বলেছিল, ভাল লাগুক চাই না লাগুক, সে যা বলবে ঠিক তাই করতে হবে

আবনারকে।

‘এর বেশি আর কিছু শোনা যায়নি?’

মাথা নাড়াল জ্যাকি। ‘আমরা সবাই অনুমান করেছিলাম কী ঘটেছে, কিন্তু কারও কাছেই কোন প্রমাণ ছিল না।’

ঘোড়ায় চেপে, যে-পথে এসেছিল সে-পথে ফিরে চলল ওরা। কেইন বলল, ‘আচ্ছা, তুমি ওদের অভিসারের কথা জানলে কীভাবে?’

‘নেহাত ঘটনাচক্রে। আগেই বলেছি আমার বেড়ানোর অভ্যেস আছে। এভাবেই একদিন চোখে পড়ে গেছে।’

শ্বেডের বাথানে ওর বন্দী হওয়া এবং সেখানে লরির উপস্থিতির কথা জ্যাকুলিনকে জানাল কেইন। তারপর জিজ্ঞেস করল, ‘এর সাথে ওই ঘটনার কী যোগাযোগ থাকতে পারে বলে তোমার মনে হয়?’

‘আবার কী? আবনার বিলের পক্ষে আছে কারণ জানে ও একা বিলের কিছু করতে পারবে না। অন্যদিকে তলে-তলে হাত মিলিয়েছে শ্বেডদের সাথে যদি এভাবে বুচারকে খতম করা যায়। কেউ যখন অন্যের বউকে কেড়ে নিতে চায় তখন সাফল্য অর্জনের জন্য সে সব রাস্তাতেই চেষ্টা চালায়। তাই না?’

‘মনে হয়,’ কেইন একমত হলো; ‘কিন্তু ধরো, বুচার মারা গেল এবং রাফেলা বিয়ে করল লরিকে। এতে করে কি আসল সমস্যার সমাধান হবে, যদিও তোমার বাবা রক্ষা পাবেন?’

‘হবে, মাইক। লরি আর রাফেলা থাকবে না এখানে, সবকিছু বেচে দিয়ে চলে যাবে। তখন আমরা নিজেদের মধ্যে একটা আপসরফা করে নিতে পারব।’

‘মনে হয় লরিকে বিয়ে না করায় এখন পস্তাচ্ছে রাফেলা।’

‘হয়তো। কিংবা এটা ওদের একটা চালও হতে পারে। তবে আমার দৃঢ়বিশ্বাস সব গোলমালের মূল কারণ—রাফেলা।’

বনের ভেতর দিয়ে কিছুদূর যাওয়ার পর উত্তর দক্ষিণমুখী সরু একটা রাস্তার দেখা পেল ওরা। রাশ টেনে কেইন জিজ্ঞেস করল, ‘কোথায় গেছে এটা, লরির বাসায়?’

মাথা ঝাঁকাল জ্যাকুলিন। ‘সিডার ক্রীকের দক্ষিণ শাখার মাইলখানেক উজানে ওর বাড়ি।’ ভ্রুকুটি করল ও। ‘তোমার মতলবখানা কী?’

‘লরির সাথে কথা বলব।’

‘পাগলামি কোরো না, মাইক। ও যদি জানতে পারে তুমি ওদের অভিসার দেখে ফেলেছ—তোমাকে খুন করবে।’

‘অন্তত তার চেষ্টা করবে। না, ওই ব্যাপারে কিছু বলব না আমি, কেবল জিজ্ঞেস করব সবকিছু ও জেনেও শ্বেডের কবল থেকে কাল ও আমাকে বাঁচায়নি কেন।’

ওর স্যাডল হর্ন আঁকড়ে ধরল জ্যাকুলিন, দৃষ্টিতে স্পষ্ট উদ্বেগ। ‘বন্দুকবাজ ভাড়া করার সময় তার জীবনের নিরাপত্তার কথা কেউ ভাবে না।’

মৃদু হাসি ফুটে উঠল কেইনের মুখে। ‘জানি। মনিব কেবল তার টাকা লোকসানের ভয় করে। একজন বন্দুকবাজ বাঁচল কি মরল তাতে তার কী!’

‘কিন্তু আমি সেরকম না, মাইক। তোমার কোন ক্ষতি হলে নিজেকে আমি ক্ষমা করতে পারব না।’

‘হবে না ক্ষতি। বলেইছি তো, এটাই আমার শেষ কাজ।’

‘সেজন্যই তো আরও বেশি ভয়। তুমি আমার সাথে চলো—বাবাকে বোঝাও আরেকটু।’

‘রাতে যাব। এখন লরির সাথে কথা বলতে হবে।’

হতাশ ভসিতে দুহাত শূন্যে ছুঁড়ল জ্যাকুলিন। ‘মানুষ এত জেদী হলে পারা যায় না।’

‘জেদী না হলে যে তোমার পছন্দ হবে না।’

কেইনের চোখ এড়িয়ে গেল জ্যাকুলিন, নতমুখে নখ খুঁটল একটুক্ষণ, তারপর বলল, ‘সাই করো, খেয়াল রেখ নিজের দিকে।’

দশ

জ্যাকির কাছ থেকে বিদায় নেয়ার পনেরো মিনিটের মধ্যে সিডার ক্রীকের দক্ষিণ শাখায় পৌঁছে গেল কেইন, আঁকাবাঁকা ট্রেইল ধরে নেমে এল ক্যানিয়নের ভেতরে। একটু থেমে ঘোড়াকে পানি খাওয়াল ও, তারপর কাদা মাড়িয়ে কষ্টেস্টেটে এগোল দক্ষিণ চড়াইয়ের দিকে। স্যান হুয়ান পর্বতমালা থেকে উড়ে আসছে মেঘের দল, মাঝেমাঝে ঢাকা পড়ছে সূর্য, ফলে মাটিতে রৌদ্রচহায়ার বিচিত্র নকশা তৈরি হয়েছে।

চড়াইয়ে উঠে রাশ টানল কেইন, ঘোড়াকে জিরিয়ে নেয়ার সুযোগ দিল। ওর সামনে উঁচু হয়ে গেছে ভূপৃষ্ঠ, রাস্তা সরু হয়ে অ্যাসপেন বনের ভেতর দিয়ে চলে গেছে। উঁচু এলাকায় গাছের পাতা ঝরা শুরু হয়েছে, ঝরাপাতার গালিচার ওপর দিয়ে চলার সময় কোন রকম শব্দ করছে না কেইনের ঘোড়া। এগিয়ে চলল ও, ক্রমশ উঠে যাচ্ছে ওপরে, সূর্য এখন ঢাকা পড়ছে ঘন কালো মেঘের আড়ালে। পাহাড় থেকে ঠাণ্ডা স্যাঁতস্যাঁতে দমকা বাতাস ছুটে এল। রাতের, আগেই সৃষ্টি হবে, কেইন ভাবল। এমনকী তুমারপাতও হতে পারে। এরকম আবহাওয়া দেখে কনহাইনের লোকজন ইতিমধ্যেই অ্যাঞ্জেল পীক্ থেকে গুরু নামিয়ে আনতে শুরু করে দিয়েছে কিনা বুঝে উঠতে পারল না ও।

ও যখন লরির স্ট্রাশ ট্রায়াম্বেলে পৌঁছাল তখন সবে বিকেল। কল্পনায় যে-ছবি এঁকেছিল তেমনি দেখতে বাথানটা, শ্রীহীন। কাঠের র‍্যাপ্স-হাউস, নড়বড়ে; বার্ন আর বাংকহাউসটার অবস্থাও তথৈবচ। পশ্চিম প্রান্তে পোল কোরাল রয়েছে কয়েকটা, গোটা ছয়েক ঘোড়া ছাড়া আর কিছু নেই।

এখানকার সবকিছুতেই কালের ছাপ পড়েছে, কেমন যেন খাঁ-খাঁ করছে চারদিক। বাসার কয়েকটা জানালা তক্তা মেরে বন্ধ করে দেয়া হয়েছে, অন্যান্য দালানগুলোর অধিকাংশ দরজাই খসে গেছে কবজা থেকে, কয়েকটা কোরাল

এখনই মেরামত করা দরকার। একনজর চোখ বুলিয়েই কেইন বুঝতে পারল এখানে এত কাজ রয়েছে যা কোন লোকের পক্ষে সম্ভব হবে না সারা হুণ্ডায় শেষ করা। এর অর্থ অ্যাবনার লরি হয় অলস, নয়তো এখানে থাকার আদৌ কোন ইচ্ছে নেই তার।

‘কেউ আছ ভেতরে?’ হাঁক দিল কেইন।

কেইনের কথায় প্রতিধ্বনি ছাড়া অন্য কোন সাড়া মিলল না। একটুক্ষণ চূপ করে স্যাডলে বসে রইল ও, কান পেতে পাথরের ফাঁক দিয়ে উতে ক্রীকের পানি ছুটে চলার আওয়াজ আর পাহাড়ের ঢালে দেবদারু গাছের শাখা বাতাসের ফিসফাস শব্দ শুনছে। ওর মনে হলো গোটা পরিবেশে যেন মৃত্যুপুরীর শূন্যতা বিরাজ করছে। এই অবস্থায় কোন মানুষ কীভাবে বাস করে এখানে ভেবে অবাক হলো সে।

লরি কখন ফিরবে কেইন জানে না, তবে আকাশের চেহারা দেখে অনুমান করল খুব বেশি দেরি নেই। এরকম ঝড়বাদলের মধ্যে রাফেলাকে আটকে রাখবে না ও, আর এখানে আনবার কোন প্রশ্নই ওঠে না।

বার্নের পেছনে গিয়ে স্যাডল থেকে নামল কেইন। হাঁটু গেড়ে বসে সিগারেট ধরাল। আপনা থেকেই জ্যাকুলিনের কথা মনে হলো ওর। ভাবল মেয়েটা কেন ওর নিরাপত্তার কথা এত ভাবে। একজন মানুষের যা হওয়া উচিত, সম্ভবত চায় না ওর কারণে মৃত্যু হোক কেইনের। তবু ওর বিশ্বাস করতে ইচ্ছে হলো শুধু এজন্য না, জ্যাকুলিনের উদ্বেগের পেছনে আরও কোন কারণ রয়েছে। একজন মানুষ যা করে, জীবনে এই প্রথম, নিজের ভবিষ্যতের ভাবনা ভাবল কেইন। একটা ব্যাপারে ও নিজের বিবেকের কাছে পরিস্কার, অতীত জীবনের সাথে তার সমস্ত সম্পর্ক ছিন্ন হয়েছে, আর কোনদিন সে পিস্তলকে তার কটিকজির পুঁজি করবে না।

জ্যাকুলিনকে কেইন কিছুতেই তার ভবিষ্যৎ থেকে আলাদা করে দেখতে পারছে না। অতীতে কখনও কোন মেয়ের ব্যাপারে এরকম মনে হয়নি ওর। তারপর অসীম এক বেদনা অনুভব করতে শুরু করল ও, মনে পড়ল টমাস হার্ভের শেষ কথাগুলো। লোকটা ওকে একজন ভাড়াটে খুন্সী বলে আখ্যায়িত করেছে, বলেছে ওর ভেতরে সত্যিকারের প্রেম-ভালবাসা বলে কিছু থাকতে পারে না। হয়তো সবাই ঠিক এ-কথাই ভাবে। এমনকী জ্যাকুলিনও। কেইন জানে, টমাস হার্ভের উক্তিকে মিথ্যে প্রমাণিত করার আগে পর্যন্ত জ্যাকুলিনের মত মেয়েকে বিয়ের প্রস্তাব দিতে পারবে না ও, আর এজন্যই নিজের প্রতি ওর বিতৃষ্ণা আরও বেড়ে গেল।

নিজের চিন্তায় ও এতটা বিভোর হয়েছিল যে খেয়ালই করল না কখন বাথানে ফিরে এসেছে অ্যাবনার লরি। উঠন পেরিয়ে বাসার দিকে রওনা হয়েছে লরি এই সময় কেইন ডাকল, ‘লরি।’ বাতাসের ভোড়ে ওর কথা অন্যদিকে ভেসে গেল, লরির কানে পৌঁছাল না। কেইন আবার ডাকল, এবার চিৎকার করে, ‘লরি!’

চমকে উঠে, ঘুরে দাঁড়াল স্যাম ট্রায়াম্পেলের মালিক, হাত চলে গেছে

হোলস্টারের কাছে। তারপর যখন চিনতে পারল বক্তাকে, পিস্তলের বাঁটের ওপর জমে গেল ওর আঙুল।

‘ড্র করতে চাও, লরি,’ এগিয়ে এসে প্রশ্ন করল কেইন।

লরি হাসল। ‘তোমাকে চেনার পর আর চাই না। এখানে কী করছ?’

‘তোমার সাথে দেখা করতে এসেছি।’

কৌতূহলের ছাপ ফুটল বাঁকা-নাকের চেহারায়। ‘আশ্চর্য! আমি ভেবেছিলাম তুমি শ্বেডকে খতম করতে যাবে।’

ওই স্বল্প মুহূর্তে একটা সত্য আবিষ্কার করল কেইন। ভেতরে যাই থাক, লরি পাকা জুয়াড়ির মত বাইরের চেহারা ভাবলেশহীন রাখতে জানে। এখন এমন ভান করছে যেন কেইনের উপস্থিতিতে ওর কিছু আসে যায় না।

‘গিয়েছিলাম শ্বেডকে দেখতে,’ কেইন শুধরে দিল ওকে।

‘আচ্ছা। এসো, ভেতরে বসবে। বাইরে ভীষণ ঠাণ্ডা।’

‘আমি এখানেই থাকব।’ ইশারায় লরির পিস্তলটা দেখাল কেইন।

‘তুমি ড্র করতে যাচ্ছিলে। কার ভয় করছ?’

শ্রীং করল লরি। ‘কী জানি। জায়গাটা খুব খারাপ।’

‘কে তোমাকে মারতে চাইছে? বুচার? না গ্যারিটি?’

কোন প্রকার ভাবান্তর হলো না লরির চেহারায়। ‘আরে, না,’ বলল ও। ‘বন্ধুরা কেন আমাকে মারতে চাইবে? আসলেই জানি না।’

‘কাল রাতে শহরে এক লোক আমাকে অ্যামবুশ করেছিল,’ বলল কেইন। ‘চেহারা দেখতে পাইনি। তখন তুমি কোথায় ছিলে? শহরে?’

‘কী বকছ অবলতাবল, আমি তোমাকে গুলি করিনি,’ লরিকে আহত দেখাল। ‘আমি বন্দুকবাজ নই। আর তা ছাড়া তোমাকে আমি মারতে চাইবই-বা কেন?’

‘আমার বিশ্বাস তুমি বুচারের পক্ষে নেই।’

‘তা কেন হবে, বিলের কোন ইচ্ছায় আমি আপত্তি করি না। সেটা আমার পছন্দ না হলেও। কন্সাইনের সবাই তা-ই। এখানে ওর ইচ্ছাই সব।’

কথাটা, কেইন ভাবল, অবশ্যই ঠিক, তবে ওর মনে যেসব প্রশ্ন জেগেছে সেগুলোর উত্তর নেই এতে। এবার সরাসরি প্রশ্ন করল ও, ‘কাল তুমি জানতে আমি শ্বেডের বাসায় বন্দী, তবু উদ্ধার করলে না কেন?’

এখনও আগের মতই নির্বিকার রইল লরি। সাদামাঠা গলায় বলল, ‘তোমার মাথা খারাপ হয়ে গেছে। গেল কয়েক মাসের মধ্যে শ্বেডের বাসায় দূরে থাক, ওর দশ মাইলের ভেতর কোথাও যাইনি।’ নাক চুলকাল লরি। ‘তোমার মতলবটা কী, কেইন?’

‘তুমি একটা মিথ্যুক।’

লরি যেন শীতল কোন ধাতুতে গড়া। মৃদু হেসে বলল, ‘দেখ, ভীষণ ঠাণ্ডা পড়েছে। তোমার যদি সত্যিই কিছু বলার থাকে ভেতরে চলো।’

‘না,’ বলল কেইন, ‘আমি চলে যাচ্ছি।’

ঝটিতি ঘুরে বাসার দিকে এগোল লরি। কেইন অপেক্ষা করল একটুক্ষণ,

আশঙ্কা করছে লরি হয়তো ড্র করার চেষ্টা করবে, তবে লরির হাবভাবে সেরকম কোন লক্ষণ দেখা গেল না। যখন বন্ধ হয়ে গেল দরজা, কেইন তার ঘোড়ার উদ্দেশে ছুটল। বার্নের কোনায় পৌছে আবার থামল ও, লরির মতলব বুঝে উঠতে পারছে না। যখন দেখল কোনরকম সাড়াশব্দ পাওয়া যাচ্ছে না ব্যাঙ্ক হাউসের ভেতর থেকে, স্যাডলে চেপে কোরালের পেছন হয়ে রাস্তার দিকে এগোল।

ও সিডার ত্রীকের দক্ষিণ শাখা পার হওয়ার পরপরই বৃষ্টি শুরু হয়ে গেল। থেমে, গায়ে বর্ষাতি চাপাল কেইন, চলতে শুরু করল আবার, অ্যাবনার লরির কথা ভাবছে। এখনও লোকটা সম্পর্কে একটা স্থিরসিদ্ধান্তে পৌছাতে পারছে না ও, তবে বুঝতে পারছে কেন ওকে সবাই সন্দেহের চোখে দেখে। আজ পর্যন্ত যত মিথ্যুক দেখেছে কেইন তাদের মধ্যে লরিই সবচেয়ে চালু, তুখোড় অভিনয় জানে। রাফেলার কথা মনে হলো কেইনের, ভাবল লরির সঙ্গে বেশ জমেছে মহিলার। তবে ওর সন্দেহ হলো ওরা হয়তো পরস্পরকে বিশ্বাস করে না এবং সম্ভবত প্রত্যেকেই নিজের নিজের স্বার্থহাসিলের জন্য কাজ করে যাচ্ছে।

সি. সি. ব্যাঙ্কের পাশ ঘেঁষে যে-রাস্তাটা শহর পানে চলে গেছে কেইন সেখানে পৌছানোর আগেই বৃষ্টি ধরে এল, তবে আকাশ মেঘলা থাকায় অন্ধকার সাত-তাড়াতাড়ি জমাট বাঁধল। কেইন একবার ভাবল বুচারের বাসায় যাবে। আগে বা পরে, বুচারকে তার সব জানাতেই হবে; তা ছাড়া সকালে যদি টমাস হার্ভে ওখানে গিয়ে থাকে, এই সুযোগে জানা যাবে ওর নামে সে কী বলেছে।

দ্বিধায় পড়ল কেইন। প্যাডি রায়ানের ভূমিকা এখনও পরিচ্ছন্ন না, তার ওপর ব্ল্যাক গ্যারিটি রয়েছে। বুচারের জানতে সময় লাগবে না শ্লেড আর তার প্রতিবেশীদের ওপর চাপ সৃষ্টি করার কোন ইচ্ছাই নেই কেইনের, এবং তারপর ওর এখানে আসার আসল কারণও সে জেনে ফেলবে। হয়তো এরই মধ্যে জেনে গেছে। ওর সাফল্যের সঙ্গে সময়ের প্রশ্ন জড়িত রয়েছে, কিন্তু ওদিকে সে জ্যাকিকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছে রাতে দেখা করবে।

অনিচ্ছা সত্ত্বেও, পুবে বো অ্যান্ড অ্যারোর দিকে ঘোড়ার মুখ ঘোরাল কেইন। বাতাসে ভেজা তুষারকণা উড়ছে, কিন্তু ওদেরকে সে আমল দিল না। মানুষ মাত্রেরই সীমাবদ্ধতা আছে, বহুকালের মধ্যে এবারই প্রথম ওর সন্দেহ হচ্ছে যে-কাজের জন্য তাকে নিয়োগ করা হয়েছে হয়তো তাতে সে সফল হতে পারবে না।

বিপদে যাদের সাহায্য পেতে পারে মনে-মনে তাদের নামগুলো ভাবল কেইন-জ্যাকি, বব হার্ভে, যখন সে ডেনভার থেকে ফিরে আসবে তখন, এবং সম্ভবত প্যাডি রায়ান। গতরাতে বুড়ো ব্যাংকারের ওপর সন্দেহ জেগেছিল ওর, তবে রায়ান সম্পর্কে জ্যাকির মনোভাব জানার পর তা অনেকটা কেটে গেছে। মোটে এই তিনজন: একটা মেয়ে, অনুপস্থিত এক ছোকরা, আর এক বুড়ো, বুচারকে সমর্থন করতে হচ্ছে বলে যে-লোক নিজের ওপর বীতশ্রদ্ধ। আপনমনে হাসল কেইন। বুচার আর তার সাক্ষপাত্তর বিরুদ্ধে এরা বিশেষ কিছু করতে পারবে না। তা ছাড়া শহরের বেশিরভাগ লোকই সম্ভবত ওদের বিরুদ্ধে। এবং

ইরা শ্লেডের কথাও ভাবতে হবে। হোমস্টেডাররা যতক্ষণ নিশ্চিত না হচ্ছে কেইন তাদের লোক, ততক্ষণ পর্যন্ত ওদের তরফ থেকে ওর বিপদের আশঙ্কা থেকেই যাচ্ছে।

জ্যাকি বলেছে, ন্যায়-অন্যায়ের কথা না ভেবে ও যদি স্রেফ পরের হুকুমে মানুষ খুন করে, তা হলে ও খোদা এবং মানুষের চোখে বিশ্বাসঘাতক বলে বিবেচিত হবে। স্বীকার করতে বাধ্য নেই, এই অর্থে খোদা এবং মানুষ উভয়ের সাথেই ও বহুবার বিশ্বাসঘাতকতা করেছে। এখন, জ্যাকুলিনকে ভুট্ট করতে, ন্যায়ের কথা ভাবছে সে, বিচারকের আসনে নিজেকে বসিয়ে জীবনের ঝুঁকি নিচ্ছে। কিন্তু কী পাবে এর বিনিময়ে?

শীতে শিউরে উঠল কেইন, ভাবল ডগড্যান্স ত্যাগ করার সময় সঙ্গে গরম কাপড় আনা উচিত ছিল। তবে এটাও ঠিক, এই শীত কেবল ঠাণ্ডার কারণে অনুভব করছে না ও। মৃদু হাসির ছোঁয়া লাগল কেইনের ঠোঁটে। এর আগে সবসময় ক্ষমতাবানদের পক্ষে থাকত সে, আইন তাকে সমর্থন জোগাত। কিন্তু এবারের অবস্থা সম্পূর্ণ উলটো। আর উলটো বলেই একধরনের চ্যালেঞ্জ আছে এতে। আর এই চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করে ও শান্তি পাচ্ছে মনে। এবং তৃপ্তি পাচ্ছে জ্যাকুলিন হার্ডের পক্ষে আছে সে একথা জেনেও।

বাতাসে ভাসমান তুষারকণার মাঝ দিয়ে কেইন যখন বো অ্যান্ড অ্যারোর বাতি দেখতে পেল তখন প্রায় রাত। এর পরপরই আচমকা ওর ঘোড়াটা এমনভাবে সামনের পা দুটো শূন্যে তুলে পিছিয়ে আসার প্রয়াস পেল যে আরেকটু হলেই পড়ে যেত কেইন। কোনমতে টাল সামলে সামনে তাকাল ও, বিজলি চমকের আলোয় আবছাভাবে দেখতে পেল রাস্তার কিনারে পড়ে আছে একটা লোক, আপাদমস্তক তুষারে ঢাকা।

মাটিতে নেমে লোকটার পাশে হাঁটু গেড়ে বসল কেইন। টমাস হার্ডে, গুলিতে বুক এফোড়-ওফোড় হয়ে গেছে। হাত-পা অসাড়, তবে বেঁচে আছে এখনও, কিন্তু ওই পর্যন্তই। জখমের কারণে যদি নাও মরে, ঠাণ্ডায় জমে মরবে। কথাটা ভাবতেই চকিতে ব্যর্থতার গ্যানিতে ছেয়ে গেল কেইনের মন। টমাস হার্ডেকে বিপদমুক্ত রাখার জন্য নিয়োগ করা হয়েছিল তাকে, কিন্তু হার্ডেকে সে জখম থেকে রক্ষা করতে পারেনি।

এগারো

হার্ডের অসাড় দেহ স্যাডলে তুলে নিজে ওর পেছনে চাপল কেইন, ঘোড়া ছুটিয়ে বো অ্যান্ড অ্যারোর উঠনে প্রবেশ করল। বার্নে লণ্ডন জ্বলছিল একটা, কেইন ডাকল, 'জ্যাকি।'

তক্ষুণি বার্ন থেকে বেরিয়ে এল জ্যাকুলিন, লণ্ডনহাতে এগোতে এগোতে জিজ্ঞেস করল, 'ওটা কে, মাইক?'

‘তোমার বাবা। গুলি লেগেছে।’

জ্যাকির দীর্ঘশ্বাস ফেলার শব্দ শুনতে পেল কেইন। ‘বঁচে আছে?’

‘আছে, তবে এখনও কিছু বলা যাচ্ছে না।’

মাটিতে নেমে পড়েছিল কেইন, জ্যাকুলিন কাছে আসতে দেখল মাথায় উলের স্কার্ফ জড়িয়েছে মেয়েটা, গায়ে ভারি পশমি কোট। জ্যাকি বলল, ‘বার্নে ঘোড়াগুলোকে খাবার দিতে গিয়ে দেখলাম বাবার বে-টাও আছে। জানি না কতক্ষণ ধরে ও আছে ওখানে। বাবার খোঁজেই বেরোচ্ছিলাম এখন।’

হার্ভের অচেতন দেহ ঘাড়ে করে বাসায় বয়ে নিয়ে গেল কেইন। দরজা খুলে দিয়ে বাঁয়ের একটা শোবারঘর দেখাল জ্যাকি। ‘ওখানে।’ হার্ভেকে বিছানায় শুইয়ে দিল কেইন, জ্যাকি সামনের ঘর থেকে একটা ল্যাম্প এনে নড়বড়ে টেবিলের ওপর রাখল।

‘ওর চিকিৎসার জন্য একজন ডাক্তার ডাকা দরকার,’ কেইন বলল।

‘এখানে কোন ডাক্তার নেই,’ জ্যাকুলিন জানাল। ‘সবচেয়ে কাছে যে আছে সেও মন্টেরোসায় থাকে।’

হার্ভের কোট খুলে নিয়ে ক্ষতস্থান পরীক্ষা করল কেইন। দেখল যতটা আন্দাজ করেছিল চোট তত মারাত্মক নয়, ডান পাশে বুকের ওপর দিকে লেগেছে, তবে প্রচুর রক্তক্ষরণ হয়েছে।

‘চুলো জ্বলছে?’ কেইন জিজ্ঞেস করল।

‘হ্যাঁ।’

‘ঘরে লোহা থাকলে গরম দাও। ওকে চাঙা করে তুলতে হবে। গরম পানির ব্যবস্থা করো, আর সম্ভব হলে খানিকটা হুইস্কি নিয়ে এসো।’

‘কেতলি চুলোর পাড়েই আছে। এখুনি গরম হয়ে যাবে।’

‘পরিষ্কার ন্যাকড়াও লাগবে কিছু।’

মাথা ঝাঁকিয়ে, দ্রুতপায়ে কামরা থেকে বেরিয়ে গেল জ্যাকুলিন।

যখন ফিরে এল, হার্ভের জামা খুলে ফেলেছে কেইন। ‘বুক ভেদ করে বেরিয়ে গেছে বুলেট,’ বলল ও। ‘ছোট্ট একটা গর্ত। তবে ঠাণ্ডার ভেতর অনেকক্ষণ পড়েছিল এটাই যা ভয়ের কারণ।’

ক্ষতস্থান খুঁজতে তাকে অল্পটুকু হুইস্কি ঢেলে দিল কেইন। জ্যাকি দাঁড়িয়ে রইল পাশে, হাতে ল্যাম্প। নিরুত্তাপ কণ্ঠে ও জিজ্ঞেস করল, ‘বুলেট ঢুকেছে কোথা দিয়ে?’

‘পেছন?’

‘তোমার কাকে সন্দেহ হয়?’

সামান্য রক্তপাত হচ্ছিল তখনও। কেইন পরিষ্কার ন্যাকড়া দিয়ে ক্ষতস্থানে ব্যান্ডেজ বেঁধে হার্ভের শরীরের ওপর কমল টেনে দিল, যেন জ্যাকুলিনের প্রশ্নের দিকে। শেষমেশ বলল, ‘জানি না।’

টেবিলের ওপর আলোটা নামিয়ে রাখল জ্যাকি। ‘আমাদের কি কিছুই করার নেই, মাইক? শুধু বসে থেকে ওর মৃত্যুর জন্য অপেক্ষা করব?’

‘গরম রাখতে পারি ওকে। বাস। ওর বয়সটা যদি আরেকটু কম হত, ধকল

সামলে উঠতে পারতেন।

‘এবং যদি বেশি মদ না খেতেন।’ দরজার দিকে ঘুরল জ্যাকি। ‘যাই, আমি খাবারের জোগাড় করিগে।’

‘লোহাগুলো গরম হলেই নিয়ে এসো,’ হাঁক দিয়ে বলল কেইন।

বিছানার পাশে বসল ও, সামনের ঘরের ফায়ারপ্লেস থেকে আসা তাপে শরীর গরম করছে। একটু বাদে উঠে পায়চারি শুরু করল সে, দুই হাত ঘষছে পরস্পর। বুঝতে পারছে যা ভেবেছিল তার চেয়ে বেশি ঠাণ্ডা লেগে গেছে ওর।

কাগজে জড়িয়ে তিনটে লোহা নিয়ে ঘরে ঢুকল জ্যাকি। লোহাগুলো কমলের নীচে হার্ভের কাছাকাছি রেখে কেইন ওর নাড়ি দেখল। ‘যদি জ্ঞান ফেরে, এক টোক হুইস্কি খেতে দিয়ো।’

‘তুমি কোথায় যাচ্ছ?’

‘আমার ঘোড়া বাঁধতে।’

‘বাইরে বেশিক্ষণ থেক না।’ বাবার মুখের দিকে তাকাল জ্যাকুলিন, কোন রঙ নেই, নীলচে শিরা-উপশিরাগুলো ফ্যাকাসে পটভূমিতে জ্বলজ্বল করছে। ‘আমার ভয় করছে, মাইক। ভীষণ ভয়।’

‘মনে সাহস রাখ।’

কেইনের চোখে চোখ রাখল জ্যাকি। ‘আমাদের অন্য কোথাও চলে যাওয়া উচিত ছিল। গত বছর বুচার যখন এই বাথানটা কিনে নেয়ার প্রস্তাব দেয় বাবা রাজি হয়েছিলেন। কিন্তু আমি আর বব ওঁকে বুঝিয়ে ক্ষান্ত করি। এটাই আমাদের ঘর।’

‘তাই ছেড়ে যেতে চাওনি।’

মাথা ঝাঁকাল জ্যাকি। ‘কিন্তু গেলেই বোধহয় ভাল করতাম।’

‘আমার তা মনে হয় না। এরকম বহু দেখেছি আমি। একবার পিছু হটতে শুরু করলে, ব্যাপারটা অভ্যাসে পরিণত হয়ে যায়।’

লণ্ডনটা তুলে নিয়ে বাইরে গেল কেইন। অবিরাম তুষারবৃষ্টি হচ্ছে, এভাবে চলতে থাকলে শিগগিরই বরফের স্তূপ জমে যাবে। বাসায় ফিরে আগেই আবার হাত-পা ঠাণ্ডা হয়ে গেল কেইনের। টুপি আর বর্ষাতি খুলে ফায়ারপ্লেসের পাশে দাঁড়াল ও, আগুনে হাত সেকল। মাংস ভাজার গন্ধে ম-ম করছিল বাসা। ওই গন্ধে ওর খিদে চাগিয়ে উঠল আরও। অপেক্ষা করে করে প্রায় অধৈর্য হয়ে উঠেছে এই সময় জ্যাকি ডাকল, ‘খানা তৈরি।’

হার্ভের ঘরে ঢুকে ওর বুকে হাত রাখল কেইন। বুড়োর শরীর গরম হয়েছে আগের চাইতে, নাড়ি জোরাল হয়েছে। কমলটা শরীরের ওপর টেনে দিয়ে এক মুহূর্ত ওর শ্বাস-প্রশ্বাসের শব্দ শুনল কেইন, নিশ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছে হার্ভের। এর অর্থ, বুকে সর্দি বসে গেছে, এ-অবস্থায় বড়জোর দু-একদিন বাঁচবে। রান্নাঘরে গিয়ে জ্যাকুলিনের থমথমে চেহারা দেখেই কেইন বুঝতে পারল জ্যাকিকে দুঃসংবাদটা ওর না জানালেও চলবে।

খেতে বসার আগে গরম গরম দুকাপ কফিপান করল কেইন। ক্ষমা চাওয়ার ভঙ্গিতে জ্যাকুলিন বলল, ‘তখন আমার রান্নার খুব বড়াই করেছিলাম। কিন্তু এব

চাইতে ভাল কিছু করা সম্ভব হলো না।

‘এত ভাল রান্না এর আগে আমি কখনও খাইনি,’ এক টুকরো মাংস চিবুতে-চিবুতে বলল কেইন। তারপর জিজ্ঞেস করল, ‘আর লোহা আছে ঘরে?’

‘আগুন দিয়েছি। আমাদের খাওয়া শেষ হলেই নিয়ে যাব বাবার কাছে। আচ্ছা, মাইক, তোমার কী কোনই ধারণা নেই কীভাবে কী হয়েছে?’

‘কী করে আন্দাজ করব বল? আমি ওঁকে তোমাদের বাসার কাছেই পেয়েছি। তবে মনে হয় আহত অবস্থায় এতদূর আসার পর আর থাকতে পারেননি স্যাডলে।’

‘নিশ্চয় বুচারের কাজ। কিন্তু এমন করল কেন সে? ও ভাল কব্বরই জানে বাবা ওর বিরুদ্ধে যাবেন না। কখনোই যাননি। আমাদের সামনে যতই হুমিভম্বি করুন, বুচারের কাছে গেলেই একদম বরফ হয়ে গেছেন।’

নীরবে মাথা ঝাঁকাল কেইন। স্টারলাইটের পেছনের কামরায় হার্ভে কীভাবে সমর্থন জুগিয়েছিল বুচারকে ওর তা মনে আছে। পাশাপাশি, আজ সকালে হার্ভের সঙ্গে যেসব কথাবার্তা হয়েছে ওর সেগুলোও মনে আছে। সাহস জিনিসটা, ও জানে, ভারি অদ্ভুত। এমনটা হওয়া খুবই সম্ভব ধৈর্যের বাঁধ ভেঙে গিয়েছিল টমাস হার্ভের, এবং সে-কথা সে স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছিল বুচারকে। সেক্ষেত্রে বুচার অনুভব করেছে হার্ভে তার বিপদের কারণ হতে পারে, তাই সচেপ্ট হয়েছে পথের কাঁটা সরিয়ে দিতে।

যখন শেষ হলো ওদের খাওয়া, চুলো থেকে লোহাগুলো নামিয়ে কাগজে জড়িয়ে দিল জ্যাকি, কেইন সেগুলো ওর বাবার ঘরে নিয়ে গেল। ঠাণ্ডা লোহাগুলো সরিয়ে সে-জায়গায় গরমগুলো রাখল ও। হার্ভের অবস্থার কোন উন্নতি হয়নি, বরং শ্বাসকষ্ট আরও বেড়েছে।

রান্নাঘরে ফিরে গেল ওরা, কেইন কোমর থেকে তার মানি বেল্টটা খুলল। ডেনভারে বব ওকে যে-টাকা দিয়েছিল সেগুলো বের করে টেবিলে রেখে বলল, ‘তোমরা আমাকে নিয়োগ করেছিলে তোমাদের বাবাকে রক্ষা করতে। আমি পারিনি। যে-কাজ আমি করিনি সে-কাজের জন্য আমি টাকা নিই না।’

‘নিজেকে দোষী কর না,’ ভৎসনা করল জ্যাকি। ‘তুমি কীভাবে আগেভাগে জানবে বাইরে বাবা এভাবে গুলি খাবেন। ও টাকা তুমি রেখে দাও।’

‘সম্ভব না,’ কেইন নিজের সিদ্ধান্তে অটল। ‘আমার নীতি অন্যরকম-কাজ কর পয়সা নাও।’

এক মুহূর্ত ওর দিকে আগুন চোখে তাকিয়ে রইল জ্যাকি, জেদের ছাপ ফুটেছে চেহারায়, তারপর যেন হঠাৎ করেই ভেঙে পড়ল। ‘দোষ যদি কারও হয় সেটা বব আর আমার। বাবা যখন বাড়ি বেচতে চাইছিলেন আমাদের আপত্তি করা উচিত হয়নি।’

উঠে নিজের কাপে কফি ঢেলে নিল কেইন, জিজ্ঞেস করল, ‘ভাল জাতের ঘাড় আনছ তোমরা, বুচার আপত্তি করেনি?’

টেবিলে এসে বসল জ্যাকি। ঠোটজোড়া কাঁপছে, তবে অতিকষ্টে কান্না সামলে রাখল। কেইন ওর মুখোমুখি একটা চেয়ারে বসল, জ্যাকির মনের অবস্থা

উপলব্ধি করছে। সিগারেট বানাল ও, অনুভব করছে মেয়েটাকে এখন কথায় ভুলিয়ে রাখতে হবে, ওর দুঃখ এতে হালকা হয়ে যাবে অনেকটা।

‘আনতে নিষেধ করেছে,’ খানিক পর বলল জ্যাকি। ‘বুচারের মতে ভালই চলছে আমাদের ব্যবসা, তা ছাড়া সে চায় না কম্বাইন ভেঙে যাক। প্যাডি রায়ান টাকা ধার দিয়েছে আমাদের। এই একটামাত্র ক্ষেত্রে দেখলাম ও বুচারের কাছে মাথা নোয়ায়নি। আমার ধারণা টাকার ব্যাপারটা বুচার জানেও না।’

‘তার মানে তুমি আর বব ঠিক করেছ আলাদাভাবে তোমাদের ব্যবসা চালাবে, কম্বাইনের সাথে না?’

ওপর-নীচ মাথা ঝাঁকাল জ্যাকি। ‘বাবার অবস্থা দেখে আমাদেরই লজ্জা হয়। সেজন্যেই বাথান বেচতে দেইনি। আমরা তাঁকে বলেছি তাঁর ইচ্ছে হলে তিনি চলে যেতে পারেন, কিন্তু আমরা এখানেই থাকছি। আমরা আমাদের গরু পুবে যে-পাহাড়টা আছে সেখানে চরাব। অ্যাঞ্জেল পীক আমাদের ব্যবহার না করলেও চলবে।’

‘শীতে?’

‘মোর্যানের সাথে রফা হয়েছে। শীতকালে নদীর ধারে ও আমাদের জায়গা দেবে।’

‘বুচার জানে মোর্যানের সাথে তোমাদের রক্ষার কথা?’

এপাশ-ওপাশ মাথা নাড়াল জ্যাকি। ‘বব ডেনভারে কেন গেছে তাও জানে না ও। আমরা যখন গরু কেনার কথা বলেছি বুচার নিষেধ করেছে। ও ধরে নিয়েছে ওখানে চুকে গেছে মামলা।’

কফি শেষ করে খালি কাপটা নামিয়ে রাখল কেইন। ‘আমাকে নিয়োগ করার সাথে তোমাদের এই ব্যবসা পরিকল্পনার কোন সম্পর্ক আছে?’

কোলের ওপর ফেলে-রাখা নিজের হাত দুটোর দিকে তাকাল জ্যাকুলিন। ‘আছে। আমাদের মনে হয়েছিল বুচার না মরলে এই মেসায় শান্তি ফিরে আসবে না। কিন্তু এখন নিজের ওপরেই ঘেন্না হচ্ছে আমার। নিজেদের স্বার্থের জন্য তোমাকে ব্যবহার করছি-অথচ আমরা নিজেরা সেই কাজ করতে ভয় পাই।’ চোখ তুলল ও, দৃষ্টিতে জেদ। ‘কিন্তু এ ছাড়া আর কী করতামই বা বল? বাবা যা করেছেন, আমরা সেভাবে মাথা নত করে চলতে পারব না।’

‘ন্যায়বিচার,’ মৃদু সুরে বলল কেইন। ‘আজব একটা শব্দ।’

‘ঠিক আছে, তোমার যা ইচ্ছে হয় বলতে পার,’ ক্রুদ্ধ সুরে বলল জ্যাকুলিন। ‘তোমার হয়তো মনে হতে পারে, স্টেজে আমি যে-কথাগুলো বলেছিলাম আমার মনের কথা না সেগুলো-কিন্তু সেটা সত্যি না। স্বীকার করছি আমি আর বব স্বার্থপরের মত কাজ করেছি। কিন্তু মানুষ যা করতে চায় তা করার অধিকার তার থাকা উচিত, অথচ আমাদের তা নেই।’

‘না, আমি বলছি না এটা তোমার মনের কথা নয়। তবে ন্যায়-অন্যায় সম্পর্কে প্রত্যেকেরই বোধহয় নিজস্ব কিছু ধারণা থাকে। আমার বিশ্বাস বুচারও এর ব্যতিক্রম না।’

‘ব্যাপারটা আমি এভাবে কখনও ভেবে দেখিনি। বোধহয় তাই।’

আরেকটা সিগারেট বানাল কেইন। 'আমার বিশ্বাস আমাদেরকে এখন নতুন কায়দা ঠাউরাতে হবে।'

উঠে দাঁড়াল জ্যাকুলিন, চেহায়ায় কষ্ট। 'বেশ, তোমার যদি ইচ্ছে হয়, কালকের স্টেজে-'

'আমি যাচ্ছি না।' সিগারেট ধরাল কেইন। 'সাউথ পার্কের বাথানটার কথা তোমাকে বলেছি। এখন মনে হচ্ছে, তোমাদের ব্যবসায় টাকা খাটাব-অবশ্যই তোমাদের যদি কোন আপত্তি না থাকে। এপাশ-ওপাশ মাথা নাড়াল কেইন। 'এই-জীবন আর ভাল্লাগছে না আমার। তাই ঠিক করেছি পিস্তল যদি ধরতেই হয়, নিজেকে বাঁচানোর জন্যেই ধরব-কারও হুকুমে না।'

ধপ করে চেয়ারে বসে পড়ল জ্যাকি। 'তার মানে তুমি পিস্তল ধরার বিনিময়ে বো অ্যান্ড অ্যারোর অর্ধেক শেয়ার কিনতে চাইছ?'

ধোঁয়ার ভেতর দিয়ে ওর পানে তাকাল কেইন, সহসা নিজেকে যেন ওর দারুণ স্বার্থপর বলে মনে হচ্ছে। একটু বাদে কেইন বলল, 'তোমার নিশ্চয়ই খুব ঘেন্না হচ্ছে আমার ওপর।'

'না, না। আমি শুধু জানতে চাইছি।'

'পিস্তল ছাড়াও দেয়ার মত আরও কিছু আছে আমার,' বলল কেইন। 'টাকাই দুনিয়াতে সব। ষাড় কেনার জন্য রায়ানের কাছ থেকে ধার করতে হয়েছে তোমাদের। নিজেদের সামান্য যা কিছু ছিল সেটা শেষ করেছ আমাকে নিয়োগ করতে গিয়ে। ঠিক?'

'ঠিক।'

'এখন বুচার যদি নরম না হয়, রায়ান আর সাহায্য করবে না তোমাদের। তখন কী হবে?'

'একদম শেষ হয়ে যাব আমরা,' জ্যাকুলিন বলল কান্না-ভেজা গলায়।

'বেশ। আমার কাছে হাজার দশেক ডলার আছে। সেটা আমি তোমাদের ব্যবসায় খাটাব। বুচার আর তোমাদের রেঞ্জের সীমানায় বেড়া দেব আমরা। তারপর আরও কিছু গরুবাছুর কিনব, সাহসী লোক ঠিক করব। তারপর দেখি বুচার কী করে? আমরা ওর শেষ দেখে ছাড়ব, জ্যাকি, মরণকামড় দেব।'

এবার সত্যি-সত্যি কাঁদতে শুরু করল মেয়েটা। কেইন উঠে, টেবিলের কোনা ঘুরে ওর পাশে গিয়ে দাঁড়াল। জ্যাকির কাঁধে হাত রেখে ও মৃদু কণ্ঠে বলল, 'কেন না, আমি শুধু ভাল হবার একটা সুযোগ চাইছি।'

কেঁপে উঠল জ্যাকুলিন, কাঁধ ঝুলে পড়েছে, তারপর পকেট থেকে রুমাল বের করে ও চোখ মুছল। 'আমি কেন কাঁদছি তুমি বুঝতে পারছ না, মাইক। এতদিন ধরে ঠিক এ-জিনিসটারই স্বপ্ন দেখছিলাম আমরা-আমি আর বব। বুচারকে মোকাবেলা করার মত যথেষ্ট টাকা আর একজন সাহসী পার্টনার। বলতে লজ্জা নেই, ওকে ভয় পাই আমরা।'

'লজ্জার কী আছে? এক-আধটু ভয় সবারই আছে। আমারও।'

পলক তুলল জ্যাকুলিন, বিস্মিত হয়েছে। 'না, তোমার নেই।'

মুখে অনাবিল হাসি ছড়াল কেইন। 'আছে, তবে বুচার সেটা জানে না।'

এখানেই তো কারসাজি। কখনও প্রতিপক্ষকে তোমার মনের অবস্থা জানতে দেবে না।' নিজের চেয়ারে ফিরে গেল কেইন, ওর ভীষণ ইচ্ছে জ্যাকিকে জানায় ওকে সে ভালবাসে। তারপর ভালল এখনও কথাটা বলার সময় আসেনি। কেইন জিজ্ঞেস করল, 'তা হলে আমাদের ও-কথাই রইল?'

'নিশ্চয়,' জ্যাকি বলল। 'বাবার যা-ই ঘটুক, এর নড়চড় হবে না।'

'বব অমত করবে না?'

'ওকে আমি জানি, মাইক। আমাদের দুজনের চিন্তাভাবনায় মিল আছে। যমজরা বোধহয় এরকমই হয়।'

সিগারেটের মশলার দিকে হাত বাড়াল কেইন, প্রশান্তিতে ভরে উঠেছে মন। জীবনে এই প্রথম এত সুখ অনুভব করছে সে। এবার সে নিজের জন্য লড়াই করবে। আড়চোখে জ্যাকুলিনকে দেখল ও, বুঝতে চেষ্টা করল মেয়েটা আসলেই ওর মনোভাব আঁচ করতে পেরেছে কিনা।

'প্যাডি রায়ানের সাথে কথা বলে শাইয়েন থেকে আমরা টাকাগুলো আনিয়ে নেব,' কেইন বলল। 'তারপর দেখাব বুচারকে কত ধানে কত চাল।'

বারো

লোহাগুলো আবার বদলে দিয়ে হার্ভের বিছানার পাশে বসে রইল কেইন, জ্যাকি থালাবাসন সাফ করতে গেল। যখন সারা হলো কাজ, শোবার ঘরে এসে ও জিজ্ঞেস করল, 'কোন উন্নতি?'

'না।'

'বাবা বাঁচবেন না, তাই না?' যখন কেইন কোন জবাব দিল না, ও বলল, 'আমি জানি। তোমাকে বলতে হবে না।' তারপর একটু থেমে ফ্যাসফ্যাসে কণ্ঠে যোগ করল, 'শুধু দুঃখ রয়ে গেল, জানতে পারলাম না কীভাবে ঘটেছে ব্যাপারটা।'

'দোয়া কর, উনি যেন জ্ঞান ফিরে পেয়ে আমাদের সেটা জানাতে পারেন। তুমি বরং ঘুমোতে যাও। আমি থাকছি ওর কাছে।'

প্রবলভাবে এপাশ-ওপাশ মাথা নাড়াল জ্যাকুলিন। 'আমার ঘুম আসবে না। আমি—'

সামনের দরজা খুলে একজন লোক ডাকল, 'জ্যাকি।'

'ওই বব এল,' ডুকরে উঠল জ্যাকি, একছুটে বেরিয়ে গেল শোয়ার ঘর থেকে।

কেইন পিছু নিল। জ্যাকুলিনকে তখন জড়িয়ে ধরেছিল ওর ভাই, উৎফুল্ল কণ্ঠে বলছিল, 'গরু কিনেছি। সামনের সপ্তাহেই এসে পড়বে কোল্যাটাসে। ওদের দেখলে তুই পাগল হয়ে যাবি, জ্যাকি। ইয়া শরীর—' কেইনের ওপর চোখ পড়তেই থতমত খেল রবার্ট হার্ভে, চেহারায় নিখাদ বিস্ময়। 'হাউডি, কেইন,'

বলল ও। 'তোমাকে এখানে দেখব আশা করিনি।'

'ভালই হলো তুমি ফিরে এসেছ,' কেইন বলল।

ববের কাছ থেকে সরে দাঁড়াল জ্যাকুলিন, আড়চোখে তাকাল কেইনের দিকে, নীচের ঠোঁট কামড়ে ধরেছে। বব তার কোটখানা খুলে ভাল করে ঝোড়ে নামিয়ে রাখল একটা চেয়ারের ওপর, তারপর ওর টুপিটা খুলল। কোথাও একটা কিছু গোলমাল আছে আঁচ করে ও জিজ্ঞেস করল, 'কী ব্যাপার?'

'বাবার গুলি লেগেছে।' মাথা ঝাঁকিয়ে শোবার ঘরটা দেখাল জ্যাকুলিন।

'ওখানে আছেন, জ্ঞান নেই। উনি বাঁচবেন না, বব। আমি জানি।'

ব্রহ্মপায়ে লিভিং-রুম থেকে বেরিয়ে গেল বব, পেছনে জ্যাকি। এক মুহূর্ত পর ফিরে এল ওরা, পিতার মুমূর্ষু অবস্থা দেখে ববের চোয়াল ঝুলে পড়েছে। ও জিজ্ঞেস করল, 'কীভাবে হলো?'

'জানি না,' কেইন বলল। 'রাস্তার পাশে ওঁকে পড়ে পেয়েছি আমি। দূরে কোথাও গিয়ে চোট পেয়েছেন, এখানে না। ঠাণ্ডার মধ্যে অনেকক্ষণ অজ্ঞান হয়ে পড়েছিলেন বাইরে।'

'কোথায় লেগেছে?'

'বুকে। পেছন থেকে।'

একটা চেয়ারে নেতিয়ে পড়ল বব, চোখ জ্যাকুলিনের দিকে ঘুরে গেছে। এ-মুহূর্তে ওকে ভীষণ অসহায় দেখাচ্ছে, যেন একজন কিশোর সাহায্য আর শক্তির আশায় চেয়ে আছে বড় বোনের মুখ পানে। নিরুত্তাপ গলায় বব বলল, 'এখন কী করব আমরা?'

'আপাতত কিছু না,' জ্যাকুলিন জবাব দিল। 'এখন আমাদেরকে বসে থাকতে হবে বাবার পাশে, যদি জ্ঞান ফিরে পেয়ে কিছু বলেন।'

'জীবনে কারও কোন ক্ষতি করেননি বাবা,' রবার্ট বলল, গলা কাঁপছে। উনি স্নেহ—'

কথাটা শেষ করতে পারল না বব, তবে কেইন অনুভব করল ও কী বলতে চাইছিল। টমাস হার্ভের মত একজন অপদার্থ লোককে হত্যা করার পেছনে কোন যুক্তি থাকতে পারে না। সংসারে কারোরই, এমনকী তার সন্তানদেরও, সত্যিকারের শ্রদ্ধাবোধ ছিল না বাবার ওপর। হার্ভে জানত সেকথা। কেইন অনুমান করল জ্যাকি বা বব কেউই সম্ভবত জানে না বুচারের কাছে কেন নতিশীকার করেছে তাদের বাবা।

'অপেক্ষা ছাড়া এ-মুহূর্তে আমাদের আর কিছু করার নেই,' কেইন নিজের অভিমত প্রকাশ করল। 'যদি ওঁর জ্ঞান ফেরে, আমরা জানতে পারব কে এর জন্য দায়ী।'

'গুলি পেছন থেকে লাগছে উনি জানবেন—' জ্যাকুলিন শুরু করেছিল।

'আমি জানি,' ওকে বাধা দিয়ে বলল কেইন। 'তবে উনি দিনের বেশির ভাগ সময় বাইরে ছিলেন। আমরা যদি জানতে পারি কোথায় গিয়েছিলেন, কী কী করেছেন, তা হলে বাকিটা অনুমান করে নেয়া শক্ত হবে না।' একটু ইতস্তত করল ও, জ্যাকি আর ববের মনে আঘাত দিতে চায় না বলে চিন্তাভাবনা করে—

শব্দ বাছাই করেছে, অনুভব করেছে আজ সকালে হাঠে তাকে যেসব-কথা বলেছে সেসব ওদেরকে জানানো উচিত হবে না। আবার খেই ধরল কেইন। 'এই পেশায় একটা শিক্ষা হয়েছে আমার। মানুষ অনেক সময় নিজের জীবনের ওপর এত হাঁফিয়ে ওঠে যে উদ্ভট সব কাণ্ড করে বসে। এমন কিছু যা তোমরা কল্পনাও করতে পারবে না।'

'তার মানে?' জানতে চাইল বব।

'তোমাদের ব্যবসার কথা জ্যাকি আমাকে বলেছে। বুচার অমত করেছে এতে তাও জানিয়েছে ও। নিজের স্বার্থহাসিলের জন্য বুচার যদি কম্বাইনকে তার হাতিয়ার মনে করছে, ততদিন সে যেভাবে পারে তোমাদের ইচ্ছায় বাধা দেয়ার চেষ্টা করবে। তোমাদের বাবা জানতেন একথা। হয়তো আরও বহুকিছুই জানতেন উনি যা তোমরা ভাবতেও পারনি কোনদিন। আমার ধারণা উনি বুচারের সঙ্গে একটা বোঝাপড়া করতে গিয়েছিলেন।'

'অসম্ভব,' তিক্ত সুরে বলল রবার্ট। 'বাবার দ্বারা এতবড় কাজ হতেই পারে না। ওঁকে আমি বিশ বছর ধরে দেখে আসছি। ওঁর সে-সাহস নেই।' কেইনের চোখে চোখ রাখল বব। 'আমি জানি, বুচার বললে উনি নাকে খত দিতে পর্যন্ত রাজি হতেন।'

'তোরা ধারণা ঠিক নাও হতে পারে।' ভাইয়ের কাঁধে হাত রাখল জ্যাকুলিন। 'বাবা আমাদের ভালবাসতেন। হয়তো এসব আর সহ্য হচ্ছিল না ওঁর। আ... আমার মনে হয় কেইনের ধারণাই ঠিক।'

দুহাতের মুঠি পাকাল বব। 'আমারও তাই মনে হয়, কিন্তু বিশ্বাস করতে বাধ্যছে। বাবা মারা গেলে একটুও দুঃখ পাব না আমি। ওঁকে নিয়ে আমাদের গর্ববোধ করার কিছু নেই। বাড়ি ফেরার সময়ে আমার কেবলই মনে হচ্ছিল, গরু কেনার জন্য বাবা চোটপাট করবেন আমার ওপর, বলবেন বুচার সহ্য করবে না এটা, ওর সাথে ঝামেলা করে আমরা সুবিধে করতে পারব না।'

'আমার বিশ্বাস তুমি ভুল বুঝেছ,' কেইন বলল। 'হয়তো উনি তোমাদের জন্য সত্যিই গর্ববোধ করতেন কিন্তু পাশাপাশি জানতেন বুচার তোমাদের কী ক্ষতি করতে পারে। তাই হয়তো সমস্ত আপদ-বিপদ থেকে দূরে রাখতে চাইছিলেন তোমাদের।'

'গর্ব!' ক্ষিপ্ত সুরে টেঁচিয়ে উঠল বব। 'হাহু, আমার ধারণা এর অর্থ কী তাই উনি জানেন না।'

'চুপ কর, বব।' ভাইয়ের হাত চেপে ধরল জ্যাকুলিন। 'একটা কথা ভুলে যাবি না, যত দোষই থাকুক-উনি আমাদের জন্মদাতা।'

উঠে, ফায়ারপ্রেসের ধারে গেল রবার্ট। 'শহরে রায়ানের সঙ্গে দেখা হয়েছে। ও বলল শ্লেডের সাথে একটা রফা হয়েছে তোমার। আটচল্লিশ ঘণ্টার ভেতর সব সমস্যার সমাধান করে দেবে তুমি। তোমার সেই সময় শেষ হতে কিন্তু আর খুব বেশি বাকি নেই, কেইন।'

'এরকম একটা রফায় আসা ছাড়া আমার কোন উপায় ছিল না,' কেইন বলল। 'এখানকার অনেক কথাই তুমি ডেনভারে বলনি আমাকে। হয়তো তুমি

জানতে না, কিন্তু এখন সেগুলো মাথাচাড়া দিয়ে উঠছে।'

'শ্লেডের কাছে আমাদের কোন দায় নেই,' স্বার্থপরের মত বলল বব। 'ওকে তুমি লড়তে দিলে না কেন?'

'দায় নেই ঠিক,' স্বীকার করল কেইন, 'কিন্তু একবার গোলাগুলি শুরু হলে তাতে কে মরবে আর কে বাঁচবে একথা বলা যায় না আগাম। তোমার বাবাকে আমি বিপদ থেকে রক্ষা করতে পারিনি সত্যি—কিন্তু জ্যাকি আর তোমাকে কোন ঝামেলায় পড়তে দেব না।' একগাল হাসল ও। 'বুচারকে আমি কথা দিয়েছি, এই রেঞ্জের সমস্ত জঞ্জাল সাফ করে ফেলব। তবে ওকেই যে তাড়াতে চাইছি এটা বলিনি। ও যদি তোমার বাবাকে গুলি করে থাকে—এর শাস্তি ওকে পেতে হবে।'

'ওটা আমার দায়িত্ব,' একগুয়ে সুরে বলল বব। 'উনি আমার বাবা।'

'না, দায়িত্বটা আমার,' শান্ত কণ্ঠে যুক্তি দেখাল কেইন। 'খেলা আমি শুরু করেছি, কীভাবে শেষ করতে হবে একমাত্র আমিই জানি। তোমার সাহায্য আমার লাগবে, তবে এখনি না। আপাতত তুমি চুপচাপ থাক।'

'ঠিক,' সমর্থন করল জ্যাকুলিন। 'এ-কাজের জন্যই ওকে আমাদের নিয়োগ করা।'

চুপ করে রইল রবার্ট। ফায়ারপ্রেসের দিকে পিঠ দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে, কপালে চিন্তার ভাঁজ। একটুক্ষণ পর দায়সারা গলায় বলল, 'ঠিক আছে, কেইন। তোমার কথাই থাকল।'

কেইন ওর টুপি তুলে নিল। 'আশা করি তোমরা দুজনেই সামলাতে পারবে এদিকটা। আমি শহরে যাচ্ছি।'

'এরকম ঝোড়ো রাতে!' আপত্তি করল রবার্ট।

'উপায় নেই। তবে একটা কোট পেলে ভাল হত।'

'বাবারটা এনে দিচ্ছি,' বলে রান্নাঘরের ভেতর ঢুকে গেল জ্যাকুলিন।

'তুমারপাত হচ্ছে এখনও?' কেইন জানতে চাইল।

মাথা নাড়াল বব। 'তবে ভয়ানক ঠাণ্ডা।'

জ্যাকুলিন ওর বাবার কোটহাতে ফিরে এল। কেইনের জন্য ঢোলাই হলো ওটা, তবে কাজ চলবে। কোটের বোতাম লাগিয়ে হ্যাট চাপাল ও, তারপর নিজের বর্ধাতিটা তুলে নিল।

'একুণি কোনরকম গোলমালের আশঙ্কা করছি না,' কেইন বলল, 'তবে বুচারের মতলব বোঝা কঠিন। তোমরা দরজা আটকে অস্ত্রপাতি হাতের কাছেই রেখ।'

'এতটা সাহস ওর হবে না,' রবার্ট বলল। 'শেরিফ সহ্য করবে না এসব। বুচারকে ও ভয় পায় না।'

'তা হয়তো পায় না, তবে শেরিফ এখন শহরে নেই। তা ছাড়া বুচার সব দোষ শ্লেডের ঘাড়ে চাপাতে পারবে।' লগুনটা তুলে নিয়ে শিখা বাড়িয়ে দিল কেইন। 'তোমরা একটু সাবধানে থেক।'

জ্যাকি ওর কাঁধে হাত রেখে আলতো চাপ দিল। 'তুমিও সাবধানে থেক,

মাইক।

‘থাকব।’ জ্যাকুনিনের চোখে স্পষ্ট উদ্বেগ দেখতে পেল কেইন। ‘যাইহোক, একটা জিনিস এখন আমাদের কাছে পরিষ্কার-বাকীদের সলভেয় কে আগুন দিয়েছে।’

‘কে?’

‘রাফেলা। আর এখানেই হয়েছে আরেক বিপদ। মহিলাদের সাথে কীভাবে লড়তে হয় আমি জানি না।’ বিদায় জানিয়ে বাইরে বেরিয়ে গেল কেইন।

পশ্চিমে ছুটে চলল ও। আকাশ এখন পরিষ্কার, জুলজুল করছে অসংখ্য তারা। ঘাড়ের ওপর কোটের কলার তুলে দিয়েছে কেইন, তবু মাইলখানেক যেতে-না-যেতেই ওর হাত-পা হিম হয়ে এল। পাহাড় থেকে নেমে-আসা হাওয়া যেন ছুরি চালাচ্ছে ওর হাড়ে। এখানকার আবহাওয়া সচরাচর কেমন থাকে কেইন জানে না, তবে ওর মনে হলো এবার শীত যেন আগেভাগে এসে পড়েছে।

এখনও যেসব গুরুবাহুর পার্বত্য এলাকায় রয়ে গেছে সেগুলোর অবস্থা ভাল ও। বড়রকমের লোকসান সামলাতে পারবে না বো অ্যান্ড আরো। এখন যেহেতু ওদের ব্যবসায়ে নিজের টাকা খাটাচ্ছে সে, এই লোকসানের আঁচ তার গায়েও লাগবে। সি.সি. রেষ্ট যখন দৃষ্টিসীমার ভেতর এল কেবলমাত্র তখনই কেইনের মনে পড়ল বো অ্যান্ড আরোতে ওর টাকা লগ্নি করার কথা রবার্টকে জানাতে সে ভুলে গেছে। তারপর ভাল একপক্ষে ভালই হয়েছে না বলে। ব্যবসার ভালমন্দ চিন্তা করার মত মানসিক অবস্থা এখন ছোকরার নেই।

কেইন যখন রাস্তা ছেড়ে বাথানের পথ ধরল তখন বুচারের বিশাল র‍্যাঙ্ক হাউস আলোয় ঝলমল করছে। এদিকে তুষারপাত বড় একটা হয়নি, বাতাসও এ-মুহূর্তে পড়ে এসেছে। হিচ রেইলে অন্য একটা ঘোড়ার পাশে নিজেরটা বেঁধে রেখে সিঁড়ি বেয়ে বারান্দায় উঠল কেইন, ভাবছে কে থাকতে পারে ভেতরে। সম্ভবত গ্যারিটি, কেইন সম্পর্কে ওর ধারণা জানাতে এসেছে বুচারকে। এতে পরিস্থিতির তেমন একটা ইতিবাচক হবে না, যদি আগেই টমাস হার্ডে সবকিছু কাস করে দিয়ে থাকে। খণ্টার দড়ি মেলল কেইন, স্পষ্ট ওমতে পেল অন্দরমহলে কোথাও ঢং করে বোজে উঠল একটা জলদগড়ীর ধাতব আওয়াজ। এবার কোটের বোতাম খুলল ও, খাপের ভেতর টিলে করে রাখল পিস্তলটা। বিপদের আশঙ্কা করছে না সে, তবে গ্যারিটি এখানে থাকলে পরিস্থিতি কোন দিকে গড়ানে কিছুই বলা যায় না।

ঘোড়াসোটা এক মেক্সিকান মহিলা দরজা খুলে ডাকল ওর দিকে, গারো ঠাণ্ডা বাতাস লাগতে আপনা থেকে কেঁপে উঠল সে। কেইন জিজ্ঞেস করল, ‘মিস্টার বুচার আছেন?’

‘নি, সিনর। তবে উনি এখন ব্যস্ত-’

‘আমার সাথে ঠিকই দেখা করবেন।’ কাঁধের ধাক্কায় কপাট খুলে ভেতরে ঢুকে গেল কেইন, ক্রুদ্ধ রমণীর দিকে তাকিয়ে হাসল একগাল। ‘বাইরে শীত ঠাণ্ডা। এ-অবস্থায় এখানে থাকা ঠিক না।’

‘কে এল, মারিয়া?’

ওপরে তাকাল কেইন। কামরার শেষপ্রান্তে যে-সিঁড়ি, তার মাথায় দাঁড়িয়ে আছে রাফেলা। ঘরের মাঝখানে ভারি একটা ওক টেবিলের ওপর বড় লাম্প জ্বলছে, কিন্তু তার আলো সিঁড়ির মাথা অবধি পৌঁছাচ্ছে না। ফলে কেইন যেখানে দাঁড়িয়ে সেখান থেকে রাফেলার মুখ পরিষ্কার দেখতে পেল না ও।

‘আমি কেইন, মিসেস বুচার,’ বলল ও। ‘তোমার স্বামীর সঙ্গে দেখা করতে এসেছি।’

দ্রুতপায়ে নীচে নেমে এল রাফেলা, মৃদু কণ্ঠে বলল, ‘ঠিক আছে, মারিয়া। আমি কথা বলছি ওর সাথে।’

‘কিন্তু সিনর বুচার যে বললেন—’

‘আহু,’ ঝামটা মারল রাফেলা। ‘তুই রান্নাঘরে গিয়ে তোর কাজ করগে।’

খানিক দোনোমনো করল ঝি, বুঝতে পারছে না এখন তার কী করা, তারপর দুপ্‌দুপ্ করে পা ফেলে চলে গেল ঘর ছেড়ে। যখন বন্ধ হয়ে গেল রান্নাঘরের দরজা, সিঁড়ির গোড়া থেকে নিচু স্বরে রাফেলা জিজ্ঞেস করল, ‘তুমি কেন এসেছ, কেইন?’

ওর কাছে গেল কেইন, লক্ষ করল মহিলা রাইডিং-স্কাট আর চামড়ার জ্যাকেট পরে আছে, কোট আর মাথার স্কার্ফটা পড়ে আছে ফায়ারপ্রেসের পাশে বিরাট একটা কাউচের ওপর। কেইনের সন্দেহ হলো এখানে একটা কিছু ঘটতে যাচ্ছিল এখন, সে নিতান্ত অসময়ে এসে পড়েছে। তার পর ভাবল এটা তার অমূলক আশঙ্কাও হতে পারে, স্বায়ুর চাপে ভুগছে বলে সবকিছুতেই সাপ দেখছে।

‘বুচারের সঙ্গে দেখা করতে।’

‘তুমি ওর পক্ষে কাজ করছ না,’ রাফেলা বলল, ‘তা হলে দেখা করবে কেন?’

দ্বিধায় পড়ল কেইন, ভাবছে মহিলা ডগড্যাঙ্গে ওর আসার কারণ জানল কীভাবে। শহরে যে-রাফেলা বুচারের সাথে ওর আলাপ হয়েছিল তার সাথে এই মহিলার যেন কোন মিল নেই। তখন ওর মনে আত্মবিশ্বাসের ছাপ দেখেছিল সে, কিন্তু এখন দেখছে সংশয়কে। যেন একটা কিছু করার সিদ্ধান্ত নিয়ে অন্তর্দ্বন্দ্বে ভুগছে রাফেলা, ঠিক বুঝে উঠতে পারছে না কাজটা আদৌ করা উচিত হবে কি-না।

‘তুমি কীভাবে জানলে আমি বুচারের লোক না?’ কেইন প্রশ্ন করল।

ওর প্রশ্নকে উপেক্ষা করল রাফেলা। অসহিষ্ণু কণ্ঠে বলল, ‘শোন, কেইন। আমার হাতে সময় নেই। এখানে আসার পর থেকেই ঝামেলা পাকাচ্ছ তুমি। তোমাকে বললাম চলে যেতে, কিন্তু তুমি তা শুনলে না। এখনও সময় আছে, তুমি চলে যাও—হার্ভেরা যা দিয়েছে তার দ্বিগুণ টাকা তোমাকে দেব আমি।’

‘গ্যারিটি বলেছে আমি হার্ভেদের হয়ে কাজ করছি।’

‘ও অনুমান করেছে। আর আজ সকালে টমাস হার্ভেও তা-ই বলেছে বিলকে।’ ঘরের ওপাশের দীর্ঘ করিডরের দিকে ঝট করে একবার তাকাল

রাফেলা, তারপর ওর চোখ আবার ফিরে এল কেইনের ওপর। 'আমি আগেই বলেছিলাম তোমাকে, দরকার হলে বিল তার বন্ধুদের পিঠে ছুরি মারতে কসুর করবে না-টমাস হার্ডেকে ইতিমধ্যেই সে ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছে।'

ওপর-নীচ মাথা ঝাঁকাল কেইন। 'জানি। ওকে আমি ট্রেইলের ওপর পড়ে পেয়েছি।'

'মারা গেছে?'

'একরকম তাই। কে গুলি করেছে?'

'টড জার্ডিস।'

'তুমি নিজে চোখে দেখেছ?'

'না, তবে এধরনের কাজগুলো সাধারণত টডই করে থাকে। তা ছাড়া মারিয়ার কাছে শুনেছি। টমাসের সাথে সকালে দারুণ ঝগড়া হয়েছে বিলের। টমাস বলতে এসেছিল তার ছেলেমেয়ের ব্যবসায় বাধা দিলে বুচারকে সে খুন করবে। ওই সময়েই টড ছিল এখানে। টমাস চলে গেলে ও তার পিছু নেয়। এবং এর পরপরই গুলির আওয়াজ শুনে পায় মারিয়া। এবার তোমার পালা আসছে, কেইন-যদি তুমি এখনই না পালাও।'

তেরো

স্থির দাঁড়িয়ে থাকে কেইন, মহিলার বেদনাক্লিষ্ট মুখের দিকে তাকিয়ে এইমাত্র শোনা কথাগুলো বিচার করছে। অবশেষে ও বলল, 'তবু আমি দেখা করব বুচারের সঙ্গে। কোথায় সে?'

উন্মাদিনীর মত ওর হাত খামচে ধরল রাফেলা। 'আমার কথা শোন, মাইক। প্রিজ। এখানে থাকলে নির্ঘাত অপঘাতে মরবে তুমি। তার চেয়ে আমি যা দিতে চাইছি সেটা নিয়ে চলে যাচ্ছি না কেন?'

'কত দেবে?'

'কত চাও তুমি?'

মুদু হাসল কেইন। 'আমার চাহিদা মেটাবার শক্তি তোমার নেই। নাকি বিল মদত দিচ্ছে তোমাকে?'

'উফ্। না, না। ও কিছুই জানে না এ-ব্যাপারে।'

'তা হলে তুমি টাকা পাচ্ছ কীভাবে?'

'সেটা তোমার মাথাব্যথা না। তুমি কত চাও সেইটে কেবল বল।'

'শ্রম। ডগড্যাপ্পে যত টাকা আছে তার সব দিলেও আমি যাব না। আমি যে-কাজে এসেছি সেটা শেষ করে তবেই যাব। এবং যাবার আগে শায়েস্তা করব বিল বুচারকে।'

'এক্ষুণি করতে পার না?'

চমকে উঠে রাফেলার দিকে তাকাল কেইন। 'তোমাকে আমি ঠিক বুঝতে পারি না। তোমার মতলবটা কী বল তো?'

'বলা সম্ভব না।' দুহাতে মুখ ঢাকল মহিলা, ঈষৎ টলছে, মুহূর্তের জন্য কেইনের মনে হলো রাফেলা বুদ্ধি জ্ঞান হারিয়ে পড়ে যাবে, কিন্তু পরক্ষণে নিজেকে সামলে নিয়ে ও বলল, 'আমি আর সইতে পারছি না এসব। পালাতে চাই এখান থেকে। তুমি আমাকে করবে সাহায্য?'

মাথা নাড়াল কেইন। 'এটা তোমাদের পারিবারিক ব্যাপার। আমি এর মধ্যে জড়াব না।'

'আমার কী সন্দেহ জান?' অস্ফুট স্বরে বলল রাফেলা, 'তুমি জ্যাকুলিনের প্রেমে পড়েছ।'

ভেতরে-ভেতরে চমকে উঠল কেইন, জানে এই মহিলাকে ওর মনের কথা খুলে বলা ঠিক হবে না। পাশাপাশি এও বুঝতে পারছে, রাফেলা যা কিছুই করুক তার প্রভাব কমবেশি ওদের সবার ওপরেই পড়বে। শেষমেশ স্বীকার করল ও। 'ঠিক।'

'তা হলে বুঝতেই পারছ, আমাদের উভয়ের সমস্যাই এক। বিল বেঁচে থাকলে আমি সুখ পাচ্ছি না-আর তুমি জ্যাকিকে। আমরা দুজন কী একসাথে কাজ করতে পারি না?'

'না,' রুদ্ধ সুরে বলল কেইন। 'এবার দয়া করে তুমি বলবে, বুচার কোথায়?'

দোনোমনো করছিল রাফেলা, রাগে-দুঃখে জ্বলছিল ওর শরীর, কিন্তু কোন উত্তর দিতে পারার আগেই করিডরে পায়ের আওয়াজ পেল কেইন। পাই করে ঘুরল ও। দেখল, করিডরের মুখে ব্ল্যাক গ্যারিটি দাঁড়িয়ে, ঠোঁটের কোণে ওর সেই মার্কামারা মেকি হাসি।

'আচ্ছা, তুমি তা হলে এসেই পড়েছ, কেইন,' গ্যারিটি বলল যাত্রার ঢঙে। 'তোমার অপেক্ষাই করছিলাম আমি।'

'আমি এসেছি বুচারের সঙ্গে দেখা করতে, কিন্তু ওর স্ত্রী আমাকে বলছে না কোথায় আছে সে।'

রাফেলার ওপর দ্বির হলো গ্যারিটির কালো চোখজোড়া। 'কেন?'

'ওর সাথে কথা বলতে চাইছিলাম আমি,' ব্যাজার মুখে জবাব দিল রাফেলা।

'তুমি খুব বেশি কথা বল। শহরেও বলেছি, এখন আবার বলছি। তোমার যদি মানুষ চেনার ক্ষমতা থাকত তা হলে বুঝতে কেইনকে তুমি তোমার স্বার্থে ব্যবহার করতে পারবে না।'

'আমার সাহায্য দরকার,' উন্মত্ত কণ্ঠে বলল রাফেলা। 'তুমি আমার ভাই, অথচ—'

আচমকা চুপ করে গেল ও, এক হাত মুখ চেপে ধরেছে, চেহারাটা ভয়ের ছাপ, পালা করে কেইন আর গ্যারিটিকে দেখেছ। তা হলে এই ব্যাপার, ভাবল কেইন, ওরা আসলে ভাই-বোন, কিন্তু সেটা কারোকে জানাতে চায় না।

‘কথাটা শেষ পর্যন্ত তুমি ফাঁস করেই দিলে,’ হিসহিস করে উঠল গ্যারিটি। ‘যাকগে, এতে অবশ্যি খুব একটা ক্ষতি হবে না এখন। আমার বিশ্বাস কেইনের আয়ু আর বেশি নেই, কাজেই ও কারোকে জানাতে পারবে না।’

‘বুচার জানে?’ কেইন প্রশ্ন করল।

‘আলবত।’ শ্রাগ করল গ্যারিটি। ‘তবে আমরা কারোকে বলি না। কারণ, বোধই তো, বিল নামজাদা ব্যবসায়ী, আর আমি সামান্য এক জুয়াড়ি। আমাদের ভেতর আত্মীয়তা আছে জানাজানি হলে বিলের সম্মানের হানি হবে।’ হঠাৎ বোনের দিকে চোখ কুঁচকে তাকাল গ্যারিটি, যেন ভাবছে ও রাইডিং-স্কাট আর লেদার জ্যাকেট পরে আছে কেন। ‘কোথাও যাচ্ছ নাকি?’

‘কীভাবে যাব?’ খেঁকিয়ে উঠল রাফেলা। ‘দেখতে পাচ্ছ না, আবহাওয়ার ছিঁরি!’

রাফেলার দিকে এক কদম এগোল গ্যারিটি, চেহারায় বিরক্তির ছাপ। ‘তাই। আমি ভুলেই গিয়েছিলাম তোমার আবার ঠাণ্ডা সহ্য হয় না।’ ঘাড় চুলকাল ও, সিদ্ধান্তহীনতায় ভুগছে। ‘দেখ, রাফেলা, তুমি বুদ্ধিমতী মহিলা। ভাল করেই জান বুচার আমাদের জন্য সোনার হাঁস। আশা করি এমন কিছু করবে না যাতে আমাদের দুজনেরই ক্ষতি হয়।’

‘কথাটা তুমি এত বেশি মনে করিয়ে দাও যে আমি ভোলার সুযোগই পাই না।’

এক মুহূর্ত অপেক্ষা করল গ্যারিটি, এখনও দ্বিধায় ভুগছে, তারপর মাথা ঝাঁকিয়ে কেইনকে ইশারা করে ঘুরল করিডরের দিকে। ‘এসো, আমার সঙ্গে। বিল ভেতরে আছে।’ কেইন পিছু নিল, ভাবছে গ্যারিটি ওর বোনের কেটে আর স্কার্ফটা দেখতে পেয়েছে কিনা।

বুচারের অফিস-ঘরের দরজা খোলাই ছিল। গ্যারিটি ভেতরে ঢুকে বলল, ‘কেইন তোমার সাথে দেখা করতে এসেছে, বিল।’

দোরগোড়ায় থামল কেইন, মেহগনি কাঠের প্রকাণ্ড একটা ডেস্কের পেছনে বসে আছে বুচার, সামনে একতড়া কাগজপত্র। পুরু চশমার ভেতর দিয়ে কেইনের দিকে তাকাল ও, জ্রুটি করে আছে, যেন ভাবছে কোন মতলবে কেইন এসেছে ওর বাসায়। তারপর বলল, ‘এসো, কেইন, ভেতরে এসে বস।’

‘ধন্যবাদ। আমি দাঁড়িয়েই থাকব।’

দরজা টপকে দেয়ালে পিঠ ঠেকাল কেইন, ভাবছে সি.সি. র‍্যাঙ্গের ফোরম্যান টড জার্ডিস কাউ ক্যাম্পে ফিরে গেছে না আছে। ঘরের চারপাশে নজর বোলাল ও, বুচারের চরিত্রের আরেকটি অভিনব বৈশিষ্ট্য আবিষ্কার করল।

র‍্যাঙ্গারদের অফিস-কামরা সাধারণত অগোছাল হয়ে থাকে, কিন্তু এটা তার সম্পূর্ণ উল্টো। ওটিকতক চেয়ার রয়েছে, একদিকের দেয়ালে বুক শেলফ, বুচারের ঠিক পেছনে ডগড্যান্সের মানচিত্র। ডেস্কটা ঝকঝকে, একটা দাগ পর্যন্ত নেই। ঘরের মেঝে আগাগোড়া কার্পেটে মোড়া। কেইন অনুমান করল বুচার তার প্রচুর সময় ব্যয় করে এই ঘরে বসে।

চেয়ারের পিঠে হেলান দিল বুচার, হাসি-হাসি মুখ করে জিজ্ঞেস করল,

‘কেমন বুঝছ, কেইন?’

‘চমৎকার অফিস,’ কেইন জবাব দিল।

‘আমার বিশ্বাস এরকম সাজানো-গোছানো অফিস তুমি আর দ্বিতীয়টি দেখনি।’ ড্রয়ার খুলে একটা সিগার বের করল বুচার। ‘আমার মত এত সফল মানুষও দেখনি।’ ড্রয়ার বন্ধ করে কপট বিনয়ের সুরে প্রশ্ন করল, ‘সিগার খাবে, কেইন?’

‘না, ধন্যবাদ।’

সিগারেটের মশলাপাতি বের করার জন্য পকেটে হাত ঢোকাল কেইন, অনুভব করছে গ্যারিটির চোখ দুটো সেঁটে আছে ওর ওপর। ওর সাথে মশকরা করছে ওরা, কৌশলে জানতে চাইছে ও কী চায় এবং কতটা জানে। বুচারের কোলের ওপর পিস্তল আছে একটা এ-ব্যাপারে কোন সন্দেহ নেই ওর। কেইন এতটুকু বেচাল হলেই বুচার এবং গ্যারিটি উভয়েই পিস্তল ধরবে ওর বিরুদ্ধে। আবারও টড জার্তিসের কথা মনে পড়ল ওর, আন্দাজ করল লোকটা হয়তো কাছেপিঠেই কোথাও ওত পেতে আছে।

‘গিয়েছিলে শ্লেডের কাছে?’ বুচার জানতে চাইল।

‘তুমি ভাল করেই জান গিয়েছিলাম। গ্যারিটি তোমাকে বলেছে।’

বুচার শ্রাগ করল। ‘কী জানি, ভুলে গেছি হয়তো। যাকগে, তুমি কী বুঝলে তাই বল?’

‘অনেক কিছু। তবে সবার আগে আমার একটা প্রশ্ন আছে। মেসার পশ্চিম সীমায় এত ভাল ঘাস নেই যার দখল নিয়ে দাঙ্গা করা যায়। সেক্ষেত্রে হোমস্টেডারদের তুমি তাড়াতে চাইছ কেন?’

‘ছোটলোকদের আমার একটুও পছন্দ না,’ বুচার বলল। ‘ওরা সবসময় বড় আউটফিটগুলোর গরু চুরি করে।’

‘উঁহু, আরও কিছু আছে,’ কেইন বলল। ‘শ্লেডকে আমার গরু-চোর বলে মনে হয়নি।’

কেইনকে একটুক্ষণ মাপল বুচার। তারপর বলল, ‘আরও অনেক কারণ আছে। এই অঞ্চলে আমিই আইনশৃঙ্খলার ব্যবস্থা করেছি। গ্যারিটির ভাষায় বলতে গেলে এই শহরটা আমারই। আমার ইচ্ছেই এখানে আইন। যারা আমার হুকুম মেনে চলবে তারা থাকতে পারবে। শ্লেড বেয়াড়া লোক-সুতরাং চলে যেতে হবে তাকে।’

‘বুঝলাম,’ কেইন বলল। ‘তোমার ধারণা তোমার প্রচুর ক্ষমতা, এখন সেটা সকলের মাথায় ঢোকাতে চাইছ। তাই তো?’

বুচারের গাল লাল হয়ে গেল রাগে। তড়াক করে চেয়ার ছাড়ল সে, তারপর আবার কী মনে করে বসে পড়ল। বলল, ‘ঠিক। আমার ক্ষমতা আছে, এবং সেটা আমি সবার মাথায় ঢোকাবও। তবে অন্য আরও কারণ আছে শ্লেডদের তাড়াবার। ম্যাপটা একবার দেখ ভাল করে।’

ম্যাপের দিকে তাকাল কেইন, মাথা নাড়াল এপাশ-ওপাশ। ‘আমি ম্যাপ ভাল দেখতে জানি না। যা বলার তুমিই বল।’

ঠিক আছে। শ্লেডের বাড়ি থেকে দেখতে পাবে না, তবে এর আরেকটু পশ্চিমে চমৎকার একটা উপত্যকা আছে—কলোর্যাডোর সেরা। উপত্যকার চারপাশ পাহাড়ে ঘেরা, ফলে ঝড়ের ভয় কম। সারা বছরই পানি থাকে। এই মেসায় শীতে আমাদের প্রচুর লোকসান হয়। এখন আমি যদি ওই উপত্যকায় শীতকালে আমার গাভীগুলো রাখতে পারি, এর প্রায় সবগুলোই বাচ্চা দেবে।

‘তার মানে শ্লেডকে তাড়াবার পর পশ্চিমে আরও কিছুদূর গিয়ে ওই উপত্যকাটা তুমি দখল করবে।’

‘এককথায় তাই।’ বুচার তার চুরুটের ছাই ঝাড়ল। ‘এতে ঝামেলা হবে কিছু। তবে সেজন্য তুমি আছ। মোটা টাকা পাবে।’

‘দুঃখিত,’ কেইন বলল।

গ্যারিটির পানে আড়চোখে তাকাল বুচার, সূক্ষ্ম হাসি ফুটে উঠেছে মুখে। ‘জানতাম। তুমি আমাকে কখনোই বোকা বানাতে পারনি, কেইন। মুহূর্তের জন্য না। শুরু থেকেই আমি সন্দেহ করেছিলাম, হার্ভের মেয়েটা কলকাঠি নাড়ছে তোমার পেছন থেকে। আশ্চর্য, একটা মেয়েকে পাওয়ার জন্য একজন পুরুষমানুষ কতকিছুই না করে।’

‘আমার চেয়ে তুমিই ভাল জান সেটা।’

ঠোট থেকে সিগার নামাল বুচার। একদৃষ্টে আগুনের দিকে চেয়ে রইল কিছুক্ষণ, প্রবল বিতৃষ্ণায় ঠোট দুটো বেকে গেছে। তবে খানিক বাদে আবার যখন মুখ খুলল সে তখন তার কণ্ঠে রাগের লেশমাত্র প্রকাশ পেল না। ‘হ্যাঁ, তা বোধহয় জানি। আমি আগেও বলেছি তোমাকে। কেবল রাফেলাই বুঝবে না।’

‘না-না, ও সব বোঝে,’ তড়িঘড়ি বলে উঠল গ্যারিটি। ‘ওকে তুমি শুধু আরেকটু সময় দাও।’

‘সময়।’ হাতে-ধরা সিগারের দিকে তাকাল বুচার। ‘ওটারই যে ভীষণ অভাব, ব্যাক। আমি যদি আরও একশো বছরও বাঁচি, তবু রাফেলা বুঝবে না ওর জন্য সবকিছু করতে পারি আমি।’

‘হ্যাঁ, বুঝবে,’ গ্যারিটি অভয় দিল। ‘তুমি কেবল একটু ধৈর্য ধর।’

সিগারটা আবার ঠোটে ঝোলাল বুচার, টান দিল বার দুয়েক, মেজাজ বদলে গেছে। ‘বেশ, কেইন, তুমি যখন করবে না আমার কাজ, তা হলে নিশ্চয় আমি ধরে নিতে পারি কালই তুমি চলে যাচ্ছ।’

‘না,’ কেইন বলল। ‘এ-কথাটা জানাতেই এলাম। বো অ্যান্ড অ্যারোর শেয়ার কিনছি আমি। বব ডেনভার থেকে কিছুক্ষণ আগে ফিরে এসেছে। ভাল জাতের কিছু ষাঁড় কিনেছে ও। আমরা কন্সাইনে আর থাকছি না।’

কেইন আশা করেছিল বুচার চমকে উঠবে খবরটা শুনে, কিন্তু সি.সি. ব্যাঙ্কের মালিককে এতটুকু বিস্মিত মনে হলো না। ঠাণ্ডা গলায় বলল, ‘তা হয় না, কেইন। তুমি তোমার গানবেল্টটা ফেলে দাও। নইলে টড তোমার খুলি উড়িয়ে দেবে।’

ধীরে-ধীরে দরজার দিকে ঘুরল কেইন, ডান হাত পিস্তলের বাঁটের কাছে স্থির। ও দেখল, বিশালদেহী এক লোক দাঁড়িয়ে আছে দোরগোড়ায়, হাতে

একটা দোনলা শটগান। লোকটার ভাবলেশহীন গোলাকার মুখের দিকে একনজর তাকিয়েই কেইন বুঝতে পারল, গানবেল্ট খুলে ফেলা ছাড়া এখন ওর সামনে আর কোন পথ নেই।

চোদ্দো

বুচার উঠে ডেস্কের ওপর নামিয়ে রাখল তার পিস্তল। 'এই তো, লম্বী ছেলে। ওকে নিয়ে চল, টড।'

'হার্ডেকেও তোমরা এভাবেই মেরেছ?' কেইন প্রশ্ন করল।

'অনেকটা এরকমই। আজ সকালে অনেকক্ষণ এখানে ছিল ও। আমার মাথায়ই এল না হঠাৎ করে অমন খেপে উঠেছিল কেন টমাস। যাইহোক, ও গেছে, এবার তুমিও যাবে। এরপর, মনে হয়, ওর ছেলেমেয়ে দুটোকে সামলানো আর তেমন কঠিন হবে না।'

'চল,' হুকুম করল জার্ডিস।

কেইন ইতস্তত করল, জানে খুব বেশিদূরে যাওয়া হবে না ওর। তর্ক করলে মরবে, আবার নির্দেশ মানলেও।

বুচারের চেহারা হিংস হয়ে উঠেছে। দরজা দেখিয়ে অসহিষ্ণু গলায় বলল, 'আগে বাড়। তোমার এত নামডাক এখন আর তোমার কোন কাজেই আসবে না।'

জার্ডিস করিডরে পা রাখলে দরজার দিকে এগোল কেইন। প্যাডি রায়ানের কথাগুলো এখন মনে পড়ছে ওর। বুচারের সমস্ত ক্ষমতার উৎস গ্যারিটি, জার্ডিস আর রেড ম্যানিয়ান। এই চারজনের মধ্যে একমাত্র ম্যানিয়ানই যা একটু বিদ্রোহ করেছিল। জার্ডিসের তুলনা চলে বড় কুকুরের সাথে: বুদ্ধিবুদ্ধি কম, তবে অনুগত।

এই সময়ে সামনের দরজা খোলা এবং বন্ধ হওয়ার ক্ষীণ শব্দ শুনতে পেল কেইন। হাতে অন্য কোন অস্ত্র না থাকায়, ও কেটে-কেটে বলল, 'এইমাত্র তুমি তোমার বউকে হারালে, বুচার।' তারপর দেখল ওর কথাগুলো নিষ্ঠুর প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করেছে র‍্যাঙ্কারের গোলাকার মুখে, কপালের দুপাশের রং দপদপ করে লাফাচ্ছে।

পলকের ভরে নীরবতা নামল ঘরে, বিল বুচার এমনভাবে স্থির দাঁড়িয়ে রইল যেন জমে গেছে। তারপর গ্যারিটি গাল বকল নিজেকে। 'নিশ্চয় ওর কোন মতলব আছে। আগেই বোঝা উচিত ছিল আমার।'

তবু নড়ল না বুচার। কেইন ভাবল, রাফেলা চলে যেতে পারে এটা বিশ্বাস করবে না বুচার, কারণ সে চায় না বিশ্বাস করতে। আবারও চিবিয়ে-চিবিয়ে বলল কেইন, 'আমি আরও বহুকিছুই জানি, বুচার। তোমার বউ আমার সাহায্য প্রার্থনা করেছিল, কিন্তু আমি রাজি হইনি। এখন সেটা ও লরির কাছে পাবে।

আজ ওরা দুজন অভিসারে গিয়েছিল।

‘কোথায়?’ চৈচিয়ে উঠল বুচার। ‘কোথায়?’

‘সাউথ সিডার স্ট্রীক ক্যানিয়নে। আজ সকালে, ঝড়ের আগে।’

‘সারা দিন বাসায় ছিল না ও,’ স্বগতোক্তির ঢঙে, অক্ষুট স্বরে বলল বুচার, ‘বিকেলের বৃষ্টির ভেতর ভিজতে-ভিজতে ফিরে এসেছিল।’

এবার আওয়াজটা শুনতে পেল ওরা সবাই-বাথান থেকে ঝড়ের গতিতে একটা ঘোড়া ছুটে বেরিয়ে গেল। ছোঁ মেরে টেবিলের ওপর থেকে বুচার তুলে নিল তার পিস্তল, হোলস্টারে ভরল।

‘ওকে আমরা ধরে আনব, টড,’ ফ্রিগু সুরে বলল বুচার। ‘মৃত্যুর আগে পর্যন্ত এজন্য পস্তাবে ও।’ খোঁড়াতে-খোঁড়াতে অফিস-কামরা থেকে বেরিয়ে গেল ও, করিডরের মাথায় পৌছে চিৎকার করে বলল, ‘কেইনকে আটকে রাখ এখানে। ফিরে এসে ওর ঠিকানা লাগাব।’

বুচারকে অনুসরণ করে সামনের ঘরে চলে গেল জার্ভিস। গ্যারিটি তার পিস্তল তাক করল কেইনের দিকে, চোয়াল ঝুলে পড়েছে।

‘বস, কেইন,’ গ্যারিটি বলল।

কেইন বসল না। ও শুনতে পেল সামনের দরজা খুলে বাইরে বেরিয়ে গেল বুচার আর জার্ভিস। শুনল বুচার বলছে, ‘গ্যারিটির ঘোড়া নিয়ে গেছে। লরির বাসার দিকে যাচ্ছে। তাড়াতাড়ি চল, টড। জিন চাপাও ঘোড়ায়।’

বাইরের দিকে কান খাড়া করে আছে গ্যারিটি, চোখ কেইনের ওপর। কেইনের গানবেল্টটা এখন ওর পেছনে পড়ে আছে। কেইন একবার তাবল চেপ্টা করে দেখবে ওটা পুনরুদ্ধার করা যায় কিনা, তারপর নাকচ করে দিল চিন্তাটা। রাফেলা ওকে কিছু সময় পাইয়ে দিয়েছে, সবুর করলে হয়তো ভাল কোন সুযোগ পেয়ে যাবে ও।

নিশ্চল দাঁড়িয়ে রইল কেইন, গ্যারিটির ভাবলেশহীন মুখখানা দেখছে। খানিক পর ঘোড়া ছুটিয়ে বুচার আর জার্ভিসের চলে যাওয়ার শব্দ শুনতে পেল ওরা। কেইন বলল, ‘আশ্চর্য, বউকে ফিরিয়ে আনতে যাচ্ছে লোকটা, অথচ মহিলা একমুহূর্তের জন্য ওর কাছে থাকতে রাজি না। কী করবে ওকে ধরার পর?’

‘এখানে নিয়ে আসবে,’ গ্যারিটি জবাব দিল।

‘কী লাভ হবে এতে?’

‘তাকিয়ে-তাকিয়ে দেখতে পারবে ওকে। ওদের বিয়ের রাত থেকে বুচার তো শুধু এ-ই করে আসছে।’

‘শুধু এই জন্য!’ কেইন অবাক।

‘অন্য পুরুষের সাথে বুচারের তুলনা করলে তুমি ভুল করবে।’

হালকা চালে ডেস্কের কোনা ঘুরল কেইন, বসল এর ওপর। ‘ওরা যদি লরির বাসায় গিয়ে থাকে, ফিরতে দেরি হবে,’ বলল সে। ‘তার চেয়ে বরং তুমি রাফেলার কাহিনি শোনাও আমাকে।’

গ্যারিটির পাঁচ কুটের ভেতর এসে পড়েছে কেইন। জুয়াড়ি ঠাণ্ডা চোখে

ওকে মাপল একটুকুণ। তারপর নিরুদ্ভাপ সুরে বলল, 'আমার ওপর লাফিয়ে পড়ার চেষ্টা কর না যেন, খুন করব তা হলে।'

কাঁধ ঝাঁকাল কেইন। 'ওরা যখন ফিরে আসবে, জার্ডিস এমনিতেও করবে সেটা। বুচার সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছে।'

'করত না, যদি না তুমি হার্ভেদের সাথে হাত মেলাতে।'

'ও মনে হচ্ছে স্লেডের ব্যাপারে ভুলেই গেছে সবকিছু।'

'না। অ্যাঞ্জেল পীক থেকে গুরুবাছুর নামানোর পর ওর হিল্লো করবে। বিল যখন কোনকিছু শুরু করে, শেষ না করে থাকে না।'

'রাফেলার ব্যাপারে কিছু বললে না?'

দেয়ালে চেয়ারের পিঠ ঠেকিয়ে, পকেট থেকে সিগার বের করে দাঁতে কাটতে শুরু করল গ্যারিটি। 'তুমি যখন মারাই যাচ্ছ তখন গুনলে ক্ষতি নেই। রাফেলা ছোটবেলা থেকেই একটু উচ্ছৃঙ্খল। আমি চাইনি ওর জীবনটা শেষ হয়ে যাক। সেজন্যই এখানে এনে কৌশলে ওকে ভিড়িয়ে দিয়েছিলাম বিলের সঙ্গে। কিন্তু ভাবতে পারিনি, ও অ্যাবনার লরির প্রেমে পড়ে যাবে। এখন আমার দোষেই আরও এলোমেলো হয়ে গেল ওর জীবন।' শেষ দিকে আবেগে বুজে এল গ্যারিটির গলা।

'আজ যা দেখলাম,' কেইন বলল, 'তাতে মনে হলো এখনও লরির প্রেমে হাবুডুবু খাচ্ছে।'

মাথা ঝাঁকাল গ্যারিটি। 'অবস্থা আরও খারাপ হয়েছে বিল ওকে গৃহবন্দী রাখতে চাওয়ায়। একটা মেয়ের যে-দাবী পুরুষের কাছে সেটা দেয়ার ক্ষমতা বিলের নেই।'

'বুচার জানে লরির ব্যাপারে?'

'লোকটা কতখানি শয়তান তা জানে না। লরি একাধারে মিথ্যুক এবং দুমুখো সাপ। বিল এটা জানে, তবে লরি ভিত্তি ওর এই ধারণাটা ভুল। আমি ওকে বহু চেষ্টা করেও বোঝাতে পারিনি, প্রথম থেকে স্লেডকে গোপনে মদত দিয়ে আসছে লরি। আমরা সবাই জানি বুডো জেককে ও-ই খুন করেছে, এখন বিলকে শেষ করার ফিকির খুঁজছে। আমার কী ধারণা জান? সেদিন রাতে লরিই অ্যামবুশ করেছিল তোমাকে।'

'তা হলে লোকটা পয়লা নম্বরের কাপুরুষ,' রাগত গলায় বলল কেইন। 'কাপুরুষ ছাড়া কেউ কারোকে পেছন থেকে আক্রমণ করে না।'

'আমি বলব লরি একটু হিসেবি মানুষ। ভেবেছিল স্লেড তোমাকে খতম করবে, কিন্তু যদি বেঁচে যাও কোনভাবে, তাই নজর রাখছিল রাস্তার ওপর। আগে বুঝতে পারিনি এতটা, কিন্তু এখন মনে হচ্ছে ও চাইছে স্লেডকে উসকে একটা রেঞ্জ ওঅর বাধাতে। বুচার যদি লড়াইতে মরে কারও সন্দেহের কিছু থাকবে না।'

'অর্থাৎ তুমি বলতে চাইছ, আরেকটা অ্যামবুশের ঘটনা ঘটলে ওর কুকীর্তি ফাঁস হয়ে যাবে?'

'তাই। তবে তোমার ব্যাপারটা আলাদা। তুমি মরলে এখানকার বেশির

ভাগ লোক খুশি হবে, কেউ প্রশ্ন তুলবে না কীভাবে মরলে তুমি। কিন্তু বিলকে মারতে হলে সাবধান না হয়ে উপায় নেই, কারণ লরি রাফেলাকে বিয়ে করতে চায়।' গ্যারিটি আবার দাঁতে কাটল সিগার। 'শুনেছ হয়তো, জুয়ায় লরি তার সমস্ত সম্পত্তি হেরে গেছে বিলের কাছে। এখন তাই রাফেলাকে বিয়ে করে সেগুলো হাতাতে চাইছে। ওই লোক আস্ত একটা মতলববাজ, রাফেলার প্রতি ওর এতটুকু ভালবাসা নেই।'

'কিন্তু রাফেলার বেলায় তো একথা খাটে না,' কেইন বলল। 'ও বুচারের হাত থেকে মুক্তি চায়।'

'জানি, কিন্তু ও লরিকে ভালবাসে,' গ্যারিটি বলল। 'বিলের কাছ থেকে মুক্তি পাওয়াই সব না। ওর জন্য চিন্তা হয় আমার, লরি কখনোই ওর সুখ নিয়ে মাথা ঘামাবে না।'

সামনে ঝুঁকল কেইন। 'তা হলে বুচার আর তোমার বোনের মধ্যে যেকোন একজনকে তোমার বেছে নিতে হবে। তোমার কথা শুনে মনে হয় না তুমি সত্যি-সত্যি চাও ও ঘর করুক বুচারের সাথে।'

'আমার অন্য পরিকল্পনা আছে,' নিস্পৃহ কণ্ঠে বলল গ্যারিটি, 'রাফেলা আর আমার দুজনের জন্যেই। বিল আমাকে বিশ্বাস করে। আমি ওর অনেক উপকার করেছি। আমি, ম্যানিয়ন, জার্ডিস আর বিল আমরা এই চারজন একে অন্যের খুব কাছের মানুষ। রাফেলা আমাদের সঙ্গে থাকলে আথেরে ওর লাভই হবে।'

'রায়ান কোন্ দিকে?'

'ও ব্যাটা বুড়ো হাবড়া। ওর সমর্থনে আমাদের কিছু যায়-আসে না।'

'ষাঁড় কেনার জন্য বব আর জ্যাকিকে ও টাকা ধার দিয়েছে।'

'এজন্য পরে পস্তাতে হবে তাকে, যখন দেখবে লোকসান খেয়েছে ওরা।'

'আমার মনে হয় না রাফেলা লরির ওখানে যাবে,' কেইন বলল। 'ও বুদ্ধিমতী মহিলা, জানে বুচার ওর পিছু নেবে।'

ওপর-নীচ মাথা ঝাঁকাল গ্যারিটি। 'সম্ভবত শহরে যাবে। তবে যেখানেই যাক, বিল ধরে ওকে আনবেই।'

'কিন্তু তুমি তোমার বোনকে ফেলতে পারবে?'

কেইনকে অপলকে খানিকক্ষণ জরিপ করল জুয়াড়ি। তারপর মৃদু হেসে বলল, 'তুমি খুব চালাক লোক, তবে একটা জিনিস বোধহয় বুঝতে পারনি। আমি কখনও বন্ধুদের সাথে বেঙ্গমানি করি না।'

'ধর ও চলে গেল এই দেশ ছেড়ে? হয়তো কোল্যাটাসে গিয়ে ট্রেন ধরে ডেনভারে চলে যাবে।'

'পারবে না। অত টাকা নেই ওর কাছে। তা ছাড়া লরির টান আছে।' গ্যারিটির পিস্তলখানা ওর কোলের ওপর পড়ে আছে, হাত দুটো হাঁটুতে বাঁধা। 'প্রেমের জন্য, শুনেছি, মানুষ অনেক কিছুই করতে পারে, কিন্তু রাফেলা যে এতটা বেপরোয়া হয়ে উঠবে আমি ভাবতে পারিনি।'

'আচ্ছা, এবার তা হলে আরেকটা কথা বল,' কেইন বলল নরম গলায়। 'রাফেলাকে বুচার ধরে আনার পর ওর কষ্ট দেখে কেমন লাগবে তোমার?'

‘আগেই বলেছি এব্যাপারে আমার কিস্যু করার নেই,’ গ্যারিটি চোঁচিয়ে উঠল
সখেদে। ‘রাফেলা আমার সমস্ত প্ল্যান মিসমার-’

জুয়াড়ির এক ফুটের ভেতর এসে পড়েছিল কেইন, ও দেখল এর চেয়ে ভাল
সুযোগ আর হতে পারে না। আর একমুহূর্ত অপেক্ষা করল না সে, গ্যারিটির
পিস্তল লক্ষ্য করে ঝাঁপ দিল।

চকিতে পিস্তল তুলেই গুলি করল গ্যারিটি, কেইনের পাঁজরে ছাঁকা দিয়ে
ঝেরিয়ে গেল বুলেট, তারপর ও জুয়াড়ির মাথায় আঘাত করল। চেয়ার থেকে
কাত হয়ে মাটিতে পড়ে গেল গ্যারিটি, তবু পিস্তল ছাড়ল না। আবার গুলি করল
ও, লক্ষ্যভ্রষ্ট হলো। পতনের ফলে ঝাঁকনি খেয়েছিল, ফলে একটু সময় লাগল
কেইনের দিকে পিস্তল ধরতে। ওই ক্ষণিকের বিরামটুকুই যথেষ্ট ছিল কেইনের
জন্য, একটা চেয়ার তুলে সবেগে জুয়াড়ির মাথার ওপর সেটা নামিয়ে আনল ও।

কেইন দেখল চিত হয়ে মেঝেতে পড়ে আছে গ্যারিটি, পিস্তল হাতছাড়া
হয়েছে। লোকটাকে মেরে ফেলেছে কিনা ঠিক বুঝতে পারল না ও। গ্যারিটির
পিস্তলখানা ডেস্কের ওপর তুলে রাখল কেইন, তারপর নিজের গানবেল্ট কোমরে
জড়াতে-জড়াতে পা রাখল করিডরে।

গুলির আওয়াজ পেয়ে ছুটে আসছিল মেক্সিক্যান ঝি। বসার ঘরে ওর দেখা
পেল কেইন। বলল, ‘তুমি রান্নাঘরে যাও, মারিয়া। গ্যারিটি সাহেব ঘুমাচ্ছেন।’

চকিতে মহিলা একবার তাকাল ওর পানে, তারপর বিনাবাক্যব্যয়ে ঘুরে যে-
পথে এসেছিল সে-পথে ফিরে গেল। রান্নাঘরের দরজা বন্ধ হওয়া অবধি অপেক্ষা
করল কেইন, তারপর একদৌড়ে বাড়ির বাইরে এসে হিচ-রেইলের দিকে
এগোল। ওর ঘোড়াটা তখনও ছিল ওখানে। রাফেলাকে ভাড়াভাড়ি ধাওয়া করার
ব্যাপারে অতিমাত্রায় মত্ত থাকায়, বুচারের কল্পনায় আসেনি কেইন পালাবার চেষ্টা
করতে পারে।

স্যাডলে চেপে, শহর অভিমুখে ঘোড়া ছোটাল কেইন। বাতাস এখন একদম
ধেমে গেছে, পাতলা বরফের চাদরের ওপর চিকচিক করছে তারার আলো।
এবার, সহসাই, একটা সত্য উপলব্ধি করল কেইন। গ্যারিটি স্বেচ্ছায় পালাবার
সুযোগ করে দিয়েছে ওকে।

ওর জানা বহু জুয়াড়ির যেমন আছে, ব্ল্যাক গ্যারিটিও তেমনি বিশেষ কিছু
নীতি মেনে চলে। বিল বুচারের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করবে না সে, কিন্তু কেইন
চেষ্টা করলে ওর বোনকে মুক্তি দিতে পারবে এটা বুঝতে পেরে ওকে সে রেহাই
দিয়েছে। ব্যাপারটা অবিশ্বাস্য, হয়তো অযৌক্তিকও বটে, তবু কেইন নিশ্চিত
এক্ষেত্রে ঠিক এরকমটাই ঘটেছে।

এবং একথা উপলব্ধি করার পরপরই, গ্যারিটির প্রতি নতুন এক শ্রদ্ধা জাগল
মাইকেল কেইনের মাঝে। তবে, পাশাপাশি, এও বুঝতে পারছে সে, কেবল
এতেই সমস্যার সুরাহা হয়ে যাবে না। লরি যদি এই তল্লাটে থাকে, মারা
পড়বে; আর যদি বুচার মারা যায় এবং রাফেলা আর লরি পালিয়ে গিয়ে বিয়ে
করে তবু অবস্থার তারতম্য হবে না এতটুকু। বুচার বা লরি-কারও কাছেই সুখী
হতে পারবে না রাফেলা।

পনেরো

অবসাদ শেষ পর্যন্ত হেঁকে ধরেছে মাইকেল কেইনকে। যা চেয়েছিল তার বেশি বেলা অবধি ঘুমাল ও, উঠল মাথায় একরাশ দুশ্চিন্তা নিয়ে। স্লেডের কাছ থেকে ও যে-সময় চেয়ে নিয়েছিল আজ সন্ধ্যা ছটায় তা শেষ হবে। লোকটা আর সময় বাড়াবে এ-ব্যাপারে যথেষ্ট সংশয় আছে ওর। হোমস্টেডাররা মরিয়া হয়ে উঠেছে; দীর্ঘদিন যাবৎ বিপদের মধ্যে বসবাস করার ফলে গুলিয়ে গেছে ওদের সমস্ত যুক্তিবোধ। শীত এসে পড়েছে, শহরে কোনরকম ধার-বাকি পাবে না ওরা, সমান্য যা কিছু গরুবাছুর আছে সেগুলো কোথাও নিয়ে গিয়ে বেচবে সেই সুযোগও নেই। এ-অবস্থায় যেকোন ঘটনা ঘটে যেতে পারে। জ্যাকুলিন যে-সলতের কথা বলেছিল সেটা এখন পুড়তে-পুড়তে বারুদের কাছাকাছি চলে এসেছে।

চীনা রেস্টোরাঁয় নাস্তা সেরে, পাশেই যে-নাপিতের দোকানটা আছে দাড়ি কামাতে সেখানে ঢুকল কেইন। থমথমে মুখে নিজের কাজ সারল নাপিত, তারপর কেইন যখন ওর পাওনা মিটিয়ে দিল, ও তিক্ত সুরে বলল, 'আমার এখন উচিত ছিল তোমার গলায় ক্ষুর চালানো।'

'কেন?'

'সেদিন গোলগুলির পর, কেলসির সাথে আমিও হোটেলে গিয়েছিলাম তোমার সঙ্গে দেখা করতে।'

গায়ে শীপস্কিনের জ্যাকেট চড়াল কেইন। 'তো?'

নাপিত তার শুকনো ঠোঁটজোড়া ভেজাল। 'আমার বউ-ছেলেমেয়ে আছে। আমি শান্তিতে থাকতে চাই।'

'আমি তোমার শান্তি কেড়ে নিচ্ছি না।'

'আলবত নিচ্ছ। লড়াই শুরু হলে কারা সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত হবে? আমার মত চুনোপুঁটিরা। আমি চাই না আমার সন্তানদের গায়ে গুলির আঁচড় লাগুক।'

'শহরের বাইরে কোথাও পাঠিয়ে দাও ওদের।'

'যাওয়ার জায়গা নেই।'

'তুমি এখানে এলে কেন, আর কোথাও গেলেই পারতে।'

'যাইহোক, আমি এসেছি। এবং এখানে আমার ব্যবসা আছে। বাড়ি আছে ছোটখাট। এখন একজন ভবঘুরে বন্দুকবাজের জন্য আমার ঘর-সংসার সব ধ্বংস হয়ে যাবে এটা কি ঠিক হবে?'

লোকটার ক্ষুব্ধ মুখের দিকে চেয়ে রইল কেইন। ভাবছে এক্ষেত্রে জ্যাকুলিন কী বলত। নাপিত অন্যায়ভাবে দুঃস্থ ওকে। ঘটনাচক্রে ও এখানে উপস্থিত হয়েছে, এ ছাড়া ডগড্যাসের যা অবস্থা তার পেছনে ওর কোন হাত নেই। এই সমস্যা আজকের নয়, এর বীজ-বপন হয়েছে বহুকাল আগে। নিজেদের রক্ষা

করার দায়িত্ব শহরবাসীদের। অথচ তারা তা করবে না, বা পারবে না করতে। ওরা সবাই এই নাপিতের মত, আঙনের মাঝে থেকেও তার আঁচ এড়িয়ে চলতে চাইছে। ডগডাম রণক্ষেত্রে পরিণত হলে এরাই ক্ষতিগ্রস্ত হবে সবচেয়ে বেশি।

‘গোলমাল নাও হতে পারে,’ কেইন বলল। ‘আর একান্তই যদি হয়, তোমার বউ-ছেলেমেয়েরা যেন বাসাতেই থাকে।’

বাইরে বেরিয়ে এল কেইন, গ্যারিটির কথাগুলো বাজছে কানে। ‘ভাড়াটে খুঁদী হিসেবে বদনাম কামিয়েছ তুমি, এই বদনাম কোনদিন ঘুচবে না।’ ফুটপাতে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল ও। রাস্তা খাঁ খাঁ করছে, অথচ দিনের এ-সময়টাতে ব্যস্ততা থাকা উচিত ছিল।

আকাশ পরিষ্কার, একটুও বাতাস নেই, তবু সূর্য যেন নিরুজ্জ্বল। বরফ মেসার এই প্রান্তে এসে পৌঁছায়নি, তবে কেইন অ্যাঞ্জেল পীকের চূড়া দেখতে পাচ্ছে এখান থেকে। ভারি তুষারপাত হয়েছে ওখানে, এবার ওই পাহাড়ের নামকরণের সার্থকতা বুঝতে পারল ও।

ডেনভারে ওর হোটেল কামরায় যে-রাতে রবার্ট হার্ভে এসেছিল তার কথা মনে পড়ল ওর। শেষের এই কয়টিদিন ছিল নিছক কল্পনাবিলাশ মাত্র; এখন সে আবার বাস্তবের মুখোমুখি হয়েছে। নাম ভাঁড়িয়ে অন্য কোথাও চলে যাওয়া উচিত ছিল ওর। অতীতকে মুছে ফেলতে পারবে এ-চিন্তা করা মস্ত বোকামি হয়েছে। বোকামি করেছে জ্যাকিকে ঘিরে নিজের স্বপ্নকে বেড়ে উঠতে দিয়ে। কাল রাতে যদি গ্যারিটি কিংবা টড জার্ডিস খুন করত ওকে, আমৃত্যু অনুশোচনায় দগ্ধ হত মেয়েটা। আজ কিংবা আগামীকাল যদি সে মারা যায় তাও অবস্থা সেই একই থাকবে। আর যদি সে ডিলন মেসায় রয়ে যায়, যেমনটা পরিকল্পনা করেছে সেইমত শেয়ার কেনে বো অ্যান্ড অ্যারোর-তবু মাইকেল কেইন হিসেবে মানুষের কাছে তার যে-পরিচয় তা বদলাবে না। গ্যারিটির কথাই ঠিক, অপঘাতে মৃত্যু ঘটবে ওর। নিজের জীবনের প্রতি, সংসারের প্রতি দারুণ ঘেন্না অনুভব করল কেইন। কেন মানুষ তার অতীতকে মুছে ফেলতে পারে না? কেন? ওর একমাত্র আকাঙ্ক্ষা এখন একজন জীবনসঙ্গিনীর, সমাজে সম্মানজনক প্রতিষ্ঠার; অথচ এর সবই তার ধরাছোয়ার বাইরে থেকে যাচ্ছে।

পলক ভুলে, স্নান সূর্যের দিকে তাকাল কেইন। বেলা প্রায় দুপুর। পশ্চিমের হোমস্টেডাররা শহরে আসতে আর ছঘণ্টা বাকি আছে। ওরা কী করবে কিছুই বলা যায় না। ওরা শহরে থাকা অবস্থায় যদি বুচার এখানে আসে তুমুল লড়াই বেধে যাবে। রাফেলা চলে যাওয়ায়, বুচার এখন পাগলা কুকুর হয়ে উঠবে।

‘কী জীবন!’ আপনমনে বলল কেইন। রাফেলার জন্য করুণা হলো ওর। ব্যাক গ্যারিটির জন্যও। আড়চোখে স্টারলাইটের দিকে তাকাল ও, ভাবল জুয়াড়ি ফিরে এসে থাকলে এখন কী করছে, রাফেলা কোথায় আছে। এরা সবাই প্রেম আর ঘৃণা, উচ্ছৃঙ্খল অহঙ্কার আর বলাহীন উচ্চাকাঙ্ক্ষার ঘূর্ণিপাকের শিকার।

হাঁটতে হাঁটতে ব্যাংকে গেল কেইন, জানে শান্তির চাবিকাঠি যদি কারও কাছে থেকে থাকে সে প্যাডি রায়ান; তবে বুড়ো সেটা ব্যবহার করবে কিনা সে-

ব্যাপারে নিশ্চিত নয় ও।

কেইন যখন ভেতরে ঢুকল ক্যাশে দাঁড়িয়ে এক খদ্দেরকে বিদায় করছিল রায়ান। চোখ তুলে নবাগতকে দেখে মৃদু হাসল ও। 'হাউডি, কেইন। একটু অপেক্ষা কর, আমি এক্ষুনি আসছি।'

'তাড়া নেই আমার,' বলে কাউন্টারের কোনা ঘুরে একটা সোফায় বসে পড়ল কেইন, সিগারেট বানাল।

খানিক বাদে রায়ান এল ওর কাছে। 'কী ব্যাপার?'

'বামেলা।'

চকিতে রায়ান তার ঘড়ি দেখল। 'দুপুর হয়ে গেছে। তাই তো বলি এত খিদে পাচ্ছে কেন। চল, হোটেলে গিয়ে খেয়ে নিই কিছু।'

'মাত্র নাস্তা করলাম।'

'তা হলে চল স্টারলাইটে যাই। গলা ভেজাবে। মোট কথা, দুপুর বেলা আমি লেনদেন বন্ধ রাখি।'

মাথা নাড়াল কেইন। 'আমি এসেছি কিছু শলাপরামর্শ করতে। ইচ্ছে হলে তুমি দরজায় তালা ঝুলিয়ে এসো।'

ধপ করে রায়ান তার সুইভেল চেয়ারে বসে পড়ল। 'তার বোধহয় দরকার হবে না। বল, কী বলবে। তোমাকে নিয়ে আমি ভীষণ চিন্তায় ছিলাম, বাছা।'

'আমি নিজেও চিন্তিত। সেদিন স্ট্রেন্ডের বাসায় বলছিলে তোমার সাহস নেই। সেটাই জানতে এসেছি।'

'আসলেই নেই।'

সিগারেট নিভিয়ে ফেলল কেইন। 'বিশ্বাস হয় না। সাহস না থাকলে ষাঁড় কেনার জন্য হার্ভের ছেলেমেয়েকে তুমি টাকা ধার দিতে না। গ্যারিটির ধারণা তুমি লোকসান খাবে এতে।'

চেয়ারে হেলান দিল রায়ান, দুহাত ভাঁজ করে কোলের ওপর রাখা, চেহারা ভাবলেশহীন। 'ভুল। আমি নিজেও এককালে ভাল জুয়াড়ি ছিলাম কারণ সবসময় নিজের লাভের দিকে খেয়াল রাখতাম। গ্যারিটিও তাই করে। সেজন্যই ও-কথা বলেছে। তবে এই ব্যাপারটা একটু আলাদা।'

'এখনও তুমি ঝুঁকি নিতে জান, তাই না?'

'নাহ। হাজার হলেও, বুড়িয়ে গেছি। তোমার বয়স যখন আমার মত হবে, তুমিও ভেবেচিন্তে কোন কাজে হাত দেবে। বব হার্ভেকে টাকা ধার দেয়ার সময়ে আমি আটঘাট বেঁধেই দিয়েছি।'

বুড়ো ব্যাংকারের কুণ্ঠিত মুখখানা জরিপ করতে করতে কেইন ডাবল জ্যাকুলিনের কথাই ঠিক। যতক্ষণ জেতার আশা আছে, প্যাডি রায়ান হাল ছাড়বে না।

'বুচার একটা পাগল,' কেইন বলল। 'ফলে কখন কী করে বসে কিসু বোঝার উপায় নেই। একবার যখন এই গোলমাল শুরু করেছে, নিজে না মরা পর্যন্ত থামবে না। আর কেউ ওকে বোঝাতে গেলে তারও ক্ষতি করতে চেষ্টা করবে।'

বুড়োকে জানাল কেইন কী ঘটেছে। চুপচাপ গুনতে লাগল রায়ান, ক্রমশ গম্ভীর হচ্ছে চেহারা। যখন শেষ হলো কেইনের বলা, ব্যাংকার মুখ খুলল। 'রাফেলার ব্যাপারটা অবাক লাগছে না আমার, তবে টমাস হার্ভেকে বুঝতে পারছি না। আসলেই, কোন্টা লাভজনক ঝুঁকি আর কোন্টা না সবসময় বোঝা যায় না ঠিকমত।'

'এখন আমাদের দায়িত্ব হবে একটাই। স্লেড আর তার বন্ধুদের সামনে রাখা। বুচারকে আগে বাড়তে দাও, দেখবে ওর নিজের ফাঁদে ও নিজেই আটকা পড়বে। কিন্তু তোমার সাহায্য ছাড়া স্লেডকে থামানো যাবে না।'

'আমি? না, বাপু, আমার দ্বারা কিছু হবে না। জিম কেলসি কিছুক্ষণ আগে শহর ছেড়েছে। রেড ম্যানিয়ন নেই। এ-অবস্থায় আমি কিছু করতে পারব না।'

'পারবে,' ধীরলয়ে বলল কেইন। 'তুমি যদি শীতকালটা চলার মত টাকা ধার দিতে রাজি হও, ওরা আপাতত চুপ করে থাকবে। তবে সমস্যা হচ্ছে, আমরা লোকসান খেতে পারি। যদি খাই, বুচার তোমাকে আস্ত রাখবে না।'

উঠে জানালার ধারে গেল রায়ান। কেইনের দিকে পেছন ফিরে দাঁড়িয়ে রইল ওখানে। খানিক পর নিচু গলায় বলল, 'মনে হচ্ছে দরজাটা বন্ধ করে এলেই ভাল করতাম।' হঠাৎ আড়ষ্ট হয়ে গেল ও, তারপর পাই করে ঘুরল দরজার দিকে। 'কিছু একটা ঘটতে যাচ্ছে।'

কেইন পিছু নিল ব্যাংকারের। জনাকয়েক শহরবাসী রাস্তা থেকে দৌড়ে ঢুকে পড়ল ব্যাংকে, ওদের নেতৃত্ব দিচ্ছে নাপিত, সকলের চোখেমুখে আতঙ্ক।

'ওরা আনছে,' চোঁচিয়ে উঠল নাপিত। 'স্লেড আর তার দলবল। প্রায় একশোজন। আমি বলেছিলাম না তোমাকে—'

'আসুক,' রিক্ত কণ্ঠে বলল কেইন। 'আমি সামলাব। তোমরা গায়ে পড়ে কোন গোলমাল কোরো না।'

লোকগুলো তবু ইতস্তত করছে দেখে কড়া ধমক লাগাল রায়ান। 'কী ব্যাপার? কানে ঢোকেনি কথা। যাও, ভাগ। এক্ষুণি।'

'তোমরা দুজনই বুচারের চ্যালা,' নাপিত গলা চড়াল। 'আর বুচার ওদের তাড়াতে চাইছে মেসা থেকে। তোমরা গোলাগুলি শুরু করবে, আর স্লেড তার ঝাল তুলবে আমাদের ওপর দিয়ে।'

'আহু,' কেইন বিরক্তি প্রকাশ করল। 'তোমরা যাও এখান থেকে, রাস্তায় বেরোবে না। তোমরা যদি শান্ত থাক, কোন গোলমাল হবে না।'

ঝট করে ঘুরেই, ছুটে বেরিয়ে গেল ওরা। রায়ানের দিকে তাকিয়ে কাষ্ঠ হাসি হাসল কেইন। 'সাহস বলতে কিছু নেই লোকগুলোর।'

'ওদেরকে দোষ দেয়া যায় না পুরোপুরি,' রায়ান সাফাই গাইল। 'প্রত্যেকেরই পরিবার আছে।'

ফুটপাতে বেরিয়ে ব্যাংকের সামনে অপেক্ষা করতে লাগল কেইন। রায়ান যখন যোগ দিল ওর সঙ্গে, ও বলল, 'তুমি ভেতরে থাক। স্লেড এলে আমি ওকে তোমার কাছে নিয়ে যাব।'

শহরে ঢুকল হোমস্টেডারদের দল। ওদের সংখ্যা একশোর ধারেকাছেও

না। কেইন গুনল-মোট বারোজন। ওদের মধ্যে কয়েকজনকে শ্বেডের বাসায় দেখেছিল ও। অন্যরা অপরিচিত। তাদের ভেতর চারজন বালক, সম্ভবত শ্বেডের প্রতিবেশীদের সন্তান; নেহাত ছেলেমানুষ, হাতে কোন কাজকাম নেই বলে মজা দেখতে এসেছে। সকলের আগে রয়েছে শ্বেড, জুলন্ত চোখ দুটো কেইনের ওপর স্থির। ক্ষিপ্ত হয়ে আছে ওরা, উপলব্ধি করল কেইন। ধৈর্যের বাঁধ ভেঙে পড়ায় একটা এসপার-ওসপার করার জন্য মুখিয়ে আছে প্রত্যেকে।

‘তোমরা আগেভাগে এসে পড়েছ,’ বলে রাস্তায় নামল কেইন।

হাত তুলে দলের লোকজনকে থামতে ইশারা করল শ্বেড, রাশ টেনে ধরেছে নিজের ঘোড়ার। অন্যরা ওর দুপাশে ছড়িয়ে পড়ল, হাত পিস্তলের বাঁটে। কেইন প্রমাদ গুনল। সামান্যতম উসকানিতে মারদাঙ্গা বেধে যেতে পারে এখানে।

‘আমরা একটু গলা ভেজাতে এসেছি,’ উদ্ধত সুরে বলল শ্বেড। ‘চুক্তি মোতাবেক ছয়টা পর্যন্ত ঠিকই অপেক্ষা করব।’

‘তারপর কী করবে?’

‘বুচারকে হাতের কাছে পেলে নিকেশ করে দেব। যদি না পাই, এই শহরটাকেই ধ্বংস করব। রায়ানের ব্যাংক লুট করব, ও আমাদের টাকা ধার দেয়নি।’

‘আউট-ল হয়ে যাবে, বন্ধু,’ কেইন বলল।

‘জানি, তুমি অভিজ্ঞতা থেকে বলছ,’ শ্বেড খোঁচা মারল।

‘না, আমি কখনও আউট-ল ছিলাম না। তবে অনেককে হয়ে ‘যেতে দেখেছি। তারা সবাই তোমার মত ভাল লোক ছিল। কেন শুধু শুধু বউ-ছেলেমেয়েকে কষ্ট দেবে?’

‘অনাহারে মরার চেয়ে অন্তত ভাল,’ খেঁকিয়ে উঠল শ্বেড। ‘এভাবে আর কাঁহাতক সহ্য করা যায়? এরপর বুচার তার ডাল-কুণ্ডাদের নিয়ে চড়াও হবে আমাদের ওপর, কুকুরের মত গুলি করে মারবে আমাদের।’

হোমস্টেডারদের মনোভাব বুঝতে পাচ্ছে কেইন। বিনা ঝামেলায় ওদের নিরস্ত্র করতে পারবে এ-ব্যাপারে সংশয় আছে ওর। এদিকে গোলমাল হলে ওকে অস্ত্র ধরতে হবে বুচারের স্বার্থে, অথচ তা সে আদৌ করতে চায় না।

‘ব্যাংকে চল, শ্বেড,’ কেইন বলল। ‘রায়ানের সাথে আমরা একটা রফা করব।’

মাথা নাড়াল রায়ান। ‘কোন লাভ হবে না, কেইন। এই শহর বুচারের, এখানকার সবকিছুর মালিক সে। কাজেই তোমাদের কারোকে বিশ্বাস করার প্রশ্নই ওঠে না।’

‘বুচার এখানে দাপট দেখায় কারণ এখানকার লোকেরা ওকে ভয় পায়। কিন্তু তুমি একটা মারাত্মক ভুল করছ। আমি বুচারের লোক না। সুযোগ পেলে ও আমাকে খুন করবে। কাল রাতে তার চেষ্টা করেওছে।’

হোমস্টেডারদের একজন বিদ্রূপের হাসি হাসল। ‘ফালতু কথা, ইরা। এরকম আজওবি ঘটনা কখনও শুনেছ?’

‘না,’ শ্বেড জবাব দিল। ‘বুচার আমাদের আগেই হুমকি দিয়েছিল

বন্দুকবাজ ভাড়া করবে। তারপর তুমি এলে। আমার বিশ্বাস তুমি একটা মিথ্যুক, কেইন। তবে আমাদের বোকা বানাতে পারবে না।’

কেইনের সংশয় ঘনীভূত হলো, অর্ধবৃত্তাকারে দাঁড়ানো অশ্বারোহীদের ওপর আবার ঘুরে এল ওর দৃষ্টি, তারপর শ্লেডের চোখে চোখ রেখে জিজ্ঞেস করল, ‘লুড পিয়ারসন কোথায়?’

তিক্ত কণ্ঠে গাল বকল শ্লেড। ‘ওর বোনের বাসায়। শহরে আসার সাহস হয়নি।’

‘আমি ভেবেছিলাম ও বদলা দিতে আসবে।’

‘বললামই তো লুডের সাহস নেই।’

‘সেদিন তোমাকে বলেছিলাম, পিয়ারসনকে ধোলাই দিলে লরি সম্পর্কে চাঞ্চল্যকর সব তথ্য জানতে পারবে। তোমরা ওকে তোমাদের বন্ধু মনে করো—অথচ ও তা না।’

‘তোমাকে আমরা বিশ্বাস করি না,’ ঝামটা মারল শ্লেড। ‘নাও, এবার পথ ছাড়। আমরা বেলা ইউনিয়ন বারে অপেক্ষা করব।’

কেইন তার পিস্তলের বাঁটে হাত রাখল। বলল, ‘শ্লেড, আমি চাই না গোলমাল হোক। তোমার লোকদের বারে পাঠিয়ে তুমি ব্যাংকে এসে রায়ানের সঙ্গে কথা বল। আমি পিয়ারসনকে ধরে আনতে যাচ্ছি। দু-চার ঘা লাগালেই ওর মুখ থেকে সত্যটা জানতে পারবে তোমরা।’

থমথমে হয়ে উঠল পরিবেশ, হোমস্টেডারদের ক্ষুব্ধ চেহারা কৌতূহল জাগল। তারপর শ্লেডের পাশে দাঁড়ানো লোকটা বলল, ‘শেষ একটা চেষ্টা করে দেখতে দোষ কী, ইরা?’

শ্লেড ঘাড় কাত করে সায় জানিয়ে ব্যাংকের হিচ রেইলের দিকে এগোল। ‘তোমরা স্যালুনে যাও,’ সঙ্গীদের বলল ও। ‘আমি দেখি ওদের কী বলার আছে।’

শ্লেড নামল ঘোড়া থেকে, অন্যরা চলে গেল স্যালুন অভিমুখে, কেইন ফুটপাতে উঠল। শ্লেড ওর কাছে এসে সন্দেহ-মাথা গলায় জানতে চাইল, ‘তুমি যদি বুচারের লোক না হবে, তবে তুমি কার লোক?’

‘হার্ভের দুই ছেলেমেয়ে আমাকে নিয়োগ করেছিল ওদের বাবাকে বিপদমুক্ত রাখতে। আমি তা করতে পারিনি। টড জার্তিস আমবুশ করেছে ওকে। বোধহয় হার্ভে বাঁচবে না, তবে আমি চেষ্টা করলে জ্যাকি আর ববকে রক্ষা করতে পারব।’

‘তার মানে,’ ফ্যাসফ্যাসে গলায় শ্লেড বলল, ‘বুচারের সাধের কন্সাইন ভেঙে যাচ্ছে।’

কেইন মাথা ঝাঁকাল। ‘ওর বউ ভেগেছে। আমার ধারণা ও লরির সাথে আছে।’

মৃদু হাসি ফুটে উঠল শ্লেডের গম্ভীর মুখে। ‘আচ্ছা।’ হাসি মিলিয়ে গেল। ‘কিন্তু একটা ব্যাপার এখনও আমার মাথায় আসছে না। তুমি ওই শয়তানটাকে বাঁচাতে চাইছ কেন?’

‘কারণ আমি আমার নিজের কথা ভাবছি,’ কেইন বলল। ‘বো অ্যান্ড অ্যারোর শেয়ার কিনছি আমি, ঠিক করেছি এখানেই থেকে যাব। কাজেই বুচারকে তাড়াতে হবে আমাদের, কিন্তু সেটা নিজেদের মধ্যে মারামারি করে করা সম্ভব না।’

ভুরু কুঁচকে ব্যাপারটা নিয়ে একটুক্ষণ ভাবল স্লেড। এই প্রথমবারের মত কেইনের মনে হলো লোকটা আসলেই ওকে বিশ্বাস করতে চাইছে। আর একটি কথাও না বলে, ঘুরে দাঁড়াল স্লেড, হনহন করে ঢুকে গেল ব্যাংকে। ও বলল, ‘কেইন বলছে তুমি নাকি একটা রফা করবে আমাদের সাথে। তোমার কী বলার আছে, রায়ান, ঝটপট বলে ফেল।’

ক্যাশ কাউন্টারে দাঁড়িয়েছিল ব্যাংকার। কর্কশ সুরে বলল, ‘হ্যাঁ, করব, ইরা। এদিকে এসো তুমি।’ ঘুলঘুলির ভেতর দিয়ে এক খণ্ড কাগজ ঠেলে দিল রায়ান।

সন্দিগ্ধ মনে, ক্যাশের সামনে গিয়ে দাঁড়াল স্লেড। কাগজটা তুলে নিয়ে পড়তে শুরু করল, ক্রমশ কপালে উঠল চোখ। ‘আজ, মনে হচ্ছে, সবারই মাথা খারাপ হয়ে গেছে। এটা পাঁচশো ডলারের হ্যান্ড নোট।’

‘তাই,’ কাঠখোঁটা গলায় বলল রায়ান। ‘সই কর।’

স্লেডের সামনে ঝনাৎ করে একমুঠো স্বর্ণমুদ্রা ফেলল ব্যাংকার। ব্যাংকার তার ধূলিমলিন টুপিখানা কপালের পেছনে ঠেলে দিয়ে জিজ্ঞেস করল, ‘হঠাৎ সুমতি?’

‘আমি চাই না আমার ব্যাংক লুট হোক।’

‘এতে কাজ হবে না। আমরা ঠিক করেছি—’

‘না, ইরা,’ বাধা দিয়ে বলল রায়ান। ‘তুমি আউট-ল না। আজ সেটা হওয়ার চেষ্টাও করো না। যাও, তোমার বন্ধুদের ডেকে নিয়ে এসো। ওদের সবাইকে আমি পাঁচশো ডলার করে ধার দেব। এতে তোমাদের শীতকালটা চলে যাবে। সেদিনই বলেছিলাম তোমাকে, পরিস্থিতি বদলাবে।’

‘এতে তোমার ব্যাংক রক্ষা পাবে বলে মনে কর?’

কেইন এগিয়ে এসে দাঁড়াল স্লেডের পাশে। ‘নাহ, তোমার মাথাটা আসলেই মোটা। কেন বুঝতে পারছ না তোমাদের টাকা ধার দিয়ে মারাত্মক ঝুঁকি নিচ্ছে রায়ান। বুচার টের পেলে আস্ত রাখবে না ওকে।’

স্লেড তার দাড়ির জঙ্গলে হাত ঘষল, পালা করে কেইন আর রায়ানকে দেখছে। তারপর জিজ্ঞেস করল, ‘টাকা না হয় নিলাম, কিন্তু শর্তটা কী?’

‘আছে, মাত্র একটা,’ কেইন বলল। ‘আমি পিয়ারসনের খোঁজে যাচ্ছি। এর ভেতরে যদি বুচার আসে একটা গোলমাল শুরু হয়ে যেতে পারে। শর্ত হচ্ছে, তুমি খেয়াল রাখবে তোমার লোকেরা যেন মাতাল না হয়। তবে শহরেই থাকবে তোমরা, লক্ষ রাখবে রায়ানের যেন কিছু না হয়।’

‘ঠিক আছে,’ বলে রায়ানের কাছ থেকে কলম নিল স্লেড, হ্যান্ড নোটে নিজের নাম সই করল।

ষোলো

শহর ত্যাগের আগে কেইন হোটেলে গেল। কেরানিকে জিজ্ঞেস করল, 'মিসেস বুচার আজ এসেছিলেন? কিংবা কাল রাতে?'

মাথা নাড়াল কেরানি। 'দেখিনি।'

ঘুরে সিঁড়ি বেয়ে দোতলায় উঠল কেইন। রাফেলা যদি তার কামরায় এসে থাকে, সম্ভবত লুকিয়ে আছে যাতে ওর স্বামী ওর হৃদিস জানতে না পায়। চাইলে, ওর পক্ষে খুবই সম্ভব রাতের কোন এক সময়ে খিড়কি দিয়ে ঢুকে পড়া।

রাফেলার দরজায় নক করে কেইন কোন সাড়া পেল না। ইতস্তত করল ও, কান পাতল, কিন্তু এমন কোন শব্দ শুনতে পেল না যা থেকে ভেতরে একজন মহিলার উপস্থিতি প্রকাশ পায়। দরজার নব ঘোরাতেই তালা খুলে গেল। কপাট ফাঁক করে কেইন ডাকল, 'রাফেলা।' তবু কোন সাড়া নেই। ভেতরে ঢুকল ও। লিভিং-রুমটা দেখে মনে হলো সবকিছুই আগের মতই আছে। ধীরপায়ে শোবার ঘরের দরজায় গেল কেইন, আবার ডাকল, 'রাফেলা।' শূন্য ঘরে প্রতিধ্বনি তুলল ওর ডাক। শোবার ঘরের ভেতর উঁকি দিল কেইন। শূন্য, এরকম কোন আলামত নেই যা থেকে বোঝা যায় রাফেলা এসে তাড়াহড়ো করে নিজের কাপড় গুছিয়ে নিয়ে চলে গেছে।

এক মুহূর্ত কেইন দাঁড়িয়ে রইল ওখানে, দৃঢ়বিশ্বাস জন্মাচ্ছে ওর ভেতর, বাথান ছেড়ে আসার পর রাফেলা শহরে আসেনি। স্ল্যাশ ট্রায়ালেও যাবে বলে মনে হলো না। রাফেলা যদি সত্যিই উগড্যান্স ত্যাগ করে না থাকে, কাল রাতে অবশ্যই অন্য কোথাও মিলিত হয়েছে লরির সঙ্গে। সম্ভবত লুকিয়ে আছে ওরা—কোন লাইন কেবিন বা প্রসপেক্টরের পরিত্যক্ত কেবিনে।

হোটেল থেকে বেরিয়ে লিভারি স্ট্যাবলে গিয়ে ঘোড়া ভাড়া করল কেইন। একটা বাদামি রঙের গেল্ডিং, দ্রুতগতিসম্পন্ন নয়, তবে ওর কাজ চলবে। উতে ক্রীকের রাস্তা ধরল ও, আধঘণ্টার ভেতর পৌঁছে গেল কেলসির খামারে।

বাসার পেছনের সবজিবাগানে কাজ করছিল মার্শাল। কেইন ওখানে হাজির হতে, কেলসি এগিয়ে এল ওর কাছে, দৃষ্টিতে সন্দেহ। 'হাউডি, কেইন,' বলে চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল মার্শাল।

'দলবল নিয়ে শ্লেড কিছুক্ষণ আগে শহরে এসেছে,' কেইন বলল। 'অবাক লাগছে?'

'না।' পকেট থেকে একচিমটি তামাক বের করে গালে ফেলল কেলসি, অস্বস্তিভরে দেখছে কেইনকে যেন বুঝে উঠতে পারছে এরপর কী ঘটবে। 'তুমি সেটাই জানাতে এসেছ আমাকে?'

'না, তবে ভাবলাম তোমার জানা দরকার। তুমি এখনও ইন্তফা দাওনি মার্শালের পদ থেকে।'

‘না, তা দেইনি।’

‘এ-দেশে থাকার ইচ্ছে তোমার?’

‘অবশ্যই।’

‘তা হলে শহরে যাও।’

হঠাৎ রাগে ফুঁসে উঠল কেলসি। ‘আমাকে কী করতে হবে আমি ভালই বুঝি। তোমার হুকুমে চলব না আমি।’

‘হুকুম না, কেলসি। একজন বন্ধুর পরামর্শ। এই রেঞ্জের বড়রকমের পরিবর্তন ঘটতে যাচ্ছে। দুই নৌকায় যারা পা দেবে কপালে চরম দুঃখ আসবে তাদের।’

কেলসি তামাক চিবাঁল একটুক্ষণ, তারপর, ‘ধন্যবাদ, আমি শহরে যাচ্ছি,’ বলে চলে গেল ওখান থেকে।

‘আমার এখানে থাকার ইচ্ছে আছে, কেলসি,’ কেইন বলল গলা চড়িয়ে। ‘সুতরাং বুঝতেই পারছ কোনরকম ঝগড়াঝাটি সহ্য করব না আমি।’

পাঁই করে ঘুরল কেলসি। ‘আচ্ছা, বাপু, আচ্ছা। আমি এক্ষুণি যাচ্ছি শহরে।’

‘লুড পিয়ারসনকে দেখেছ এর মধ্যে?’

‘না।’

‘মিসেস বুচার, কিংবা অ্যাবনার লরিকে বোধহয় দেখেছ।’

লরি আর রাফেলা মলি পিয়ারসনের বাসায় নয়তো আউল-স্ হোলে আশ্রয় নেয়ার জন্য এ-পথে আসতে পারে ভেবে আন্দাজে ঢিল ছুঁড়েছিল কেইন, ওর কথায় কেলসিকে চমকে উঠতে দেখে বুঝল ওর অনুমান ঠিক।

মনস্থির করতে একটু সময় লাগল কেলসির। তারপর হুঁশিয়ার গলায় জবাব দিল, ‘না, দেখিনি। কেন?’

‘এমনি জিজ্ঞেস করছিলাম।’ মাথায় হ্যাট চাপাল কেইন, হাসছে। কেলসি, তোমার আর আজ শহরে যাওয়া হলো না। আমাকে মনে হচ্ছে আউল-স্ হোলে যেতেই হচ্ছে। অথচ জায়গাটা আমি চিনি না। তুমি আমার গাইড হবে।’

‘দুঃখিত। আমি নিজেও চিনি না।’

কেইন মাথা ঝাঁকাল, যেন এরকম জবাবই আশা ছিল। ‘আমারও দুঃখ হচ্ছে, কেলসি। শেষপর্যন্ত এই দেশে তোমার থাকা হবে না।’

কেইন আউট-লদের গোপন ডেরায় যাচ্ছে শুনে কেন-যেন সাহস ফিরে পেল কেলসি। উদ্ধত গলায় বলল, ‘তোমাকে আমি ভয় পাই না, কেইন। আগে পেতাম, কিন্তু এখন আর না। তুমি ওখান থেকে প্রাণ নিয়ে ফিরতে পারবে না।’

‘দেখা যাক,’ বলে ক্রীকের ভাটিতে এগোল কেইন।

নদীর ধারে ছোটখাট খামার রয়েছে বেশকিছু। রাস্তার দুপাশেই খেত রয়েছে। কোন-কোনটাতে খড় শুকোচ্ছে, অন্যগুলোতে ভুট্টা জন্মেছে, এখনও কাটা হয়নি। প্রতিটা বাড়ির পেছনেই শোভা পাচ্ছে সবজিবাগান।

ক্যানিয়নের ভেতরটা বেশ গরম, রোদে কেইনের পিঠ পুড়ে যেতে লাগল। শেষমেশ অতিষ্ঠ হয়ে থামল ও, গা থেকে শীপস্কিনের জ্যাকেট খুলে বেঁধে রাখল

স্যাডলের পেছনে। মেসার এই অঞ্চলটা, কেইন ভাবল, বুচারের উচ্চাভিলাষের ফলে ক্ষতিগ্রস্ত হবে না। যে-পক্ষই জয়লাভ করুক, এখানে যে-ফসল আর শাকসবজি উৎপন্ন হয় তার বাজার সবসময়েই থাকবে।

কেইন যখন একটা ঝুপড়ির সামনে রাশ টেনে এক কৃষককে ডেকে জিজ্ঞেস করল, 'মলি পিয়ারসনের বাসা কোনটা?' তখন সবে বিকেল হয়েছে।

উবু হয়ে বাগানের গাজর কাটছিল লোকটা, প্রশ্ন শুনে সোজা হলো, দুটোটা পরস্পর চেপে বসেছে। একটুক্ষণ কেইনকে মাপল সে, ঘুণা চেপে রাখার কোন চেষ্টাই করছে না। তারপর বিরক্ত কণ্ঠে, 'পরের বাড়িটাই,' বলে আবার নিজের কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়ল।

কেইন এগিয়ে চলল, হাসছে আপনমনে। সন্দেহ নেই ওই কৃষক, এবং সম্ভবত এদিককার কেউই পছন্দ করে না পিয়ারসনদের; তবে ওদের বাসায় পৌছানোর আগে পর্যন্ত এর কারণ ওর বোধগম্য হলো না।

খানিকদূর যাওয়ার পর ছোট্ট সাদা একটা কেবিন চোখে পড়ল কেইনের। বাসার সামনে রাশ টেনে ও ডাকল, 'কেউ আছ ভেতরে?'

সাদা পেল না ও, তবে দেখল সামনের জানালার পর্দার পাশ দিয়ে চকিতে একটা নারীমুখ উঁকি দিল। উপত্যকা এই অংশে নেহাত অপ্রশস্ত, বাসার পেছনে ছোটখাট বাগান আর ত্রীক বরাবর লম্বা একফালি খেত রয়েছে। বাসা থেকে অল্পটুক দূরে ছোট্ট বার্ন, তার পাশে পোল কোরাল। খেতের শেষমাথায় খাড়া ওপর পানে উঠে গেছে পাথুরে দেয়াল। কেইন ধারণা করল মলির সংসার চলার মত পর্যাপ্ত চাষাবাদের জমি এখানে নেই।

দরজা খুলে পোর্চে বেরিয়ে এল এক মহিলা। মদির গলায় ডাকল, 'বাইরে কেন, ভেতরে এসো।'

দ্বিধায় পড়ল কেইন। মনে হচ্ছে না কাছেপিঠে আর কেউ আছে, তা ছাড়া ওর ধারণা লুড পিয়ারসন যদি গোলমাল শেষ না হওয়া পর্যন্ত গা ঢাকা দিয়ে থাকতে চায় এখানে সে বেশিক্ষণ থাকবে না। তবু, সাবধানীর মার নেই বলে, ও জিজ্ঞেস করল, 'তুমি একা?'

'আলবত। না হলে তোমাকে চলে যেতে বলতাম।'

নেমে হিচ রেইলে ঘোড়া বাঁধল কেইন। মহিলা এগিয়ে এল ওর কাছে। কেইন আন্দাজ করল ওর বয়স বছর পঁয়ত্রিশেক হবে, মাঝারি উচ্চতা, উজ্জ্বল সোনালি চুল। অলস জীবনযাপন করলে যা হয়, মেদ জমেছে শরীরে, তবে চেহারা এখনও যথেষ্ট আকর্ষণীয়।

'চমৎকার দিন, তাই না?' আবার সেই মদির গলা।

'মোটামুটি,' বলে ওর সাথে বাসার দিকে এগোল কেইন।

ওরা ভেতরে ঢুকতে দরজা বন্ধ করল মেয়েটা, বলল, 'গলা ভেজাবে নিশ্চয়?'

চারপাশে নজর বোলাল কেইন। অপরিচরিত কামরা, তবে পরিপাটি করে গোছানো। মেঝেতে কোথাও ময়লার দাগ নেই, দেয়াল ভাল কাগজে মোড়া। শোবার ঘরের দরজা খোলা ছিল, সাদা বেড কভারে ঢাকা একটা খাট চোখে

পড়ল কেইনের। এবার সে বুঝতে পারল কেন মলি পিয়ারসনের বাসার ঠিকানা জিজ্ঞেস করায় ঘৃণার ছাপ ফুটেছিল সেই কৃষকের চেহারায়।

কেইনের খুব কাছেই দাঁড়িয়েছিল মহিলা। ওর বাহুতে বুকের ঘষা দিয়ে ডাইনিং টেবিলের দিকে ঘুরল সে। কেইন বলল, 'না, আমি গলা ভেজাতে আসিনি। তুমি মলি পিয়ারসন?'

ঝট করে ঘুরে ওর মুখোমুখি হলো মলি, ভুরু কুঁচকে আছে। 'অবশ্যই। আমাকে যদি না-ই চিনবে তা হলে তুমি এখানে এসেছ কেন?'

'নিশ্চিত হতে চাইছিলাম। লুড কোথায়?'

পিছিয়ে গেল মহিলা, হালকা নীল চোখে সতর্কতার আভাস। 'এখানে যদি তোমার কোন কাজ না থাকে—'

'কাজ আছে, ম্যাম। লুড কোথায়?'

'কে তুমি?'

'কেইন।'

একটা দোলনা চেয়ারে আচমকা ধপ করে বসে পড়ল মলি, যেন ওর দেহের ভার আর সহিতে পারছিল না ওর হাঁটুজোড়া। 'কেইন!' অস্ফুট সুরে বলল। 'তুমি জো-কে খুন করেছ।'

কেইন জবাব দেয়ার প্রয়োজন মনে করল না। শুধু আবার জিজ্ঞেস করল, 'লুড কোথায়?'

মলি উঠে পেছনের জানালার কাছে গিয়ে দাঁড়াল। 'ওপাশের ওই পাইন গাছটার নীচে জোয়ের কবর। ওকে মেরেই কি তোমার পিপাসা মেটেনি?'

'লুডকে মারব না। ধরে নিয়ে যাব শহরে। ওকে জেরা করলেই জানা যাবে এই মেসায় সব গোলমালের হোতা কে?'

'তা বোধহয় যাবে,' আপনমনে বলল মলি। 'কিন্তু ও তো এখানে নেই। আউল-স্ হোলে। বুচারের বউ আর লরিও আছে ওর সঙ্গে।'

পকেটে হাত ঢুকিয়ে একমুঠো স্বর্ণমুদ্রা বের করল কেইন, টেবিলের ওপর ছুঁড়ে দিল। 'আউল-স্ হোল আমি চিনি না। ওই টাকাগুলো দিলে তুমি আমার গাইড হবে?'

লোলুপ দৃষ্টিতে টাকার দিকে চেয়ে রইল মেয়েটা। 'অনেক টাকা,' অস্ফুট স্বরে বলল, 'সত্যি দেবে?'

'দেব।'

'তা হলে যাব।'

সতেরো

কেইন আশা করেনি মলি ওর প্রস্তাবে রাজি হবে। তাই সোনার দিকে যখন হাত বাড়াল ও, কেইন চট করে আগে বেড়ে টাকাগুলো পকেটস্থ করল। 'এখন না, ফিরে আসি আগে। আমি ভুলিনি তুমি লুডের বোন।'

'ভুলে যাও,' মলি বলসে উঠল, 'ওর জন্যই আজ আমার এই হাল। মুরোদ নেই, খালি কথা।'

'তবু।'

ভুরু কোঁচকাল মলি, তারপর ঢিল পড়ল মুখের পেশীতে। 'বেশ। আমার বিশ্বাস তুমি আমাকে ঠকাবে না।'

শোবার ঘরে গিয়ে কাপড় বদলে ফিরে এল মলি। দুজনে মিলে রওনা হলো আউল-স্ হোলের উদ্দেশে। মলির ঘোড়াটা একটা খয়েরি রঙের মেয়ার, জবুখুবু ভঙ্গিতে মহিলা বসেছে স্যাডলে। নীরবে ওকে অনুসরণ করছে কেইন। মলি পিয়ারসনের মত কোন মহিলার সাথে আজতক পরিচয় হয়নি ওর, সম্ভবত আর কখনও হবেও না। রাফেলা বুচারকে মনে পড়ল ওর, ভাবল মহিলা এখন নিজের ভুলের জন্য পস্তাচ্ছে কিনা। যদি এখনও আক্ষেপ না করে, ভবিষ্যতে অবশ্যই করবে। ব্ল্যাক গ্যারিটির লোভের ফাঁদে আটকা পড়েছিল ও; স্বামীর কাছে ওর চাহিদা পূরণ না হওয়ায় ছুটে গেছে লরির কাছে, এখন ওর বা লরির কারোরই পালাবার কোন পথ নেই।

রাফেলাকে মন থেকে সরাল কেইন, ভবিষ্যতের কর্মপন্থা ভাবতে লাগল। পিয়ারসন যদি হাইড-আউটে একা থাকত তেমন একটা ঝামেলা পোয়াতে হত না কেইনকে, কিন্তু লরি ওর সঙ্গে থাকায় সমস্যা জটীলাকার ধারণা করেছে। দুজনেই মারাত্মক খল, একের সাহসের ঘাটতি অন্যে পুষিয়ে দেবে।

মলি আর কেইন ডেভিল রিভার ক্যানিয়নে পৌছাল। সামনে ট্রেইল ঢেউ খেলে নেমে গেছে নীচে। ওদের বাঁয়ে উত্তে ক্রীক, প্রায় পঞ্চাশ ফুট নীচে একটা ক্রিফের ওপর সশব্দে আছড়ে পড়ছে ঝরনার পানি। কোনদিকে না তাকিয়ে, সোজা নীচের ট্রেইল ধরল মলি, নদীতে পৌছে তবে থামল।

'পাহাড়ে চড়তে ভয় করে না আমার,' কেইনকে বলল ও, 'কিন্তু নামতে করে।'

নদীটা জরিপ করছিল কেইন, এই অংশে চওড়া, স্রোত কম। 'অনেক পানি?'

মলি ঘাড় নাড়াল। 'না।' অপর পাশে, প্রায় পঞ্চাশ ফুট ভাটিতে বড় একটা কটনউড দেখাল ও। 'ওই গাছ বরাবর এগোও, পানি তোমার ঘোড়ার পেট অবধি পৌছাবে না। এখান দিয়ে পার হওয়াই সবচেয়ে সোজা।'

পশ্চিমে হেলে-পড়া সূর্যের দিকে তাকাল কেইন। গতরাতের ঠাণ্ডা আর

ভূমিরপাতের চিহ্নমাত্র নেই কোথাও। এরকম পাহাড়ি এলাকায় মূলত উচ্চতার ওপর নির্ভর করে সেখানকার আবহাওয়া কেমন হবে। বৃষ্টিতে পারল কেইন কেন শীতকালে মোর্যানের জমিতে গরু চরাতে চেয়েছে জ্যাকুলিন, বা মেসার পশ্চিমের উপত্যকা দখল করতে চায় বুচার।

‘চল, এগোই,’ কেইন বলল। ‘আর কদর?’

‘বেশি না,’ মাথা ঝাঁকিয়ে ক্যানিয়নের উত্তর দেয়ালটা দেখাল মলি। ‘ওর পেছনেই। না পৌছা অবধি তুমি কিছু বৃষ্টিতেই পারবে না।’

নদীতে নামল ওরা, মলি সামনে রয়েছে, তারপর কোনাকুনিভাবে ক্যানিয়নের ওপাশের দেয়ালে উঠল। এই ট্রেইলটাও একরকম আগেরটার মতই, লাল ধুলো উড়ছে ওদের আশপাশে, চড়াই ভাঙতে গিয়ে হিমসিম খাচ্ছে ঘোড়াগুলো, হাঁপাচ্ছে।

‘পেলে জায়গাটা দেখতে?’ মলি প্রশ্ন করল।

রেকাবের ওপর দাঁড়িয়ে চারপাশে নজর বোলাল কেইন। উত্তরে ক্রমশ খাড়া হয়ে পাহাড়ের দিকে উঠে গেছে মাটি। জ্রাব ওকের গভীর জঙ্গল রয়েছে ওখানে।

মাথা নাড়াল ও। ‘নাহ্।’

‘আউট-লরা ছাড়া বাইরের বিশেষ কেউ চেনে না জায়গাটা।’ আচমকা ডানে বাক নিল মলি। দেয়ালের কিনার থেকে গজ পঞ্চাশেক যেতেই আউল-স্-হোল চোখে পড়ল ওদের। সামনে ঘন ঝোপঝাড় থাকায় একেবারে ক্রিফের মুখ অবধি না যাওয়া পর্যন্ত কেউ বৃষ্টিতেই পারবে না ওখানে পাহাড়ের গায়ে ফাটল রয়েছে একটা। ট্রেইল একেবেঁকে নীচে নেমে গেছে। মাথা-সমান ঝোপ-ঝাড়ের ভেতর দিয়ে নীচের পথ ধরল ওরা। পাঁচ মিনিট পর হাইড আউটের সমতল মেঝেতে রাশ টেনে মলি বলল, ‘এসে গেছ মিস্টার। এবার তোমার কাজ তুমি কর।’ কান খাড়া করল ও, অর্থপূর্ণ দৃষ্টিতে তাকাল কেইনের দিকে। ‘তবে আমার মনে হয় না লুড যেতে চাইবে তোমার সাথে।’

‘যাবে,’ কেইন বলল।

মুখ বাকাল মলি। ‘কী জানি, তবে আমার পাওনাটা এখনই দিয়ে দিলে পারতে।’

‘ফিরে গিয়ে দেব,’ কেইন বলল। ‘টাকা পাওয়ার ইচ্ছে থাকলে, তুমি লক্ষ রাখবে আমি যেন ফিরতে পারি।’

‘অসম্ভব, মিস্টার। লুড কোথায় আছে আমি দেখিয়ে দেব, কিন্তু ওকে খুন করার ব্যাপারে তোমাকে সাহায্য করব না।’

বেশ কিছুক্ষণ চুপ করে রইল কেইন, কান পেতে আছে, কিন্তু কোন জনমানবের সাড়া পেল না। ও এখন যেখানে আছে সেখান থেকে বৃষ্টিতে পারছে না লুড কোথায় থাকতে পারে, কিংবা আউট-লদের এই গোপন ডেরাটা কত বড়। আপাতদৃষ্টিতে মনে হচ্ছে ক্যানিয়নটা বেশ দীর্ঘ এবং সরু, দুপাশে খাড়া বেলেপাথরের দেয়াল। ওদের মাথার ওপর ক্রিফের চূড়া ক্যানিয়নের ভেতর দিকে বাকা হয়ে আছে, ফলে আকাশটাকে দেখাচ্ছে নীল একটা ফিতের মত।

সূর্য, কেইন অনুমান করল, দুপুরের দিকে অল্প কিছুক্ষণের জন্য দেখা যায়। সব মিলিয়ে খুব সুখকর পরিবেশ নয়।

‘সামনে যাও,’ মলি বলল প্রচ্ছন্ন বিদ্বেষের সুরে, ‘ওদের দেখতে পাবে।’

মলির চোখের পানে অনুসন্ধিৎসু দৃষ্টিতে তাকাল কেইন, আশঙ্কা হচ্ছে ঠিক এই মুহূর্তেই হয়তো লুড পিয়ারসন তার পিস্তল তাক করেছে ওর দিকে। মলিকে বিশ্বাস করতে পারছে না কেইন, এমনকী একশো ডলারের বিনিময়েও না। থেমে-থেমে ও বলল, ‘লুডকে খুন করার ইচ্ছে আমার নেই কারণ মরা মানুষ কথা বলে না। অথচ ওকে আমার কথা বলাতে হবে। তুমি তাতে সাহায্য করতে পার আমাকে।’

‘না। ওটা তোমাকে একাই করতে হবে। তবে আমি একটা পরামর্শ দিতে পারি। ঘোড়া এখানে রেখে হেঁটে যাও।’

এটা মলির কোন চাল হতে পারে, কেইন ভাবল। হয়তো ওকে অসহায় অবস্থায় ফেলে রেখে ওর ঘোড়া নিয়ে পালাতে চাইছে। আবার, সম্পূর্ণ ভাল মনেও কথাটা বলে থাকতে পারে ও। টাকার প্রয়োজন আছে ওর, তা ছাড়া ভাইকে যে ও দুচোখে দেখতে পারে না সে-ব্যাপারে কোন সন্দেহ নেই। কেইনের বোঝা ভুল না হয়ে থাকলে, লুড মারা গেলেই বরং মলি লাভবান হবে বেশি-লুডের কেবিন বেচে দিয়ে টাকাপয়সা-সহ চলে যেতে পারবে অন্য কোথাও।

ঘোড়া থেকে নেমে লাগাম ছেড়ে রাখল কেইন। ‘তুমি থাকছ এখানে?’

‘আলবত। খানিক পর গিয়ে ঘোড়ার পিঠে তোমার লাশ তুলে শহরের পথ ধরব।’

‘মনে হয় না তোমার আশা পূরণ হবে।’

হোলস্টার থেকে পিস্তল বের করে ঝটপট পরখ করে দেখল কেইন গুলি ভরা আছে কিনা, তারপর আবার যথাস্থানে রেখে দিল। আলতো পায়ে ট্রেইল ধরে এগোল ও, বিপদের আশঙ্কায় পাকস্থলির ভেতর পাক দিচ্ছে।

পিয়ারসন আর লরি ছাড়াও, আরও অনেক লোক এখানে থাকা বিচিত্র না। মলি হয়তো ধাপ্পা দিয়েছে, কিংবা ওর সেটা জানা নাও থাকতে পারে। যদি সত্যিই আরও লোক থেকে থাকে, পাহারার বন্দোবস্ত করবে ওরা। কেইন জানে কোন ধরনের লোক এরকম হাইড-আউটে আশ্রয় নেয়; জানে পলাতক জীবনে ভয় ওদের সার্বক্ষণিক সঙ্গী হয়।

উবু হয়ে ট্রেইল পর্যবেক্ষণ করল কেইন। বেশিক্ষণ হয়নি দুটো ঘোড়া গেছে এ-পথে। ওগুলো নিশ্চয় রাফেলা আর লরির। সম্ভবত আরও আগে থেকে পিয়ারসন আছে এখানে। কেইন এগিয়ে চলল, ভাবছে আর কতদূর যেতে হবে এভাবে।

যে-মুহূর্তে মলির দৃষ্টিসীমার আড়াল হলো, ঝট করে ট্রেইল থেকে সরে গেল ও, একটা ক্রাব ওকের তলায় মাটি কামড়ে মরার মত পড়ে রইল কয়েক মিনিট। এখন লাকড়ি পোড়ার গন্ধ পাচ্ছে ও। এর অর্থ, ওদের কেবিনটা আর বেশি দূরে নেই। লরি আর রাফেলা, অথবা হয়তো তিনজনেই একত্রে ডিনার খাচ্ছে।

বুকে হেঁটে এগোল কেইন, থেমে কান পাতল। আউট-স্ হোলের তলদেশ মোটামুটি উষ্ণ, এবং খটখটে। বোধহয় গেল কয়েক হস্তার মধ্যে বৃষ্টি হয়নি। ও যখনই নড়াচড়া করছে, শরীরের চাপে মচ্ শব্দে ঠড়িয়ে যাচ্ছে ওক পাতা। অথও নীরবতার মাঝে ওর কানে অসম্ভব জোরাল শোনাচ্ছে সেই আওয়াজ। এখন ক্যাম্পের প্রায় কাছে চলে এসেছে ও, ঝোপের ফাঁক দিয়ে ক্যাম্পফায়ারের আলো দেখতে পাচ্ছে। আরও দশ কদম যাওয়ার পর ছোট্ট একফালি ফাঁকা জমির কিনারে পৌঁছাল সে; একটা কেবিন, ঘোড়া রাখার ছাউনি আর পোল কোরাল চোখে পড়ল।

পিস্তল বের করল কেইন, কেবিনের পাশের দেয়াল লক্ষ্য করে দৌড়ে যেতে চাইছিল। ঠিক তখনই পেছনে এক লোকের ছুটন্ত পায়ের আওয়াজ পেল।

আঠারো

পয়লা চোটে কেইনের মনে হলো লরি নয়তো পিয়ারসন ওর পেছনে রয়েছে, সম্ভবত ওদের কেউ একজন ট্রেইল পাহারায় ছিল, এবং কোন কারণবশত মলি আর ওর এখানে ঢোকা দেখতে পায়নি। পিস্তল হাতে ট্রেইলে পা রেখেই সম্ভাবনাটা নাকচ করে দিল ও। এরকম অবস্থায় কোন পাহারাদারই এতটা দায়িত্বজ্ঞানহীন হবে না। আরেকটা ব্যাখ্যা আছে এর। পাহারাদার নিশ্চয় চেনে না কেইনকে, ফলে মলির সাথে দেখে ধরে নিয়েছে ও-ও কোন ফেরারি আউট-ল হবে, আউল-স্ হোলে আশ্রয় নিতে আসছে।

লোকটা দৃষ্টিসীমায় এল, কেইনের অপরিচিত। বেঁটে, ছুঁচোল মুখ, কালো কুঁতকুঁতে চোখ, সম্ভবত এখানে যখন কোন ফেরারি থাকে, পাহারার জন্য ওকে ভাড়া করে পিয়ারসনরা। পিস্তল ছিল লোকটার হাতে, কেইনকে একনজর দেখেই তাক করল।

মনে-মনে গাল বকল কেইন, জানে পিয়ারসন আর লরিকে চমকে দেয়ার সুযোগ হাতছাড়া হয়ে যাচ্ছে। গুলি করল ও, গোড়ালির ওপর পিছিয়ে গেল পাহারাদার, ওর বুলেট উড়ে চলে গেল কেইনের কানের পাশ দিয়ে।

থমকে দাঁড়িয়েছে পাহারাদার, কেইনের বুলেটের ধাক্কায় টলছে, বা হাতখানা আপনাআপনি চেপে বসেছে আহত পাজরের ওপর। অতিকষ্টে টাল সামলাল ও, গুলি করল আবার; এবারও লক্ষ্যভ্রষ্ট হলো। কেইনের দ্বিতীয় বুলেট ওর বুকে আঘাত হানল, হুড়মুড় করে দু'কদম পিছিয়ে গেল লোকটা, হাঁটু ভেঙে বসে পড়ল মাটিতে, মুখ খুবড়ে লুটিয়ে পড়ল।

লোকটা মরেছে কিনা জানতে সময় ব্যয় করল না কেইন। গোড়ালির ওপর ঘুরেই, কেবিন লক্ষ্য করে ছুটে গেল। পানির বালতি হাতে এই সময় কেবিনে ঢুকছিল লুড পিয়ারসন। কেইনকে দেখতে পেয়ে চেঁচিয়ে উঠল সে, ঝাঁপ দিল দরজার ভেতরে, ওর পায়ের ধাক্কায় বালতি কাত হয়ে অধিকাংশ পানি ছলকে

পড়ল। ইতিমধ্যে কেবিনের পূর্ব দেয়ালের ধারে পৌছে গেছে কেইন, হাঁপাচ্ছে, এপাশে কোন জানালা না থাকায় নিজের ভাগ্যকে মনে-মনে ধন্যবাদ দিল ও। একটুক্ষণ স্থির দাঁড়িয়ে রইল কেইন, কান খাড়া, তারপর খালি টোটা ফেলে দিয়ে সিলিন্ডারে গুলি ভরল নতুন করে।

‘পিয়ারসন,’ ডাকল ও।

সাদা এল না। আবার চিৎকার করল কেইন, ‘পিয়ারসন!’ তবু কোন শব্দ নেই কেবিনের ভেতরে। উদ্যত পিস্তল হাতে সামনের কোণের দিকে সরে গেল ও। টুপি খুলে কোণের ব্যারেলের মাথায় ঝুলিয়ে দিল সে, ঠেলে দিল সামনের দিকে যেন দরজা থেকে দেখা যায়। যখন কিছুই ঘটল না, আবার মাথায় টুপি চাপিয়ে উকি দিল কোনা থেকে। কেউ নেই।

‘পিয়ারসন,’ কেইন ডাকল। ‘তোমাকে আমি ডগড্যাঙ্গে নিয়ে যাব। তুমি সবাইকে বলবে মোর্যানের স্টেজ স্টপে আসলে কী ঘটেছিল।’

‘কেইন,’ হিস্টিরিয়াগ্রস্ত রোগীর মত চোঁচিয়ে উঠল রাফেলা।

‘কী?’

‘পিয়ারসনকে ধরতে তুমি ভেতরে এসো না। আমি চোট পাব।’

‘তা হলে ওকে দুহাত তুলে বাইরে আসতে বল।’

‘জাহান্নামে যাও,’ খেঁকিয়ে উঠল পিয়ারসন। ‘আমি বেরোলেই তুমি আমাকে শেষ করবে।’

‘আমি জবানের বরখেলাপ করি না,’ কেইন বলল। ‘তুমি তা ভালই জান।’

‘আমি বেরোব না। ইচ্ছে হলে তুমি ভেতরে আসতে পার।’

রাফেলার কথা ভেবে একটু ইতস্তত করল কেইন। তারপর হাঁক দিল, ‘রাফেলা, তুমি বাইরে আস।’

ফের নীরবতা নামল, কেইন বুঝল বাইরে আসার বিন্দুমাত্র ইচ্ছা নেই রাফেলার। তা ছাড়া লরি আর পিয়ারসন সেই সুযোগ দেবে না ওকে। নিজেদের নিরাপত্তার জন্য ওরা ওকে জিম্মি হিসেবে ব্যবহার করবে। তারপর পেছনে ফ্রীণ একটা শব্দ গুনল ও, কাঠের গায়ে বুট ঘষা খেলে যে-রকম আওয়াজ হয় তেমনি। ওদের কেউ একজন পেছনের জানালা দিয়ে বাইরে আসছে।

‘ঠিক আছে, কেইন,’ চিৎকার করে বলল পিয়ারসন। ‘আমি আসছি খালি হাতে। গুলি কোরো না।’

ঝটিতি ঘুরেই পেছন দিকে এগোল কেইন, জানে পিয়ারসন ধাপ্পা দিচ্ছে, ওরা ওকে ক্রসফায়ারে ফেলার ভাল করছে। এরকম কিছু ঘটতে পারে ও আশা করেনি; ওর ধারণা ছিল লুড বা লরি কারোরই সাহস হবে না ওর মুখোমুখি হওয়ার। জানালা দিয়ে সবে বাইরে এসেছে লরি এই সময়ে কেবিনের পেছনের কোণে পৌছাল কেইন। পরস্পরের এত কাছাকাছি রয়েছে ওরা যে মিস করার প্রশ্নই ওঠে না। এই প্রথমবারের মত লরির ডাবলেশহীন মুখে বিস্ময়ের ছাপ ফুটল। ও আশা করেছিল পিয়ারসনের কথায় কেবিনের সামনেই থাকবে কেইন।

ভূরিত প্রতিক্রিয়া হলো কেইনের। একপাশে ঝাঁপ দিল ও, একই সাথে গুলি করেছে। বুকে গুলি লাগল লরির, এর এক সেকেন্ড পর ওর বুলেট কেইনের

কোটের বাঁ আঙ্গিন ভেদ করল। মাটি স্পর্শ করেই একটা গড়ান দিল কেইন, লরির দিকে পিস্তল তাক করে উঠে বসল। কিন্তু ততক্ষণে লড়াই শেষ, লরি পড়ে আছে উপুড় হয়ে।

‘লরি, কেব্রা ফতে?’ জিজ্ঞেস করল পিয়ারসন।

কেবিনের সামনে এসে কেইন দেখল দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে আছে পিয়ারসন, হাতে পিস্তল, দোনোমনো করছে, যেন বুঝতে পারছে না কী করবে।

‘অস্ত্র ফেলে দাও,’ কেইন আদেশ করল।

পিয়ারসন দিশেহারা হলো আতঙ্কে। বিড়বিড় করে কিছু একটা বলে পিস্তল উঁচু করল। ওদিকে কেবিনের ভেতরে তারপরে চোঁচাচ্ছে রাফেলা। আবারও পরিস্থিতির শিকার হলো কেইন, অনিচ্ছাসত্ত্বেও গুলি করল। সামনের দিকে বাঁকা হয়ে গেল পিয়ারসন, শিথিল মুঠি থেকে পিস্তল খসে পড়ল। ওই অবস্থায় একটুক্ষণ টলমল করল ও, তারপর ধপাস করে লুটিয়ে পড়ল ধুলোয়। ওর মুক্তো রঙের স্টেটসন হ্যাট স্থানচ্যুত হয়ে পাশেই গড়াগড়ি যেতে লাগল।

তখনও চোঁচাচ্ছিল রাফেলা। পিস্তল খাপে রেখে, লুডের লাশ টপকে কেবিনে ঢুকাল কেইন। ঘরের মাঝখানে দাঁড়িয়েছিল মহিলা, মুখ হাঁ, বিস্ফারিত চোখ দুটো কোটর ঠেলে বেরিয়ে আসতে চাইছে। কেইন প্রবলভাবে ঝাঁকুনি দিল ওকে, বলল, ‘চুপ কর। চুপ কর।’ রাফেলাকে ধরে বসাল ও। ধীরে-ধীরে প্রকৃতিস্থ হলো রাফেলা, কাদতে শুরু করল। কেইন নীরবে ওর পাশে দাঁড়িয়ে থাকল, ব্র্যাক গ্যারিটি আর বিল বুচারের ওপর অসীম ঘৃণায় ছেয়ে আছে মন, উপলব্ধি করছে এই মহিলার প্রতি কী নিদারুণ অন্যায় করেছে ওরা, অথচ সুযোগ পেলে এই রাফেলাই যে-কোন পুরুষকে ভালবাসায় ভরিয়ে তুলতে পারত।

পকেটে হাত ঢুকিয়ে রুমাল বের করল রাফেলা, চোখ মুছল। তারপর, নতমুখে নিস্পৃহ গলায় জিজ্ঞেস করল, ‘অ্যাবনার?’

‘মারা গেছে।’

‘জানি,’ ফ্যাসফ্যাসে গলায় বলল রাফেল। ‘তুমি একটা শয়তান, কেইন। আমাদেরকে একা থাকতে দিলে না কেন?’

‘কী আশা করছিলে, পুতুলের মত দাঁড়িয়ে থেকে আমি মরব?’

কেইনের চোখে চোখ রাখল রাফেলা, দৃষ্টিতে ঘৃণার আঙন। ‘অ্যাবনার আমার ছিল, কেইন। এখন নিজের বলতে আমার আর কিছুই থাকল না।’

‘আমি তোমাকে ফিরিয়ে নিয়ে যাব,’ কেইন বলল। ‘এখানে তুমি থাকতে পারবে না।’

চুপ করে রইল রাফেলা। যেন নড়াচড়া করার শক্তি হারিয়ে ফেলেছে, একদৃষ্টে চেয়ে আছে কেইনের দিকে, দুই গাল বেয়ে অশ্রু নেমেছে। ঘুরে বাইরে বেরিয়ে গেল কেইন। কোরালাে ছিল গ্যারিটির ঘোড়া। জিন চাপিয়ে ঘোড়াটাকে কেবিনের সামনে নিয়ে এল ও। তখনও ভেতরে বসে আছে রাফেলা, দেখে মনে হয় না নড়াচড়া করেছে। কিন্তু কেইন যখন কাছে গেল ডান হাতখানা তুলল ও, তাতে জোঁট একটা পিস্তল ধরা, কাঁপছে থরথর করে।

ওর হাত থেকে পিস্তলটা আলগোছে ছিনিয়ে নিল কেইন। বলল, 'আমাকে অভিশাপ দাও। তবে একদিন বুঝবে লরিকে মেরে আমি ভালই করেছি। ও তোমার যোগ্য ছিল না, রাফেলা।'

'আমাকে তুমি ডগড্যাঙ্গে নিয়ে যাবে,' নিশ্চয় কণ্ঠে রাফেলা বলল। 'বিল—'

ওর কাছে তোমার যাওয়া লাগবে না। আমরা অন্য ব্যবস্থা করব।' দরজার দিকে ইশারা করল কেইন। 'চল, যাওয়া যাক। আর কেউ আছে এখানে?'

'একজন। পাহারাদার।'

'ও কারোকে বিরক্ত করবে না।'

উঠে আড়ষ্ট ভঙ্গিতে দরজার দিকে এগোচ্ছিল রাফেলা। কেইন খামল ওকে, দ্রুতহাতে ওর কোটের পকেট তল্লাসি করল, কিন্তু আর কোন অস্ত্র পেল না।

'যতদিন বাঁচব, আমি তোমাকে ঘৃণা করব,' রাফেলা বলল। 'তুমি জান না আজ তুমি আমার কী ক্ষতি করেছ।'

ডেনভার থেকে মেন্টেরোসায় আসার সময়ে ট্রেনের কামরায় রাতে যে-স্বপ্ন দেখেছিল কেইন, ওর হাতে যেসব লোক নিহত হয়েছে তারা বাঙ্গ-বিদ্রূপ করেছে, এবার চকিতে সেই স্বপ্নের কথা মনে পড়ল ওর। কোল্যাটাসে ট্রেন ত্যাগ করার পর থেকে এ-পর্যন্ত চারজনকে হত্যা করেছে ও, এখন ওদের প্রেতাত্মারা অন্যদের সঙ্গে ওর বিরুদ্ধে হাত মেলাবে।

'বেশ তো, কর,' রুক্ষ সুরে বলে রাফেলাকে নিয়ে বাইরে এল ও। রাফেলা দেখল পিয়ারসনের লাশ পড়ে আছে কেবিনের ধারে। থমকে দাঁড়াল ও, এক হাত উঠে আসছে গলার কাছে। বিদ্যুটে একটা আওয়াজ বেরোল ওর গলা চিরে, মূর্ছা গেল। কেইন ধরে ফেলল ওকে, লরির লাশ ওকে দেখতে হয়নি বলে ধন্যবাদ দিল নিজের ভাগ্যকে। রাফেলাকে বাইরে ঠুইয়ে দিয়ে, লাশ দুটো কেবিনের ভেতর রেখে এল ও, দরজায় শেকল তুলে দিল। তারপর রাফেলার অসাড় দেহখানা সামনে রেখে, গ্যারিটির ঘোড়ায় চেপে বেরিয়ে গেল কেবিনের উঠন ছেড়ে।

যেখানে পড়েছিল, ট্রেনের সেখানেই পড়ে আছে পাহারাদার। কেইন ওকে পাশ কাটিয়ে আবার ট্রেনে ফিরে এল। এক মিনিট পর মলি পিয়ারসনের দেখা পেল ও, ক্যানিয়নের দক্ষিণ দেয়ালের গোড়ায় ওর মেয়ারের লাগামহাতে দাঁড়িয়ে আছে।

'তোমার ভাই আর লরি মারা গেছে,' বলে ওর পাওনা মিটিয়ে দিল কেইন। 'আমি দুঃখিত।'

'আমার কিন্তু একটুও দুঃখ হচ্ছে না,' মলি বলল। 'এরকম কিছুই পাওনা ছিল লুডের। ও সবসময় জো আর আমাকে ব্যবহার করেছে, আর লাভের বড় অংশটা নিয়েছে নিজে।'

উনিশ

ক্যানিয়ন থেকে বেরিয়ে যখন নদীর কাছে পৌঁছাল ওরা, রাফেলা নিজের ওপর নিয়ন্ত্রণ ফিরে পেল। 'এবার আমি একাই চালাতে পারব,' বলল ও।

রাশ টেনে ওকে নামিয়ে দিল কেইন। নিজেও নামল, দেখছে নদীর পাড়ে হাঁটু গেড়ে বসে হাত-মুখ ধুচ্ছে রাফেলা। সূর্য ডুবে গেছে, ক্যানিয়নের নীচে আলো বিশেষ নেই। রাফেলা উঠে কান্না ভেজা রুমাল দিয়ে মুখ মুছল। কেইনের কাছে এসে জিজ্ঞেস করল নিচু গলায়, 'তোমার বিশ্বাস আমিই দায়ী সবকিছুর জন্য, তাই না?'

ওর বেদনাক্রিষ্ট মুখের দিকে তাকিয়ে কেইন বলতে পারল না ঠিক একথাটাই ও আর জ্যাকুলিন হার্ভের ধারণা করেছিলাম। তবে এখন ওর মনে হচ্ছে ওদের সেই ধারণা ভুল। সম্ভবত ব্ল্যাক গ্যারিটি কিংবা বুচারই দায়ী।

'না,' শেষমেশ বলল ও। 'তোমার একার না। আমরা সবাই ভুল করি।'

'যেমন আমি করেছি বিলকে বিয়ে করে,' তিজু সুরে বলল রাফেলা। 'এখন ওর কাছেই আমাকে নিয়ে যাচ্ছ তুমি।'

'না। তুমি কী চাও তাই বল?'

'পালাতে। কিন্তু আমার কাছে টাকাপয়সা নেই।'

'তা হলে কাল রাতে যে আমাকে দিতে চেয়েছিলে?'

'ব্ল্যাকের কাছ থেকে নিতাম।'

'আমাকে তাড়াবার জন্য এত ব্যস্ত হয়েছিলে কেন?'

'সবটাই লরির প্ল্যান,' নিরুত্তাপ কণ্ঠে বলল রাফেলা। 'শ্লেড বিশ্বাস করেছিল ওকে। যখন লড়াই শুরু হত, বুচারকে মারার ব্যবস্থা করত লরি, ও মরলে আর কোন সমস্যাই থাকত না।'

কথাটা মনেপ্রাণে বিশ্বাস করে মেয়েটা। কেইনের কোন সন্দেহ নেই। ও বলল, 'কিন্তু লরি একটিবারও ভেবে দেখেনি হোমস্টেডারদের কপালে কী ঘটবে এর ফলে। বুচারকে পথ থেকে সরাতে চেয়েছিল ও যাতে বাঁধ দিয়ে লোকজনের কাছে পানি বেচতে পারে।'

'তুমি কী করে জানলে?' রাফেলা অবাক। 'এক আমি ছাড়া এ-ব্যাপারে ও আর কারও সাথে আলাপ করেনি।'

'নিছক অনুমান। তোমার সাথে চুক্তি করব। লরির ব্যাপারে পিয়ারসন এখন আর কিছু বলতে পারছে না শ্লেডকে, কাজেই তুমি বলবে। বিনিময়ে তোমার একটা হিল্লো আমি করে দেব।'

'না,' ডুকরে উঠল রাফেলা। 'অ্যাবনার মারা গেছে। ওর সুনাম আমি নষ্ট করতে পারব না।'

'সুনাম ওর কোনকালেই ছিল না,' কেইন বিরক্ত। 'শুরু থেকেই এই ভুলটা

করে আসছ তুমি। একমাত্র তুমি ছাড়া মেসার অন্য সবাই বিশ্বাস করে লরিই খুন করেছে ওর বাপকে। বুচারের বিরুদ্ধে মদত জোগানোর আশ্বাস না দিলে, শ্লেডও ওকে বিশ্বাস করত না।

অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে নিল রাফেলা। 'আমার বিশ্বাস হয় না অ্যাবনার ওর বাবাকে খুন করেছে।'

'তুমি বিশ্বাস কর না কারণ তুমি ওকে ভালবেসেছিলে। এখন ওর জন্য তোমার নিজের জীবন নষ্ট করার কোন মানে হয় না।'

নদীর পাড়ে গিয়ে দাঁড়াল রাফেলা, বলল, 'বেশ, তাই হবে।'

'এখন পারবে রওনা হতে?'

'পারব।'

ওরা যখন ডগড্যাঙ্গে পৌছাল হোটেল আর তিনটে স্যালুনেই তখন বাতি জ্বলছে। কিন্তু একটা তাৎপর্যপূর্ণ ব্যাপার চোখে পড়ল কেইনের। একমাত্র বেলা ইউনিয়নের হিচ রেইলে-বাঁধা কয়েকটা ঘোড়া ছাড়া সদর রাস্তা একদম ফাঁকা।

বেলা ইউনিয়নের সামনে থামল ওরা, কেইন বলল, 'তুমি অপেক্ষা কর, আমি শ্লেডকে ডেকে আনছি।'

স্যাডল থেকে নামল ও, রাফেলা অপলকে চেয়ে আছে স্যালুনের দরজার দিকে। হিচ রেইলের কোনা ঘুরে কেইন যখন ফুটপাতে উঠল তখন ও নিশ্চিত হতে পারছিল না শেষপর্যন্ত রাফেলা তার প্রতিশ্রুতি রাখবে কিনা। স্যালুনে ঢুকল কেইন। শ্লেড আর প্যাডি রায়ান গল্প করছিল বারে দাঁড়িয়ে। অন্যরা ছড়িয়ে-ছিটিয়ে রয়েছে, বেশির ভাগই তাস পিটাচ্ছে। কেইন ডাকল, 'শ্লেড, গুনে যাও।'

পাঁই করে ঘুরল শ্লেড, অবাক হয়েছে। 'তুমি এসে গেছ তা হলে।'

'শোন, এদিকে,' কেইন আবার ডাকল।

শ্লেড এগিয়ে এল কাছে, পেছনে রায়ান। ধমথমে নীরবতা নেমেছে ঘরে, সবগুলো চোখ কেইনের ওপর স্থির, তারপর ওরা একে একে ওর আশেপাশে জড় হতে শুরু করল।

'চালির সাথে কথা হয়েছে?' কেইন জিজ্ঞেস করল।

'হ্যাঁ। জ্যাকির সাথেও আলাপ করেছি।'

'এবার বিশ্বাস হয় আমাদের?'

'হয়, তবে লরি—'

'এস আমার সঙ্গে।' ব্যাটউইং ঠেলে বাইরে বেরিয়ে এল কেইন।

রাফেলা একচুল নড়েনি। হিচ রেইলের কোনা ঘুরে ওর পাশে গিয়ে দাঁড়াল কেইন। বলল, 'শোনাও ওদের।'

গালে হাত রাখল রাফেলা, কাঁপছে, যেন পাহাড় থেকে নেমে আসা হিমেল হাওয়া ছুরি চালাচ্ছে ওর শরীরে। ওদের দিকে তাকাল ও, রায়ানকে চিনতে পেরে হাউমাউ করে বলল, 'প্যাডি, আমি—' গলা বুজে আসায় মাঝপথে থেমে গেল রাফেলা।

'লরি সম্পর্কে তুমি কতটা জান?' রায়ান প্রশ্ন করল।

'ওর একমাত্র লক্ষ্য ছিল বিলকে খতম করা,' একটুক্ষণ চুপ করে থেকে

বলল রাফেলা। 'নদীতে বাঁধ দিয়ে পানি বিক্রি করার ইচ্ছে ছিল ওর। এ-
ব্যাপারে ডেনভারের একটা কোম্পানি সাহায্যও করতে চেয়েছিল, তবে শর্ত ছিল
লরিকে কথা দিতে হবে। গরু ব্যবসায়ীরা কোম্পানির কাজে কোনরকম বাধার
সৃষ্টি করবে না।'

'কিন্তু বিল বাধা দিত,' বায়ান বলল, 'ঠিক?'

মাথা ঝাঁকাল রাফেলা। 'লরি ঠিক করেছিল বিলের বিরুদ্ধে স্লেড আর তার
সঙ্গীদের সে উসকে দেবে। বিলকে খুন করতে চাইছিল ও, কিন্তু দোষ হত
স্লেডের।'

রাফেলার কথা শুনে পাথরের মত জমে গেল সবাই। কেইন ঘাড় ফেরাল
ওদের দিকে, বলল, 'এবার নিশ্চয় বুঝেছ তোমাদের সাথে আমার কোন বিরোধ
নেই?'

'বুঝেছি,' স্লেড জবাব দিল, 'কিন্তু এতে পরিস্থিতি পাল্টাচ্ছে না। লড়াই
আমাদের করতেই হচ্ছে।'

'তুমি তোমার লোকদের নিয়ে চলে যাও,' কেইন পরামর্শ দিল। 'বুচার
এখন অন্য ঝামেলায় ব্যস্ত। আমি কথা দিচ্ছি ওর দলবল তোমাদের ওখানে
যাওয়ার আগেই আমি তোমাদেরকে খবর দেব।'

গাল চুলকাল স্লেড, সিদ্ধান্তহীনতায় ভুগছে। তারপর সঙ্গীদের উদ্দেশ্যে
ফিরে বলল, 'বেশ, চলে যাচ্ছি আমরা।'

লম্বা-লম্বা পা ফেলে কেইনের পাশে এসে দাঁড়াল রায়ান, নিচু গলায় বলল,
'বুচার, টড জার্ডিস আর গ্যারিটি স্টারলাইটে আছে। ওদের কিছু লোক শহর
পানে রওনা হয়েছে, অন্যরা রেড ম্যানিয়নের তদারকিতে গরুবাছুর নামিয়ে
আনছে অ্যাঞ্জেল পীক থেকে।'

ভয়াল হাসি ফুটে উঠল কেইনের মুখে। 'আসতে দাও।'

'স্লেডকে আমাদের দরকার হবে,' তর্ক জুড়ল রায়ান। 'ওদের পাঠিয়ে দিয়ে
না।'

এপাশ-ওপাশ মাথা নাড়াল কেইন। 'না, এতে তুমুল লড়াই শুরু হয়ে
যাবে। অনেকে মারা যেতে পারে। তুমি আর আমিই যথেষ্ট। বুচারের সাথে
একটা ফয়সালা এখনও বাকি আছে আমার।'

'তুমি আর আমি,' আঁতকে উঠল রায়ান। 'শোন, কেইন-'

ব্যাংকারকে আমল দিল না কেইন, ঘাড় ফিরিয়ে রাফেলাকে বলল, 'তুমি
হোটেলে গিয়ে তোমার কামরায় থাক। কাল সকালে যখন স্টেজ ছাড়বে,
তোমাকে তাতে তুলে দেব।'

হ্যাঁচকা টান মেরে কেইনকে নিজের দিকে ফেরাল রায়ান। 'বাছা, একটু
বুদ্ধি খাটাও। এখন আমাদের লোকবল আছে, যা করার এইবেলা করাই ভাল।'

'বললাম তো, আমরা দুজনই যথেষ্ট।' এমন সুরে কথাটা বলল কেইন যে
ওখানেই সব তর্কের অবসান হয়ে গেল।

রাফেলা এগোল হোটেলের দিকে। কেইন ওর সঙ্গী হলো। ধূলি-ধূসর
রাস্তার মাঝামাঝি পৌছেছে ওরা। এই সময়ে হাঁপাতে-হাঁপাতে ওদের কাছে

দৌড়ে এল রায়ান, ফাঁসফাঁসে গলায় বলল, 'আরেকটা খবর জানাতে ভুলে গিয়েছিলাম। হার্ভে আজ বিকেলে মারা গেছে। জ্যাকি আর বব ওর লাশ নিয়ে এসেছে শহরে। কাছেপিঠেই কোথাও আছে ওরা।'

কেইন এক মুহূর্ত দাঁড়িয়ে রইল স্থাণুর মত, ভাবছে মৃত্যুর আগে টমাস হার্ভে জ্ঞান ফিরে পেয়েছিল কিনা। তারপর বলল, 'রাফেলাকে ওর ঘরে রেখে জ্যাকুলিন আর ববের খোঁজে যাচ্ছি আমি।'

'বব যুদ্ধ ঘোষণা-' রায়ান শুরু করল, কিন্তু কেইন তখন চলে গেছে, রাফেলার পাশাপাশি হওয়ার জন্য পা চালাচ্ছে দ্রুত।

বুচার নিশ্চয় রাফেলার স্যুটে আছে, কেইন ভাবল, সম্ভবত ওদেরকে আসতে দেখেছে শহরে। হয়তো গ্যারিটিও আছে ওর সঙ্গে।

লবিতে ঢুকল ওরা। কেরানি ছাড়া আর কেউ নেই। কৌতূহলী চোখে ওদের দিকে তাকাল সে। রাফেলা সিঁড়িতে পা রাখল, কেইন ওর পেছনে, ভাবছে বুচার যদি এখানে থেকে থাকে এখনই চূড়ান্ত ফয়সালা হয়ে যাবে।

রাফেলা যখন করিডরে পৌঁছাল কেইন বলল, 'দাঁড়াও।' দেয়ালে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে রইল রাফেলা, চেহারা হতাশার ছাপ। 'তুমি এখানেই থাক,' বলে ওর ঘরের দিকে এগোল কেইন। সিঁড়ির মাথায় ওয়াল ল্যাম্প রয়েছে একটা, তার ছিটেফোঁটা আলো এসে পড়েছে রাফেলার দরজায়। সাবধানে বাঁ হাতে নব ঘোরাল কেইন, ডান হাতে পিস্তল তৈরি। আপাতত রাফেলা ছাড়া অন্য কোনদিকে নজর দেবে না বুচার, ভাবল ও। শ্লেড এবং সি. সি. রেঞ্জ সম্প্রসারণের ব্যাপারটা এই মুহূর্তে বেশি গুরুত্ব পাবে না ওর কাছে, বিশেষ করে এগুলোর আসল উদ্দেশ্য যদি হয়ে থাকে রাফেলার মন পাওয়া। বেলা ইউনিয়নের সামনে খানিক আগে যা ঘটেছে তা যদি বুচারের চোখে পড়ে থাকে, সহজেই আন্দাজ করে নেবে রাফেলার সাথে কেইনও আসবে হোটеле।

দরজা ঠেলে ভেতরে ঢুকল কেইন, ডাকল, 'বুচার।' শূন্য কামরায় প্রতিধ্বনিত হয়ে ফিরে এল ওর গলা। স্থির দাঁড়িয়ে থাকল ও, আধো-অন্ধকারে চোখ কুঁচকে দেখছে ঘরের ভেতরটা, বিশ্বাস করতে কষ্ট হচ্ছে বুচার নেই এখানে। জানালার পর্দা তোলা, রাস্তার ম্লান আলোয় কারোকে দেখতে পেল না কেইন।

করিডর পেরিয়ে ঘরে এসে ঢুকল রাফেলা। ও একটা টেবিল ল্যাম্প জ্বালাতেই কেইন বলল, 'তুমি অপেক্ষা কর এখানে।' রাফেলাকে পাশ কাটিয়ে ওর শোবার ঘরে গেল কেইন। বিপদের আশঙ্কা করেছিল ও, তৈরিও ছিল সেজন্মা, কিন্তু ওর অনুমান ভুল হওয়ায় কিছুটা বিস্ময়বোধ করল।

সামনের দরজা আটকে ল্যাম্পহাতে শোবার ঘরে এল রাফেলা, বলল, 'এখানে কেউ নেই, কেইন। তুমি কী আশা করেছিলে?'

'বিপদ। ব্যাপারটা কেমন যেন গোলমালে মনে হচ্ছে। এখানে বা স্টারলাইট থেকে নজর রাখলে যে-কেউ আমাদের শহরে আসা দেখতে পেত।'

খাটের কিনারে বসল রাফেলা, অবসন্ন গলায় বলল, 'আমাকে একা থাকতে দাও, কেইন।'

কেইন তবু দাঁড়িয়ে থাকল, বুঝতে পারছে সত্যিকার অর্থেই মোয়েটার এখন সাহায্যের প্রয়োজন। ও বলল, 'তুমি তোমার কথা রেখেছ। আমি আমারটা রাখব।'

'সকালে দেখা কর। স্টেজ দশটার আগে ছাড়ে না।'

'আমি ববের খোঁজে যাচ্ছি। বিপদ দেখলে চিৎকার কর।'

ঘুরল কেইন, চোখের কোণে দেখল টেবিলের উপর সাদামত কী একটা পড়ে রয়েছে। কাছে গিয়ে দেখল ওটা একটা চিঠি, নীচে ব্যাক গ্যারিটির সই। ওতে লেখা গ্যারিটি চূপ করে রায়ানের কাছে পাঁচশো ডলার রেখেছে রাফেলার জন্য। টাকাটা রায়ান সকালে দিয়ে দেবে রাফেলাকে। বুচার যদি বাধা না দেয় রাফেলা যেন ওই টাকা নিয়ে স্টেজে চেপে অন্য কোথাও চলে যায়।

চিঠিটা আবার টেবিলের ওপর রেখে দিল কেইন। 'তোমার কোন অসুবিধে হবে না।'

রাফেলাকে রেখে শোবার ঘর থেকে বেরিয়ে এল ও, দরজার ছিটকিনি খুলে করিডরে পা রাখল, ভাবছে গ্যারিটির কাছে ঠিক এ রকম কিছুই আশা করা উচিত ছিল ওর। তবে কেবলমাত্র গ্যারিটির চিঠি আর টাকায় সমস্যার সমাধান হবে না। স্টেজ যখন ছাড়বে তখন যদি বুচার বেঁচে থাকে, স্ত্রীকে সে চলে যেতে দেবে না। গ্যারিটিও নিশ্চয় জানে একথা। করিডর ধরে নিজের ঘরের দিকে এগোতে এগোতে কেইন আন্দাজ করতে চেষ্টা করল যখন চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেয়ার সময় আসবে তখন গ্যারিটি কোন পক্ষে দাঁড়াবে। গ্যারিটি নিজেও বোধহয় জানে না এ ব্যাপারে, তবে আশা করেছে এমন কিছু ঘটবে যার ফলে সহজেই উদ্ধার পাবে রাফেলা, বুচারের সঙ্গে তার আনুগত্যের বন্ধন ছিন্ন করতে হবে না।

কেইন ওর দরজায় পৌঁছে লক্ষ করল কপাটের নীচ দিয়ে এক চিলতে আলো দেখা যাচ্ছে। সিঁড়ির মাথায় চলে এল ও, আবার স্নায়ুর চাপে ভুগতে শুরু করেছে। তা হলে বুচার এই চক্রান্ত করেছে। কেইন যা ভেবেছিল, ফাঁদ পেতেছে বুচার, তবে সেটা ওর ঘরে-রাফেলার না।

এক মুহূর্ত সিঁড়ির মাথায় দাঁড়িয়ে থাকল কেইন, তারপর পা টিপে-টিপে ওর দরজায় ফিরে গেল, হাতে পিস্তল উঠে এসেছে। সন্তর্পণে নব ঘোরাল ও, আচমকা একধাক্কায় পাল্লা খুলেই ঝাঁপিয়ে পড়ল ভেতরে। পরক্ষণে বোকা হয়ে গেল সে, উপলব্ধি করল তার বোঝা উচিত ছিল বুচার যদি সত্যিই ওর ঘরে ফাঁদ পাতত তা হলে আলো জ্বলত না।

জানালার পাশে একটা চেয়ারে বসে আছে জ্যাকুলিন, কেইন দেখল ও কান্দছিল। উঠে ওর কাছে এল জ্যাকি, হাসতে চেষ্টা করল। 'খোদার কাছে আমি প্রার্থনা করছিলাম, তুমি যেন এখানে আস, মাইক। ভীষণ ভয় হচ্ছিল আমার, কেবলই মনে হচ্ছিল আর বোধ হয় দেখতে পাব না তোমাকে।'

নিজের হাতের ভেতর ওর হাত টেনে নিল কেইন। 'রায়ানের কাছে গুনলাম তোমার বাবার ব্যাপারে। আমি দুঃখিত—'

'না, বিল। একপক্ষে এ-ই ভাল হয়েছে। বাবার জ্ঞান আর ফিরে আসেনি।

ওধু এক সময় নিশ্বাস বন্ধ হয়ে গেছে। এখানে তো সুখ পেলেন না, খোদা মেহেরবান, এবার নিশ্চয় সুখ দেবেন বাবাকে।

‘তোমার বাবা যদি তোমাদের একটু বলতে পারতেন—’

‘সেখানেই হয়েছে সমস্যা,’ কেইনকে বাধা দিল জ্যাকি। ‘উনি বলে যেতে পারেননি, আর সেই সুযোগে গ্যারিটি ববকে বুঝিয়েছে কাজটা তোমার। এখন বব বদলা নেওয়ার জন্য তোমাকে খুঁজছে।’

‘ও কীভাবে বিশ্বাস করল এটা।’

‘করেছে। কথা বানানোর ব্যাপারে গ্যারিটির জুড়ি নেই। কিন্তু এক্ষেত্রে কারণটা ভিন্ন। আমি ববকে বলেছি তুমি আমাদের বাথানের শেয়ার কিনতে চাও, আর গ্যারিটিও কীভাবে যেন জেনে গেছে সেটা।’

‘আমিই বলেছি।’

‘আচ্ছা। জানই তো, বব বিশ্বাস করেনি বাবা বুচারের সঙ্গে বোঝাপড়া করতে গিয়েছিলেন। গ্যারিটি ওকে বুঝিয়েছে তুমিই বাবাকে খুন করেছ যাতে আমরা বাথানের মালিক হতে পারি। কারণ তুমি জানতে তোমার শেয়ার কেনার ব্যাপারে বাবা কখনোই রাজি হবেন না।’

কেইন বুঝতে পারল গ্যারিটি কেমন সুকৌশলে তথ্যটাকে ওদের স্বার্থে ব্যবহার করেছে। ‘কিন্তু বব পারবে না আমার সাথে? গান ফাইটের কিছু জানে ও?’

‘না,’ কম্পিত গলায় বলল জ্যাকুলিন। ‘ও জানে লড়াই হলে তুমি ওকে হত্যা করবে, কিন্তু বব পিছপা হবে না। গ্যারিটি ওকে বুঝিয়েছে তোমার সাথে ওর লড়া উচিত, যাতে সবাই বুঝতে পারে ও বাবার মত কাপুরুষ না।’

এবার সহসাই সমস্যার প্রকৃত রূপ উপলব্ধি করল কেইন। বুঝতে পারল এর সাথে ও আর জ্যাকির কী সম্পর্ক। আজ পর্যন্ত কোন লড়াই থেকে পিছিয়ে আসেনি ও। এ জন্য একধরনের অহঙ্কার আছে ওর, ফলে লড়াই হলে এবারও পিছু হটবে না। কিন্তু যদি জ্যাকির ভাইকে হত্যা করে তা হলে কোনদিন জ্যাকির ভালবাসা সে পাবে না।

জ্যাকুলিনকে পাশ কাটাল কেইন, বিছানায় গিয়ে বসল, সিগারেটের মশলার ঝোঁজে হাত আপনাআপনি চলে গেছে পকেটে। ও জানে আনুগত্যের বেড়াজালে আটকা পড়েছে গ্যারিটি, এবার সে কেইনকেও একই ফাঁদে জড়িয়েছে। কেইনের মনে হলো কেয়ামতের দিন যেন আসন্ন। ক্ষণিকের জন্য বেহেশতের চেহারা দেখতে পেয়েছে সে, তারপর দরজাটা তার মুখের ওপর বন্ধ করে দেয়া হয়েছে।

বিশ

তামাকের ধলে আর কাগজ হাতে, অনেকক্ষণ খাটের কিনারে চুপচাপ বসে রইল কেইন, হতাশার গ্রানিতে ছেয়ে গেছে মন। ভালবাসা! জিনিসটা কেমন আপে কখনও জানত না ও; এমনকী একটা মেয়েকে পাবার জন্য যে সব পুরুষ উদ্ভাস হয়ে উঠত তাদের প্রতি করুণাবোধ করত।

মাইকেল কেইনের কাছে সবসময়ই ব্যাপারটা ছিল সোজাসাপ্টা। সংসারে দুধরনের মেয়ে আছে। কেউ মলি পিয়ারসনের মত, সামান্য কয়েকটা ডলারের বিনিময়ে কেনা যায়। অন্যরা রাফেলা বুচারের মত—এদেরকেও কেনা যায়, তবে তার মাপুল একটু চড়া হয়। জ্যাকুলিনের দিকে তাকাল ও; ওর নাকের বাদামি তিল, লাল চুল, কালচে নীল চোখে উৎকণ্ঠা সবই দেখল খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে। জ্যাকুলিন হার্ভেকে কেনা যাবে না। কোনভাবেই না। কোল্যাটাসে প্রথম দর্শনেই ওর মাঝে সে একধরনের অটল সত্যতাকে প্রত্যক্ষ করেছিল। কেইনের মনে হলো সেই দিনটা যেন বহু আগের। গত কয়েক ঘণ্টায় বহুকিছু ঘটে গেছে; এত অল্প সময়ের ভেতর, বোধহয় ওর জীবনে এতবড় ওলটপালট আর হয়নি। ওর, জ্যাকুলিন আর ববের ভবিষ্যৎ—সবকিছুই জড়িত এর সঙ্গে।

একটা কাগজে কিছু তামাক নিয়ে সিগারেট বানাল কেইন, ববের সাথে প্রথম দেখার কথা ভাবছে। ওর মনে পড়ল ছেলেটাকে দেখে সেদিন ওর ঈর্ষা হয়েছিল। ক্ষমতা থাকলে, ববের সঙ্গে নিজের জায়গা বদল করত সে; যদি পুনর্জন্ম নিতে পারত, বব যেভাবে করেছে সেভাবে শুরু করত ওর জীবন। অথচ এখন সেই যুবকই শান্তির পথ ছেড়ে অশান্তির দিকে ঝুঁকেছে। ভুল। কোন লাভ নেই এতে। সিগারেট ধরাল কেইন, চোখ সরিয়ে নিয়েছে জ্যাকির ওপর থেকে, গ্যারিটির কথাগুলো গরম শিকের ছাঁকার মত বাজছে কানে। 'ভাড়াটে বন্দুকবাজ হিসেবে তুমি যে দুর্নাম কামিয়েছ তা কোনদিন ঘুচবে না।' এই কথাই এখন ওর আর জ্যাকির মাঝে বিচ্ছেদের দেয়াল তুলেছে। ববের জন্য কিছুই করার নেই ওর। আর এখানেই হয়েছে সবথেকে জ্বালা। কারণ এই জীবনের যন্ত্রণা সে নিজেও ভোগ করছে। রবার্টের এখন আর পিছু হটার উপায় নেই। মানবচরিত্র গ্যারিটি ভালই বোঝে, আঁতে ঘা দিয়ে ওকে উসকে দিয়েছে।

বুচার আর গ্যারিটি জানে লড়াই হলে কেইনের সামনে টিকতে পারবে না বব। হয়তো তলে-তলে ওরা কোন ফন্দি এঁটেছে যাতে কেইন ববকে মারার আগেই পেছন থেকে ওকে মারতে পারে ওরা। কিংবা হয়তো ভেবেছে বব মরলেই ওদের সুবিধা, কারণ এরপর আর ডিলন মেসায় থাকতে পারবে না কেইন। ব্যাপারটা যা-ই হোক, বস্তুর এ-কারণেই রাফেলার কামরায় ফাঁদ পাতা হয়নি। গ্যারিটি এর চেয়েও ভাল মতলব ঠাউরেছে।

সময়জ্ঞান হারিয়ে ফেলল কেইন। নীরবে বসে রইল খাটের কিনারে, দুই কাঁধ আড়ষ্ট হয়ে আছে, ঠোঁটের ফাঁকে মরা সিগারেট। জ্যাকুলিন এগিয়ে এসে নিচু গলায় জিজ্ঞেস করল, 'তুমি এখন কী করবে, মাইক?'

'পালাতে পারব না,' মেঝের দিকে তাকিয়ে জবাব দিল কেইন। 'তোমরা যে-কারণে তোমাদের বাবাকে বুচারের কাছে বাখান বেচতে দাওনি, আমিও ঠিক সে কারণেই পালাতে পারব না। পালানো সম্ভব নয় বলে।'

'কিন্তু ও এখনও ছেলেমানুষ।'

'তোমাদের বয়স সমান, অথচ তোমার বুদ্ধি কত পরিণত।'

'বয়সটাই সব না, মাইক।'

'তুমি বলেছিলে তোমাদের চিন্তাভাবনায় মিল আছে।'

'বরাবর তাই ছিল, কিন্তু এই ব্যাপারটা আলাদা। বব এখন নিজের পায়ে দাঁড়াতে চায়। ওর ধারণা বাবার দুর্নাম ঘুচানোর দায়িত্ব ওর। ওকে যদি বিশ্বাস করানো যায় বুচারের সঙ্গে বোঝাপড়া করার জন্য বাবা সি.সি. ব্যাঞ্চে গিয়েছিলেন, তা হলেই পরিস্থিতি বদলে যাবে।'

কেইন জানে কথাটা সত্যি। সেক্ষেত্রে লজ্জার বদলে বাবাকে নিয়ে গৌরব করতে পারবে বব, কিন্তু ওকে বোঝাবার কোন উপায় নেই। বুচার আর গ্যারিটি সত্য কবুল করবে না, টমাস হার্ভের খুন্সী জার্ডিসও না। রাফেলা নিজের চোখে গোলগুলি দেখেনি, ফলে এরকম কেউ নেই যে ববকে জানাতে পারবে আসলে কীভাবে ঘটেছিল ঘটনাটা। বব যদি ঠাণ্ডা মাথায় চিন্তাভাবনার সময় পেত, শেষপর্যন্ত ঠিকই ধরে ফেলত গ্যারিটির মতলব; কিন্তু এখন ওই সময়েরই বড় অভাব। বব অপেক্ষা করছে কেইনের জন্য, সম্ভবত স্টারলাইটে। যদি সে ওখানে না যায়, বব এখানে আসবে। আবার সেই অতিপরিচিত পরিস্থিতির মুখোমুখি হয়েছে কেইন-মার নয়তো মর। তবে একটা তফাত আছে। ববকে সে খুন করতে পারবে না। যদি ববকে সুযোগ দেয় ওকে খুন করার, সেটাও ছেলেটার জন্য মঙ্গলের হবে না। দুদিন আগে বা পরে, আসল ঘটনা ও ঠিকই জানবে। এবং তখন ও যতদিন বাঁচবে কেইনের মৃত্যু একটা দুর্বিষহ বোঝা হয়ে থাকবে ওর জন্য।

'তা হলে কী করবে?' আবার প্রশ্ন করল জ্যাকি।

'তুমি কী করতে বল?'

'চলে যাও শহর ছেড়ে,' ফিসফিস করে বলল জ্যাকি। 'এটা ঠিক পালানো না, মাইক। আমি ভেবেছিলাম তুমি-মানে আমরা-' জিভ দিয়ে শুকনো ঠোঁটজোড়া ভেজাল জ্যাকুলিন। 'দেয়ার মত আমার তেমন কিছু নেই, মাইক, কিন্তু আমি ঠিক করেছি তোমার সাথে চলে যাব। ববকে এখানে রেখে যাব আমরা, বাখানটা ও-ই নিক। আমরা সাউথ পার্কে চলে যাব, তোমার পছন্দের জায়গাটা কিনব।'

উঠে ওর মুখোমুখি হলো কেইন। 'আমি তোমাকে ভালোবাসি,' বলল নিচু সুরে, 'কিন্তু এভাবে পেতে চাই না।'

ওর কাছ থেকে সরে গেল জ্যাকি, জানালায় গিয়ে দাঁড়াল, বাইরের

অন্ধকারের ভেতর চেয়ে আছে। 'আমিও তোমাকে ভালবাসি, মাইক।'

জ্যাকির পিঠের দিকে তাকিয়ে থাকে কেইন, কপালে ঘাম দেখা দিয়েছে। ওই মেয়েকে চায় সে এবং পেতেও পারে। চুপিসারে খিড়কি দিয়ে বেরিয়ে পেছনের গলি ধরে লিভারি স্ট্যাবলে যেতে পারবে ওরা। সেখান থেকে ঘোড়ায় চেপে চলে যাবে অন্য কোথাও। সম্ভাবনাটা মুহূর্তের জন্য সুরেলা এক ঘণ্টা বাজাল ওর কানে, তারপর মিলিয়ে গেল। কিন্তু অপবাদ তাড়া করবে ওকে। অন্য মানুষের ক্ষেত্রে এরকম হতে দেখেছে সে। লোকে বলবে মাইকেল কেইন তার সাহস হারিয়ে ফেলেছে। একটা আনাড়ি ছোকরার ভয়ে পালিয়েছে সে। না, এ-কাজ সে করতে পারবে না। এমনকী জ্যাকির জন্যও নয়। অহঙ্কার, নিছক অহঙ্কার, কিন্তু এই পেশায় কেইন এখন এমন এক স্তরে আছে যেখান থেকে পিছু হটা অসম্ভব।

তারপর আরেকটা ব্যাপারে উপলব্ধি করল ও, এবং বিস্মিত হলো। জ্যাকুলিন হার্ভেকেও কেনা সম্ভব। ওর ভাইয়ের জীবনের বিনিময়ে। একমাত্র রবার্টের প্রতি ভালবাসার কারণেই এরকম একটা কঠিন সিদ্ধান্ত নিতে পেরেছে মেয়েটা। জীবনে কখনও এমন ভালবাসার স্বাদ কেইন পায়নি। কাছে গিয়ে জ্যাকিকে জড়িয়ে ধরল ও। দীর্ঘক্ষণ ওইভাবে দাঁড়িয়ে রইল মেয়েটা, চোখ অন্ধকারের দিকে, মাথার পেছনটা ডুবে আছে কেইনের বুকে।

'কোন লাভ হবে না,' একসময় বলল কেইন। 'কিছুদিন পর তুমি আমাকে ঘৃণা করবে, আর আমিও হয়তো তোমাকে ঘৃণা করব আমাকে পালাতে বাধ্য করেছ বলে।'

'তাই,' ফুঁপিয়ে উঠল জ্যাকি। 'এখন মনে হচ্ছে নরক কী বস্তু আমি বুঝতে পারছি, মাইক। তোমাদের দুজনকেই আমি ভালবাসি। এর মধ্যে একজনকে বেছে নেব কীভাবে?' একটুক্ষণ চুপ করে রইল কেইন, মাথায় একটা পরিকল্পনা খেলতে শুরু করেছে, যদিও সেটা খুব মজবুত না। ও ভেবেছিল রাফেলার খোঁজে বুচার আর গ্যারিটি আসা পর্যন্ত এখানে সে অপেক্ষা করবে, তারপর যখন আসবে ওরা, নিজের পছন্দমত কায়দায় বোঝাপড়া করবে। এখন আর তা করা সম্ভব হবে না। ওরা আসবে না, কারণ জানে গ্যারিটির ধাপ্পা সেই কাজটি করে দেবে ওদের হয়ে।

'বোধহয় একটা উপায় আছে,' কেইন বলল। 'আমাকে বিশ্বাস হয়?'

'হয়,' অস্ফুট স্বরে বলল জ্যাকি।

'এতে কাজ হবেই তা বলছি না, তবে অপেক্ষা করার চাইতে ভাল। তুমি স্টারলাইটে গিয়ে ববকে বলবে আমি আমার কামরায় আছি। বা অন্য কিছুও বলতে পার। কেবল ওকে সরিয়ে দেবে ওখান থেকে।'

'যদি স্টারলাইটে না থাকে?'

'আমার বিশ্বাস আছে। আর যদি একান্তই না থাকে, লক্ষ রাখবে ও যেন আসতে না পারে। পারবে না করতে?'

'চেষ্টা করব।'

'স্রেফ পাঁচ মিনিট সময় পাইয়ে দাও আমাকে,' বলে ঘর থেকে বেরিয়ে

গেল কেইন, করিডর ধরে পেছনের সিঁড়িতে গেল।

সিঁড়ির মাথায় মুহূর্তের জন্য থামল সে, পিস্তলে গুলি ভরা আছে কিনা দেখে নিয়ে আবার খাপের ভেতর এমনভাবে রাখল যেন সহজেই বের করা যায়। তারপর নীচে নেমে গেল ও, পেছনের দরজা দিয়ে গলিতে নামল। যখন স্টারলাইটের পেছনের অংশে এল কেইন দেখল দেয়ালে ঝোলানো লঠনের আলোয় লোডিং প্র্যাটফর্মে মাল খালাস করছে এক লোক।

হালকা চালে ও প্রশ্ন করল, 'গ্যারিটি ভেতরে?'

লোকটা সোজা হয়ে, কৌতূহলী চোখে তাকাল কেইনের দিকে। 'হ্যাঁ। বুচার আর টড জার্তিসও আছে। আর হার্ভের ছেলেটা। জরুরি পরামর্শ করছে ওরা। তুমি না গেলেই ভাল করবে, মিস্টার।'

'গ্যারিটিকে আমার একটু দরকার,' প্র্যাটফর্মে উঠে বসল কেইন।

এবার সন্দিক্ত হয়ে উঠল লোকটা, বলল, 'এটা খোশগল্প করার সময় না, মিস্টার।'

'খোশগল্প করব না,' বিরক্তির সুরে জবাব দিল কেইন। 'আমার কাছে গ্যারিটির কিছু দেনা আছে, পাওনা বুঝে নেয়ার এর চেয়ে ভাল সময় আর পাব না।'

লোকটাকে ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে গুদাম-ঘরে ঢুকে গেল কেইন, পেছনের দরজা আটকে হড়কো তুলে দিল। হড়কো তোলার শব্দ পেয়ে দরজায় লাথি মারতে শুরু করল লোকটা, ত্রুষ্ক গলায় গালি-গালাজ করতে লাগল। ওকে পাত্তা দিল না কেইন, অন্ধকারের ভেতর দিয়ে পথ করে এগিয়ে স্যালুনে ঢোকার দরজায় এসে থামল। কান পাতল ও, বেশকটা গলা শুনতে পেল, কিন্তু দূর থেকে ভেসে আসায় চিনতে পারল না। পাত্তা সামান্য ফাঁক করল ও। তবু ঘরটা কতখানি লম্বা বা ভেতরে কে-কে আছে বুঝতে পারল না; অথচ ওর সময় ফুরিয়ে আসছে, জানে আর অপেক্ষা করার উপায় নেই। দরজাটা আরেকটু ফাঁক করল কেইন, আলগোছে ঢুকে পড়ল স্যালুনের ভেতরে।

বুচার আর জার্তিস কামরার সামনের অংশে দাঁড়িয়ে রয়েছে, বুচার বারের পাশে, জার্তিস তার বাঁয়ে খানিকটা দূরে। গ্যারিটি বারের পেছনে। চকিত নজরেই কেইন দেখল রোজকার বারটেন্ডার উপস্থিত নেই। বব হার্ভেকে কাছেপিঠে দেখা যাচ্ছে না। ওদের দিকে এগিয়ে গেল কেইন, মাথা দ্রুতগতিতে কাজ করছে। কাজটা এখনই শেষ করতে হবে-বব ফিরে আসার আগেই। জ্যাকুলিন ওকে বেশিক্ষণ আটকে রাখতে পারবে না।

কেইনকে প্রথম দেখতে পেল জার্তিস। গাল বকল ও, চোঁচিয়ে উঠল, 'শালা, বন্দুকবাজ।'

পাই করে ঘুরল বুচার, চশমার ভেতর দিয়ে পিটপিট করে তাকাল কেইনের দিকে। গ্যারিটি বলল, 'তুমি বোধহয় বব হার্ভেকে খুঁজছ, কেইন। নিশ্চয় শুনেছ ও-ও তোমাকে খুঁজছে।'

খোঁচাটা গায়ে মাখল না কেইন। এখনই আক্রমণ শানাতে হবে, নইলে ফালতু কথা বলে বব ফিরে না আসা অবধি ওকে দেরি করিয়ে দেবে গ্যারিটি।

‘আজ আমি অ্যাবনার লরিকে খুন করেছি, বুচার,’ কেইন বলল কঠিন গলায়। ‘অথচ তোমারই উচিত ছিল ওকে মারা। আমার বউ যদি কারও সাথে পালাত, আমি নিজের হাতে খুন করতে চাইতাম সেই লোককে।’

‘বেরিয়ে যাও,’ চেষ্টা করে উঠল গ্যারিটি। ‘সাহস থাকে তো বব হার্ভেকে খোঁজ গিয়ে-’

‘চুপ কর।’ এগিয়ে এল কেইন, ধীরপায়ে হাঁটছে, চোখের কোণে লক্ষ রাখছে গ্যারিটির ওপর। ‘শোন, বুচার, তোমার বউ হোটেলে আছে। কাল সকালের স্টেজে চলে যাচ্ছে ও। আমি সাধারণত কারও পারিবারিক ব্যাপারে জড়াই না, তবে এতে জড়ানো। আমি নিজে দাঁড়িয়ে থেকে ওর যাওয়ার ব্যবস্থা করব।’

একথার পর আর চুপ থাকতে পারল না বুচার। ফাঁসফাঁসে গলায় একটা চিৎকার দিয়ে হাত বাড়াল পিস্তলের দিকে, দৌড়ে আসতে শুরু করল কেইনের উদ্দেশ্যে। কিন্তু ততক্ষণে কেইনের হাতে পিস্তল উঠে এসেছে, তিনজনের মধ্যে গ্যারিটি সবচেয়ে চালু হবে আন্দাজ করে ওকেই করল প্রথম গুলিটা। গ্যারিটির ডান হাতে আঘাত হানল তপ্ত সীসা, ভারি ক্যালিবারের বুলেটের ধাক্কায় আধপাক ঘুরে গেল জুয়াড়ি।

বুচার পিস্তল বের করে ফেলেছে। গুলি করল কেইনকে, কিন্তু চশমা পরে কাছের জিনিস ভালমত দেখতে পায় না বলে মিস্ করল। চোখের কোণে কেইন লক্ষ করল টড জার্ডিসের পিস্তল হোলস্টার থেকে বেরিয়ে এসেছে আধাআধি। এখন দুজনের যে-কারোকে বেছে নিতে হবে ওর, কেইন বুঝতে পারল। বুচার না থাকলে, জার্ডিস এমন নিতেও শক্তিহীন হয়ে পড়বে। তাই বুচারকেই গুলি করল ও।

জার্ডিস ওকে ঘায়েল করবে আশঙ্কা করেছিল কেইন, কিন্তু স্যালুনের দরজা থেকে আচমকা আরেকটা গুলি হলো, বারের কিনার থেকে দূরে ছিটকে পড়ল জার্ডিস। ঘাড় ফিরিয়ে কেইন দেখল দোরগোড়ায় প্যাডি রায়ান দাঁড়িয়ে, হাতের পয়েন্ট ফোর ফাইভ থেকে ধোঁয়া বেরুচ্ছে অল্প-অল্প।

বুচারের পিস্তল হাতছাড়া হয়েছে। এবার হাঁচড়ে-পাঁচড়ে উঠে বসল সে, হাত বাড়াল পিস্তলের দিকে, কিন্তু ওর তখন শেষসময় উপস্থিত। চিত হয়ে মেঝেতে পড়ে গেল ও, কষ বেয়ে রক্তের ধারা নেমেছে, দুবার খিঁচুনি দিয়েই স্থির হয়ে গেল শরীর, পিস্তলের বাঁটের ওপর হাত শক্ত হয়ে গেছে।

গ্যারিটির দিকে পিস্তল তাক করে বারের উদ্দেশ্যে এগোল কেইন। ঠিক ওই সময়ে ব্যাটউইং ঠেলে ভেতরে ঢুকল রবার্ট হার্ভে, মুখ সাদা। চেষ্টা করে উঠল ও, ‘কেইন, আমি তোমাকে-’

‘চোপ।’ ওর পিঠে পিস্তল ঠেসে ধরল রায়ান। ‘গোঁফের রেখা দেখা না দিতেই পাখা গাজিয়েছে, না? চুপ করে শোন আগে, কেইনের কী বলার আছে।’

গ্যারিটির দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল কেইন। কনুই থেকে জুয়াড়ির ডান হাত বুলছে ল্যাগব্যাগ করে, শ্যামলা মুখাবয়বে যন্ত্রণার ছাপ স্পষ্ট। কেইন

জিজ্ঞেস করল, 'তোমার বাঁ হাত কেমন চালু, ব্যাক?'

'একদম না,' গ্যারিটি জবাব দিল। 'প্রথম দিন তোমাকে দেখেই বুঝেছিলাম তুমি একটা আস্ত কুফা। লরি সেই রাতে তোমাকে মারতে পারলে আমরা সবাই বাঁচতাম।'

নিশ্চল হয়ে দাঁড়িয়ে আছে রবার্ট, পালা করে জার্তিস আর বুচারের লাশ দেখেছিল। এবার কেইনের উদ্দেশে বলল, 'আমি তোমাকে ছাড়ব না, কেইন। ওদের মেরেছ বলে তুমি রেহাই পাবে না।'

'যাতে পাই গ্যারিটি তার ব্যবস্থা করবে,' শান্ত গলায় বলল কেইন। 'পিস্তল ধরতে পারবে না এমন লোককে আমি কখনও খুন করিনি, কিন্তু ও যদি মুখ না খোলে আজ তাই করব।'

'আমি বেঁচে থাকতে চাই।' এপাশ-ওপাশ মাথা নাড়িয়ে, বুচারের লাশের দিকে তাকাল গ্যারিটি। 'যাই বল, কেইন, লোকটা কিন্তু দারুণ একটা প্রতিভা ছিল। দুটো ওণ ছিল ওর। টাকা বানাতে জানত, আর লোক খাটাতে পারত। আমার ওপর নির্ভর করেছিল বিল, কিন্তু আমি ওকে বাঁচাতে পারলাম না।'

'আসল কথাটা বল।'

'এখন আর না বলার কোন মানে হয় না।' বাঁ হাতে বারের রেইল ধরে নিজেকে সোজা রাখল গ্যারিটি, ব্যথায় দুই ঠোঁট পরস্পর চেপে বসেছে। একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে ও বলল, 'আমরা তোমাকে ধাওয়া দিয়েছিলাম, বব। টড জার্তিস তোমার বাবাকে খুন করেছে। টমাস বিলকে ওর বাসায় জানাতে গেছিল সে কম্বাইন ছেড়ে দিচ্ছে। বিলকে ও জোচ্চর বলে গাল দিয়েছিল, কিন্তু বিল লড়াই করেনি। তারপর টমাস যখন বাড়ির পথ ধরে তখন জার্তিসকে পাঠিয়ে ওকে মারিয়েছে।'

হাতের পিঠ দিয়ে কপালের ঘাম মুছল রবার্ট, ভয়ার্ত শিশুর মত কাঁপছে ঠকঠক করে। কেইন বুঝতে পারল সমস্ত ভুল বোঝাবুঝির অবসান হয়েছে এখন। ও বলল, 'গ্যারিটি, তুমি মনে হয় অনেকদিন বাঁচবে-অন্য কোথাও।'

'অবশ্যই,' অক্ষুট স্বরে বলল গ্যারিটি। 'রাফেলাকে নিয়ে আমি চলে যাব। রায়ান, তোমার কাছে স্টারলাইট বেচে দেব আমি। সস্তায়। এই শহরে তুমিই যা একটু ডাক্তারি জান। এবার আমার জখমের চিকিৎসা কর।'

ঘরে ঘর থেকে বেরিয়ে এল কেইন। গুদাম-ঘর পেরিয়ে পেছনের দরজা খুলে দিল ও। লোডিং প্ল্যাটফর্মে এসে দেখল যে-লোকটা মাল খালাস করছিল ওখানে সে চলে গেছে। লাফিয়ে গলিতে নামল কেইন, লিভারি স্ট্যাবলের দিকে দৌড়াতে শুরু করল।

এখানে থাকতে পারবে না ও। জ্যাকিকে ও ভীষণ ভালবাসে, বিয়ে না করে ওর কাছাকাছি থাকা সম্ভব হবে না। আবার, ওকে বিয়ে করবে তাও সম্ভব না। ওর প্রতি মেয়েটার যত দুর্বলতাই থাকুক, সময়ে সব ঠিক হয়ে যাবে। সময়! হ্যাঁ, সময়ই এই সমস্যার একমাত্র সমাধান। আর কোন পুরুষকে ও খুঁজে

নেবে। ওকে ভুলে যাবে।

গলি থেকে বেরিয়ে লিভারি স্ট্যাবলে গিয়ে ঢুকল কেইন। আস্তাবল মালিক আরেক প্রান্তে রয়েছে দেখে চোঁচিয়ে বলল, 'আজ যে ঘোড়াটা নিয়েছিলাম সেটা আমি কিনতে চাই। স্যাডলসহ। কত পড়বে?'

লঠনের স্থান আলোয় কেইনের মুখ একটুক্ষণ জরিপ করল আস্তাবল মালিক, বুঝতে পারছে কেইনের তাড়া আছে। সুযোগ পেয়ে দর বাড়াল সে। 'দেখ, ভাল জিনিস—'

'কত?'

'তা শ-খানেক—'

'বেশ,' বলে ঘোড়ার দাম চুকিয়ে দিল কেইন।

ঘোড়ার পিঠে জিন চাপাচ্ছে ও এই সময় শুনতে পেল জ্যাকুলিন বলছে, 'মাইক, তুমি নিশ্চয় চলে যাচ্ছ না?'

জ্যাকুলিনের দিকে ঘুরল কেইন, আরও আগেই চলে যায়নি বলে মনে-মনে অভিশাপ দিল নিজেকে। 'হ্যাঁ, চলেই যাচ্ছি।'

কাছে এল জ্যাকি, মাথা উঁচু করে আছে। 'বব?'

'না। গ্যারিটি সবকিছু খুলে বলেছে ওকে।'

'তা হলে?'

টোক গিলল কেইন, জ্যাকিকে বুকে টেনে নেয়ার ইচ্ছে দমন করল অতিজকটে। বলল, 'গ্যারিটি একবার আমাদের বলেছে, আমার দুর্নাম কোনদিন ঘুচবে না। অপঘাতে মৃত্যু হবে আমার। এর ভেতর তোমাকে আমি জড়াতে পারব না, জ্যাকি। নিজের কাছেই অপরাধী হয়ে যাব।'

ওর গা ঘেষে দাঁড়িয়ে আছে জ্যাকুলিন, মুখে লঠনের আলো এসে পড়েছে। 'মাইক,' বলল ও, 'আমি জানি তুমি কী ভাবছ। এজন্যই তোমাকে এত ভাল লাগে। তবে একটা জিনিস তুমি ভুলে যাচ্ছ। তোমাকে প্রয়োজন আছে ডিলন মেসার লোকদের। বহু কাজ বাকি রয়ে গেছে এখনও।'

একদৃষ্টে ওর মুখের দিকে চেয়ে রইল কেইন, ভাললাগায় মন উথালপাতাল করছে। জ্যাকি বোধহয় ওর মনোভাব বুঝতে পারল, তাই তাড়াতাড়ি শেষ করল কথা। 'বন্দুকবাজিতে অন্যায়ের কিছু নেই, মাইক। কাজটা তুমি কার স্বার্থে করছ সেইটেই আসল। তোমার যদি সত্যিই অপঘাতে মৃত্যু হয় কখনও, যে কটাদিন কাটাতে পারব তোমার সাথে তাতেই সুখী থাকব বাকি জীবন।'

স্যাডলের দিকে ঘুরল কেইন, তারপর অনুভব করল হাত টেনে ধরেছে জ্যাকি। মেয়েটার কথা ঠিক, ওকে প্রয়োজন মেসার লোকদের। ছোটখাট অনেক ক্রটিবিচ্যুতি এখনও রয়ে গেছে, সেগুলো সারিয়ে তুলতে হবে। তবে ও সব থেকে উপকারে আসতে পারবে ববের। ও এখনও ছেলেমানুষ, সুপথে ওকে চালাবার জন্য একজন অভিভাবক দরকার।

'মাইক,' আবার ডাকল জ্যাকুলিন, 'আমার মুখের দিকে তাকাও। বব, মার্সেনারি

আমাকে ভূমি ভালবাস না।’

‘পারব না বলতে।’

‘তা হলে আমি তোমার সাথে যাব।’

স্যাডল থেকে হাত সরিয়ে নিল কেইন, তাকাল জ্যাকির দিকে। সহসাই মনে হলো ও ভুল করতে যাচ্ছিল। নিজেকে ভাল করার সময় এখনও আছে।

SHAMIM

